বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ

এম. আই. হোসেন

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ
বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
দ্বিতীয় সংস্করণ)

এম. আই. হোসেন

ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ
এম. আই. হোসেন

Eastern Publications
105, Great Rasel Street, Landon
W C 2 B 3 PL. Great Briten.

প্রকাশকাল
বাংলা সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৩ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৩ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সংস্করণ:
তৃতীয় প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৪ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব : © লেখক

মুদ্রণে : ধ্রুব প্রিন্টিং প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা

কভার ডিজাইন ও বর্ণবিন্যাস : এস ইসলাম, লন্ডন

প্রাপ্তিস্থান : অভিজাত লাইব্রেরী সমূহ

ISBN : 974-1-41445 -0

বাংলা সংস্করণ মূল্যঃ
বোর্ড বাঁধাই : ৫০০.০০ টাকা মাত্র
বিদেশে মূল্য : £. 10 only

www.pathagar.com

[illegible]

খণ্ড : এক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

খণ্ড : দুই

স্বাধীনতার যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন
একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

খণ্ড : তিন

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার
আইনগত বিশ্লেষণ

খণ্ড : চার

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার

শেষকথা

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের
অর্থই যদি স্থায়ী দেশপ্রেমবোধ হিসেবে
বিবেচিত হতে থাকে,
তাহলে আরেকটি অনুরূপ মুক্তিযুদ্ধ
সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত দেশপ্রেমের
সনদপত্র কেউ কি পাবে না ?
এরূপ হলে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের
পরবর্তী কাল থেকে এ পর্যন্ত
স্বাধীন বাংলাদেশে যারা জন্ম নিয়েছে,
তাদের দেশপ্রেম নির্ণিত হবে
কোন মানদন্ডের ভিত্তিতে ?

– মেজর এম এ জলিল

মেজর জলিল রচনাবলী

(পৃষ্ঠা ১৭)

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়সূচি	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট তালিকা		১৭
যে জন্য এ লেখা		১৯

খণ্ড : এক (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ)

অধ্যায় : এক

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ	২৭
সুবে বাংলার পরাধীনতার একশত নব্বই বছর	২৭
পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান	৩৬
পাকিস্তান ভাঙ্গনের সুর	৪১
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট	৪৬
৭ মার্চ ১৯৭১ : শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ	৪৯
২৫ মার্চ ১৯৭১ ঃ কালো অধ্যায়ের সূচনা	৫১
Operation Searchlight	৫৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৫৫
ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহরুল হক হল)	৫৮
জগন্নাথ হল	৫৯
রাজার বাগ পুলিশ লাইন	৬০
ই পি আর	৬১
শাঁখারী পট্টি	৬১
রমনা কালী বাড়ি	৬২
জিঞ্জিরা অপারেশন	৬২
চুকনগর হত্যাকান্ড	৬২
অন্যান্য স্থান	৬২
মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা	৬৩
মুজিব নগর সরকার গঠন	৭৫
বিপুল সংখ্যক মানুষের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ	৭৮
মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনী গঠন এবং প্রশিক্ষণ	৭৮

অধ্যায় : দুই

স্বাধীনতা যুদ্ধে পক্ষ বিপক্ষ	৮৩
স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষ শক্তি	৮৪
আওয়ামী লীগ	৮৪
মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টি	৮৫

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনী	৮৫
ছাত্র এবং ছাত্র সংগঠন	৮৬
সাধারণ মানুষ	৮৬
কাদেরিয়া বাহিনী	৮৬
হেমায়েত বাহিনী	৮৭
সরকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৮৭
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি	৮৯
পাকিস্তান সামরিক শাসক	৯০
মালেক মন্ত্রীসভা	৯১
পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপত্র	৯২
শান্তি কমিটি	৯৩
রাজনৈতিক দল	৯৭
আওয়ামী লীগের একাংশ	৯৮
চীনপন্থী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ	১০২
জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী দল	১০৫
মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল	১০৬
পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি অফিসারবৃন্দ	১০৬
পুলিশ বাহিনী	১১৪
রাজাকার বাহিনী	১১৭
ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব	১২৩
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী	১২৪
বুদ্ধিজীবী, আইনজীবীসহ অন্যান্য পেশাজীবী	১২৬
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	১৩০
জাহানারা ইমাম	১৩১
শাহরিয়ার কবির	১৩১
মুনতাসীর মামুন	১৩৩
সংবাদপত্র	১৩৩
সরকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩৪
বিহারি জনগোষ্ঠী	১৪৫
পার্বত্য উপজাতি	১৪৬
আল বদর, আল শামস্ ও মুজাহিদ বাহিনী	১৪৮

অধ্যায় : তিন

স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি	১৪৯
মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতি ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সরাসরি অংশগ্রহণ	১৪৯
৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি প্রদান	১৫০
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ	১৫০

www.pathagar.com

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ
বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
দ্বিতীয় সংস্করণ)

এম. আই. হোসেন

ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ
এম. আই. হোসেন

Eastern Publications
105, Great Rasel Street, Landon
W C 2 B 3 PL. Great Briten.

প্রকাশকাল
বাংলা সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৩ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৩ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সংস্করণ:
তৃতীয় প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৪ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব : © লেখক

মুদ্রণে : ধ্রুব প্রিন্টিং প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা

কভার ডিজাইন ও বর্ণবিন্যাস : এস ইসলাম, লন্ডন

প্রাপ্তিস্থান : অভিজাত লাইব্রেরী সমূহ

ISBN : 974-1-41445 -0

বাংলা সংস্করণ মূল্যঃ
বোর্ড বাঁধাই : ৫০০.০০ টাকা মাত্র
বিদেশে মূল্য : £. 10 only

www.pathagar.com

[illegible]

খণ্ড : এক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

খণ্ড : দুই

স্বাধীনতার যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন
একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

খণ্ড : তিন

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার
আইনগত বিশ্লেষণ

খণ্ড : চার

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার

শেষকথা

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের
অর্থই যদি স্থায়ী দেশপ্রেমবোধ হিসেবে
বিবেচিত হতে থাকে,
তাহলে আরেকটি অনুরূপ মুক্তিযুদ্ধ
সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত দেশপ্রেমের
সনদপত্র কেউ কি পাবে না ?
এরূপ হলে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের
পরবর্তী কাল থেকে এ পর্যন্ত
স্বাধীন বাংলাদেশে যারা জন্ম নিয়েছে,
তাদের দেশপ্রেম নির্ণিত হবে
কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে ?

– মেজর এম এ জলিল

মেজর জলিল রচনাবলী

(পৃষ্ঠা ১৭)

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়সূচি	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট তালিকা		১৭
যে জন্য এ লেখা		১৯
খণ্ড : এক (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ)		
অধ্যায় : এক		
	পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ	২৭
	সুবে বাংলার পরাধীনতার একশত নব্বই বছর	২৭
	পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান	৩৬
	পাকিস্তান ভাঙ্গনের সুর	৪১
	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট	৪৬
	৭ মার্চ ১৯৭১ : শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ	৪৯
	২৫ মার্চ ১৯৭১ ঃ কালো অধ্যায়ের সূচনা	৫১
	Operation Searchlight	৫৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৫৫
	ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহরুল হক হল)	৫৮
	জগন্নাথ হল	৫৯
	রাজার বাগ পুলিশ লাইন	৬০
	ই পি আর	৬১
	শাঁখারী পট্টি	৬১
	রমনা কালী বাড়ি	৬২
	জিঞ্জিরা অপারেশন	৬২
	চুকনগর হত্যাকান্ড	৬২
	অন্যান্য স্থান	৬২
	মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা	৬৩
	মুজিব নগর সরকার গঠন	৭৫
	বিপুল সংখ্যক মানুষের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ	৭৮
	মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনী গঠন এবং প্রশিক্ষণ	৭৮
অধ্যায় : দুই		
	স্বাধীনতা যুদ্ধে পক্ষ বিপক্ষ	৮৩
	স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষ শক্তি	৮৪
	আওয়ামী লীগ	৮৪
	মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টি	৮৫

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনী ৮৫
ছাত্র এবং ছাত্র সংগঠন ৮৬
সাধারণ মানুষ ৮৬
কাদেরিয়া বাহিনী ৮৬
হেমায়েত বাহিনী ৮৭
সরকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৮৭
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি ৮৯
পাকিস্তান সামরিক শাসক ৯০
মালেক মন্ত্রীসভা ৯১
পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপত্র ৯২
শান্তি কমিটি ৯৩
রাজনৈতিক দল ৯৭
আওয়ামী লীগের একাংশ ৯৮
চীনপন্থী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ ১০২
জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী দল ১০৫
মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল ১০৬
পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি অফিসারবৃন্দ ১০৬
পুলিশ বাহিনী ১১৪
রাজাকার বাহিনী ১১৭
ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ১২৩
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ১২৪
বুদ্ধিজীবী, আইনজীবীসহ অন্যান্য পেশাজীবী ১২৬
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ১৩০
জাহানারা ইমাম ১৩১
শাহরিয়ার কবির ১৩১
মুনতাসীর মামুন ১৩৩
সংবাদপত্র ১৩৩
সরকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১৩৪
বিহারি জনগোষ্ঠী ১৪৫
পার্বত্য উপজাতি ১৪৬
আল বদর, আল শামস্ ও মুজাহিদ বাহিনী ১৪৮

অধ্যায় : তিন

স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি ১৪৯
মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতি ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সরাসরি অংশগ্রহণ ১৪৯
৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি প্রদান ১৫০
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ১৫০

www.pathagar.com

প্রবাসী সরকারের দেশে আগমন ১৫৩
শেখ মুজিবুর রহমান ঃ বাংলাদেশের স্থপতি ১৫৩
মুক্তিযুদ্ধের গৌরবে কালিমা লেপন ১৫৭
১০ জানুয়ারি ১৯৭২ : স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন ১৫৮
অধ্যায় : চার
স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১৬১
শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১৬৫
ধর্ষণ ১৬৫
পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী বাঙালি ও বিহারি হত্যাকান্ড ১৬৯
অধ্যায় : পাঁচ
বাংলাদেশের রাজনীতি ও ঘটনাপ্রবাহ ১৭২
মুসলিম লীগ ১৭২
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৭৩
আওয়ামী লীগের শাসনামল (যুক্তফ্রন্ট) (১৯৫৪-৫৭) ১৭৫
আওয়ামী লীগের ৬ দফা (১৯৬৬) ১৭৭
আগরতলা ষড়যন্ত্র এবং এ নিয়ে মামলা ১৭৮
শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসনামল (১৯৭২-৭৫) ১৮০
রক্ষী বাহিনীর নির্যাতন ১৮৫
লাল বাহিনীর নির্যাতন ১৮৮
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) ১৮৯
বাকশাল শাসনের পতন ১৯০
খন্দকার মোশতাকের আওয়ামী শাসন (১৫ আগস্ট - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫) ১৯২
শেখ মুজিব পতন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ১৯৫
শেখ হাসিনার আওয়ামী শাসন (১৯৯৬-২০০০) ১৯৬
ডিজিটাল আওয়ামী সরকার (২০০৮-২০১২) ১৯৭
ফ্যাসীবাদের স্মারকশক্তি ছাত্রলীগ-যুবলীগ ২০২
আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধিতা ২০৬
আওয়ামী লীগপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম বিরোধিতা ২০৯
ধর্ম নিয়ে আওয়ামী প্রতারণা ২১০
গণতন্ত্রের লেবাসে ফ্যাসীবাদী দল আওয়ামী লীগ ২১১
বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ২১৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ও মুজাফ্ফর) ২১৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২১৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ২১৫
জাতীয় পার্টি ২১৬
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২১৬
রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ২১৭

www.pathagar.com

৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ঃ আওয়ামী আনুকূল্যে সামরিক অভ্যুত্থান ২১৭
৭ নভেম্বর ১৯৭৫ ঃ সিপাহী জনতার বিপ্লব ২১৮
জিয়াউর রহমান : আধুনিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পথিকৃৎ ২১৯
হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ঃ বাংলাদেশের আইউব খান ২২০

খণ্ড : দুই (স্বাধীনতা যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন: একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ)

অধ্যায় : এক ২২৩
স্বাধীনতা যুদ্ধে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ২২৪
ভারতের রাজনৈতিক স্বপ্ন ও পাকিস্তান বিভক্তি ২২৬
বাংলাদেশ সৃষ্টিতে RAW এর ভূমিকা ২২৮
মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে ১৯৭১ সনে স্বাক্ষরিত চুক্তি ২৩৫
৭ দফা চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ২৩৫
ভারতের দাবী ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাদের আনুকূল্যের ফসল ২৩৭

অধ্যায় : দুই
বুদ্ধিজীবী হত্যার রাজনৈতিক দায় ২৪৩
বুদ্ধিজীবী হত্যা : দায় কার ২৪৩
পাকিস্তান সামরিক শাসক ২৪৪
আল বদর ২৪৬
আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী দল ২৪৬
শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা ২৫৪
জহির রায়হান অন্তর্ধান ২৫৭
স্টুয়ার্ড মুজিব হত্যা ২৬২

অধ্যায় : তিন
স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার- প্রথম পর্যায় (১৯৭২-১৯৭৫) ২৬৩
মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের শ্রেণী বিভাগ ২৬৩
পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বা যুদ্ধাপরাধী ২৬৩
যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা ২৬৪
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি কেন ২৬৬
১৯৭৪ সনের ত্রিদেশীয় চুক্তি ২৬৮
স্বাধীনতা বিরোধী ঃ কলাবরেটর ২৬৮
কলাবরেটরদের শ্রেণী বিন্যাস ২৬৯
কলাবরেটরদের বিচার ও সাধারণ ক্ষমা ২৬৯
সাধারণ ক্ষমার প্রেক্ষাপট ২৭০
শেখ মুজিবের সঙ্গে ব্যক্তিগত সখ্যতা ২৭১
নিরাপত্তা সহায়তা ২৭২
সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ২৭২
সাধারণ ক্ষমার সিদ্ধান্ত ২৭২

www.pathagar.com

প্রেস নোট ২৭৪
দ্বিতীয় দফায় সাধারণ ক্ষমা– যারা মুক্ত হন ২৭৫
সাধারণ ক্ষমা অভিনন্দিত ২৭৬
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্ত ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩ দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় ২৭৮
সাধারণ ক্ষমার বিষয়ে পত্রিকায় ফলোআপ ২৮২
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেসনোটে ভিন্নতা ২৮৪
শাহরিয়ার কবিরের বই থেকে ২৮৫
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সামাজিক ও রাজনৈতিক ফল ২৮৯

অধ্যায় : চার

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার- দ্বিতীয় পর্যায় ২৯১
জিয়া-এরশাদ আমলে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার ২৯১
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক) ২৯২
গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিচার ও তার নাগরিকত্ব . ২৯৩

অধ্যায়: পাঁচ

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার– তৃতীয় পর্যায় ২৯৭
মঈনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকার ও আওয়ামী লীগ ২৯৭
অপরাধীদের বিচারের দাবী ২৯৮
আওয়ামী লীগের ২০০৮ সনের নির্বাচনী ইশতেহার ৩০০
সংশোধিত আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ৩০১
উভয় পক্ষ যুদ্ধাপরাধ করেছে ৩০৩
পরিচিত স্বাধীনতাবিরোধীদের কোন দলে কত জন ৩০৪
যুদ্ধাপরাধী অপবাদে দাড়ি টুপির অবমাননা ৩০৫
যুদ্ধাপরাধীদের নয়, মানবতা বিরোধীদের বিচার: একটি রাজনৈতিক চাতুরতা ৩০৬
সরকার ও সরকারী দলের বক্তব্য বিশ্লেষণ ৩০৭

অধ্যায় : ছয়

৪১ বছরের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ ৩০৯
১৯৭০-৭১ এ বিহারি হত্যাকান্ড ৩০৯
বেসামরিক বিহারিদের হত্যা, নির্যাতন, তাদের সম্পত্তি লুন্ঠন ও ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত ৩১১
যশোর হত্যাকান্ড ৩১৩
স্বাধীনতার পর ভারতীয় বাহিনীর লুটতরাজ ৩১৪
বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাঙালি হত্যাকান্ড ৩১৫
পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড সিরাজ শিকদার হত্যাকান্ড ৩১৮
৩২ হাজার জাসদ কর্মী হত্যাকান্ড ৩১৯
২৮ অক্টোবর ২০০৬ ঃ আওয়ামী লগি বৈঠার পৈশাচিকতা ৩১৯

www.pathagar.com

২০০৯-২০১২ ঃ গুম চর্চার আওয়ামী স্টাইল ৩২০
পিলখানা হত্যাকান্ড ঃ দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী নিধন ৩২৩
আনন্দমোহন কলেজ ঃ নারী নির্যাতন ৩২৩
১ বৈশাখ ১৪১৭ (১৪.০৪.২০১০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নির্যাতন ৩২৩
এগুলো মানবতা বিরোধী অপরাধ হওয়ার যৌক্তিকতা ৩২৪

অধ্যায় : সাত

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিসমূহের ভূমিকা এবং এদের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক ৩২৮
আন্তর্জাতিক সহায়তাকারী (International collaborators) ৩২৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩২৯
চীন ৩৩০
ব্রিটেন ৩৩১
সৌদী আরবসহ মুসলিমবিশ্ব ৩৩১

অধ্যায় : আট

বাংলাদেশের জাতি সত্ত্বার সংকট ও যুদ্ধাপরাধ বিচার ৩৩৩
ইসলামপন্থী/মুসলিমপন্থী বনাম সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও হিন্দুবাদী ৩৩৪
পাকিস্তানপন্থী বনাম ভারতপন্থী বনাম বাংলাদেশপন্থী ৩৩৪
রাজাকার-আল বদর বনাম মুক্তিযোদ্ধা ৩৩৪
দ্বন্দ্ব নিরসনবাদ বনাম দ্বন্দ্ব প্ররোচণাবাদ ৩৩৫
'আসুন আমরা সবাই করি' বনাম 'আসুন আমরা কয়েকজন করি' ৩৩৫
দূরদর্শিতা বনাম পশ্চাৎমুখিতা ৩৩৬
'আমাদের ইতিহাস ১৯৭১ থেকে' বনাম 'আমাদের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো' ৩৩৬
আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর বক্তব্য ৩৩৭
আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ ৩৪০
ধর্মভিত্তিক দলগুলোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ ৩৪১
১৯৭১ পরাজিত ইসলামপন্থী এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের অবস্থা ৩৪৬
খন্ডচিত্র-১ ৩৪৭
খন্ডচিত্র- ২ ৩৪৮
খন্ডচিত্র-৩ ৩৪৯
খন্ডচিত্র- ৪ ৩৪৯
স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতার বিষয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য ৩৫০
ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি ৩৫২
সব দলকে সাথে রাখতে আওয়ামী লীগের অনীহা ৩৫২
বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও ভারত বিরোধিতা ৩৫৩
স্বাধীনতাযুদ্ধের রাজাকার আজকের মুক্তিযোদ্ধা ৩৫৪

www.pathagar.com

ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতিয়তাবাদীদের বাইরে অন্যান্য স্বাধীনতা-বিরোধীদের বর্তমান অবস্থান ৩৫৬
বাংলা ভাগ (বঙ্গভঙ্গ) রদকারী আর পাকিস্তান ভাগ রদকারী ৩৫৭
ড. ওয়াজেদ মিয়া বনাম মাওলানা সাঈদী ৩৫৭
ঘাদানিক, ইসলাম ও যুদ্ধাপরাধ ৩৫৮

খণ্ড : তিন (বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার আইনগত বিশ্লেষণ)

অধ্যায় : এক

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচারের প্রেক্ষাপট ৩৬৩
আন্তর্জাতিক আইন, সনদ, সংবিধি ও চুক্তি ৩৬৬
লন্ডন চুক্তি ১৯৪৫ ও লন্ডন সনদ ১৯৪৫ ৩৬৬
নুরেমবার্গ নীতিমালা ১৯৪৫ ৩৬৭
জেনোসাইড কনভেনশন ১৯৪৮ ৩৬৯
রোম ষ্ট্যাটিউট ১৯৯৮ ৩৭১
বিচার/ প্রসিকিউটর/ রেজিস্টার অপসারণ ৩৭২
১৯৭৪ বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ৩৭৩
ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ও যুদ্ধাপরাধের বিচার ৩৭৪
আইনসমূহ এবং প্রাসঙ্গিক কথা ৩৭৫
বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ ৩৭৬
বাংলাদেশ সংবিধান ৩৭৭
সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ৩৭৮
যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম সংশোধনী ১৯৭৩ ৩৭৯
সংবিধান ও আইনের অসামঞ্জস্যতা ৩৮০
যুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনুগত্য ঘোষণার আদেশ ৩৮২
যুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনা ৩৮৪
রাজাকার এবং রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১ ৩৮৪
রাজাকার এবং রাজাকার অধ্যাদেশ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ৩৮৬
স্বাধীনতার পক্ষের নেতাকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, কর্মকর্তা–কর্মচারীদের কৃত অপরাধের দায়মুক্তি ৩৮৭
অপরাধের এক পক্ষের দায়মুক্তি ও আন্তর্জাতিক বিধি বিধান ৩৮৯
বাংলাদেশ কলাবরেটরস (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ ৩৯০
আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ ৩৯৪
আন্তর্জাতিক আইনের আবশ্যকতা ৩৯৫
আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন (সংশোধন) ২০০৯ ৩৯৭
আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন (সংশোধন) ২০১০ ৪০০
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কার্যপ্রণালী বিধিমালা ২০১০ প্রণয়ন, সংশোধন, প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক কার্যপ্রণালী বিধিমালা ৪০২

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই
যুদ্ধাপরাধের বিচার দেশে দেশে ৪০৩
নুরেমবার্গ ট্রায়াল ৪০৩
টোকিও ট্রায়াল ৪০৫
কম্বোডিয়া ট্রায়াল ৪০৫
রুয়ান্ডা ট্রায়াল ৪০৭
সিয়েরা লিওন ট্রায়াল ৪০৯
যুগোশ্লাভিয়া ট্রায়াল ৪১১
বাংলাদেশ ট্রায়াল ৪১৩

অধ্যায় : তিন
বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আন্তর্জাতিক মান এবং বিচার বিভাগ ৪১৭
আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি ও সংবিধির সংগতিপূর্ণ আলোকে আইন ও বিধি ৪১৭
আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আদালত কাঠামো ৪১৯
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অরাজনৈতিক তদন্তকারী টীমের ব্যবস্থা ৪২১
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ ৪২১
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অরাজনৈতিক ও প্রাজ্ঞ বিচারক নিয়োগ ৪২২
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ ৪২৩
বিচারের নামে ধোকা ৪২৪
বিচারক ও বিচার বিভাগ নিয়ে প্রশ্ন ৪২৬

অধ্যায় : চার
যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন, সংবিধি, সনদ, চুক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের আইন, বিধি-বিধানের তুলনামূলক পর্যালোচনা ৪২৯

খণ্ড : চার (বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার)

অধ্যায় : এক ৪৩৩
অধ্যায় : দুই ৪৩৯
শেষকথা : ৪৪৯
অব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসী ৪৪৯
আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায় ৪৫০
সালাউদ্দীন কাদের চৌধূরীর মাললার রায় ৪৫১
লন্ডল প্রবাসী চৌধুরী মঈনুদ্দীন ও আশরাফ হোসেনের মামলার রায় ৪৫১

অধ্যায় : পরিশিষ্ট ১-২৮ ৪৫৭- ৫৬০
অতিরিক্ত পরিশিষ্ট ৫৬১
সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ৫৪৮

www.pathagar.com

টেবিল তালিকা

খন্ড : এক (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ)

টেবিল ১.১	: ১৮৫৬ সনে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র পরিসংখ্যান	৩৩
	পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান	৩৫
টেবিল ১.২	: ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের মন্ত্রী সভার চিত্র	৩৭
টেবিল ১.৩	: গভর্ণর জেনারেলদের তালিকা	৩৯
টেবিল ১.৪	: গণ-পরিষদের প্রেসিডেন্ট বা স্পিকার তালিকা	৩৯
টেবিল ১.৫	: ২৫ মার্চের মধ্য রাতে ও পরে পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যার পরিসংখ্যান	৫৮
টেবিল ১.৬	: ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের মৃত্যুর পরিসংখ্যান	৫৯
টেবিল ১.৭	: সেক্টর কমান্ডারগণের তালিকা	৭৭
টেবিল ২.১	: স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিএসপি কর্মকর্তাদের তালিকা	৮৭
টেবিল ২.২	: বন্দী সিএসপি কর্মকর্তাদের তালিকা	৮৮
টেবিল ২.৩	: মালেক মন্ত্রিসভা	৯১
	পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপাত্র	৯১
টেবিল ২.৪	: পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপাত্র তালিকা	৯২
টেবিল ২.৫	: কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ১৪০ সদস্যের কার্যকরী কমিটির মধ্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ৫৯ জনের তালিকা	৯৩
টেবিল ২.৬	: আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য (MNA) যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন	৯৮
টেবিল ২.৭	: আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (MPA) যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন	৯৯
টেবিল ২.৮	: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সেনা ইউনিটে কর্মরত ও ছুটি ভোগকারী বাঙালি অফিসারদের তালিকা	১০৬
টেবিল ২.৯	: পাকিস্তানে সরকারের অধীন কর্মে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তাদের তালিকা	১১৩
টেবিল ২.১০	: রাজাকার বাহিনীর কমান্ডের সদস্যদের নাম-পরিচয়	১২০
টেবিল ২.১১	: স্বাধীনতা যুদ্ধে সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী এবং তাদের ভূমিকা	১২৭

www.pathagar.com

টেবিল ২.১২ : যুদ্ধকালে পাকিস্তান শাসকদের অধীনে চাকরি করেছেন এবং তাদেরকে সহায়তা করেছেন এমন কর্মকর্তাদের তালিকা ১৩২
টেবিল ২.১৩: পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অফিসারদের নামের তালিকা ১৪১
টেবিল ৪.১ : বিভিন্ন হিসাব অনুসারে স্বাধীনতার যুদ্ধে মানুষ মারা যাওয়ার হার ১৬২
টেবিল ৪.২ : প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর হতাহতের সংখ্যা ১৬২
টেবিল ৪.৩ : শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১৬৩
টেবিল ৪.৪ : বিভিন্ন হিসাব অনুসারে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় ধর্ষণের হার ১৬৫
টেবিল ৫.১ : খন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভা ১৯৩

খন্ড : দুই (স্বাধীনতার যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন: একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ)

টেবিল ২.১ : নিহত বুদ্ধিজীবীদের তালিকা ও মৃত্যুর বিবরণ ২৪৮
টেবিল ২.২ : বাংলাপিডিয়ায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে বুদ্ধিজীবী নিহত হওয়ার তথ্য ২৫১
টেবিল ৫.১ : 'চরম পত্র' বই এর তালিকা অনুযায়ী দাড়িওয়ালা ও দাড়িবিহীন যোগসাজশকারীদের পরিসংখ্যান ৩০১
টেবিল ৮.১ : পাকিস্তান সরকারের দালালি করার পর যারা আওয়ামী লীগ মন্ত্রী-এমপি হয়েছেন বা ছিলেন ৩৫৩

খন্ড : তিন (বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার আইনগত বিশ্লেষণ)

টেবিল ৪.১ : বিচার বিভাগ নিয়ে মানুষের মূল্যায়ন চিত্র ৪২৮

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট তালিকা

পরিশিষ্ট- ১	লন্ডন চুক্তি ১৯৪৫	৪৫৭
পরিশিষ্ট- ২	লন্ডন সনদ ১৯৪৫	৪৫৯
পরিশিষ্ট- ৩	নুরেমবার্গ নীতিমালা ১৯৪৫	৪৬৭
পরিশিষ্ট- ৪	Genocide Convention 1948	৪৬৮
পরিশিষ্ট- ৫	International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 বিধানাবলী	৪৬৯
পরিশিষ্ট- ৬	স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র	৪৭১
পরিশিষ্ট- ৭	PROVISIONAL CONSTITUTION OF BANGLADESH ORDER, 1972.	৪৭৩
পরিশিষ্ট- ৮	মুজিব নগরের ১৮ দফা নির্দেশনা	৪৭৫
পরিশিষ্ট- ৯	পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি	৪৭৬
পরিশিষ্ট- ১০	পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১	৪৮১
পরিশিষ্ট- ১১	BENGAL'S ELITE DEAD IN A DITCH	৪৮৪
পরিশিষ্ট- ১২	বুদ্ধিজীবী হত্যায় মার্কিন গোয়েন্দাদের হাত ছিল	৪৮৭
পরিশিষ্ট- ১৩	INSTRUMENT OF SURRENDER	৪৮৯
পরিশিষ্ট- ১৪	Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972	৭৯০
পরিশিষ্ট- ১৫	THE INTERNATIONAL CRIMES (TRIBUNALS) ACT, 1973	৪৯৮
পরিশিষ্ট- ১৬	Naming The Names: Introducing The War Criminals	৫০৯
পরিশিষ্ট- ১৭	Simla Agreement	৫১৭
পরিশিষ্ট- ১৮	Tripartite Agreement between India, Bangladesh and Pakistan for normalisation of relations in the subcontinent	৫২০
পরিশিষ্ট- ১৯	রোম ইনিষ্টিটিউট ১৯৯৮ এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা	৫২৪
পরিশিষ্ট- ২০	269,000 people died in Bangladesh war, says new study	৫৩০
পরিশিষ্ট- ২১	জিয়ার উনিশ দফা কর্মসূচী	৫৩১
পরিশিষ্ট- ২২	THE LEGAL FRAMEWORK ORDER, 1970	৫৩২
পরিশিষ্ট- ২৩	সার্বজনীন দুর্গাপূজা এবং রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন	৫৩৬
পরিশিষ্ট- ২৪	Lord Avebury confronts Law Minister over Bangladesh War Crimes Tribunal	৫৪১

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট- ২৫	ইব্রাহীম কুট্টি নিহত হলে তার স্ত্রী মামলা করেন। এ মামলায় আল্লামা সাঈদী আসামী নন। অথচ ইব্রাহীম কুট্টিকে হত্যার দায়ে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। মামলার FIR	৫৪৫
পরিশিষ্ট- ২৬	শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার চিঠি	৫৪৯
পরিশিষ্ট- ২৭	শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে নিয়ে গোলাম মাওলা রনির লেখা-১	৫৫৭
পরিশিষ্ট- ২৮	শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে নিয়ে গোলাম মাওলা রনির লেখা- ২	৫৬০

অতিরিক্ত পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকারে ডা. হাসানঃ যুদ্ধাপরাধী রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে	৫৬১
শুধু ঢাকার যুদ্ধাপরাধীদেরই বিচার হবেঃ আইন প্রতিমন্ত্রী	৫৬২
যুদ্ধাপরাধী পরিবারের আপ্যায়ন নিলেন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান	৫৬৩
পুতুলের দাদাশ্বশুর রাজাকার হলেও যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না; দেশে কোন রাজাকার নেইঃ ফরিদপুর আ'লীগ নেতাদের শেখ হাসিনা	৫৬৩
আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল রাজাকার পরিবারের সদস্য	৫৬৫
পুতুলের দাদাশ্বশুর রাজাকার হলেও যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না দেশে কোনো রাজাকার নেই	৫৬৮

www.pathagar.com

I disapprove of what you say,
but I will defend to the death your right to say it.
-Voltaire

যে জন্য এ লেখা

৭৫০ সনে রাজা গোপালের নেতৃত্বে পাল বংশের অভ্যুদয়, ১০৯৫ সনে বিজয় সেনের নেতৃত্বে সেন বংশের ক্ষমতারোহণ, ১২০৪ সনে বখতিয়ার খিলজীর আগমনের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের অভিযাত্রা, ১৩৩৮ সনে বাংলার স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা, ১৫৪০ সনে শেরশাহের সোনারগাঁও-চট্টগ্রাম গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ, ১৫৭৬ এ মোগল বাদশাহ আকবরের বাংলা অভিযান, মুঘলদের কাছ ১৫৮৩ সনে বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁর পরাজয় বরণ, ১৫৯৪ সনে বাংলা বিহার উড়িষ্যাকে নিয়ে মুঘলদের সুবে বাংলা গঠন, ১৬০৮ সনে সুবেদার ইসলাম খাঁর হাতে রাজধানী ঢাকার গোড়াপত্তন, ১৬৬৬ সনে শায়েস্তা খাঁর আমলে মগ্ দস্যুদের বিতাড়ন ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত সুবে বাংলার সম্প্রসারণ, ১৭০৫ সনে মুর্শীদ কুলী খানের নেতৃত্বে নবাবী আমলের উন্মেষ, ১৭৫৭ সনে লর্ড ক্লাইভের হাতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতন, ১৭৬৯-৭০ সনে ইংরেজ লুণ্ঠনে বিপর্যস্ত বাংলায় (বঙ্গাব্দ ১১৭৬) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ১৭৯৩ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিসের জারী করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সামন্তবাদী আগ্রাসন, ১৮১৭ সনে মসলিন ধ্বংস ও নীলকরদের গণঅত্যাচারের শুরু, ১৮৫৭ সনে সিপাহি বিদ্রোহে বাংলার সক্রিয় অংশগ্রহণ, ১৮৭৪ সনে সুবে বাংলা থেকে আসামকে বিচ্ছিন্নকরণ, ১৯০৫ সনে বাংলাকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গ নামে দুটি রাজ্যে বিভক্তিকরণ, ১৯০৬ সনে ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯১১ সনে দুই বাংলার পুনঃএকত্রিকরণ এবং ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোতে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা অর্জন ইত্যাদি হচ্ছে এ জনপদের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস পরিক্রমা। সেই ইতিহাসের সাম্প্রতিক মহা-আলোড়নের বছর ১৯৭১; বাংলাদেশ নামে একটি নতুন জাতিরাষ্ট্রের (Nation state) উত্থানকাল।

২০১১ সনে এ জাতিরাষ্ট্র চল্লিশ বছর অতিক্রম করেছে। আমাদের রাজনীতিতে এ সময়ে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পালাবদল হয়েছে, সংবিধান সংশোধিত হয়েছে, কিন্তু জাতীয় জীবনে চেতনা ও মূল্যবোধের বিভাজন নিরসন হয়নি। চল্লিশ বছরের আগের ইতিহাসের মেয়াদকাল পাকিস্তানের পঁচিশ বছর। তারও আগের সময় হচ্ছে ইংরেজের অধীনে একশ নব্বই বছর। ১৭৫৭ সনে সুবে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাজিত করে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুবে বাংলার স্বাধীনতা হরণ করে। ইংরেজদের হাতে রাজ্যহারা হয়ে মুসলমানগণ হৃত রাজ্য ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, লড়াই আর শাহাদাতের নজরানা পেশ করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হয় তারা। বিপরীতে হিন্দুরা অনুভব করলো মুসলমানদের অধীনে থাকা আর ইংরেজদের অধীনে থাকা একই কথা। বরং নতুন প্রভুর

www.pathagar.com

সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে প্রাপ্তির অংশটুকু বাড়াতে তারা তৎপর হলো। ব্রিটিশরা মুসলমানদের সকল ধরণের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা খর্ব করতে থাকে এবং হিন্দুদেরকে বেশী বেশী সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের তাবেদার বানাতে থাকে। এক পর্যায়ে মুসলমানরা শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, বাণিজ্যে, চাকরিতে, অর্থনীতিতে পিছু হটতে হটতে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়, বিপরীতে হিন্দুরা হতে থাকে বলীয়ান।

বিট্রিশ পরাধীনতার শিকল ছিঁড়তে বাংলাসহ সারা ভারতে মুসলমানরাই সশস্ত্র লড়াইয়ে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ভারতের অন্য অংশে হায়দার আলী, টিপু সুলতান, সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী, ইসমাইল শহীদ প্রমুখের পাশাপাশি স্বাধীনতার জন্য বাংলায় মীর কাশিম ও ফকির মজনু শাহ (বাকের জং) থেকে শুরু করে সৈয়দ নেসার আহমেদ তীতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ, মুহসিনুদ্দীন আহমদ দুদু মিয়াসহ হাজার হাজার আলেম-ওলামার প্রায় দু'শত বছরের জিহাদ-সংগ্রামী ইতিহাসের প্রণিধানযোগ্য অধ্যায়। বিট্রিশ বিতাড়নের আন্দোলন-যুদ্ধ সফলতা না পেলেও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। স্যার সৈয়দ আহমেদ (১৮১৭- ১৮৯৮), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) প্রমুখ উপলব্ধি করতে পারেন যে, মুসলমানদেরকে পুনরায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে এ দেশ স্বাধীন করা যাবে না। তাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় Mohammedan Anglo-Oriental College সহ (১৯২০ সনে এটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়) আরো অনেক শিক্ষালয়। এ আলিগড়ে পড়ুয়ারাই ইংরেজ ও হিন্দু নিপীড়ণের মোকাবেলায় ভারতে মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মুসলিম জাতীয়তার রাজনৈতিক চেতনা।

১৯৪০ সনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে ভারত বর্ষকে তিনটি রাষ্ট্র করার প্রস্তাব করা হয়। (১) সুবে বাংলার অঞ্চল নিয়ে বাংলা, (২) পশ্চিমে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে একটি দেশ (পাকিস্তান) এবং (৩) হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারত (হিন্দুস্তান)। মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের এই তত্ত্বকেই বলা হয় দ্বি-জাতি তত্ত্ব (Two nation theory)। নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেলসহ অন্যান্য হিন্দু নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতার ফলে বাংলা ভাগ হয় এবং পূর্ববঙ্গ হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিভূত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। অবশ্য Jaswant Singh এর বই JINNAH: India-Partition-Independence প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাগের দায়ভার পাকিস্তানের স্থপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপরই চাপানো হতো। নিজে গুজরাটি হয়েও উর্দূকে পাকিস্তানের Lingua Franca হিসেবে ঘোষণা দিয়ে জিন্নাহ যে বিতর্কের সূচনা করেন, সেটাই ক্রমে দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যে সম্পদ ও উন্নয়ন বৈষম্যের প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়। পাকিস্তানের বাংলা অঞ্চলে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতার চিন্তা, নতুন করে স্বাধিকারের ইচ্ছে।

১৯৬২ সনে ভারত পাকিস্তানকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করে। ১৯৬৮ সনে 'আগরতলা ষড়যন্ত্রে'র মাধ্যমে এর সাথে নতুন মাত্রা

www.pathagar.com

যুক্ত হয়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণের কারণে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দেশে আত্মগোপন না করে সরাসরি ভারতে পাড়ি জমান। সেখান থেকে সংগঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ। এ সব তথ্য থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বৈরীতার ব্যাপকতা ও কৌশল ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারতে পাড়ি না জমিয়ে জীবন বাজি রেখে থেকে যায় মাতৃভূমিতে। এদের কেউ ছিলেন নিরব দর্শক, কেউবা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সক্রিয়, আবার কেউ ছিলেন পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী। এই শেষোক্তদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আর কেউ কেউ বাধ্য হয়েই পাকিস্তান রক্ষার ভূমিকায় নেমেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষে এদেরই নাম হয় দালাল।

১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সকল যুদ্ধাপরাধী ও যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তীতে স্বাধীন দেশের স্থিতিশীলতা, উন্নতি, অগ্রগতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশের জনগণের ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে যোগসাজশকারী বা দালালদেরকে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে সকল বিরোধ নিস্পন্ন করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের মানুষ সংহতির পথে বহুতর বিভাজনের বেড়াজালে আটকে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে ইসলামী মূল্যবোধের সংঘাত সৃজন, বাঙালি বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সংঘাত, স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষশক্তি ও বিপক্ষশক্তির বিভেদ রেখা, প্রভৃতির একটি আরোপিত দ্বন্দ্ব সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা লাভের শুরু থেকেই অনাকাংখিত অন্তর্বিরোধের আবহ থেকে বেরিয়ে আসতে অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। যে ব্রিটিশরা আমাদের জান-মাল-ইজ্জত-ধর্মীয় মূল্যবোধ তথা সর্বস্ব দু'শ বছর ধরে লুন্ঠন করেছে, যাদের সাথে আমাদের ভাষার কোন মিল নেই, তাদের অপরাধ ভুলে গিয়ে আমরা তাদের সাথে মিত্রতা, সখ্যতা দৃঢ়তর করতে ব্যস্ত। কেবল তাই নয় ঐ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শত আন্দোলন-যুদ্ধ করে যে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল তার পশ্চিমাংশের পঁচিশ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সর্বশেষে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়ে তাদেরও ক্ষমা করা হয়। তাদের দেশীয় সহযোগীদের জন্যও ১৯৭৩ সনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে সাধারণ ক্ষমা দেয়া হয়। কিন্তু ২০০৯ সনে এসে নতুন করে তাদেরই একাংশের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও বিচারের আয়োজন করা হয়েছে। এ আয়োজনকে ঘিরে জাতীয় সংহতিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। স্বাধীনতার ৪০ বছর পর যুদ্ধাপরাধের বিচারের ইস্যু দেশের মানুষের বৃহত্তর ঐক্যের প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে পত্রিকার বড় বড় শিরোনাম, বক্তৃতা-বিবৃতির তোড়জোড়, সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের তৎপরতা, War Crimes Fact Finding Committee-র সক্রিয়তা, কিছু বুদ্ধিজীবী-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অতিমাত্রার আগ্রহ এবং ক্ষমতাসীনদের দমন-পীড়ণ ও বিতর্কিত একমুখী প্রচারণা নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে।

বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকগণের একাংশ বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার সময় নিজস্ব চিন্তা, মতাদর্শ বা অন্য কারো ফরমায়েশ অনুসারে তা বর্ণনা করেন। এক পেশে এ

www.pathagar.com

ইতিহাস ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে হতাশ এবং নবীনদেরকে আবেগতাড়িত ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়। তারা যখন বাংলাদেশের ইতিহাস লিখেন তখন মনে হয় ১৯৫২-র পেছনে উল্লেখ করার মত কিছু নেই। খন্ডিত ইতিহাস চর্চায় লিপ্ত এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিকগণ যখন সূর্য সেন, বিনোদ বিহারি, ইলা মিত্র বা দেবী চৌধুরাণীর কথা লিখেন তখন ১৯৪৭পূর্ব ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অনেক কথাই বেমালুম গোপন করেন অবলীলাক্রমে। আড়াল করেন ইংরেজ বিতাড়নে ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের অবদান। এভাবেই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। আগামীতে এ সকল বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক হয়তো লিখবেন যে, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন কেবল হিন্দুরাই, যেমনটি এখনই রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী তার সম্পাদিত 'বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ' বইতে লিখেছেন, "গবেষকদের অনেকের মতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের অধিকাংশ ছিল সংখ্যালঘু।"

যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ; এ বিষয়গুলোর উপর পরিষ্কার ধারণা পেতে হলে বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ২০০৯, লন্ডন সনদ, জেনেভা কনভেনশন, বাংলাদেশ-ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি, দালাল আইন ১৯৭২, সাধারণ ক্ষমা, The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Repeal) Ordinance, 1975 ইত্যাদি সহ এ সংক্রান্ত সকল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এটা জানা আবশ্যক যে, সে সময়ে যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ কাদের কাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং কারা কারা এর সহায়তাকারী ছিল।

যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটির রাজনৈতিক দিকের পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক ও আইনগত দিকের প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, অবস্থা ও অবস্থানের পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বস্তুত নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করবার বা আদর্শিক চেতনাকে মোকাবেলা করার হাতিয়ার হিসেবে যুদ্ধাপরাধ বিচারের বিষয়টিকে সামনে আনা হলে তার যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হবেই। কেননা তাতে রাজনৈতিক অভিলাষে ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা ন্যায়বিচারকে প্রভাবিত ও কলুষিত করে নতুন অস্থিরতার জন্ম দেবে। নতুন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবীকারীরা জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদেরকে যুদ্ধাপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বলে গণ্য করে। তার সাথে জিয়াউর রহমানের আনুকূল্যে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত বিএনপির কিছু নেতা-কর্মীকেও তারা যুদ্ধাপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে চায়। এছাড়া অন্যদের বিষয়ে তারা নিরব। এ কারণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ আয়োজনকে রাজনৈতিকভাবে জামায়াত এবং বিএনপিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে পরিচালিত বলে অভিযোগ রয়েছে। সেটা ন্যায়বিচারের পরিবর্তে রাজনৈতিক জিঘাংসার রূপায়ণ এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তার রাজনৈতিক চেতনাকে ধবংস করার ষড়যন্ত্র বলে প্রতীয়মান। এতে জাতিসত্ত্বার সুস্থ বিকাশের লক্ষ্যে রাজনীতিবিদদের করণীয় অগ্রাধিকার ব্যাহত হবে এবং রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির কাছে জাতির সকল সম্ভাবনা

www.pathagar.com

পরাজিত হবে। কোন পক্ষ প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে চাইলে সেটা গণতন্ত্রের মেজাজ ও পরিবেশকে রুদ্ধ করে ফেলতে বাধ্য। পাকিস্তান সরকার ও সামরিক জান্তার ভয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক মানুষই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি সমর্থন জানায়। ইসলামপন্থী দল– জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, খেলাফত আন্দোলন; মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল– মুসলিম লীগ (তিন গ্রুপ), পিডিপি, জাতীয় দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রভৃতির পাশাপাশি চীনপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ও বুদ্ধিজীবী, সকল উপজাতি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং ভারত থেকে নির্যাতিত-বিতাড়িত বিহারিগণ পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি সমর্থন জানায় এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখে। আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীও পাকিস্তানের অখন্ডতার কট্টর সমর্থক ছিলেন এবং তা রক্ষার জন্য সক্রিয় ছিলেন।

নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখার কাজটি একান্তই দুরূহ। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহের কাজ তাই ঘটনা ঘটবার বহু পরে শুরু হয়। ঘটনা ঘটার সাথে সাথে যা লিপিবদ্ধ হয় তাতে আবেগ, পক্ষপাত ও একদেশদর্শীতার যে প্রভাব পড়ে সেটা প্রকৃত সত্যকে নানাভাবে আড়াল করে ফেলে। কথায় বলে ইতিহাস রচিত হয় তরবারির প্রভাবে। তাই ইতিহাসকে তরবারির প্রভাব তথা বিকৃতির হাত থেকে উদ্ধার করতে হলে নির্মোহ গবেষণার জন্য ধৈর্য্যের সাথে পর্যাপ্ত সময় পার করতেই হয়। সময়ের পরিক্রমায় বিতর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে আসে প্রয়োজনীয় সত্যটুকু। তাতে হয়তো বা অনেক সাক্ষ্য ও তথ্যকে বিস্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার করা কঠিন হয়। তবে সেটাও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের ঐতিহাসিক বাস্তবতা। মোহতাড়িত অর্ধ সত্য বা ভেজাল সত্যের বিভ্রান্তির চাইতে নির্মোহ গবেষণালবদ্ধ প্রকৃত সত্যের স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্রতা অনেক বেশী কল্যাণবহ। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সত্য আজ ক্ষমতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার কবলে নিপতিত।

১৯৭১ সনে যারা পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ করার পক্ষে ছিলেন, তারা ভেবেছিলেন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ বন্ধ হয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গড়া যাবে এবং দেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হবে। পক্ষান্তরে অখন্ড পাকিস্তানের সমর্থকদের কাছে পাকিস্তান ছিল বৃহত্তম ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ, তারা বিশ্ব মুসলিমের নেতৃত্ব প্রদানে পাকিস্তানের অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা ভাবতেন। তাদের বিবেচনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে ছিল পাকিস্তান। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এ রাষ্ট্রের অগ্রগতির সঙ্গে পূর্বাংশে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হবে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের সাহায্য নিয়ে আলাদা হলে সে রাষ্ট্র হবে ভারতের আজ্ঞাবহ একটি রাষ্ট্র, যার জাতীয় পতাকা থাকবে, জাতীয় সঙ্গীত থাকবে, সরকার থাকবে; কিন্তু থাকবে না প্রকৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

আজও এ বিতর্ককে ঘিরেই দেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছে এবং তা সামগ্রিক বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন হলো নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা। কোন্ বিষয় রাজনৈতিক

www.pathagar.com

অস্থিরতা বাড়াবে, কোন্ ইস্যু জাতীয় সংহতি বিপন্ন করবে, কোন্ ইস্যু জাতিসত্ত্বার বিকাশ তরান্বিত বা রুদ্ধ করবে তার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ আবশ্যক।

বইটিতে চারটি খন্ড রয়েছে, যার প্রথম খন্ড হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ । 'হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস' কথার ফুলঝুরির মধ্যে ১৯৫২ সনের পূর্বের কোন ইতিহাস আমাদের ঐতিহাসিকগণ অথবা রাজনৈতিক ইতিহাসবিদগণ প্রায়শঃ উল্লেখ করেন না। আমরা এখানে সুবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পর থেকে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও ভাঙন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে কারা কতটুকু জড়িত আর কারা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী হয়ে কাজ করেছেন তাদেরকে নির্মোহভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকেও বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন সম্পর্কিত একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কাদের কি অবস্থান সে প্রেক্ষাপট ও ঘটনাপ্রবাহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন, বিচারের আয়োজন, আইন বাতিল, সাধারণ ক্ষমা ইত্যাদির সম্যক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ৪০ বছর পর ২০০৯ সনে নতুন করে বিচার কেন ও কিভাবে হচ্ছে এবং জাতীয় জীবনে এর সম্ভাব্য ফলাফল কি হবে তাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় খন্ডে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচারের আইনগত খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সংবিধান, আইন, সংবিধি, আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি ইত্যাদি কতটা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করছে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ খন্ডে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার্থে যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে কি করণীয় তার একটি সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটি মূলত নতুন প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে লেখা, যাদের সামনে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে অর্ধসত্য। কখনো কখনো পুরো অসত্য ঐতিহাসিক বর্ণনা। তাদের নির্মোহ করা প্রয়োজন, সামনে সত্যকে আনা প্রয়োজন; জাতীয় সংহতি বিপন্ন করার পরিবর্তে দেশকে সার্বিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সকল দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান ঘটাতে উদাত্ত আহ্বান জানানোই এ লেখার মূখ্য উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

খন্ড : এক

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

Contemporary history is a dangerous subject to handle.
It is full of explosive materials. Much essential information
will not be known until many years later.

Rajani Palme Dutta
Problems of Contemporary History

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ

সুবে বাংলার স্বাধীনতার একশত নব্বই বছর

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা মিলিয়ে 'সুবে বাংলা' মোঘল আমলে একটি সুবা (প্রদেশ) ছিল; নবাব আলীবর্দী খানের পর তার দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা এর সুবেদার (প্রাদেশিক সরকার প্রধান) নিযুক্ত হন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুটচালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ভারতবর্ষের পরাধীনতার সূচনা করে। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী খানকে কোম্পানী সুবে বাংলার সুবেদার নিয়োগ করলেও মোগল সম্রাট আজিজ উদ দীন আলমগীর (২য় আলমগীর) নূরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জংকে[১] এর সুবেদার নিয়োগ করেন। নূরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জং ইংরেজ কোম্পানী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন এবং ১৭৮৭ সনে মোগলহাটের যুদ্ধের পর রংপুরের ফুলচৌকীতে মৃত্যুবরণ করেন। অন্যদিকে কোম্পানী মীর জাফর আলী খানকে সুবেদার পদ থেকে অপসারণ করে মীর কাশিম আলী খানকে বাংলার সুবেদার নিয়োগ করে। স্বাধীনচেতা এ সুবেদার ইংরেজ কোম্পানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এরপরও পুরো ভারতবর্ষ পরাধীন হতে সময় লেগেছে একশ' বছর; দুর্ভাগ্য সুবে বাংলার, এটি পরাধীন ছিল একশ' নব্বই বছর।

ইংরেজরা যখন সুবে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয় উইলিয়াম হান্টারের[২] ভাষায় তখন এদেশে একজন মুসলমানও গরীব ছিল না। বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে মুসলমানরা হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে ব্যস্ত হন, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সংগ্রাম শুরু করেন। অন্যদিকে বৈদান্তিকরা (হিন্দুরা) প্রভু পরিবর্তনে নতুন প্রভুদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাদের আনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টায় ব্রত হয়।

---

১ • বিকৃত ইতিহাসে যিনি এক জন ফকির বলে চিহ্নিত এবং ফকির মজনু শাহ বা ফকির মজনু শাহ বুরহান হিসাবে পরিচিত।
• পলাশী যুদ্ধোত্তর সংগ্রামের পাদপীঠ, হায়দার আলী চৌধুরী।

২ Sir William Wilson Hunter, (15 July 1840 – 6 February 1900) was a Scottish historian, statistician, a compiler and a member of the Indian Civil Service, who later became Vice President of Royal Asiatic Society. He described the socio-economic situation of the then Sube Bangla in his important historical book "The Indian Musalmans (first published in 1871)"

www.pathagar.com

সুবে বাংলার মানচিত্র

১৮৮৫ সনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের বছর এর কোলকাতা সম্মেলনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী[৩] বলেন-

I ask whether in the most glorious days of Hindu rule, in the days of Rajahs like the great Yikram, you could imagine the possibility of a meeting of this kind, whether even Hindus of all different provinces of the kingdom could have collected and spoken as one nation.... It is our good fortune that we are under a rule which makes it possible for us to meet in this manner. (Cheers) It is under the civilizing rule of the Queen and people of England that we meet here together, hindered by none, and are freely allowed to speak our minds without the least fear and without the least hesitation. Such a thing is possible under British rule and British rule only. (Loud Cheers). Then I put the question plainly: Is this Congress a nursery for sedition and rebellion against the British government (cries of no, no); or is it another stone in the foundation of the stability of that government ? (cries of yes, yes)..... These simple facts bring home to all of us at once some of those great and numberless blessings which British rule has conferred upon us. But there remain even greater blessings for which we have to be grateful.... Let us speak out like men and proclaim that we are loyal to the backbone (cheers) ; that we understand the benefits. English rule has conferred upon us.... and that we do not want to subvert British rule ; that our outspoken utterances are as much for their good as for our good.[৪]

(হিন্দু শাসনামলের খুব চমৎকার দিনগুলোতে যেমন- রাজাদের শাসনামল থেকে মহামতি বিক্রমের শাসনামলেও আমরা কি অনুমান করতে পেরেছিলাম যে এমন

---

৩ দাদাভাই নওরোজী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন ।

৪ The Indian National Congress, Part -1, G . A. NATESAN & Co., ESPLANADE, Madras; pp5-23

www.pathagar.com

একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে রাজ্যের সকল প্রদেশের হিন্দুগণ একসাথে মিলিত হয়ে একই সুরে কথা বলবে? এটি আমাদের নিতান্তই সৌভাগ্য যে আমরা এমন একটি শাসনামলে বাস করছি যেখানে আমরা একই জাতি হিসাবে একসাথে মিলিত হতে পারছি (হর্ষধ্বনি)। এটি ইংল্যান্ডের জনগণ ও মহান রাণীর ঔদার্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে, যেখানে আমরা কোন বাধাবিঘ্ন, ভয় ও উৎকণ্ঠা ছাড়াই আমাদের মনের কথা বলতে পারছি। এটি সম্ভব হয়েছে বৃটিশ শাসনের ফলে এবং একমাত্র বৃটিশ শাসনের ফলে (প্রবল হর্ষধ্বনি)। আমি দুঃখের সাথে একটি প্রশ্ন করতে চাই, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সুতিকাগার হবে? (প্রবল না, না, ধ্বনি)। অথবা কংগ্রেস কি বৃটিশ সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য আরেকটি স্তম্ভ হবে? (প্রবল হাঁ, হাঁ, ধ্বনি)। বৃটিশ সরকার আমাদের যে অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তা বিবেচনায় রেখে আমাদেরকে কতিপয় সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। তাছাড়া বৃটিশ সরকারের এসব বিরাট আনুকূল্যের জন্য তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। .....চলুন আমরা সকলেই একই সুরে ঘোষণা দেই যে, আমরা অবশ্যই বৃটিশ রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকব। (হর্ষধ্বনি), আমরা ভালোভাবেই আমাদের প্রতি বৃটিশ রাজের আনুকুল্য অনুধাবন করি।....এবং বৃটিশ সরকারের ক্ষতি করতে চাই না; আমাদের প্রচেষ্টা যেমন আমাদের সমৃদ্ধির জন্য এবং সাথে সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্যও।)

তৎকালীন হিন্দু নেতাদের এ ধরণের মনোভাব এবং দেশের পরাজিত জনগোষ্ঠীর স্পষ্ট বিভাজন ইংরেজদেরকে উরারফব ধহফ ৰুষব নীতি গ্রহণে উৎসাহিত করে। 'মুসলমান দলন আর হিন্দু লালন' ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি গ্রহণের ফলে সমাজের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পিছিয়ে পড়ে আর হিন্দুরা প্রতিপত্তিশালী হতে থাকে। সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের ভূসম্পত্তি হিন্দুদের হাতে হস্তান্তর করা হয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অজুহাতে হাজার হাজার মুসলমানকে নিগ্রহ করা হয়।

ব্রিটিশ সরকার অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে বিশ্ব বিখ্যাত মসলিনসহ এ দেশের তৎকালীন সকল শিল্প ধ্বংস করে দেয়। দূর্ভিক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধানের পরিবর্তে জমিতে নীল চাষ বাধ্যতামূলক করে। এতে **'ছিয়াত্তরের মতান্তর'**[৫] দেখা দিলে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমায় লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। কোলকাতায় বসবাস করা নব্য হিন্দু জমিদারদের আরাম আয়েশের অর্থ যোগাড় করতে এ বঙ্গের মুসলমানদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে।

১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর বতর্মান বাংলাদেশ এবং তৎকালীন আসাম ও ত্রিপুরা (বাংলাদেশ ও ভারতের seven sisters) নিয়ে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠিত হলে কংগ্রেস ও

---

৫ রবার্ট ক্লাইভের শাসনামলে বাং... ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলাদেশে যে ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তার চিহ্ন এদেশে বিশ-পচিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, যা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এর বিরোধিতা করেন। ১৯০৫ সালের বাংলা ভাগ[৬] (চধৎঃরঃরড়হ ড়ভ ইবহমধষ; যাকে হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ বঙ্গভঙ্গ হিসাবে গণ্য করেন) হিন্দু জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তা রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলা হয়[৭]। তাদের প্রবল বিরোধিতার কারণে ১৯১১ সনের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাংলা ভাগ রদ করেন। পূর্ব বঙ্গের মুসলমানগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়লে সান্তনা হিসাবে তাদেরকে দেয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের[৮] জমিদারী ছিল পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়; আর এ জমিদারী থেকে আয় যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সে জন্য তিনি বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেন। এসময় তিনি অখন্ড বাংলা রক্ষায় হিন্দুদেরকে উদ্দীপ্ত করার জন্য "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি লিখেছিলেন। পাশাপাশি মুসলমানরা যাতে শিক্ষিত না হতে পারে সেজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (Dacca University) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১৯১২ সনের ২৮ মার্চ কলকাতার 'গড়ের মাঠে' তার (রবীন্দ্রনাথের) সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়; হিন্দুদের সকল নেতাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং ব্যঙ্গ করে একে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় (Mecca University) বলেন।[৯]

মুসলিম বিজয়ের পর ভারতে একবারই মাত্র হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে এবং সে কাজটি করেছিলেন শিবাজী[১০]। শিবাজীর মৃত্যুর প্রায় দু'শ বছর পরে ১৮৯৬ সনে শিবাজী উৎসব পালন অনুষ্ঠানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "এক ধর্মরাজ্য হবে ভারতে এ মহাবচন করিব সম্বল" কবিতা পড়ে শুনান। শিবাজীর বিজয়কে তিনি যেভাবে দেখেন ঃ

'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন সেনা, অন্য দিকে তিন সহস্র আর্য সৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বথ বৃক্ষের মতো হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু এইবার

---

৬ 'যাহারা বঙ্গ বিভাগের বিরোধী তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া বঙ্গ বিভাগকে বঙ্গভঙ্গ নাম দিয়াছিল।' মাধ্যমিক ইতিহাস, মুহাম্মদ ইসহাক (নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই) বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বোর্ড, ঢাকা ; প্রকাশিত ১৯৭৭, পৃঃ ২৭৭
জয়া চ্যাটার্জী, তার বই এর নাম দিয়েছেন 'বাঙলা ভাগ হল' কিন্তু 'বঙ্গ ভঙ্গ' লেখেননি।

৭ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ: পৃঃ ২৫৫

৮ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্ত কবি যিনি সাহিত্যের সকল অঙ্গনে বিচরণ করেছেন। আমাদের কতিপয় বুদ্ধিজীবি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ বলতে জ্ঞানহারা, কেউ কেউ রবীন্দ্র সংগীতকে ইবাদতের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

৯ একশ বছরের রাজনীতি, আবুল আসাদ; পৃষ্ঠাঃ ৭১-৭২ A History of Freedom Movement গ্রন্থে বলা হয়েছে " The Contoversy that started on the proposal for founding a university at Dacca, throws interesting light on the attitute of the Hindus and Muslims. About two hundred prominent Hindus of East Bengal, headed by Babu Ananda Chandra Roy, the leading pleader of Dacca, submitted a memorial to the Viceroy vehemently against the establishment of a university at Dacca . For a long time afterward they tauntingly termed this University as Mecca University

১০ ছত্রপতি শিবাজী শাহাজী ভোসলে (১৬৩০-১৬৮০) ছিলেন মারাঠা শাসক। তিনি মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে ১৬৫৯ সনে প্রতাপগড়ের যুদ্ধে জয়ী হয়ে তার অঞ্চলে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিস্যাৎ হইবে এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্তী সহস্র রশ্মির সহিত হিন্দুস্তানের গৌরব সূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্ ! পাঠক বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রু সৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইল ? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচন্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ?--- কাহার বজ্রমন্ডিত 'হর হর বোম্ বোম্ ' শব্দে তিন লক্ষ ম্লেছকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবার' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল ? কাহার উদ্যত অসির মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযুথের ন্যায় শত্রু সৈন্য মুহূর্তের মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল ? বলিতে পার, সেদিনকার আর্যস্থান এর সূর্যদেব সহস্ররক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারীকে আশীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন? বলিতে পার কি পাঠক। [১১]

ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ সে সময়ে প্রভু পরিবর্তনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলে মরিয়া হয়ে উঠে। ১৮৮৫ সনে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল সে প্রয়াসের প্রথম সমন্বিত উদ্যোগ।

১৯০৫ সনে বর্তমান বাংলাদেশ এবং তৎকালীন আসাম ও ত্রিপুরা নিয়ে মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ[১২] প্রদেশ গঠিত হয়। এ সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সর্বাত্মক বৈরিতার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের মধ্যে নতুন চেতনার উদ্ভব ঘটতে থাকে। ১৯০৬ সনে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংজ্ঞান ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয়তার চেতনা বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। "চিত্তরঞ্জণ দাশ ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে স্যার আব্দুর রহিম, মৌলভী আব্দুল করিম, মৌলভী মুজিবর রহমান, মওলানা আকরাম খান, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ মুসলমান নেতা ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎ বসু, জে এম দাশ গুপ্ত, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ হিন্দু নেতাদের নিয়ে ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা হিন্দু-মুসলিম চুক্তি করেন। এ চুক্তি অনুসারে অবিভক্ত বাংলায় দীর্ঘ অতীত থেকে বিদ্যমান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার হারিয়ে যাওয়া স্বীকৃতি নতুনভাবে অর্জিত হয়।

---

১১ রীতিমত নভেল, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; গল্পগুচ্ছ বই এর পৃঃ ৭১

১২ বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, অরুনাচল, মিজোরাম ও ত্রিপুরা নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়।

www.pathagar.com

স্থির হয় যে, সরকারী চাকরিতে মুসলমানরা সংখ্যানুপাতে চাকরি লাভ করবে এবং যতদিন ঐ সংখ্যানুপাত পূর্ণ না হবে ততদিন তারা শতকরা ৮০ ভাগ চাকরি পাবে।"[১৩] এ চুক্তির সুবাদেই এ কে ফজলুল হক ১৯৩৫ সনে কোলকাতা পৌরসভার মেয়র ও ১৯৩৭ সনে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৪৫ সনে সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন।

Nawab Sir Salimullah Khan

উল্লেখ্য যে, ভারত বিভাগের বৃটিশ উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু এবং কিরণ শংকর রায় প্রমুখ অখন্ড সার্বভৌম বাংলার চেতনায় এগিয়ে আসেন। কিন্তু দিল্লীতে কংগ্রেসের অবাঙ্গালী হাইকমান্ড বাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনার তীব্র বিরোধিতা করেন। কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মেলনে হিন্দু নেতাদের প্রবল চাপের মুখে দেশবন্ধুর বেংগল প্যাক্ট নাকচ হয়ে যায়।নেহরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অখন্ড সার্বভৌম বাংলার ধারণার মধ্যে প্রকারান্তরে একটি পৃথক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের আশংকা করেন। তাই তারা বাংলাকে প্রস্তাবিত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। লক্ষণীয় যে, বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী দলসমূহের সংসদীয় দলের (Parliamentary party) পৃথক পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। "বাংলার আইন পরিষদের সভায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সদস্যদের সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাদ মহতাব এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সদস্যদের সভাপতিত্ব করেন নুরুল আমীন।

স্যার আব্দুর রহীম	স্যার সৈয়দ আহমদ	মৌলভী আঃ করিম	মাওলানা আক্রাম খাঁ	নূরুল আমীন

হিন্দু অঞ্চলগুলির সদস্যরা ৫৮ জন বাংলা ভাগের পক্ষে এবং ২১ জন বিপক্ষে ভোট দেন। বাংলা ভাগের পক্ষে এক যোগে ভোট দেন হিন্দু মহাসভার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ও কমিউনিষ্ট পার্টির জ্যোতি বসু, যিনি পরবর্তীতে পশ্চিম বঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী হন। অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ভোট দেন ১১৬ জন লীগ সদস্য এবং পক্ষে ৩৪ জন কংগ্রেসী সদস্য। তফশিলী ফেডারেশনের ৫ সদস্য বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট দেন। কমিউনিষ্ট পার্টিও কংগ্রেসের পথই সেদিন অনুসরণ করেছিল।"[১৪]

[১৩] বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী ; পৃঃ VII

[১৪] বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী; পৃঃ x

www.pathagar.com

১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ।[১৫] মাহমুদ শফিক বলেন, "এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, পাকিস্তান সৃষ্টিতে এ দেশের মুসলমানরা খুশি হয়েছিল । কারণ পাকিস্তান হবার ফলে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়েছে । মুসলমান জনগণের শতকরা ৯০ ভাগ ছিল কৃষক । আর ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে এ দেশে শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ হিন্দু জমিদার সৃষ্টি করা হয়েছিল । কাজেই ইংরেজ শাসনের অবসান হলে হিন্দু জমিদারদের অবসান হবে, এটাই ছিল এ দেশের জনগণের ধারণা । ফলে ফুটপাত, গাছতলায় চেয়ার টেবিল বসিয়ে, তাঁবু খাটিয়ে, পেটে পাথর বেঁধে এ দেশের মানুষ পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেছে । সব রকম ত্যাগ স্বীকার করেছে ।"[১৬]

ইতিহাসের নির্মম সত্য হলো ১৯০৫ সনে যে হিন্দুরা বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছিলেন ১৯৪৭ সনে তারাই বাংলাকে ভাগ করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন । বিপরীতে ১৯০৫ সনে যে মুসলমানরা বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন ১৯২৩ সনের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অনুযায়ী পুরো বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ গণ্য হওয়াতে ১৯৪৭ সনে তারাই তা ভাগ করার বিপক্ষে কাজ করেন । আজ আবার সেই হিন্দুরাই বাংলাকে একত্রিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে । মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে ১৯৪৭ সনের বাংলা হতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আর এখন যুক্ত বাংলা হবে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ ।

			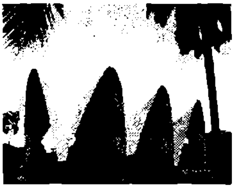
খাজা নাজিমুদ্দিন	শেরে বাংলা	সোহ্‌রাওয়ার্দী	এই তিন নেতার মাজার

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বৈষম্য

নেহরু বলেন, "কলকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির সামনে, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে পর্ণ কুটিরে পথে প্রান্তরে মাঠে-ঘাটে হাজার হাজার মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে উঠে ।"[১৭] নেহরুর এ অভিজ্ঞতা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বৈষম্যের একটি চিত্র সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠে । কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাসাদোপম অট্টালিকা একদিনে গড়ে উঠেনি ।

---

১৫ ১৯৪৮ সনের জুন মাস পর্যন্ত Lord Mountbetten কে ভারতে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে রাখা হয় ।

১৬ গণহত্যা ১৯৭১ ,মাহমুদ শফিক; পৃঃ১৯

১৭ দ্যা ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া, জওহরলাল নেহেরু , ভারতের সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ : ২০১১; চারদিন পৃঃ ১৮

www.pathagar.com

বাংলার দীর্ঘ দিনের রাজধানী আর পূর্ববঙ্গের জমিদারদের আবাসস্থল কলকাতা থাকায় যা উন্নয়ন হয়েছে তার সিংহভাগই পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক।

পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সঙ্গে এক রাষ্ট্র হয়ে স্বাধীনতা লাভ করলে সম্পদের দেনা পাওনার বিষয়টি সামনে আসে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্য হিসাবের কারচুপিতে আমাদেরকে কিভাবে ঠকানো হয়েছিল তা আবুল মনসুর আহম্মদ এভাবে বর্ণনা করেছেন- "নলিনীরঞ্জন সরকার হিসাব নিকাশ করিয়া দেখাইলেন যে, পূর্ব বাংলার পাওনা হইয়াছে ৩ কোটি, আর পূর্ব বাংলার কাছে ভারত ও পশ্চিম বাংলার পাওনা হইয়াছে ৯ কোটি। পূর্ব বাংলা আগে পশ্চিম বাংলা ও ভারতের ৯ কোটি শোধ করিবে; তারপর তার পাওনা ৩ কোটি পাইবে, অর্থাৎ ওজেবাদ করিয়া শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার দেনা থাকিল ৬ কোটি, হায় কপাল; ৩৩ কোটি যোগের বদলে ৬ কোটি বিয়োগ, নলিনী বাবুর এই ঘোষণায় মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী কেন মুর্চ্ছা গেলেন না, আমরাই বা বাঁচিয়া থাকিলাম কিরূপে আমি আজিও তা বুঝি নাই। বোধ হয় এই সান্তনায় যে শুধু রেডক্লিফ একা আমাদের ঠকাইতে পারেন নাই, আমরা সকলে মিলিয়াই আমাদের ঠকাইয়াছি। তার উপর সত্যযুগ কলিযুগ হইয়াছে। সত্যযুগে ছিল শুভঙ্করের ফাঁকি, ৩৩ থনে ৩০০ গেলে ৩০ থাকে বাকি; আর কলিযুগে শুভঙ্করের ফাঁকি ৩৩ থনে শুন্য গেলে দেনা থাকে বাকি।"[১৮]

১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে পূর্ববঙ্গে কোন উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এ প্রতিষ্ঠান হবার পরও এটিকে পংগু করে রাখার জন্য সকল ব্যবস্থা করেন কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ। পূর্ববঙ্গের যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার আশা পোষণ করতেন তাদেরকে পাড়ি জমাতে হতো কলকাতায়। ১৮৫৬ সনে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো --

---

১৮ রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহম্মদ; পৃঃ ২০৭

www.pathagar.com

টেবিল ১.১
১৮৫৬ সনে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র পরিসংখ্যান

পশ্চিমবঙ্গ

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
১.	প্রেসিডেন্সী কলেজ	১২৭	০	৫	১৩২
২.	হিন্দু কলেজ	৪৬২	০	০	৪৬২
৩.	কলুটোলা স্কুল	৫৬৭	০	৪	৫৭১
৪.	কলিংগ স্কুল	১২৪	১৫	৪	১৪৩
৫.	সংস্কৃতি কলেজ	৩৩৯	০	০	৩৩৯
৬.	পাঠশালা	৩৪৫	০	০	৩৪৫
৭.	হুগলী কলেজ	৪৫৫	৭	৬	৪৬৮
৮.	হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	১৬৯	৮	০	১৭৭
৯.	কৃষ্ণনগর কলেজ	২৪০	৭	০	২৪৭
১০.	বহরমপুর কলেজ	২২৭	১০	৫	২৪২
১১.	হাওড়া স্কুল	২২৯	৩	৪	২৩৬
১২.	উত্তরপাড়া স্কুল	২০৩	০	০	২০৩
১৩.	বীরভূম স্কুল	১০৪	১০	০	১১৪
১৪.	মেদিনীপর স্কুল	১৪৫	১০	০	১৫৫
১৫.	বাকুড়া স্কুল	১৪৬	১	০	১৪৭
১৬.	বাউলিয়া স্কুল	১২৯	৫	০	১৩৪
১৭.	রসপাগলা স্কুল	৪০	৬৩	০	১০৩
১৮.	বারাসাত স্কুল	১৯২		০	১৯৫
১৯.	বারাকপর স্কুল	১১৬		০	১১৮
২০.	পাটনা স্কুল	১৪৪		০	১৪৮
মোট		৪৫০৩	১৪৮	২৮	৪৬৭৯

পূর্ববঙ্গ

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
১.	ঢাকা কলেজ	৩৯০	২৪	৪১	৪৫৫
২.	যশোর স্কুল	১৩৪	৫	২	১৪১
৩.	ফরিদপুর স্কুল	১০২	৪	০	১০৬
৪.	বরিশাল স্কুল	২০৯	২২	৩	২৩৪
৫.	কুমিল্লা স্কুল	৯৩	১৬	৭	১১৬
৬.	নোয়াখালী স্কুল	৬৬	১	৪	৭১
৭.	চট্টগ্রাম স্কুল	১৬৬	৪২	১৪	২২২
৮.	বগুড়া স্কুল	৮৫	৬	০	৯১
৯.	দিনাজপুর স্কুল	১১৪	৮	৪	১২৬
১০.	ময়মনসিংহ স্কুল	১৬৭	৯	৮	১৮৪
১১.	সিলেট স্কুল	১৫৭	৫	২	১৬৪
	মোট	১৬৮৩	১৪২	৮৫	১৯১০
সর্বমোট		৬১৮৬	২৯০	১১৩	৬৫৮৯

সূত্রঃ British Policy and the Muslims in Bengal, A R Mallick; p 281

www.pathagar.com

১৯৪৭ সনে পূর্ববঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকাতে[১৯] কোন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। তখন পূর্ববঙ্গের তাঁত আর কলকাতার মিলের কাপড় ছিল এ অঞ্চলের পরিধেয় বস্ত্র। কলকাতায় পাট কল (জুট মিল) ছিল ৪১ টি। মাড়োয়ারীরা নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, দেবীগঞ্জ, মাধবপুরসহ দেশের বিভিন্নস্থানে পাটের আড়ৎ স্থাপন করে পূর্ববঙ্গে উৎপাদিত সকল পাট নিয়ে যেতো কলকাতা আর ডান্ডিতে।

১৯৪৭ সনে এ অঞ্চলের তিনজন মাত্র ICS কর্মকর্তা ছিলেন; দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের মধ্যে এক জন মাত্র কেবল পাকিস্তানে এসে যোগদান করেন। ২৫ বছর পর ১৯৭১ সনে সেখানে CSP'র সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। ১৯৪৭ সনে সামরিক বাহিনীতে এ অঞ্চল থেকে হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র কর্মকর্তা ছিলেন অথচ ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ১৪২ জন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কমপক্ষে ১৪০ জন বাংলাভাষী সামরিক কর্মকর্তা পাকিস্তান সরকারের অধীন চাকরিরত ছিলেন। আর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে ১১০০ জন সামরিক কর্মকর্তা এবং ২৮০০০ সৈনিক পাকিস্তান থেকে ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশে ফিরে আসেন।[২০]

পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর আমল থেকেই এ অঞ্চলের উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়। 'জিন্নাহ বিমান বা স্থল বাহিনীর চাইতে নৌ বাহিনীকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য নৌ পথই একমাত্র উপায় বলে সম্ভবতঃ নৌ বাহিনীকে শক্তিশালী করার আগ্রহ তাঁর বেশী ছিল। রিয়ার এডমিরাল জে. ডব্লিউ জেফোর্ড[২১] হাজার মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্তানে কোন নেভাল বেস না থাকায় ক্রুসহ একটি গোটা বেতার ষ্টেশন চট্টগ্রামে আকাশ পথে নিয়ে এসে বসালেন।'[২২]

দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য আমাদেরকে চীন-কোরিয়ানদেরকে Foreign Direct Investment করার জন্য আহ্বান জানাতে হচ্ছে, তাদেরকে বিভিন্ন tax rebate দিতে হচ্ছে। পাকিস্তান হবার পর ইস্পাহানী, বাওয়ানীসহ বড় বড় শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে দেশের এ অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তারা প্রতিষ্ঠিত করেন আদমজী, ইস্পাহানী ও বাওয়ানী জুট মিল এবং এদের পথ অনুসরণ করে বাংলাভাষী মুসলমানরা ১৯৭১ সনের মধ্যে গড়ে তুলে ৭৬টি পাট কল, বস্ত্রকল ৫৯টি ও চিনি কল পূর্বের ৪টিসহ ১৫টি।[২৩]

---

১৯ ঢাকার নবাব পরিবারের বিশেষ করে নবাব আহ্‌সানউল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় Dacca Electric Light Trust গঠিত হয়। নবাব পরিবার ও ঢাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলো আবাসিক ব্যবহারে জন্য ১৯০১ সনে গঠিত এ Trust এ তিনি চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে জমা দেন। ১৮৭৮ সনে ঢাকায় ৬০টি Kerosene lamp post (Light post) স্থাপন করা হয়, ১৯২১ সনে এ সংখ্যা দাড়ায় ৫২৫। তৎকালীন ঢাকা পৌরসভার কর্মচারীরা সন্ধ্যায় কেরোসিন দিয়ে lamp post এ বাতি জ্বালিয়ে যেতো, সারা রাত তা মিটমিট করে আলো দিত এবং সকালে আপনা থেকেই নিভে যেতো। ১৯৬০ সন পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় Kerosene lamp post দেখা যায়।

২০ The Bangladesh Revolution And Its Aftermath, Talukder Maniruzzaman; p-127

২১ পাকিস্তানের প্রথম নেভী প্রধান ছিলেন।

২২ ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ্, এম এ মোহাইমেন; পৃঃ ২১৬

২৩ ওলট-পালট করে দে মা লুটেপুটে খাই, এস মুজিব উল্লাহ, দৈনিক ইত্তেফাক,তারিখঃ ০৩.০৯.১৯৮০।

www.pathagar.com

উর্দূভাষী মানুষদের প্রতি পূর্ববঙ্গের স্থানীয়দের একটি মনস্তাত্তিক বৈরিতা ছিল। কলকাতা কেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতায় উর্দূভাষীরা অগ্রগামী থাকায় তাদের মধ্যে ছিল একটি অহংবোধ, বিপরীতে বাংলাভাষী মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন থাকাতে তাদের সামনে স্থানীয়দের হীনমণ্যতা ছিল প্রবল। আগত উর্দূভাষী মানুষদের নিয়েই এ অঞ্চলের রেলপথ ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ বিভাগ চালু করা হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় স্থাপনা তৈরী করা হয় বা নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া তার একটি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি ঃ

০১. বাংলাদেশ সচিবালয় (১৯৭১ সনের পর এ সচিবালয়ের পুরাতন ৬ নং ভবনটি ভেঙে ২০ তলা ভবন তৈরী করা হয়।)
০২. পাকিস্তানের Second capital হিসাব শেরেবাংলা নগরকে পরিকল্পিতভাবে তৈরী
০৩. সংসদ ভবন
০৪. বায়তুল মোকাররম মসজিদ
০৫. বাংলা একাডেমি
০৬. ইসলামিক একাডেমি (বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
০৭. রাজশাহী, চট্টগ্রাম,খুলনা, রংপুর, সিলেট বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা
০৮. কমলাপুর রেল ষ্টেশন (পূর্বতন রেল ষ্টেশনটি ছিল গুলিস্তান-ফুলবাড়িয়ায়)
০৯. মীরপুর চিড়িয়াখানা (পূর্বতন চিড়িয়াখানায় বর্তমানে জাতীয় ঈদগাহ, সুপ্রীম কোর্টের প্রবেশদ্বারসহ প্রাঙ্গণ, বার কাউন্সিল, সড়ক ভবন নির্মিত হয়েছে)।
১০. কূর্মিটোলা বিমানবন্দর (ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর)
১১. যমুনা সেতু (১৯৬৬ সনে সংসদে অনুমোদিত)
১২. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৬১ সনে এটির পরিকল্পনা গ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়, যারা বর্তমানে ইরান-ইরাকে কর্মরত। ১৯৭২ সনে প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়া হয়)
১৩. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১৪. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
১৫. শেরে বাংলা কৃষি কলেজ (কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)
১৬. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৭. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৮. শাহজীবাজার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
১৯. আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
২০. কর্ণফুলী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
২১. হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল
২২. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প

১৯৭২ সনে যেগুলোকে জাতীয়করণ করে ধ্বংস করা হয়। বর্তমানে Privatization Board গঠন করে এগুলো বিক্রয় করার চেষ্টা করে সরকার ব্যর্থ হচ্ছে।

www.pathagar.com

২৩. রামপুরা টেলিভিশন ভবন
২৪. ঢাকা স্টেডিয়াম
২৫. ঢাকা যাদুঘর (পূর্বতন যাদুঘরটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে)
২৬. WAPDA এবং এর অধীন শতশত বাঁধ ও সেচ প্রকল্প
২৭. ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মীরপুর, গুলশান, বনানী প্রভৃতি পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গঠন ও নগরায়ন।
২৮. শত শত পাট ও কাপড়ের কল যা বাংলাদেশ হওয়ার পর জাতীয়করণের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়।
২৯. শিল্পায়নের জন্যে গড়ে তোলা হয় East Pakistan Industrial Development Corporation (EPIDC)
৩০. গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা (Ordinance Factory)
৩১. গাজীপুর মেশিন টুল্স্ ফ্যাক্টোরী
৩২. The Mercantile Marine Academy পরিবর্তীত নাম Bangladesh Marine Academy
৩৩. Institute of Postgraduate Medicine and Research (IPGMR) (বর্তমান নাম Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University)
৩৪. মংলা সামুদ্রিক বন্দর (চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরটি মুঘল আমলে স্থাপিত)।
৩৫. ঢাকার নিউ মার্কেটসহ বিভাগীয় শহরে এক একটি নিউ মার্কেট তৈরী।
৩৬. Textile Institute (এটি ১৯৫০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বর্তমানে Bangladesh University of Textile|)
৩৭. Bangladesh Institute of glass and Ceramic (এটি ১৯৬০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।)
৩৮. Institute of Leather Engineering and Technology (এটি ১৯৪৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।)
৩৯. তেজগাঁও শিল্প এলাকা
৪০. হাজারীবাগ ট্যানারী শিল্প এলাকা
৪১. খালিশপুর শিল্প এলাকা

তারপরও এ অঞ্চলের মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা এ অঞ্চলের মানুষকে কেবল শাসন-শোষণ করছে, উন্নয়নমূলক কোন কাজ করেনি। এছাড়া সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নের পরিকল্পনাকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করা হয়।

অর্থনীতির বাইরে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় তথা মন্ত্রী সভা, রাষ্ট্রপ্রধান ও গণ-পরিষদের স্পীকার পদে পূর্ব পাকিস্তানের অংশিদারিত্ব ছিল নিম্নরূপ--

www.pathagar.com

টেবিল ১.২

১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের মন্ত্রি সভার চিত্র

ক্রম	মন্ত্রিসভা	সদস্য সংখ্যা		মোট
		পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	
০১	লিয়াকত আলী খান (পশ্চিম পাকিস্তান)	১৬	০৬	২২
০২	খাজা নাজিমুদ্দিন (পূর্ব পাকিস্তান)	১১	০৭	১৮
০৩	মুহাম্মদ আলী বগড়া (পূর্ব পাকিস্তান)	০৯	০৫	১৪
০৪	মুহাম্মদ আলী বগড়া (পূর্ব পাকিস্তান)	১০	০৬	১৬
০৫	চৌধুরী মুহাম্মদ আলী (পশ্চিম পাকিস্তান)	০৯	০৭	১৬
০৬	হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (পূর্ব পাকিস্তান)	০৫	০৮	১৩
০৭	ইব্রাহীম ইসমাইল (আই আই) চুন্দ্রিগড় (পশ্চিম পাকিস্তান)	০৭	০৪	১১
০৮	ফিরোজ খান নুন[২৪] (পশ্চিম পাকিস্তান)	তথ্য পাওয়া যায়নি।		
০৯	ইসকান্দর মীর্জা (পশ্চিম পাকিস্তান)	০৫	০৩	০৮
১০	ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইউব খান (পশ্চিম পাকিস্তান)	১০	০২	১২
১১	ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইউব খান (পশ্চিম পাকিস্তান)	১২	০৪	১৬
১২	ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইউব খান (পশ্চিম পাকিস্তান)	০৯	০৮	১৭
১৩	ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইউব খান (পশ্চিম পাকিস্তান)	১০	৭	১৭
১৪	জেনারেল আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান (পশ্চিম পাকিস্তান)	০৫	০৫	১০

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী ; পৃঃ ৩৬৬-৩৭৭

টেবিল ১.৩

গভর্ণর জেনারেলদের তালিকা

ক্রম	নাম	মেয়াদকাল		মন্তব্য
		শুরু	শেষ	
০১	মুহাম্মদআলী জিন্নাহ	১৪.০৮.১৯৪৭	১১.০৯.১৯৪৮	পাকিস্তানের স্থপতি
০২	খাজা নাজিমুদ্দিন (পূর্ব পাকিস্তান)	১৪.০৯.১৯৪৮	১৭.১০.১৯৫১	
০৩	মালিক গোলাম মোহাম্মদ (পশ্চিম পাকিস্তান)	১৭.১০.১৯৫১	০৬.১০.১৯৫৫	আমলা
০৪	ইস্কান্দর মীর্জা (পশ্চিম পাকিস্তান)	০৬.১০.১৯৫৫	২৩.০৩.১৯৫৬	এ মেয়াদের পর গভর্ণর জেনারেলের পদ বিলুপ্ত হয়।

টেবিল ১.৪

গণ-পরিষদের প্রেসিডেন্ট বা স্পীকারদের তালিকা

[২৪] ফিরোজ খান নুন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর থাকা কালে ১৯৫২ সালে তার স্ত্রী ভিকারুন্নেসা নুন যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেন, সেটি 'ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ'।

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	মেয়াদকাল		মন্তব্য
		শুরু	শেষ	
০১	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ	১১.০৮.১৯৪৭	১১.০৯.১৯৪৮	গণপরিষদ প্রেসিডেন্ট
০২	মৌলভী তমিজউদ্দিন খান (পূর্ব পাকিস্তান)	১৪.১২.১৯৪৮	২৪.১০.১৯৫৪	ঐ
০৩	আব্দুল ওয়াহাব খান (পূর্ব পাকিস্তান)	১২.০৮.১৯৫৫	০৭.১০.১৯৫৮	স্পীকার
০৪	মৌলভী তমিজউদ্দিন খান (পূর্ব পাকিস্তান)	১১.০৬.১৯৬২	১৯.০৮.১৯৬৩	স্পীকার, ২য় বার
০৫	ফজলুল কাদের চৌধুরী (পূর্ব পাকিস্তান)	২৯.১১.১৯৬৩	১২.০৬.১৯৬৫	স্পীকার
০৬	আব্দুল জব্বার খান (পূর্ব পাকিস্তান)	১২.০৬.১৯৬৫	২৫.০৩.১৯৬৯	স্পীকার

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীগণ সফর করে এখানকার উন্নয়নগতি দেখে অবাক হন। ১৯৪৭ সনের পূর্বের কলকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির বিপরীতে বাংলাদেশের পর্ণ কুটিরের পরিবর্তনের চিত্র দেখে তাদের একজন এম আর আখতার মুকুলকে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। এম আর আখতার মুকুল বলেন,

"অন্ধকারে ডাঃ বোসের চেহারার প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ করে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আমি তো' মাঝে মাঝে ঢাকায় গিয়েছি। সেখানে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছি, তাতে নিজেই ঈর্ষান্বিত হয়েছি। অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী আর অফিসারদের অনেকেরই নতুন নতুন বাড়ি-গাড়ি দেখে আর ঘন ঘন বিদেশে যাতায়াতের গল্প শুনে অবাক হয়েছি। এতো আরাম-আয়েশের জীবন ও সচ্ছল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আপনারা বাঙালি মুসলমানরা কেনো এই মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হলেন বলতে পারেন?'

অথচ বারবার পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানের সংহতি বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা করাচি লাহোর-পিন্ডির শানশওকত দেখে আমরা ঈর্ষান্বিত হয়েছি। মনে মনে ভেবেছি আমরা বাঙালিরা হচ্ছি পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ, অথচ মজাটা ভোগ করেছো তোমরা! বছরের পর বছর ধরে সবার অজান্তে আমাদের মধ্যে এসবের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমরা যদি বিগত বছরগুলোতে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করতে পারতাম আর দেখতাম যে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পরও ভারতীয় বাঙালী হিন্দু যুবককে কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বাসে করে যাদবপুর কিংবা দমদম থেকে যাতায়াত করতে হয়। চার আনার নস্যি আর দু'পয়সা দামের কয়েকটা ক্যাভেন্ডার সিগারেট খেয়ে দিন কাটাতে হয়। পিতা মাতা আর অবিবাহিত ভগ্নির বোঝা বহন করতে হয়। আমরা

www.pathagar.com

যদি পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভয়াবহ জীবনযাত্রাকে দেখতে পেতাম ও নিজেদের অবস্থার সংগে তুলনা করতে পারতাম, তা'হলে আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই এই মুক্তিযুদ্ধে শরীক হওয়ার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করতো। আমরা চব্বিশটা বছর ধরে শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমাদের অবস্থাটা তুলনা করতে পেরেছি বলেই তো "পূর্ব বাংলা শ্মশান কেনো?" পোষ্টার দেখে উত্তেজিত হয়েছি আর নিজেদের অবস্থার আরো উন্নতির জন্য মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছি।"[২৫]

এম আর আখতার মুকুল আরো বলেন,"একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ভারতের কাঠামোতে পশ্চিম বাংলা আর পাকিস্তানের কাঠামোতে পূর্ব বাংলার মধ্যে তুলনামূলকভাবে আমরা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তরা কিন্তু অনেক বেশী আরাম-আয়েশের মধ্যে ছিলাম। এই কথাটা আমরা প্রায় ২৪ বছর পর মুজিবনগরে এসে বুঝতে পারছি। আপনাদের এখানে মধ্যবিত্ত সমাজটা ক্ষয়িষ্ণু; আমাদের ওখানে মধ্যবিত্ত সমাজ সবেমাত্র পূর্ণতার পথে। করাচি-লাহোর-ইসলামাবাদের মহারথীরা পশ্চিম বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার অনুপ্রবেশের ভয়ে আমাদের কোলকাতা যাতায়াত করতে দেয়নি। তাই এর আগে আমরা আপনাদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা করতে পারিনি। উল্টো পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্মতাবোধের নামে আমাদের শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, অফিসার সবাইকে অবিরাম পশ্চিম পাকিস্তান সফর করিয়েছে। তাই আমরা করাচি-লাহোর-পিন্ডির মধ্যবিত্তের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান তুলনা করে প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পেরেছি যে, আমরা বঞ্চিত ও নিগৃহীত। অথচ আমরাই হচ্ছি পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ। মুক্তিযুদ্ধে শরীক হওয়ার পিছনে আমাদের অনেকের মধ্যেই এই মনোভাব কাজ করেছে।"[২৬]

পাকিস্তান ভাঙ্গনের সুর

১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত ১৯০ বছর বাংলা-পাক-ভারত[২৭] উপমহাদেশ ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক শাসিত হয়। ব্রিটিশের অধীন থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য মুসলমান, হিন্দু[২৮], বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ, সাওতাল, হরিজন, টিপরা, তনচংগা, ব্যোম, পাংখো, চাক, খ্যাং, খুমী, নাগা, কুকী, চাকমা, মারমা,খাসিয়াসহ অন্যান্য সকল ধর্ম ও গোত্রের মানুষ মিলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্যাপক আন্দোলন, সংঘাতের পর পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক স্বাধীন দেশ এবং ২৮৩ টি[২৯] স্বাধীন

---

[২৫] আমি বিজয় দেখেছি,এম আর আখতার মুকুল, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৮

[২৬] আমি বিজয় দেখেছি,এম আর আখতার মুকুল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩

[২৭] মূলতঃ ১৯০ বছর সুবে বাংলা পরাধীন ছিল।

[২৮] হিন্দু ধর্ম ঃ হিন্দু বা হিদেন - এর সহজ বাংলা অর্থ হচ্ছে অধার্মিক, নিম্নস্তরের ধর্মাবলম্বী জাতিভুক্ত ব্যক্তি, অখ্রিস্টান, অসভ্য বা বর্বর ব্যক্তি রুক্ষ, নিষ্ঠুর প্রভৃতি। Samsad English- Bengali Dictionary ; Fifth edition, 1976, pp504

[২৯] সাপ্তাহিক দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা (১৮৮৫-১৯৯৫); শ্রী অতুল্য ঘোষ, পৃঃ ১৩০

www.pathagar.com

সত্ত্বা বিশিষ্ট রাষ্ট্র (যাদেরকে ব্রিটিশ করদ রাজ্য[৩০] হিসাবে চিহ্নিত করা হয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত ১৯৪৮ সনের মধ্যে সকল স্বাধীন সত্ত্বা বিশিষ্ট ২৮৩ টির মধ্যে কাশ্মীর ব্যতীত ২৮২ টি রাষ্ট্র সম্পূর্ণ দখল করে নেয়।

ব্রিটিশ সরকারের Divide and Rule নীতি দ্বারা শাসিত হয়ে মূল দু'টি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী তথা মুসলমান ও হিন্দু ভারতকে একটি জাতি-রাষ্ট্র (Nation State) হিসাবে স্বাধীন করার পরিবর্তে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৪৭ সন থেকে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ ধারণ করে গান্ধী ও নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের যাত্রা শুরু হয় যেটি এখন বিশ্বে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে একটি পরাক্রমশালী জাতি-রাষ্ট্র (Nation State) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। অপরদিকে ইসলাম ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানকে বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামী জাতি-রাষ্ট্র (Islamic Nation State)[৩১] হিসেবে গড়ে তোলার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে মর্মে এক ধরণের প্রচারণা শুরু হয়।

১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্টের পর কোলকাতা থেকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঢাকায় চলে আসেন। এখানে সংজ্ঞান গঠনে তারা উপদলে বিভক্ত হলেও 'অসাম্প্রদায়িক'[৩২] ছাত্ররা ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর "পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন" করে ভাষার বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, "পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হোক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।"[৩৩]

১৯৪৮ সনে পাকিস্তানের স্থপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে[৩৪] সফরে আসেন। জিন্নাহ এ অঞ্চলের ভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারেই বলেন "Whether Bengali shall be the official language of this province is a matter for the elected representatives of the people of the province to decide. I have no doubt that this question shall be decided solely in accordance with the wishes of the inhabitants of this province at the appropriate time."[৩৫]

উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী, ইবনে আমীর, ইতিহাস অন্বেষা, জুন-জুলাই ২০১০ সংখ্যা।

৩০ করদ রাজ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কর বা রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে একটি সার্বভৌমত্বহীন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিচালিত হয়।

৩১ মূলতঃ ইসলামি রাষ্ট্র (Islamic State)। স্পেন, পর্তুগাল এবং আইরীশ জনগণ যেমন ধর্মবিশ্বাসের ক্যাথলিক রাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রোটেস্টান্ট রাষ্ট্র,পাকিস্তানও অনুরূপভাবে একটি মুসলিম রাষ্ট্র।

৩২ যে সকল ছাত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের বাইরে চিন্তা করতেন বা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, যেমনটি বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেছেন।

৩৩ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১, বদরুদ্দীন উমর; পৃঃ ২৭

৩৪ ১৯৫৫ সন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের নাম ছিল পূর্ববঙ্গ। এ বছর মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মোহাম্মদ এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখেন।

৩৫ Jinnah Speeches, Speech at a Public meeting at Dacca (Dhaka) on March 21,1948, Pakistan Publication, Printer- Feroz Sons Ltd. Karachi. pp- 79-89

www.pathagar.com

(প্রদেশের দাপ্তরিক ভাষা বাংলা হবে কিনা তা এ প্রদেশের জনপ্রতিনিধিগণ নির্ধারণ করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ অঞ্চলের মানুষের ইচ্ছানুযায়ী তারা যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হবে।)

কিন্তু তিনি দেশের সুসংহতির কথা বিবেচনা করে এবং একটি জাতি-রাষ্ট্র (ঘধঃরড়হ ঝঃধঃব) গঠনের লক্ষ্যে দেশের পাঁচটি অঞ্চলের মানুষের ভাষার বাইরে সহজবোধ্য উর্দূকে[৩৬] রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন। অনেকের ধারণা যে জিন্নাহর মাতৃভাষা ছিল উর্দূ এবং সে কারণে তিনি এটিকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন। জিন্নাহর মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি বরং উর্দূ ভাষাভাষীর মানুষের বাসস্থান বিহার ছিল সুবে বাংলার অংশ। তা ছাড়া পূর্ববঙ্গের অভিজাত পরিবারের মানুষেরা তখন উর্দূতেই কথা বলতেন। জিন্নাহ্ ভেবেছিলেন এ অঞ্চলের মানুষেরা রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে উর্দূকে স্বাগত জানাবেন এবং তখন এটি পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এ অঞ্চলের মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ[৩৭]এটিকে মানুষের মাতৃভাষার উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করে এ ঘোষণার বিরোধিতা করেন। ১৯৫২ সনে পুনরায় রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে উর্দূকে ঘোষণা, এ নিয়ে আন্দোলন এবং ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা ছিল পাকিস্তানের সংহতি চেতনায় প্রথম আঘাত। এরকম একটি অবস্থায় ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গবাসী মুসলিম লীগকে প্রত্যাখান করে। পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক শাসকগোষ্ঠীর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শুরু তখন থেকেই। পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ আর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪৫ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ১৯৫৫ সনে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একটি প্রদেশ ঘোষণা দেন যা ১৯৭০ সন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিরোধী জনমত এত প্রবল ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য আখতার হোসেনের নেতৃত্বে একটি ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করতে বাধ্য হন। ইনকোয়ারী কমিটি পাঞ্জাবে, সিন্ধু, বেলুচিস্তানে, ও সীমান্ত প্রদেশে গঠন করার প্রস্তাব দেয়। আওয়ামী লীগ ব্যাতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দল এক ইউনিট বিলোপ করে সাবেক প্রদেশসমূহ গঠন করার দাবী করছিল। ১৯৭০ সনের নির্বাচনের পূর্বে এক ইউনিট বিলোপ করে সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে সংসদীয় আসন বন্টন করা হয়।

---

[৩৬] মূলতঃ উর্দূ ভাষা পাকিস্তানের নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা নয়। পাঞ্জাবের ভাষা পাঞ্জাবী, সিন্ধুর ভাষা সিন্ধি, বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচি এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভাষা পোস্তু। উর্দূ ভাষাকে **lingua franca** করতে গিয়ে বাংলা-উর্দূতে দ্বন্দ্ব তৈরী করা হয়। [A lingua franca (or working language, bridge language, vehicular language) is a language systematically used to make communication possible between people not sharing a mother tongue, in particular when it is a third language, distinct from both mother tongues] Maj. Gen. (Retd) M A Wahab, P said in his book 'Mukti Bahani Wins Victory'-' The first Governor General of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah declared that Urdu and Urdu alone would be the state language for Pakistan. Ironically enough he made the declaration in English, not in Urdu. He tried to follow the theory of nation state, a common ingredient; 'the language' is the main factor for forming a nation. He was correct that Pakistan was divided on language issue. The Bengali and the Punjabi could not talk to each other, had to take the assistance of third language. Mujib and Yahya never had dialogue in their mother tongue Bengali or Punjabi.

[৩৭] প্রিন্সিপল আবুল কাশেম, মাওলানা আক্রাম খা, আবুল হাশিম, ড.শাফিয়া খাতুন, শামসুল হক, নঈমুদ্দীন আহমদ, মুহাম্মদ তোয়াহা, এড. গাজীউল হকসহ আরো অনেকে।

www.pathagar.com

ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান[৩৮] ইসলামী আইনানুযায়ী পরিচালিত না হয়ে এখানে ব্রিটিশ আইন-কানুন, নিয়ম নীতি অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার অনুসরণ অব্যাহত রাখা হয়। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্যনীতি কোনটাই সেখানে স্থান করতে পারেনি। কারণ যাদের নেতৃত্বে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ইসলামী আদর্শের লোক ছিলেন না। ব্রিটিশ জীবনাদর্শের মানুষেরা কেবল রাজনৈতিক কারণে দ্বিজাতিতত্ত্ব গ্রহণ করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে কার্যত মুসলিম প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৯] অধিকন্তু তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতে ব্যর্থ হয় এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলারাই পাকিস্তান শাসন করতে থাকে। জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলা যারা মূলতঃ বুর্জুয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি তাদের অগণতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়; তবে তা প্রচারণার চেয়ে অনেক কম।[৪০] ফলে, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের মুসলমানরা ইসলাম ধর্মের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ভুলে গিয়ে ভাষার ভিত্তিতে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হতে শুরু করে। জিন্নাহ্-পরবর্তী সকল রাষ্ট্র প্রধানদের অরাজনৈতিক, অদূরদর্শী ও অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আন্তঃকাঠামো (inner structure) বিনষ্ট করে।

•দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯০ বছরের পরাধীনতার শৃংখল ভেঙে ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান অর্জনের পর বাংলা ভাষার উপর আঘাতের ধারণাসহ শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করা এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দেশের দু'অংশের মানুষের মধ্যে আস্থায় ফাটল ধরায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের ইসলামী মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে এ অঞ্চলে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ চেতনার উন্মেষ ঘটে। বিপরীতে ভারত তার ওহফরধ উড়পঃৎরহব অনুযায়ী অখন্ড ভারত[৪১] প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তান ভেঙে প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানের পূর্বাংশকে তার প্রদেশ, কমপক্ষে করদ রাজ্যে পরিণত করার সুযোগের সদ্ব্যবহারের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

১৯৬৬ সনে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৬ দফা ঘোষণা, শেখ মুজিবের গোপন ভারত সফরের মাধ্যমে নেহরুর নিকট সাহায্য চাওয়া, সর্বশেষে ১৯৬৮ সনে ভারতের সঙ্গে শেখ মুজিবের আগরতলা গোপন চুক্তি পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংসে এক একটি হাতুড়ির আঘাত ছিল।[৪২]

---

৩৮ রাষ্ট্রীয় নাম হচ্ছে Islamic Republic of Pakistan

৩৯ সলামী প্রজাতন্ত্রঃ যে দেশের মানুষ তাদের রাষ্ট্রীয় সকল ব্যবস্থাপনায় ইসলামী জীবনাদর্শ গ্রহণ করে তাকে বলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র; সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ হোক তাতে কিছু আসে যায় না। মুসলিম প্রজাতন্ত্রঃ যে দেশের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু ইসলামী জীবনাদর্শ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গ্রহণ করা হয়নি।

৪০ আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল; পৃষ্ঠা ঃ ১৫৮ ।

৪১ এ বই-এর পৃষ্ঠাঃ ১২৪ দ্রষ্টব্য।

৪২ সত্য মামলা আগরতলা, কর্ণেল শওকত আলী, পৃঃ ভূমিকা।

www.pathagar.com

মুজিববাহিনীর এক সভায় আব্দুর রাজ্জাক[৪৩] বলেন, "যারা ইতিহাস বিকৃত করতে চায়, তারা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। ১৯৬১ সালে সংগ্রামী জনতার নামে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে লিফলেট বিলি করা হয়েছিল তাঁরই নির্দেশে।"[৪৪]

১৯৬২ সনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনাল সদর দপ্তর কোলকাতার ভবাণীপুরে সর্বপ্রথম চিত্তরঞ্জণ সুতার[৪৫] ও কালিদাস বৈদ্য[৪৬]কে দিয়ে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এরই যোগসূত্র ধরে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান অতি-ভারতপন্থী ছাত্রনেতাদের নিয়ে ১৯৬২ সনেই 'নিউক্লিয়াস' নামে ছাত্রলীগের ভিতরে এ গোপন সংস্থানটি গড়ে তোলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ এ গোপন সংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৫ সনে আবুল কালাম আজাদ ও এম এ মান্নানকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। পরে অবশ্য তাদেরকে পরে বাদ দেয়া হয়। পরবর্তীতে এর কলেবর বৃদ্ধি করা হয় এবং সদস্য হিসেবে আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, মার্শাল মনি, মোস্তাফিজুর রহমান, স্বপন চৌধুরী, মমতাজ বেগম, আ ফ ম মাহবুবুল হক, বদিউল আলম, আফতাব আহমেদ, রফিকুল ইসলাম লিটন, হিটলার ফারুক, বাতেন চৌধুরী, হান্নান, খসরু, মন্টু, সেলিম, ফিরোজ, সাইফুদ্দিন, নজরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, চিশ্‌তী শাহ্ হেলালুর রহমান, শিব নারায়ন দাশ, ইউসুফ সালাহ উদ্দিন, রেজাউল হক মোস্তাক, রায়হান ফেরদৌস মধু, জাহিদ হোসেন প্রমুখকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৪৭]

---

৪৩ আব্দুর রাজ্জাক সাবেক ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সনের পর আব্দুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বাকশাল নামে দল তৈরী করেন। পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন। ২০০৭ সনে পরোক্ষ সামরিক সরকারের সময় তিনি আওয়ামী লীগে সংস্কার আনার চেষ্টা করলে সংস্কারপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হন। ২০০৮ সনের নির্বাচনে তাকে দল থেকে মনোনয়ন দিলেও মন্ত্রিপরিষদে তার কোন জায়গা হয়নি। তিনি শেখ হাসিনার বিরাগভাজন ব্যক্তি হিসেবেই লন্ডনে মারা যান।

৪৪ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ৩০৫

৪৫ চিত্তরঞ্জন সুতার ঃ চিত্তরঞ্জন সুতার কালিদাস বৈদ্য ও নিরোদ মজুমদারের সঙ্গে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫১ সালের শেষের দিকে ভারতীয় চর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবেশ করেন। ঢাকায় ঢুকে পড়েন। Sheikh Mujib Triumph & Tragedy বই থেকে জানা যায় চিত্তরঞ্জন সুতার 'র'এর লোক ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সনে ভবানীপুরের ২৬ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ সড়কে বাস করতেন। ভারতীয় পাসপোর্টে তার নাম হচ্ছে ভূজঙ্গ ভূষণ রায়। তিনি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে হিন্দু রাজ্যে পরিণত করার জন্য 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে তার নাম হচ্ছে পার্থ সামন্ত।

৪৬ কালিদাস বৈদ্য ঃ ডাঃ কালীদাস বৈদ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় চর হিসেবে ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবেশ করেন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তখন থেকেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ববঙ্গ নামে মুক্তির জন্য তৎপর; যদিও তিনি বলেন হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কারণে তিনি পাকিস্তানকে ভাঙতে চেয়েছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে শেখ মুজিবের সঙ্গে তার পরিচয়। ডঃ কালীদাস বৈদ্য বাংলা সেনা নামক একটি সংগঠনের প্রধান। বাংলা সেনা সংগঠনটি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ছিল এবং সেটি কলকাতা থেকে কার্যক্রম চালায়। তার রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে " দ্বিজাতি তত্ত্ব যদি নাই থাকে, তবে সীমান্ত থাকবে কেন?"

৪৭ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক; পৃঃ ১৯ ও আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ; পৃঃ ৬-৭

www.pathagar.com

"বঙ্গবন্ধু '৬৬ সালেই আমাদের বলেছিলেন, 'আমি সব প্রস্তুত রেখেছি। আমেরিকা ও চীন আমাদের সমর্থন করবে না। কিন্তু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের সাহায্য করবে। পাঁচ বছর পর তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল'। তোফায়েল আহমেদ বলেন,"বঙ্গবন্ধু স্বয়ং বলেছেন, পাকিস্তান হওয়ার পর পরই তিনি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চিন্তা শুরু করেন। আগরতলায় গিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করার উদ্যোগ নেন। আগরতলার ঘটনা ষড়যন্ত্র নয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়।"[৪৮]

আওয়ামী লীগ পাকিস্তান ভাঙার অপবাদ থেকে কৌশলে নিজেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাই ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা, কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন না করা, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করাসহ পাকিস্তানের স্বার্থের পক্ষে সকল ঘোষণা দেয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ১৬৭ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সমগ্র পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা পরিচালনার হকদার হয়।

পাঞ্জাবের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর সূচনা হয় Indian Accounts Service এর আমলা গোলাম মোহাম্মদকে দিয়ে। তিনি গভর্ণর জেনারেল হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দ্বারা গঠিত সরকারগুলোকে বারবার বরখাস্ত করে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেন। সকালে শেরে বাংলা সরকার তো বিকালে আতাউর রহমান সরকার; পরদিন সকালে আবু হেসেন সরকারের সরকার; এরকম একটি অবস্থার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক সরকারের পরিবর্তে গভর্ণর জেনারেলের শাসন চালু করেন, যা পুরো পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। শেষে প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৫৮ সনে জেনারেল মোঃ আইউব খান সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

জেনারেল ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর একগুয়েমি ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর সামরিক evwnbx Operation Searchlight bv‡g Operation Searchdark ev Operation Searchbreak পরিচালনা করে; বাধ্য হয়ে এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। শক্তিশালী একটি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত সামরিক শক্তি না থাকা স্বত্বেও স্বাধীন হওয়ার উন্মাদনা এ দেশের মানুষকে জীবন মরণ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার সাহস যোগায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

০১ মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার মানুষ মিছিল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, সরকার ১৪৪ ধারা এমনকি কার্ফ্যু জারী করে। এদেশের মানুষ তা ভঙ্গ করলে পুলিশের গুলিতে অনেক বিক্ষোভকারী নিহত হয়; এতে ক্ষোভের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সিদ্দিক সালিক[৪৯] বলেন "১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ১৭২ জন

[৪৮] দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ৩০৭

[৪৯] ১৯৭১ সনে পাকিস্তানী মেজর সিদ্দিক সালিক ছিলেন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জন সংযোগ কর্মকর্তা।

www.pathagar.com

নিহত ও ৩৫৮ জন আহত হয়। এ আহত-নিহতের মধ্যে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গাকালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, ফিরোজবাগ কলোনী ও ওয়ারলেস কলোনীতে মারা যায় ৭৮ জন ও আহত হয় ২০৫ জন। সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয় ৫ জন এবং আহত হয় ১ জন। ইপিআর এর বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ২ জন। খুলনায় স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে দাঙ্গা দমনকালে পুলিশের গুলিতে মারা যায় ৪১ জন। স্থানীয় গোলযোগ প্রশমণে পুলিশের গুলিতে মারা যায় ৩ জন এবং জখম হয় ১১ জন। একটি ট্রেন লাইনচ্যুত করা কালে ৪ মার্চ খুলনায় পুলিশের গুলিতে মারা যায় ৪ জন এবং আহত হয় ১ জন। ৩৪১ জন আসামী ও বিচারাধীন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৬ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানা ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেছিল, ফলে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। এতে প্রাণ হারায় ৭ জন এবং আহত হয় ৩০ জন। একদল হিংসাত্মক জনতা ৩ ও ৪ মার্চ যশোর, খুলনা ও রাজশাহী টেলিফোন কেন্দ্রে আক্রমণ চালায়। এ সময় সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয় ৮ জন এবং আহত হয় ১৯ জন। ৫ মার্চ সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যশোর থেকে খুলনা যাচ্ছিল। পথে জনতা কর্তৃক তারা আক্রান্ত হয়, তাদেরকে গুলি ছুঁড়তে হয়। এতে ৩ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা তাদের দায়িত্ব পালনকালে দূর্ঘটনার শিকার হয়; মারা যায় ১ জন অফিসার ও আহত হয় ১ জন। ২ ও ৩ মার্চ রাতে নওয়াবপুর-তাঁতীবাজার দুর্ঘটনায় ইপিআর এর গুলিতে মারা যায় ৬ জন এবং জখম হয় ৫৩ জন। আত্মরক্ষার জন্য একজন ইপিআর সদস্য গুলি ছোঁড়ে, তাতে নিহত হয় ৪ জন এবং আহত হয় ৩ জন। সারা প্রদেশে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয় ২৩ জন এবং আহত হয় ২৬ জন।"[৫০]

৭ মার্চ ১৯৭১; আওয়ামী লীগ প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) প্রধান জুলফিকার আলী ভূট্টো তার সংগে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার অগ্রগতির বিষয়ে জাতিকে অন্ধকারে রেখে সামরিক শাসক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বড় ধরণের সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি সমাপ্ত করে। হাজার হাজার পাঞ্জাবী, পুস্তী, বেলুচ রেজিমেন্টের সদস্যদেরকে বিমান ও নৌপথে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জমায়েত করে। পুস্তী ও বেলুচ রেজিমেন্টের সদস্যদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের "মালাউনদের" মারার জন্য ভ্রান্ত তথ্য ও উদ্বুদ্ধকরণের (motivation) মাধ্যমে অপারেশনে আনে। "মালাউন কেদার হায়, মালাউন কেদার হায়" অথবা কারো বাড়িতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখে "ইয়ে সাচ্চা মুসলিম হায়" আর কবি নজরুল ইসলামের ছবি দেখে "ইয়ে মালাউনকা আওলাদ হায়" ২৫ মার্চের Operation Searchlight চালানোর পর পুস্তী ও বেলুচ সৈন্যদের ইত্যাদি উচ্চারণ থেকেই বিষয়টি পরিস্কার হয়। কিন্তু গোলাম মোহাম্মদের প্রেতাত্মা

---

[৫০] নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক; পৃঃ ৬৮

www.pathagar.com

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ছিল নির্দিষ্ট টার্গেট। ইয়াহিয়া ঘোষণা দিলেন Kill three million of them and the rest will eat out of our hands[৫১] তাদের ধারণা ছিল যে, কিছু মানুষকে হত্যা করলেই সকল আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন।

বস্তুতঃ ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের পর পরই সেনাবাহিনী জেনারেল ইয়াহিয়াকে ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ব্যবহার করে। মূল ক্ষমতা চলে যায় সেনাপ্রধান জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের হাতে। ৩ মার্চ ১৯৭১ মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী প্রেসিডেন্ট হাউজের লাউঞ্জে গিয়ে দেখেন "লাউঞ্জে বসে জেনারেল হামিদ, মিঃ ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট মদ পান করছিলেন। সামনের টেবিলের উপর ইয়াহিয়া ও হামিদ দু'জনে পা দিয়ে বসেছিলেন।"[৫২]

পাকিস্তান ভাঙার মূল নায়ক হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট আইউব খানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, লারকানার জমিদার পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো। ৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৭ আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানের বৃহত্তর দল হলেও এ দল পশ্চিমাংশে কোন আসন পায়নি। অনুরূপভাবে পশ্চিমাংশে ৮৮টি আসন পেলেও পিপিপি পূর্বাংশে কোন আসন পায়নি। গণতান্ত্রিক পার্টির নেতার মত কোন আচরণ না করে ভূট্টো একজন সামরিক জান্তার মত একের পর এক বক্তব্য দিয়ে যান। তিনি বলেন "পিপিপি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় আসনে বসতে রাজি নয়।"[৫৩] তিনি আরো বলেন "শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আর আমি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ।"[৫৪] পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানে তার ফর্মুলা হলো "পূর্ব পাকিস্তান কোন সমস্যাই নয়। বিশ হাজারের মত লোক মারতে হবে, সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।"[৫৫]

"১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সাল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। ঐ দিনের প্রথম ভাগে রাওয়ালপিন্ডির সেনাসদর দফতরে বসে সামরিক জান্তার একটি বৈঠক। ২৫ মার্চের হামলা ঐ দিনের বৈঠকের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল হামিদ, লেঃ জেঃ পীরজাদা, লেঃ জেঃ গুল হাসান, লেঃ জেঃ টিক্কা খান, মেঃ জেঃ ওমর, মেঃ জেঃ আকবর ও পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার উপ-প্রধান এস এ সউদ। ঐ সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত হয়--

- পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড প্রধান লেঃ জেঃ সাহেবজাদা ইয়াকুব খান আর পূর্ব পাকিস্তানে থাকবেন না।
- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান অপসারিত হবেন।

---

৫১ Robert Payne, Massacre, (New York: Macmillan 1973)

৫২ ভুট্টো, শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ, মেঃ জেঃ রাও ফরমান আলী, মোস্তফা হারুন (অনূদিত) উর্দূ ডাইজেস্টে প্রকাশিত পৃঃ ৬০

৫৩ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৩১

৫৪ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ৩০৭

৫৫ জেনারেলস ইন পলিটিকস ,এয়ার মার্শাল আজগর খান; পৃঃ ২৮

www.pathagar.com

লেঃ জেঃ টিক্কা খানকে একাধারে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর, সামরিক আইন প্রশাসক ও পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড প্রধান নিয়োগ করা হবে।"[৫৬]

সামরিক জান্তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া তার বেসামরিক মন্ত্রীসভা ভেঙে দেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে পিআইএর বিমানে করে সৈন্য ও রসদ পূর্ব পাকিস্তানে জড়ো করা শুরু হয়।

অন্যদিকে সামরিক জান্তার ছক অনুযায়ী ১৩ ফেব্রুয়ারী ৭১ এর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন, ৩ মার্চ ১৯৭১-এ ঢাকায় আহবান করা হয়। সামরিক জান্তার ইচ্ছানুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার উদ্দেশ্যে পিপিপি চেয়ারম্যান পাকিস্তানের দু'অংশের জন্য দু'জন প্রধানমন্ত্রী দাবী করেন। ১ মার্চ ইয়াহিয়া আহুত ৩ মার্চ অধিবেশন স্থগিত করলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ক্রোধে ফেটে পড়ে। ৩ মার্চে পল্টনে ময়দানে ছাত্র সমাবেশ এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভাই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেয়। বাকী থাকে ২৫ মার্চ Operation Search light, যে Operation পাকিস্তানকে অখন্ড রাখার সকল বিকল্প রুদ্ধ করে দেয়।

৭ মার্চ ১৯৭১ ঃ শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ

১ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের আহুত ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত হচ্ছে শেখ মুজিব তা আগের দিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারীতেই জানতে পেরেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর এ্যাডমিরাল এস এম আহসান তাকে বিষয়টি অবহিত করেন।[৫৭] কিন্তু এ ঘোষণায় মানুষ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, ঘোষণা প্রত্যাখান করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শেখ মুজিব হারিয়ে ফেলেন; ছাত্রনেতাদের হাতে তখন সকল চাবিকাঠি। চার খলিফা খ্যাত নূরে আলম সিদ্দিকী, আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং এর বাইরে শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, কাজী আরেফ আহমেদ, হাসানুল হক ইনু, মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি) হয়ে পড়েন সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু যাদেরকে শেখ মুজিব 'চরমপন্থী'[৫৮] বলে আখ্যায়িত করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের সংবাদ অবহিত হওয়ার পর গভর্ণরের সামরিক সচিব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে শেখ মুজিব বলেন "আমার অবস্থা হচ্ছে, দু'পাশে আগুন আর মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থীরা আমাকে হত্যা করবে।"[৫৯] ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের মাধ্যমে জাতীয়

---

[৫৬] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক; পৃঃ ৬১

[৫৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক; পৃঃ ৩৪

[৫৮] সে সময়ে ছাত্রলীগে দু'টি পন্থী ছিল, একটি হচ্ছে শেখ মুজিবের ছয় দফাপন্থী আর অন্যটি হচ্ছে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশপন্থী। ছয় দফাপন্থী ভাগেছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমদ; স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশপন্থী ভাগে ছিলেন আসম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ। শেখ মুজিব স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশপন্থীদেরকে চরমপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করে থাকতে পারেন।

[৫৯] নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, অনুবাদ মাসুদুল হক; পৃঃ ৫৬

www.pathagar.com

পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণায় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান কার্যতঃ অচল হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব হোটেল পূর্বাণীতে দলীয় নেতাদের নিয়ে সভা স্থগিত করে পল্টন ময়দানে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার সামনে হাজির হতে বাধ্য হন। ২ মার্চ হরতালের ডাক দেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভার কথা ঘোষণা করেন। ২ মার্চ থেকে ৬ মার্চ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটে যেতে থাকে। ৭ মার্চ শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে কি ভাষণ দেবেন সে অপেক্ষায় থাকে পুরো পাকিস্তানবাসী (তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান)। এই দিন সকালে আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে শেখ মুজিব তার বাসায় মিলিত হয়ে বক্তৃতায় চার দফা ঘোষণা স্থির করেন -

৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে)
জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ

১. সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

২. ১ মার্চ হতে আন্দোলনে যে সমস্ত ভাইবোনকে হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠন করে সে ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

৩. সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং

৪. অবিলম্বে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ ভাষণ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ভীত নড়বড়ে করে দেয়, উত্তপ্ত রাজনীতিকে নৈরাজ্যকর করে তুলে এবং বাঙালি চেতনাকে শাণিত করে। শেখ মুজিবের ভাষণের

www.pathagar.com

কোন সরকারী প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকার সামরিক প্রধানের উক্তি নাকি এরকম ছিল যে "বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ"।[৬০]

কবি নির্মলেন্দু গুনের মতে "শেখ মুজিবর রহমানের ৭ মার্চের দাবী পাকিস্তান যদি মেনে নিত তাহলে আর যাই হোক, এ যাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।"[৬১] মতিয়ুর রহমান রেন্টু বলেন, "ঘটনা প্রবাহের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের শেষ ব্যক্তি, যিনি পাকিস্তানের অখন্ডতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।... ৭ই মার্চের শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে অদ্বিতীয় এক অনন্য ভাষণ। যে ভাষণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।"[৬২]

২৫ মার্চ ১৯৭১ ঃ কালো অধ্যায়ের সূচনা

১ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৭ মার্চের শেখ মুজিবের ভাষণে দু'ধরনের নির্দেশনা ছিল-

১. "তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যার যা আছে সব কিছু-- আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, বন্ধ করে দেবে।" এবং "আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

২. "সামরিক আইন মার্শাল ল' উইদ্‌ড্র (withdraw) করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকাতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না।"

প্রথম নির্দেশনা বিবেচনায় এনে ৯ মার্চ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে শপথ পড়াতে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি বি.এ.সিদ্দিকী অস্বীকার করেন। এ দিনই পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানী বলেন "সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।"[৬৩]

দ্বিতীয় নির্দেশনায় পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করার আভাস থাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান, পিপিপি চেয়ারম্যান

---

[৬০] নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, অনুবাদ মাসুদুল হক; পৃঃ ৬৬

[৬১] আমার ফাঁসি চাই, মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু; পৃঃ ১৯

[৬২] আমার ফাঁসি চাই, মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু; পৃঃ ২০

[৬৩] দৈনিক পাকিস্তান; তারিখঃ ১০ মার্চ ১৯৭১

www.pathagar.com

জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ অনেক নেতৃবৃন্দই ঢাকায় আসেন। পিপিপি বাদে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জামায়েতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শেখ মুজিব বরাবর হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করেন।[৬৪] ১৬ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বৈঠক হয়। প্রথমদিন দু'জনের মধ্যে কোন সহকারী ছাড়াই একান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার পরিবেশ সৌহার্দপূর্ণ রাখার জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা হয়। ২৫ মার্চে অধিবেশন বসার পূর্বেই ১৯ মার্চ অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা হয়।[৬৫]

২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকা এলে ২২ তারিখে মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠক চলাকালেই তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করার সুবিধার জন্য ২৫ মার্চে আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়[৬৬] কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে সরকার বা শেখ মুজিব কেউ মুখ খোলেননি।

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। লাহোর প্রস্তাব[৬৭] দিবস এটি। সরকারী ও বেসরকারী ভবনগুলোতে পাকিস্তানের পতাকা উড়ার কথা। কিন্তু সামরিক সদর দপ্তর, গর্ভর্ণর হাউজ ও রাষ্ট্রপতির ভবন ছাড়া কোথাও সে পতাকা উড়েনি, উড়েছে বাংলাদেশের পতাকা। শেখ মুজিবের বাস ভবনেও "জয়বাংলা পতাকা" উত্তোলন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসভবনে সবুজের মাঝে লাল বৃত্তের উপর হলুদ রং এর মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে করা হয় পাকিস্তানের যবানিকাপাত। পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকা উড়লো না। পাকিস্তানী সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করলো না। পাকিস্তানের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলো না।[৬৮]

২৩ বা ২৪ তারিখ শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে কোন বৈঠক হয়নি, তবে ২৪ তারিখ উভয় পক্ষের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক হয়। ড. কামাল হোসেন বলেন "আমরা ২৩ মার্চ ১৯৭১ গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট হাউজে গিয়েছি। পীরজাদা বললেন, তোমরা অবিভক্ত পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা বলছ, এখন (অন্য রাষ্ট্রের) পতাকা উড়িয়ে বৈঠকে যোগ দিতে এসেছ।"[৬৯] ভুট্টোর একগুয়েমীতে পরিস্থিতির কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা না যাওয়াতে এবং ২৫ মার্চের আহুত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার কারণে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ভুট্টো বাদে সকল নেতাই ফেরৎ যান। ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের উপদেষ্টারা যে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন ২৫ তারিখ সকাল ৯ টায় ভুট্টো তাতে

---

৬৪ দৈনিক সংগ্রাম ; তারিখঃ ১০ মার্চ ১৯৭১

৬৫ বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলিল ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৬৫

৬৬ বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলিল ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৭৫

৬৭ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ভারতবর্ষে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন, লাহোর প্রস্তাব যা পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিতি পায়।

৬৮ আমার ফাঁসি চাই, মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু; পৃঃ ২১

৬৯ গণহত্যা এড়াতেই মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা,ড. কামাল হোসেন, প্রথম আলো: তারিখঃ ২১ মার্চ, ২০১২

www.pathagar.com

চূড়ান্তভাবে অসম্মতিজ্ঞাপন করেন। ইয়াহিয়া-মুজিবের উপদেষ্টাদের শাসনতান্ত্রিক আলোচনার ফল জেনারেল পীরজাদা টেলিফোনে ডঃ কামালকে জানানোর কথা ছিল।

এরই মধ্যে সামরিক সরকার সেনা অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বিষয়টি রাত ১১-৩০ টা পর্যন্ত কারোই জানা ছিল না। ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া বলেন, "রাত সাড়ে এগারটার দিকে নীচ থেকে কাজের লোকদের একজন উপরে এসে জানান যে, ঝন্টু নামক এক যুবক বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে চান। বঙ্গবন্ধু বলেন, ওর কথাই তো আমি ভাবছি। ওয়াজেদ তুমি ওকে ওপরে নিয়ে এসো। ঝন্টু নামক যুবকটি নিজেকে লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগের নেতা জাকারিয়া চৌধুরীর ভাই বলে পরিচয় দিলেন। কিন্তু আমি তাকে চিনি না বলে বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী ছাত্রলীগের মহিউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে উপরে যাই। বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেন, "মুজিব ভাই" পাকিস্তান আর্মিরা আপনাকে মারতে আসছে, আপনি এখনই বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তারা ট্যাংক, কামান ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইতিপূর্বেই ঢাকা শহরে প্রবেশ করার জন্য তৈরী হয়েছে।[৭০]

২৩ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব তার বাসভবনে। "জয়বাংলা পতাকা" উত্তোলন করে সালাম গ্রহণ করেন

ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া বলেন, "২৫ শে মার্চ সন্ধ্যে সাতটার আগেই একে একে আওয়ামী লীগ ও এর অন্যান্য অঙ্গদলের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর নির্দেশ নিয়ে চলে যান। সন্ধ্যায় আসে ছাত্র নেতৃবৃন্দ। রাত ৮টায় এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দিন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম পুনরায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন।"[৭১]

---

[৭০] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃঃ ৮৪

[৭১] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃঃ ৮৩

www.pathagar.com

Operation Searchlight

১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ তারিখেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনাকে Operation Searchlight নামে অবহিত করে। তাদের শক্তিমত্তা বিবেচনা করে এ Operation এর সময়সীমা ২৫ মার্চ ১৯৭১ শেষ প্রহর (২৬ মার্চ জিরো আওয়ার) থেকে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫ দিন নির্ধারণ করা হয়। তাদের Operation এর মূল বিষয়গুলো ছিল[৭২] --

১. সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এক সাথে অপারেশন চালানো হবে।

২. সর্বোচ্চ সংখ্যক রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতা, সাংস্কৃতিক সংজ্ঞান ও শিক্ষকদের আটক করতে হবে।

৩. ঢাকার অপারেশনে একশতভাগ সফলতা অর্জন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

৪. সেনানিবাস দখলের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার করা যাবে।

৫. টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও ও টেলিগ্রাফ যন্ত্রসহ সকল ধরণের অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

৬. সকল পূর্ব পাকিস্তানী (বাঙালি) সামরিক সদস্যের নিকট হতে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করার মাধ্যমে তাদেরকে অকার্যকর করতে হবে।

৭. আওয়ামী লীগকে ভুলপথে পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সাথে সংলাপের অভিনয় করবেন। এতে প্রয়োজনে ভূট্টোর অসম্মতিতেও আওয়ামী লীগের দাবীর সাথে একমত হতে হবে।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে[৭৩] --

১. ভোররাত ১টা ১০ মিনিটে কারফিউ জারী করতে হবে এবং টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও ও সকল সংবাদ মাধ্যমকে বন্ধ করে দিতে হবে।

২. রেল, নৌ ও সড়ক যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঢাকা শহর সীল করে দিতে হবে এবং নৌপথে পেট্রোল ডিউটি দিতে হবে।

৩. অপারেশনের সময় শেখ মুজিবসহ ১৫ জন শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

৪. হিন্দু অধ্যুষিত ও ধানমন্ডি এলাকায় বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান করতে হবে।

---

[৭২] http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight; accessed on 04.01.2012 থেকে বঙ্গানুবাদ।

[৭৩] http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight; accessed on 04.01.2012 থেকে বঙ্গানুবাদ।

www.pathagar.com

৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস হেডকোয়ার্টার এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনকে অকার্যকর করতে হবে। দ্বিতীয় ও দশম ইষ্টবেংগল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করতে হবে।

৬. গাজীপুরের গোলাবারুদ কারখানা ও রাজেন্দ্রপুরের অস্ত্র গুদাম রক্ষাকল্পে এদের দখল নিতে হবে।

সেনাবাহিনী ২৫ মার্চের শেষ প্রহরে তথা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তথা ই.পি.আর, সদর দপ্তর, রাজার বাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রেডিও স্টেশন, শাখারীবাজারসহ অন্যান্য স্থান বশে আনতে গিয়ে হিংসাত্মক আক্রমণ চালায় এবং নির্মমভাবে মানুষ হত্যা করে। এতে বিভিন্ন সূত্র থেকে হতাহতের ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলোর একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে বারবার আন্দেলন গড়ে তোলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, তাই সামরিক শাসকের ক্ষোভ এই প্রতিষ্ঠানের উপর প্রথম থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টির ভ্রূণস্থলেই পাকিস্তান ভাঙার ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। জিন্নাহর ভাষণের বিরুদ্ধে কথা বলার প্রতিষ্ঠান; ৬-দফা ১১-দফা আন্দেলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার সংগ্রাম এবং ৬৯ এর গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার কেন্দ্র হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬২ সনে গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তৈরি হয়। ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জেতাতে সাহায্য করে। আগরতলা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পাকিস্তানকে সশস্ত্র পন্থায় ভেঙ্গে বাংলাদেশ তৈরী করার জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় গড়ে তোলা হয় 'নিউক্লিয়াস' বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' এর রাজনৈতিক উইং "বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বি এল এফ"[৭৪] এবং সামরিক উইং "জয় বাংলা বাহিনী"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে জয় বাংলা বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলতো তখন।[৭৫] পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করার সকল ব্যবস্থাই গড়ে তুলেছে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা। তাই সেনাবাহিনীর Operation পরিকল্পনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সর্বাগ্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য ১৮তম ও ৩২তম পাঞ্জাব এবং ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকটি ইউনিটকে নিয়োজিত করা হয়।

[৭৪] ১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ বি এল এফ সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ হাজার। এদের প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং "মুজিব বাহিনী নামে কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

[৭৫] গবেষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ চত্বর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের শহীদদের তালিকা ফলক

তারা রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ ইকবাল হল[৭৬] ও জগন্নাথ হল আক্রমণ করে। নীলক্ষেত ও ফুলার রোডের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় তারা তল্লাসী চালিয়ে এম এ মুকতাদির, অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ড. এ এন এম মনিরুজ্জামান, আতাউর রহমান খান খাদেম, শরাফত আলী, ড. ফজলুর রহমান খান, মোঃ সাদেক প্রমুখকে হত্যা করে। সেনাবাহিনীর এ অভিযানে কতজন শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী নিহত হন তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। "হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী এ দিনের হামলায় মারা গেছেন" এমন প্রচারণা দীর্ঘ দিন যাবৎ চলে আসছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ চত্বরের ফলক ও ডাকসু সংগ্রহশালার তথ্যানুসারে যুদ্ধের ন'মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার পরিবারের ১৫২ জন সদস্যকে হারায়।

---

[৭৬] বাংলাদেশ হবার পর আল্লামা ইকবালের নামে প্রতিষ্ঠিত হলটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সার্জেন্ট জহরুল হক।

www.pathagar.com

টেবিল ১.৫
২৫ মার্চের মধ্য রাতে ও পরে পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যার পরিসংখ্যান

ক্রমিক	বিবরণ	২৫ মার্চের মধ্য রাতে	মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ে	মন্তব্য
১.	শিক্ষক	৮ জন	১৯ জন	১ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক
২.	ছাত্র	৩৫ জন	১০৩ জন	
৩.	কর্মচারী	৫ জন	২৯ জন	
৪.	অন্যান্য		১ জন	চিকিৎসক
মোট		৪৮ জন	১৫২ জন[৭৭]	

সূত্রঃ ডাকসু সংগ্রহশালা, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ (ঢাবি) ও History of the University of Dacca, M, A, Rahim

টেবিল ১.৬
২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের মৃত্যুর পরিসংখ্যান

	বিবরণ	মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ে	মন্তব্য
শিক্ষক		১৮	১ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক এবং ১ জন চিকিৎসক
ছাত্র	ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)	৭	
	জগন্নাথ হল	৪১	
	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল	১০	
	ফজলুল হক মুসলিম হল	৭	
	জিন্নাহ হল (বর্তমানে সূর্য সেন হল)	৭	
	হাজী মুহাম্মদ মহসিন হল	১০	
	শহীদুল্লাহ হল	১	
কর্মচারী		২৬	
অন্যান্য		২	
মোট		১২৯	

সূত্রঃ History of the University of Dacca, M, A, Rahim, Published 1981

Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh war, Sarmila Bose; p-67 এ এ সংখ্যা ১৪৯ জন উল্লেখ করেছেন। ড. এম এ রহিম তার বই History of the University of Dacca, M, A, Rahim, Published 1981এ বলেন, পুরো যুদ্ধকাল ৮৩ জন ছাত্র ও ২৭ জন কর্মচারী মারা গিয়েছেন।

www.pathagar.com

ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ছিল ছাত্রলীগ তথা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ঘাঁটি। এখান থেকেই পাকিস্তানকে ভেঙ্গে বাংলাদেশ বানানোর পরিকল্পনা করা হয়। উগ্রজাতীয়তাবাদী[৭৮] হিসেবে পরিচিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ, চার খলিফা হিসেবে পরিচিত আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন ও নূরে আলম সিদ্দিকীসহ সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ, শাহ হেলালুর রহমান চিশ্‌তী এবং সকল পর্যায়ের ছাত্রনেতাদের কেন্দ্র ছিল এ হল। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এটাকে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করে।

বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য ১৮তম ও ৩২তম পাঞ্জাব এবং ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকটি ইউনিট সেখানে আক্রমণ চালায়। হলে অবস্থানরত ছাত্র চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান[৭৯] ও নৈশ প্রহরী সামছুদ্দিনকে তারা হত্যা করে। বাকী ৭ জন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল অবস্থার কারণে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলে সকল ছাত্র হল ত্যাগ করেন। ছাত্র রাজনীতির সাথে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং সামনে যাদের মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষা ছিল তারা হলে অবস্থান করেন। সে সময়ে ছাত্র রাজনীতির সাথে কোনভাবেই জড়িত নন এমন কোন ছাত্র এ হলে বাস করতেন না। এ হলের ছাত্ররা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করার কারণে তারা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে রাতের পূর্বভাগেই হল ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ হেলালুর রহমান চিশ্‌তী কি কারণে হলে থেকে গিয়েছিলেন তা আজো রহস্যাবৃত।

২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে সেনা আক্রমণে এ হলে কতজন মারা গিয়েছে তার তথ্য দিতে গিয়ে আবুল হাসনাত বলেন ঐ রাতে ২০০ জন ছাত্র মারা যায়[৮০], ড. এম এ ওয়াজেদ বলেন ৫০-৬০ জন ছাত্র মারা গিয়েছে[৮১], প্রফেসর ড. কে এম মুনিম বলেন ২০০ জন মারা গিয়েছে[৮২] তবে এম এ রহিমের তথ্যের[৮৩] সঙ্গে হলের স্মৃতিফলকের মিল রয়েছে। লেঃ কর্ণেল তাজ[৮৪] বলেন,"There were twelve dead at Iqbal Hall, he told to me, including two ladies of 'dubious purpose.'[৮৫] (ইকবাল হলে বার জন মারা যায়, তার মধ্যে সন্দেহভাজন দুটি মহিলা ছিল। হলের একজন ছাত্র ও একজন নৈশপ্রহরী বাদে বাকী বাইরের দশ জন মারা গিয়েছে বলে মনে হয়।)

---

৭৮ জাহানারা ইমাম তার 'একাত্তরের দিনগুলো'তে যেভাবে বর্ণনা দেন, "এখন আওয়ামী লীগের উগ্রজাতীয়তাবাদী সেকশনের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলার দাবী উঠেছে। চার খলিফা খুব চাপ দিচ্ছে শেখকে স্বাধীনতা ঘোষণা দে'য়ার জন্য।" পৃঃ ১৫

৭৯ Behind the Myth of 3 million, Dr. M. Abdul Mu'min Chowdhury ; ePublication

৮০ Abul Hasanat, The Ugliest Genocide in History, Muktadhara [Swadhin Bangla Sahitya Parishad] 74 Farashganj, Dhaka - I,1974: pp 26-34.

৮১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. এম এ ওয়াজেদ; পৃঃ ৮৬

৮২ http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Dhaka_University_massacre accessed on 04.01.2012

৮৩ History of the University of Dacca, M, A, Rahim.

৮৪ The then C.O. of 32nd Punjab Regiment; later Brigadier.

৮৫ Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh war, Sarmila Bose; p 66 .

www.pathagar.com

কিন্তু Simon Dring[৮৬] বলেন "Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, headquarters of the militantly anti-government students' union, as shells slammed into the building and their rooms were sprayed with machine-gun fire."[৮৭] (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ছিল সরকার বিরোধী জঙ্গি ছাত্রদের ঘাটি। এখানে ২০০ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়, তাদের ঘরগুলোকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়)

এ তথ্যটির অনুকূলে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

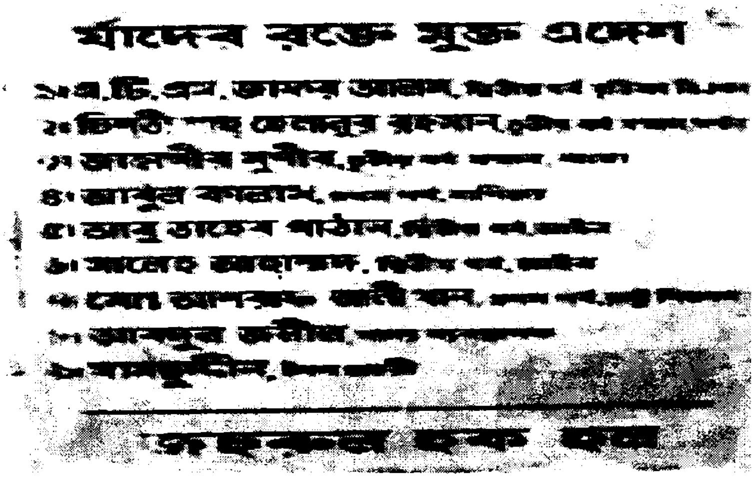

সার্জেন্ট জহরুল হক হলের শহীদদের তালিকা ফলক

জগন্নাথ হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হিন্দু হল এটি। ভারত ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভাঙছে এ বিশ্বাস থেকে সেনাবাহিনী হিন্দুদের উপর ক্ষিপ্ত ছিল। তাদের কাছে ইকবাল হলের মত এটিও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ঘাঁটি; তারা এটিও আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রধান হলের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রায় ২০ জন পাকিস্তানী সেনা (১৮তম ও ৩২তম পাঞ্জাব এবং ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের) সেখানে আক্রমণ করে। এ হলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের নিহতের সংখ্যা নিয়ে ধুম্রজাল রয়েছে। জ্যোতি সেন গুপ্ত বলেন ১০৩ জন ছাত্র মারা গিয়েছে[৮৮], রতন লাল চক্রবর্তী বলেন ৩ জন শিক্ষক, ৩৪ জন

---

[৮৬] এ Simon Dring এবং একুশে টিভির প্রাক্তন প্রধান Simon Dring একই ব্যক্তি।

[৮৭] Tanks crushed revolt in Pakistan, Simon Dring, Daily Telegraph (London); March 30, 1971

[৮৮] Jyoti Sen Gupta, History of Freedom Movement in Bangladesh 1943-1973

www.pathagar.com

ছাত্র এবং ৪ জন কর্মচারী[৮৯]; ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া বলেন যে, ১০০ জনের অধিক ছাত্র মারা গিয়েছে;[৯০]

www.newworldencyclopedia.org এর মতে সেদিন সেখানে ৬০০-৭০০ জন ছাত্র মারা গিয়েছে[৯১], হলে স্থাপিত স্মারকস্তম্ভ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৪ জন শিক্ষক ৪১ জন ছাত্র ও কর্মচারী মারা যায়; লেঃ কর্ণেল তাজ বলেন, "At Jagannath Hall there were thirty two dead, all men."[৯২] (জগন্নাথ হলে ৩২ জন মারা যায়, সকলেই পুরুষ)।

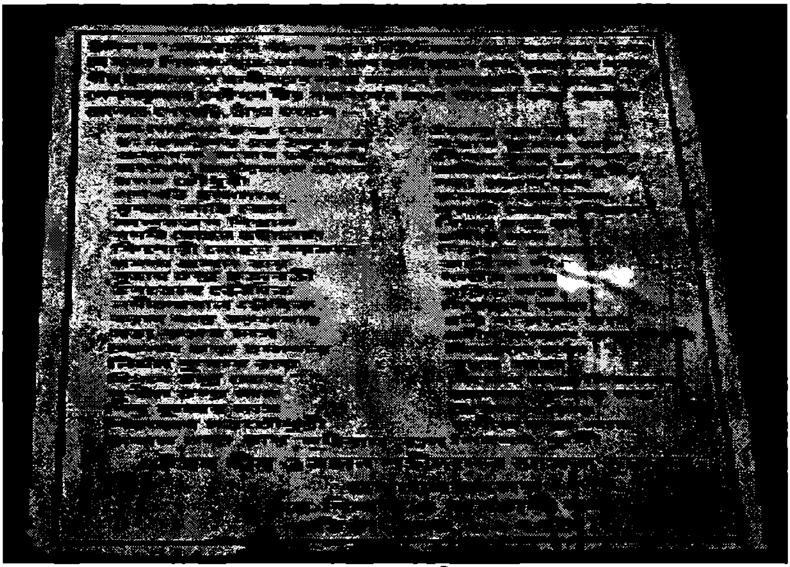

জগন্নাথ হলের স্মৃতিফলক

রাজারবাগ পুলিশ লাইন

Operation Searchlight এর অংশ হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। কারণ তাদের হিসেব মতে সেখানে প্রায় ২০০০ জন পুলিশ সব সময় অবস্থান করে।[৯৩] এ পুলিশ লাইন আক্রমণ করার জন্য ৩২তম

---

[৮৯] রতন লাল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা ১৯৭১, পৃঃ ৩০

[৯০] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ , ড. এম এ ওয়াজেদ ; পৃঃ ৮৬

[৯১] http://www.newworldencyclopedia.org /entry/Bangladesh_War_of_Independence// accessed on 03.01.2012

[৯২] Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh war, Sarmila Bose; p 66

[৯৩] http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight; accessed on 04.01.2012 তখন পুলিশের জনবল ছিল ৩৩,৯৯৫ । জুন ২০১১ হিসেব অনুসারে পুলিশের জনবল হচ্ছে ১৪১,১২৩

www.pathagar.com

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কয়েকটি ইউনিটকে নিয়োজিত করা হয় । সেখানে আক্রমণ করলে প্রথমে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়; তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৪ জন পুলিশ শহীদ হয়।[৯৪] রাত সাড়ে তিনটার মধ্যে পুলিশের ১৫০ জন সদস্যকে তারা বন্দী করে।[৯৫] কতজন সেখান থেকে পালিয়ে যান তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি । পুরো যুদ্ধে পুলিশ বাহিনী তার পরিবারের মোট ১২৬২ জনকে হারায়।[৯৬]

ই পি আর

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লক্ষ্য ছিল সকল পূর্ব পাকিস্তানী (বাঙালি) বাহিনীর নিকট হতে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করার মাধ্যমে তাদেরকে অকার্যকর করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনের মতই পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস হেডকোয়ার্টার দখল করা তাদের পরিকল্পনায় ছিল। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (EPR)[৯৭] এর জনবল ছিল প্রায় ১৫০০০ যার ১২০০০ জনই ছিল বাঙালি। ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকটি ইউনিটকে সেখানে আক্রমণ চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের কত জন নিহত হয়েছেন তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি তবে ন'মাসের যুদ্ধে এ বাহিনীর মোট ৮১৭ জন শহীদ হয়েছেন।[৯৮]

শাঁখারী পট্টি

ঢাকার সদরঘাট এলাকায় শাঁখা প্রস্তুতকারী হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। হিন্দুদেরকে জব্দ করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ এলাকাটি আক্রমণ করা হয়। এখানে কতজন মারা গিয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। জ্যোতি সেন গুপ্ত বলেন যে এখানে ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয়[৯৯], অ্যান্থনী মাসকারেণহাসের মতে সেখানে ৮০০০ মানুষ মারা যায়[১০০] কিন্তু সর্মিলা বসু বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানান যে সেখানে মোট ১৫ জন মানুষ মারা যায়।[১০১]

---

৯৪ http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-43576// accessed on 03.01.2012

৯৫ http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-43576// accessed on 03.01.2012

৯৬ http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police // date 02.01.2012

৯৭ EPR: East Pakistan Rifles; স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ বাহিনীর নামকরণ করা হয় East Pakistan Civil Affairs Force (EPCAF), বাংলাদেশ হওয়ার পর এ বাহিনীর নাম রাখা হয় Bangladesh Rifles (BDR); ২০০৯ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের ঘটনার পর এ বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় Border Guard Bangladesh (BGB).

৯৮ http://bgb.gov.bd/index.php /bgb/history// accessed on 03.01.2012

৯৯ Jyoti Sen Gupta, History of Freedom Movement in Bangladesh 1943-1973

১০০ দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, অনূদিত : রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি), পৃঃ ১২৩

১০১ Sarmila Bose, 'Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan', Economic and Political Weekly, October 8th, 2005,

www.pathagar.com

রমনা কালী বাড়ি

পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক দিক থেকে কোন গুরুত্ব নেই এমন যে কয়টি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে তার মধ্যে রমনা কালী বাড়ি একটি।[১০২] জ্যোতি সেন গুপ্ত বলেন যে এখানে ২৫০ জন সাধু ও ভক্তকে হত্যা করা হয়। কিন্তু শ্রী শ্রী বুড়া শিবধামের (রমনা কালী বাড়ি) ভক্ত মনোরঞ্জণ দাস বলেন যে সেখান ৪ জন সাধু ও কয়েকজন ভক্ত মারা যায় কিন্তু স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতীকে পাক সেনারা মারেনি; তিনি ভারতে ছিলেন।[১০৩]

জিঞ্জিরা অপারেশন

২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখ রাতে ও ২৬ মার্চ দিনে ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ হলে ঢাকার একেবারে কাছে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরায় আশ্রয় গ্রহণ করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। একই সময় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, ছাত্র নেতা-কর্মী, ইপিআর, পুলিশ এবং সাধারণ মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে কেরানীগঞ্জ তথা জিঞ্জিরায়। ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ইউনিটকে জিঞ্জিরা পরিস্কার করতে আদেশ দেয়া হয়। তৎকালীন ল্যাঃ আলী শাহ নদী পার হয় এবং clean Jingira-র জন্য গুলি চালানোসহ অগ্নিসংযোগ করে।

চুকনগর হত্যাকান্ড

চুকনগর হচ্ছে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ভারতের সীমান্তবর্তী একটি বাজার। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের পর দলে দলে মানুষ ভারতে পাড়ি জমাতে থাকলে খুলনা ও বাগেরহাটের অনেক মানুষ এ পথটিকে সীমানা অতিক্রমের পথ হিসেবে বেছে নেয়। ২০ মে ১৯৭১ তারিখে ভারতে যাবার জন্য মানুষ এখানে জমায়েত হলে পাকিস্তান বাহিনী আক্রমণ চালায়। এতে বহু মানুষ মারা যায়, যার অধিকাংশ পুরুষ ও মুসলমান। ১৯৭১ সনের বড় গণহত্যাগুলোর মধ্যে চুকনগর হত্যাকান্ড একটি।

অন্যান্য স্থান

সামরিক দিক থেকে পুলিশ লাইন ও ইপিআর সদর দপ্তর, রাজনৈতিক দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু ঢাকার অন্যান্য স্থানগুলো কোন্ বিবেচনায় ঙঢ়বৎধঃরড়হ ঝবধৎপযষরমযঃ এর পরিকল্পনাকারীগণ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন, তা পরিস্কার নয়। নয়াবাজারের কাঠপট্টিতে (Timber Market) অগ্নিসংযোগ, দৈনিক ইত্তেফাক ও Daily Peoples কার্যালয় আক্রমণের কোন কারণ জানা যায় না।

---

১০২ বাকীগুলো হচ্ছে শহীদ মিনার, দৈনিক ইত্তেফক ও The Daily People কার্যালয়।

১০৩ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ, ডাঃ এম এ হাসান;পৃঃ ৪৪-৪৫

www.pathagar.com

বাংলাদেশের এমন কোন জেলা ছিল না যেখানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আক্রমণ চালায়নি। কোথাও তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, কোথাও তারা বিনা বাধায় সাধারণ মানুষকে হত্যা নির্যাতন করেছে। ঢাকার বাইরে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনাসহ অন্যান্য সকল জেলাতে আক্রমণ-প্রতিরোধ ঘটে; আর এতে শত শত মানুষ মারা যায়।

মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা[১০৪]

৭ মার্চের শেখ মুজিবের ভাষণ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে অদ্বিতীয় এক অনন্য ভাষণ। যে ভাষণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি।[১০৫] তবে স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছেন এ নিয়ে দেশে গত দু'দশকের অধিক সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা ও বিতর্ক হচ্ছে। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে শেখ মুজিবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাহিনীর অবতারণা করে। আওয়ামী ঘরাণা থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি মমতাজউদ্দিন আহমেদ ২০০৯ সনের ২১ জুন রায় দেন যে, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক নন। ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে তারা পূর্ণাঙ্গ রায়ে সই করেন। রায়ে বলা হয় "আমরা বিচারকগণ ঐতিহাসিক নই এবং ইতিহাস লেখনও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়েনা। তবে সংবিধান ও আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করতে আমরা শপথবদ্ধ। সার্বভৌম জাতীয় সংসদ ব্যতীত সংবিধানের একটি বিন্দুও কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।"[১০৬] খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেন "স্বাধীনতার ঘোষক প্রশ্নে আদালতের রায় জনগণ মানবে না। জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষক।"[১০৭]

শেখ মুজিব স্বীকৃত[১০৮] ১৯৭২ সালে প্রকাশিত "বাংলা নামের দেশ" বইয়ে উল্লেখ আছে, "মুজিব গ্রেফতার। সর্বত্র সঙ্ঘশক্তি প্রায় তছনচ। এই শূন্য অবস্থাকে ভরাট করে তোলার জন্যে মেজর জিয়া রবিবার ২৮ মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও থেকে অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করলেন। তার প্রধান তিনি নিজেই। -মনোবল বজায় রাখতে সব জেনেও বললেন, মুজিবের নির্দেশেই এই সরকার, তিনি যেমন বলছেন তেমন কাজ হচ্ছে।"[১০৯]

---

১০৪ প্রথম সংস্করণ থেকে কিছুটা আলাদা।

১০৫ আমার ফাঁসি চাই, মতিয়ূর রহমান রিন্টু, পৃঃ ২০ (প্রকাশিত ২০০২)

১০৬ বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে শেখ মুজিব বা জিয়াউর রহমানের কেউ স্বাধীনতার ঘোষক নন। ১৯৭২ সনের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে " আমরা বাংলাদেশের জনগন, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি"

১০৭ প্রথম আলো: তারিখঃ ১৭.০৩.২০১০

108 শেখ মুজিব এ বইয়ে বাণী দিয়েছেন।

109 বাংলা নামের দেশ, পৃষ্ঠা- ৮১, আনন্দ পাবলিশার্স (ভারত) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এপ্রিল মাসে প্রকাশিত। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এ বইয়ে ২৫ মার্চ ১৯৭২ তারিখে নিজ স্বাক্ষরিত বানী প্রদান করেন। এ গ্রন্থে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সংগ্রামের আগের ও পরের

www.pathagar.com

আর বেরোতে পারল না।

> মুজিব গ্রেফতার। সর্বত্র সন্ত্রশক্তি প্রায় ভঙ্গুর। এই শূন্য অবস্থাকে ভরাট করে তোলার জন্যে মেজর জিয়া রবিবার ২৮ মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও থেকে অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করলেন। তার প্রধান তিনি নিজেই। মনোবল বজায় রাখতে সব জেনেও বললেন, মুজিবের নির্দেশেই এই সরকার—তিনি যেমন বলছেন তেমন কাজ হচ্ছে।

এপ্রিলের ১২ তারিখ মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। তার দু'দিন পরে কর্নেল ওসমানিকে সি-ইন-সি করে যুক্ত কমান্ড গড়ে তোলা হল। কে কোন্ এলাকার কমান্ডার—তাও স্থির করে দেওয়া হল। তখনই এই বাহিনীর নাম হল 'মুক্তিফৌজ'।
প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ এলাকাওয়ারি ঘোষণা করলেন:
শ্রীহট্ট-কুমিল্লা এলাকার কমান্ডার মেজর মুসারেফ, চট্টগ্রাম-নোয়াখালির কমান্ডার মেজর জিয়া, ময়মনসিং-টাঙ্গাইলের কমান্ডার মেজর শফিউল্লা, খুলনা-যশোরের কমান্ডার মেজর ওসমান।
এপ্রিলের মাঝামাঝি এই মুক্তিফৌজ ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু তখনই গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ জমি তৈরি হয়ে উঠেছে।
৮১

১১ এপ্রিল ১৯৭১[১১০] প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, "The brilliant success of our fighting forces and the daily additions to their strength in manpower and captured weapons has enabled the Government of the People's Republic of Bangla Desh, first announced through major Zia Rahman, to set up a fullfledged operational base from which it is administering the liberated areas."[১১১]

এ.এম.এ. মুহিত[১১২] বলেন, "The next evening Major Zia announced the formatica of a provisional, government under his and solicited the support of the world in the liberation of Bangladesh. Major Zia declared allegiance to Sheikh Mujib and on March 30 he made it clear that the straggle was being led by Mujib who was the supreme commander of the liberation from The movement for autonomy for Bangladesh in the Federation of Pakistan was convested into a struggle for liberation with the revolt of East Pakistan Rifles and Bengali Regents of the Pakistan army in Chittagong."[১১৩]

মঈদুল হাসান বলেন "শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী যারা তার সাথে দেখা করেছিলেন, তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েও তাদের সকল

ইতিহাস, ধারাবাহিক রচনা, আলোকচিত্রমালায় চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। বইটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ন দলিল।

১১০ মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা লগ্নে

১১১ The Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharat to Mujib, Nitish K. Sengupta, p- 559 and, Bangladesh Document vol-I, Indian Government, page 284

১১২ শেখ হাসিনা সরকারের বর্তমান অর্থমন্ত্রী প্রখ্যাত আমলা

১১৩ Bangladesh Emergency of a Nation: AMA Muhit page 227

www.pathagar.com

অনুরোধ উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব রয়ে যান নিজ বাসভবনে। সেখান থেকে গ্রেফতার হন হত্যাযজ্ঞের প্রথম প্রহরে। কিন্তু যেভাবেই হোক, ঢাকার বাইরে এ কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন এবং পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করে চলেছেন।[১১৪]

১৯৭১ সনের মুজিবনগর সরকারের কেবিনেট সচিব এইচ. টি. ইমাম বলেন "চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিকরা পুরোপুরি কাজ বন্ধ রেখে 'সোয়াত' নামক জাহাজ থেকে বিশাল অস্ত্রসম্ভার খালাসে অস্বীকৃতি জানায় এবং পরে বাধা দেয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেকে প্রাণও বিসর্জন দেয়। সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাথে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান সাহেব, এম.আর. সিদ্দিকী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর মীর শওকত আলীর সাথে যান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের জন্য"।[১১৫]

এইচ. টি. ইমাম বলেন "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা যাঁর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল সেই মেজর জিয়াউর রহমানকেই এই অপারেশনের কমান্ড দেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, এই ঘাঁটি আমাদেরই মুক্ত-অঞ্চল চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম-রামগড়"।[১১৬]

এইচ. টি. ইমাম আরো বলেন "মেজর জিয়ার এই ঘোষণা-পাঠ অনেকেই শুনেছিলেন এবং বাঙালি সৈনিকরা যে তাঁর এই ঘোষণা শুনেই আমাদের জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়েছিল।"[১১৭]

"যেহেতু আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং যেহেতু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী রাজনৈতিক দল জনগণের ম্যান্ডেট-এর ভিত্তিতে (অর্থাৎ ৬-দফার ভিত্তিতে) সরকার গঠন করার বৈধ, আইনগত এবং নীতিগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়; সেহেতু তাঁদের যিনি অবিসম্বাদিত নেতা, তাঁর ঘোষণাই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহির্বিশ্বে সুপরিচিত ছিলেন। সবাই জানত তিনিই নেতা। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বৈধতা পাবে না। জিয়াউর রহমান এই সত্য উপলব্ধি করেই তাঁর প্রাথমিক ঘোষণা সংশোধন করে 'বঙ্গবন্ধু'র নামেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ২৭ মার্চ অপরাহ্নে"।[১১৮]

সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মাকসুদ বলেন "মেজর জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণা[১১৯] যারা শোনেননি, তারা ২৮ মার্চের ঘোষণাটিকেই সম্ভবত প্রথম বলে মনে করেন। প্রথম

---

[১১৪] মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান; পৃঃ ৪

[১১৫] বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ৩৩

[১১৬] বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ১৪১

[১১৭] বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ১৮১

[১১৮] বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ৫২

[১১৯] ২৭ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় আসে; এ দু'টি তারিখের একটিকেও স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়নি। সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত

www.pathagar.com

ঘোষণায় মেজর জিয়া নিজেকেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা করেছিলেন। মেজর জিয়ার ঘোষণাটি ছিল এরকম --

১৯৭১ সনের মেজর জিয়া

I, Major Zia, do hereby declare the independence of Bangladesh; request all the peace loving countries of the world, to give immediate recognition to the Swadhin Bangladesh and extend physical assistance of all types to liberate the democratic minded people of Bangladesh. Under the circumstances, I hereby declare myself as a provisional head of Swadhin Bangla liberation Government. I urge upon the people of Bangladesh to continue this freedom movement with increased vigour and intense sense of devotion.

By the grace of God, the victory is ours. Joy Bangla."[১২০]

(আমি, মেজর জিয়া, এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং বিশ্বের সকল শান্তিকামী রাষ্ট্রকে সানুগ্রহচিত্তে অনুরোধ করছি যে, তারা যেন স্বাধীন বাংলাদেশকে সত্বর স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক জনগণকে তাদের স্বাধীনতার জন্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করার হাত সম্প্রসারণ করেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, আমি নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করছি। আমি, বাংলাদেশের সকল জনগণকে দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত, জয় বাংলা।)

পাকিস্তান সরকারের অধীন চাকরি করেছেন এবং ২৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখ হতে বালাদেশ সরকারের অধীন চাকরি করেছেন: তাদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য জেনারেল ওসমানীর অনুরোধে ২৬ মার্চ ১৯৭১ কে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়।

১২০ অরণ্যে বেতার, সৈয়দ আবুল মকসুদ: পৃঃ ৭৪

www.pathagar.com

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, "কিন্তু সেই মেজরও সেদিন যে ভূমিকা রেখেছেন তা তিনি রেখেছেন under the guidance of অথবা under the leadership of শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ সেদিন তাকে অতিক্রম বা পাশ কাটিয়ে কারও পক্ষে কিছু করা ছিল স্রেফ অনধিকার চর্চা।"[১২১]

মেজর জিয়ার ২৮ মার্চের ঘোষণাটি ছিল এ রকম--

"I, Major Zia, provisional Commander in chief of Bangla liberation army, hereby proclaim on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the Independence of Bangladesh.

I also declare that we have already formed a sovereign legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution.

We, therefore, appeal to all democratic and peace loving countries of the world to recognize the democratic Government of Bangladesh."[১২২]

(আমি, মেজর জিয়া, বাংলা সামরিক বাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

আমি আরো ঘোষণা করছি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই আইনানুগ সার্বভৌম সরকার গঠিত হয়েছে এবং তা আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক শান্তিকামী রাষ্ট্রের নিকট বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সানুগ্রহ অনুরোধ করছি।)

বেলাল মোহাম্মদ বলেন "অফিসকক্ষে শুধু আমরা দুজন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। বলেছিলাম আচ্ছা মেজর সাহেব আমরা তো সব মাইনর আপনি মেজর হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয়। কথাটা ছিল নিতান্ত রসিকতা। তিনি নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন: হ্যা। কিন্তু কি বলা যায় বলুনতো। 'আমি একপাতা কাগজ এগিয়ে দিলাম। তিনি পকেট থেকে কলম হাতে নিলেন। প্রথমে তাতে লিখেছিলেন: I, major Zia do hereby declare independence of Bangladesh.[১২৩] এবং মোস্তফা আনোয়ার বলেন, "২৭ মার্চ সন্ধ্যার অধিবেশনে সাতটা ১০ মিনিটে ইংরেজি প্রথম ভাষণটি মেজর জিয়াউর রহমান নিজেই লিখেছিলেন এবং পড়েছিলেন এবং তা বাংলায় অনুবাদ ও পাঠ করেছিলেন আবদুল্লাহ আল ফারুক।"[১২৪]

---

[১২১] অরণ্যে বেতার, সৈয়দ আবুল মকসুদ: পৃঃ ৭৪

[১২২] অরণ্যে বেতার, সৈয়দ আবুল মকসুদ; পৃঃ ৭৬

[১২৩] বেলাল মোহাম্মদ ; স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : পৃঃ ৫৬-৫৮

[১২৪] অরণ্যে বেতার, সৈয়দ আবুল মকসুদ; পৃঃ ১১৩

www.pathagar.com

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি গানের রচয়িতা ও সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন "৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানীদের হাতে ধৃত এবং জীবিত কি মৃত কেউ যখন তা জানে না এবং মুক্তিযোদ্ধারা[১২৫] অসংগঠিত এবং চারদিকে বিশৃংখলা; সেই সুযোগে জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন, বেতার মারফৎ নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করতে। স্বাধীনতা তিনি ঘোষণা করেননি। আওয়ামী লীগের কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধারা তাকে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করাতে গিয়ে এই বিপদে পড়েছিলেন। অতঃপর তাদের প্রচন্ড বিরোধিতার সামনে প্রথম ঘোষণা প্রচারের কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যোগ করে দ্বিতীয় ঘোষণা প্রচার করতে বাধ্য হন।"[১২৬]

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অলি আহাদ বলেন "জনাব আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর বাসায় রাত্রি যাপন করিতে গিয়া তার রেডিও সেটে ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে "স্বাধীন বাংলা রেডিও" ঘোষণা শুনিতে পাই। এই স্বাধীন বাংলা বেতার হইতে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বরে স্বাধীন বাংলার ডাক ধ্বনিত হইয়াছিল। এই ডাকের মধ্যে সেই দিশেহারা, হতভম্ব, সম্বিতহারা ও মূর্ছিতপ্রায় বাঙালী জনতা শুনিতে পায় এক অভয় বাণী, আত্মমর্যাদার রক্ষার সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়ার আহ্বান স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের লড়াই এর সংবাদ। ফলে সর্বত্র উচ্চারিত হয় মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আওয়াজ উঠে জালেমের নিকট আত্মসমর্পণ নয়, আহ্বান ধ্বনিত হইতে থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিরোধ শক্তিকে সুসংহত করণের। এভাবেই সেদিন জাতি আত্মসম্বিত ফিরে পায় এবং মরণপণ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে।"[১২৭]

তিনি বলেন, "আগরতলা এসেম্বলী মেম্বার রেষ্ট হাউসে আমার ও আওয়ামী লীগের নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য আব্দুল মালেক উকিলের মধ্যে সর্বশেষ রাজনেতিক পরিস্থিতির উপর এক বিশাল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতারের পূর্ব পর্যন্ত কোন আদেশ প্রদান করেন নাই।"[১২৮] "ইতিমধ্যে আমি সর্বজনাব আব্দুল মালেক উকিল, জহুর আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল হান্নান চৌধুরী, আলী আযম, খালেদ মোহাম্মদ আলী, লুৎফুল হাই সাচ্চু প্রমুখ আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিয়াছিলেন কিনা, জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে তারা স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন যে ২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের ফলে কোন নির্দেশ দেয়া সম্ভব হয়নি।"[১২৯]

---

১২৫ মুক্তিযোদ্ধাঃ ২৬ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি উচ্চারিত হয়নি।

১২৬ ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; পৃঃ ৬৩-৬৪

১২৭ জাতীয় রাজনীতি ৪৫থেকে ৭৫, অলি আহাদ;পৃঃ ৪৯৬

১২৮ জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ;পৃঃ ৫০০-৫০১

১২৯ জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ;পৃঃ ৫০১

www.pathagar.com

তিনি (অলি আহাদ) আরো বলেন, "সেদিন আমার মত কোটি কোটি উৎকণ্ঠিত বাঙ্গালী প্রাণ উল্লিখিত একটি নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। পক্ষান্তরে সেই অন্ধকারে ও চরম সংকটের মুহূর্তে চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে ভাসিয়া আসিয়াছিল একটি নির্ভয় বীরদর্পী বিদ্রোহী কণ্ঠ। এই কণ্ঠই সেদিন কোটি কোটি বাঙালীকে দিয়াছিল অভয় বাণী; ডাক দিয়াছিল মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে। সময়োপযোগী নেতৃত্বদানের ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্যই পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্দেশ প্রদানের একটি ঘোষণাপত্র ছাপাইয়া সাধারণে বিলি করিয়াছিলেন। ইহা না করিয়া তাহার উচিৎ ছিল সময়োপযোগী অবদানের জন্য মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বীকৃতি দান, কেননা ইহা হইত নেতা সুলভ আচরণ। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাভাবিকভাবেই তাহা করিতে ব্যর্থ হন। ইহা অতীব পরিতাপ এবং দুঃখের বিষয়।"[১৩০]

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন "স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পরে, আগে নয়। এখন পর্যন্ত (০৬.১১.১৯৭১) আমার জানা মতে তার আগে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেননি।"[১৩১]

ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সঞ্জিব রেড্ডি ১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সম্মানে একটি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় ঘোষণা করেন "Your Position is already assumed in the annals of the history of your country as a brave fighter who was the first to declare the independence of Bangladesh. Since you took over the reign of government in your country, you have earned wide respect both in Bangladesh and abroad as a leader truly dedicated to the progress of your country and the well-being of your people."[132] "একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাকারী হিসেবে আপনার মর্যাদা ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে জাতীয় অগ্রগতি এবং জনকল্যাণে নিবেদিত একজন জননেতা হিসেবে এবং বাংলাদেশের বাইরে আপনি গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।"[১৩৩]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে রহস্য পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত সিরাজুল আলম খান বলেন, "১৯৭১ এর ২ মার্চ আ.স.ম. আবদুর রব কর্তৃক স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং পরে চট্টগ্রাম থেকে বাঙালি সৈনিকদের পক্ষ হয়ে

---

[১৩০] জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ; পৃঃ ৫০১

[১৩১] আমাদের সময়: ২৯.০৭.২০১১

[১৩২] Bangladesh in International Politics by M. Shamsul Haq, Page 96, 1993

[১৩৩] অনুবাদটি আমাদের সময়; ২৯.০৭.২০১১ এ প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মেজর জিয়াউর রহমানের আহ্বান ছিল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করার লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ দিক নির্দেশনা।"[১৩৪]

হাবিবুল আলম বীর প্রতীক বলেন,"I kept wondering, since the only name that was ringing in my ears was that of Major Ziaur Rahman who had made the historical announcement over the radio immediately after the crackdown by the brutal Pakistan Army."[১৩৫]

(আমি অভিভূত হয়েছি এবং আমার কানে শুধু মেজর জিয়াউর রহমানের নামই বাজে; যখন বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশে নির্মম হত্যাকান্ড শুরু করে তখন তিনি ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছেলেন।)

মেজর জেনারেল কে.এম.সফিউল্লাহ, বীর উত্তম[136] বলেন, "Having settled his score with his commanding officer on the night of march 25, Zia decided to take his battalion on the outskirts of the city to reorganise, strengthen and then launch a decisive blow on Chittagong. All troops were collected at a place near patiya.

......All the troops then took an oath of allegiance to Bangladesh. The oath was administered by Zia at 1600 hrs on March 26. Thereafter, he distributed 350 soldiers of East Bengal Regiment and about 200 troops of East Pakistan Rifles to various task forces under command of an officer each. These task forces were meant for the city. The whole city of Chittagong was divided into various sectors and each sector was given to a task force. After having made these arrangements, Zia made his first announcement on the radio on March 26. In this announcement apart from saying that they were fighting against Pakistan army he also declared himself as the head of the state. This, of course, could have been the result of tension and confusion of the moment. As the battalion began to gather strength, in the afternoon of March 27, Zia made another announcement from the Shawadhin Bangla Betar Kendra established at Kalurghat.[১৩৭]

---

১৩৪ সিরাজুল আলম খান - এর নির্বাচনী ইশতেতহার। প্রকাশকঃ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন: প্রকাশকালঃ নভেম্বর, ২০০৮

১৩৫ BRAVE OF HEART, Habibul Alam, Bir Pratik; p: 3

১৩৬ মুক্তি বাহিনীর ৩নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান, যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দলীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য।

১৩৭ Bangladesh at war, Maj. Gen. (Retd) K M Safiullah, Academic Publisher, Dhaka 1989, page 44-45

www.pathagar.com

CONFIDENTIAL
Classification

Department of State 053712

TELEGRAM

6473

ACTION: Page 2

made in the name of Mujib. The Martial Law Administration, however claims to have arrested Mujib and his leading lieutenants the night of March 25-26, and their failure to surface publicly thus far lends credence to this claim. On March 27 the clandestine radio announced the formation of a revolutionary army and a provisional government under the leadership of a QUOTE Major Zia Khan UNQUOTE.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রতি ডিক্লাসিফাইড করা বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলপত্রে উল্লেখ রয়েছে, "On March 27 the clandestine radio announced the formation of a revolutionary army and a provisional government under the leadership of a Major Zia Khan."[138]

---

১৩৮ পাকিস্তানের উচ্চ পদস্থ বিশেষ করে সামরিক কর্মকর্তাদের নামের শেষে 'খান' থাকতো, যেমন- আইউব খান, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান। আমেরিকা মনে করেছিল 'মেজর জিয়া' একই ভাবে "মেজর জিয়া খান" হবেন।

www.pathagar.com

আওয়ামী ঘরাণার বুদ্ধিজীবীগণ কাহিনী তৈরী করলেন যে, শেখ মুজিব ইপিআর এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের এম এ হান্নানের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা পৌঁছিয়েছেন। ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন-- "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী বলেন, "রাত ১১.৩৮ মি. চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আহমেদ চৌধুরীর (সম্ভবতঃ জহুর আহমেদ চৌধুরী, গবেষক) কাছে পুলিশ ওয়ারলেস বার্তায় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেন--"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানা ইপিআর ঘাটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা, চট্টগ্রামের রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের সাথে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারের সাহায্য চান। কোন আপোষ নেই, জয় আমাদের, পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা। -- শেখ মুজিবুর রহমান।"[১৩৯]

এ অবস্থায় মতিয়ুর রহমান রিন্টু প্রশ্ন করেন "২৫ শে মার্চ রাতে ঘরে ডঃ কামাল হোসেন থাকতে এবং হাতের কাছে তাজুদ্দিন আহামদ (মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্বদানকারী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) সহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকতেও শেখ মুজিবর রহমান কেন তাদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন না?[১৪০]

স্বাধীনতা ঘোষণা যে শেখ মুজিব দেননি তার সবচেয়ে বড় প্রমান দেন শেখ মুজিবের প্রধান সহচরদের মধ্যে অন্যতম ও প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে শারমিন আহমদ। তিনি বলেন, "পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ মার্চে আব্বু গেলেন মুজিব কাকুকে নিতে। মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন সেই ব্যাপারে আব্বু মুজিব কাকুর সাথে আলোচনা করেছিলেন। মুজিব কাকু সে ব্যাপারে সম্মতিও দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আত্মগোপনের

---

১৩৯ ৭১ এর দশমাস,রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী,কাকলী প্রকাশনী, পৃঃ ৬৪-৬৫

১৪০ আমার ফাঁসি চাই, মতিয়ুর রহমান রিন্টু; পৃষ্ঠা ঃ ২৬০

www.pathagar.com

জন্য পুরান ঢাকার একটি বাসাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল। বড় কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আব্বুর উপদেশ গ্রহণে মুজিব কাকুর এর আগে দ্বিধা করেননি। আব্বুর, সে কারণে বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে মুজিব কাকু কথা রাখবেন। মুজিব কাকু, আব্বুর সাথেই যাবেন। অথচ শেষ মুহূর্তে মুজিব কাকু অনড় রয়ে গেলেন। তিনি আব্বুকে বললেন, 'বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো, পরশুদিন (২৭ মার্চ) হরতাল ডেকেছি । মুজিব কাকুর তাৎক্ষণিক এই উক্তিতে আব্বু বিস্ময় ও বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এদিকে বেগম মুজিব এই শোবার ঘরেই সুটকেসে মুজিব কাকুর জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখতে শুরু করলেন। ঢোলা পাজামায় ফিতা ভরলেন। পাকিস্তানি সেনার হাতে মুজিব কাকু স্বেচ্ছাবন্দি হওয়র প্রস্তুতি দেখার পর আব্বু হাল না ছেড়ে প্রায় এক ঘন্টা ধরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে মুজিব কাকুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি কিংবদন্তি সমতুল্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদাহরণ তুলে ধরলেন, যাঁরা আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মুজিব কাকু তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে রইলেন। আব্বু বললেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য হলো পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ রূপে নেতৃত্ব শূন্য করে দেওয়া। এই অবস্থায় মুজিব কাকুর ধরা দেওয়ার অর্থ হলো আত্মহত্যার শামিল। তিনি বললেন, 'মুজিব ভাই, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা আপনি। আপনার নেতৃত্বের উপরই তারা সম্পূর্ণ ভরসা করে রয়েছে।' মুজিব কাকু বললেন, 'তোমরা যা করার কর। আমি কোথাও যাব না'। আব্বু বললেন, 'আপনার অবর্তমানে দ্বিতীয় কে নেতৃত্ব দেবে এমন ঘোষণা তো আপনি দিয়ে যাননি। নেতার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হবে, দলকে তো তা জানানো হয়নি। ফলে দ্বিতীয় কারো নেতৃত্ব প্রদান দুরূহ হবে এবং মুক্তিযুদ্ধকে এক অনিশ্চিত ও জটিল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।' আব্বুর সেদিনের এই উক্তিটি ছিল এক নির্মম সত্য ভবিষ্যদ্বাণী।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্বু স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে নিয়ে এসেছিলেন এবং টেপ রেকর্ডার নিয়ে এসেছিলেন। টেপে বিবৃতি দিতে বা স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদানে মুজিব কাকু অস্বীকৃতি জানান। কথা ছিল যে, মুজিব কাকুর স্বাক্ষরকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটন) অবস্থিত বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আব্বু বলেছিলেন, 'মুজিব ভাই এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে, কারণ কালকে কী হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না কি করতে হবে। এই ঘোষণা কোন না কোন জায়গা থেকে আমরা কপি করে জানাব। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায়, তাহলে সেটাই করা হবে।' মুজিব কাকু তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারে।'[১৪১]

---

[১৪১] তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা, শারমিন আহমদ, পৃঃ ৫৯-৬০

www.pathagar.com

এ কে খন্দকার (বীর উত্তম) বলেন, "স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রকাশ্য কাউকে কিছু বলেননি। অনেকে বলেন, ২৫ মার্চ রাতে এক হাবিলদারের মারফত চিরকুট পাঠিয়ে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আবার বলা হয়, বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জন্য সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কোথাও কোথাও এমনও উল্লেখিত হয়েছে যে. বঙ্গবন্ধু ইপিআরের বেতার যন্ত্রে বা দাক ও তার বিভাগের টেলিগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি প্রচার করেন ।কিন্তু এগুলোর কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমান নেই ।"[১৪২]

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণটি সাজিয়ে দিয়েছিলেন তাজউদ্দীন। ২৫ মার্চ পর্যন্ত নেতারা কী করবেন, তা ছিল অনিশ্চিত। তবে একটা পরিকল্পনা ছিল আত্মগোপন করে তাঁরা স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। সেই অনুযায়ী তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়েছিলেন। গিয়ে শোনেন তিনি বাড়িতেই থাকবেন, আত্মগোপনে যাবেন না। ফলে কোনো সিদ্ধান্ত এল না। তাজউদ্দীন একটি লিখিত বিবৃতি ও বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করতে একটি টেপ রেকর্ডারও নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাক্ষরও পেলেন না, কণ্ঠস্বরও পেলেন না।" [১৪৩]

মেজর জিয়ার ঘোষণায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতি দিকনির্দেশনা পায়, পায় যুদ্ধে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও সাহস। তাজউদ্দীন যখন দিল্লীতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন নিয়ে ব্যস্ত, তখন ৪ এপ্রিল আপন তাগিদেই যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সেনা অফিসাররা একত্রিত হলেন হবিগঞ্জ জেলার[১৪৪] মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার বাংলোতে[১৪৫]। এ বৈঠকে ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত কর্নেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী[১৪৬], কর্ণেল সালাউদ্দিন মোঃ রেজা, লেঃ কর্নেল আবদুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর মমিন চৌধুরী, মেজর সাফাত জামিল, মেজর মাইনুল হোসেন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন আব্দুল মতিন প্রমুখ। এ ছাড়াও বৈঠকে বিএসএফের ব্রিগেডিয়ার ভিসি পান্ডে, আগরতলার (ত্রিপুরা) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সায়গল[১৪৭] এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা প্রশাসক কাজী রকিব উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

---

১৪২ ১৯৭১ ভেতরে বাইরে, এ কে খন্দকার; পৃঃ ৫৩ .

১৪৩ প্রথম আলো, ০৭.০৯.২০১৪

১৪৪ ইতিহাসে 'সিলেট জেলার মাধবপুর' উল্লেখ রয়েছে। কারন ১৯৮৪ সনের পূর্বে হবিগঞ্জ সিলেট জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা ছিল।

১৪৫ সেখানে একটি স্মৃতিসৌধ আছে।

১৪৬ ১ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ২ ও ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ এবং সমন্বয় সাধনের জন্য তেলিয়াপাড়া (মাধবপুর, হবিগঞ্জ) চা বাগানে মিলিত হন। বিকেলে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) পূর্বাঞ্চলীয় মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার ভি সি পান্ডে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাঙালী অফিসাররা ব্রিগেডিয়ার পান্ডের কাছ থেকে কর্ণেল এম এ জি ওসমানী (অবসরপ্রাপ্ত) এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, ৪ এপ্রিল কর্ণেল ওসমানীসহ ওই এলাকার সব সামরিক অফিসার তেলিয়াপাড়ায় একত্রিত হয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

১৪৭ বিএসএফের ব্রিগেডিয়ার ভিসি পান্ডে, আগরতলার (ত্রিপুরা) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সায়গল তেলিয়াপাড়া চা বাগানে উপস্থিত হন তা প্রথম জানা যায় দৈনিক প্রথম আলো ২৬.০৩.২০১১ এর একটি প্রতিবেদনে।

www.pathagar.com

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা হওয়ায় এ যুদ্ধে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বাধীনতার ঘোষণা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বাংলাদেশীদের নিকট যুদ্ধে রাজনৈতিক দমনের চেয়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনা আর পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের জলন্ত চিত্রটি মানুষকে আলোড়িত করে। ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-আধিপত্যবাদী নীতি (Politico-Econo-Religion Imperialism PERI policy) যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শতকরা নিরানব্বই জনের নিকট ধরা দেয়নি। তাদের সকলের সামনে একটিই স্বপ্ন-- স্বাধীন ভূ-খন্ড, মানচিত্র আর পতাকার বাংলাদেশ। যুদ্ধের জন্য ভারতের পূর্ব নির্ধারিত এগারটি সেক্টরে, সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সামরিক যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও RAW এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী, গণবাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী আর ন্যাপ কম্যুনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত বাহিনী পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে।

২৫ মার্চ ১৯৭১ Operation Searchlight এর মাধ্যমে পাকিস্তান সামরিক জান্তারা যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের জীবনের আলো নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল ঐ বছরের ১৬ ডিসেম্বর সেই light এই অঞ্চলবাসীদের জন্য উজ্জল হয়ে জ্বলে উঠে। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে এ অঞ্চলের নাম, মানচিত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ইত্যাদিতে পরিবর্তন সূচিত হয়; পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে এ অঞ্চলের নাম হয় বাংলাদেশ, আকাশে ওড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

মুজিব নগর সরকার গঠন

২৬ মার্চ ১৯৭১ সনের প্রথম প্রহরে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ আওয়ামী লীগ নেতাসহ সকল মানুষকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়; মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা জাতিকে দিগ্ নির্দেশনা দেয়া এবং যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার প্রেরণা যোগায়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী আওয়ামী লীগ নেতারা RAW এর সহযোগিতায় একত্রিত হওয়ার সুযোগ পান।[১৪৮] শেখ মুজিবের অবস্থান সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ ভারতীয় সরকার কুট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে দাবী করে যে শেখ মুজিব তাদের নিকট আছেন, পরক্ষণেই পাকিস্তান ঘোষণা করে যে শেখ মুজিব স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করে পাকিস্তানে (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান) আছেন। পাকিস্তানের এ ঘোষণা ভারতের বিরাট কূটনৈতিক বিজয় এনে দেয়। কারণ-

---

The Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharat to Mujib, Nitish K. Sengupta, এর বইয়ে এ দু'জনের নাম নেই।

[১৪৮] জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ; পৃঃ ৪৮৬। মূলধারা'৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ১৫। বাংলাদেশে "র", আবু রুশদ, পৃঃ ৪৮।

www.pathagar.com

ভারত শেখ মুজিবের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে অন্ধকারে ছিল যা তাদের জানা প্রয়োজন ছিল। ভারতের ঘোষণার পরপরই পাকিস্তান ঘোষণা না দিলে রাজনৈতিক ভাবে ভারত বিপদে পড়তো, শেখ মুজিবের সকল দায় দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাতো।

শেখ মুজিব পাকিস্তানীদের বন্দী, এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ একক নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত ; কট্টর ভারতপন্থী তাজ উদ্দিন[১৪৯]কে সকল ক্ষমতার অধিকারী করে সরকার গঠন করা যায়।

'শেখ মুজিবকে পাকিস্তান ফাঁসিতে ঝুলাবে' এমন বিশ্বাস থেকে ভারত[১৫০] পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছিল। শেখ মুজিব সম্পর্কে ভারতের স্টাডি হচ্ছে তিনি না পাকিস্তানী না ভারতীয়; তিনি সুবে বাংলার চিন্তাধারার মানুষ। মুজিব জীবিত থাকলে এবং তার নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ হলে তা হতো ভারতের seven sister, বিহার, উড়িষ্যাসহ স্বাধীনতার যুদ্ধ, যা ভারতকেই খন্ডিত করে ফেলত।[১৫১]

আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতাই 'আগরতলা চুক্তি'[১৫২] অনুযায়ী ভারতে পাড়ি জমায় এবং RAW তাদেরকে কলকাতায় সমবেত করে সরকার গঠনের পরিকল্পনা জানায়। এ লক্ষ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ ও ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী ও রহমত আলী ছদ্মনামে দিল্লীতে অবস্থান করে ২ এপ্রিল ১৯৭১ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রথম বার এবং ৫ ও ৬ এপ্রিল দ্বিতীয় বার আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

সরকার গঠনে তাদের নেতাদের কোন দ্বিমত না থাকলেও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে বিরোধিতা হয়। অনেক বাক-বিতন্ডার পর শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। খন্দকার মোশতাক আহমেদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রী, কামরুজ্জামানকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। "খন্দকারের বক্তব্য ছিল যে, তিনি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি, অতএব তিনি বঙ্গবন্ধুর পর প্রথম নেতা, কামরুজ্জামান মনে করতেন কামরুজ্জামান সর্ব পাকিস্তান আওয়ামী

---

১৪৯ অনেকে মনে করেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের অঙ্গরাজ্য করতে চেয়েছিলেন। শেখ মুজিব তাকে এতটাই অবিশ্বাস করতেন যে, বাকশাল গঠনের সময় তাকে ঐ দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পর্যন্ত স্থান দেননি।

১৫০ শেখ মুজিব আর পাকিস্তান থেকে ফিরে আসবেন না এ বিশ্বাস তাজউদ্দিন আহমদও করতেন। সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক, পৃঃ১৫১

১৫১ Indo-Bangladesh Friendship Treaty; Expression of Indian Mistrust and Our Sincerity, Brigadier Anwarul Azim Khan; Dhaka Courier; 15 April 1994

১৫২ পাকিস্তন আমলে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'কে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে প্রচার করা হয়; কিন্তু এখন শেখ হাসিনাসহ অনেক নেতাই এটিকে সত্য ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করেন। কর্ণেল শওকত আলী তার বই ' আগরতলা মামলা সত্য' তে বিস্তারিত বলেছেন।

www.pathagar.com

লীগের সাধারণ সম্পাদক, অতএব তিনিই প্রধানমন্ত্রীর পদ দাবী করতে পারেন। তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কেমন করে হন"?[১৫৩] কিন্তু সকলে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন, কারণ "ব্যক্তি তাজউদ্দীন আহমদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করলে ভারত সরকারের নিকট হইতে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্তি ঘোরতরভাবে ব্যাহত হত।"[১৫৪]

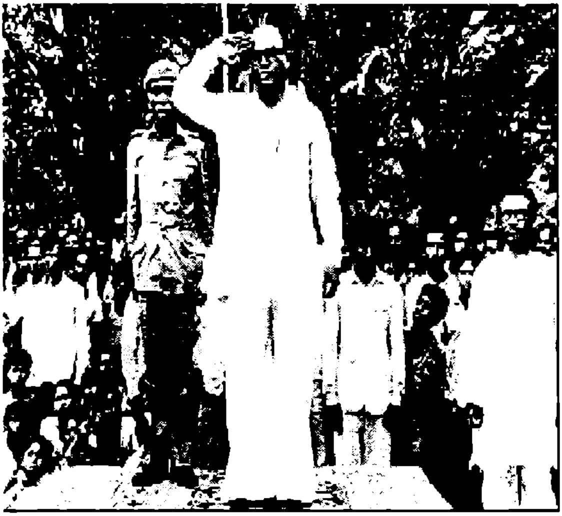

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সরকার গঠনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম সালাম গ্রহণ করেন

RAW তার ছক অনুযায়ী ভারত সংলগ্ন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রসহ[১৫৫] বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ঘোষণা করে। এ সরকারই মুজিবনগর সরকার হিসাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এ দিনই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত বলে গণ্য হয়।[১৫৬]

মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার পর এটি যুদ্ধের দ্বিতীয় মাইলফলক যা বাংলাদেশের তারুণ্যকে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার উৎসাহ যোগায়।

---

১৫৩ বাংলাদেশে সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ৭৮

১৫৪ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ; পৃঃ ৪৮৮

১৫৫ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঘোষণার তারিখ যদিও ১০ এপ্রিল ৭১ তারিখে দেখানো হয়, তা মূলতঃ করা হয় ১৭ এপ্রিল ৭১ তারিখে। সূত্র ঃ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ১৫

১৫৬ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

www.pathagar.com

বিপুল সংখ্যক মানুষের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ

২৫ মার্চ ১৯৭১ এর Operation Searchlight নামে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ এবং পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে সারাদেশে সামরিক অভিযান, হত্যা, অগ্নিসংযোগ সাধারণ মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে। ঢাকা শহরের মানুষেরা দলে দলে পায়ে হেটে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামে নিজ বাড়ি বা আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয় । পাকিস্তান বাহিনী গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ায় যুবক-যুবতীদের জান ও ইজ্জতের উপর হামলার আশঙ্কায় মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ দলবেধে ভারতে প্রবেশ করতে গেলে তাদেরকে কোন বাধা না দিয়ে বরণ করার সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে দূরবর্তী মানুষেরাও ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এভাবে ভারতের শরণার্থী শিবিরে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে। Bangladesh Documents এর পৃষ্ঠা নম্বর ৪৪৬ এ উল্লেখ রয়েছে যে, ৩১ আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত ৮২ লাখ ৮১ হাজার ২২০ জন শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে যার ৬৯.৭১ লাখ হিন্দু, ৫.৪১ লাখ মুসলমান ও ০.৪৪ লাখ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনী গঠন এবং প্রশিক্ষণ

২৭ মার্চ ১৯৭১। মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতি দিগ্-নির্দেশনা পায়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিদ্রোহী বাঙালি সামরিক বাহিনী, ই.পি.আর. ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। ৪ এপ্রিল ৭১ তারিখে সামরিক কর্মকর্তাগণ মিলিত হন হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজারস্ বাংলোতে। পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী সামরিক বাহিনী, ই.পি.আর. পুলিশ ও আনসার সদসদের নিয়ে গঠিত হয় মুক্তিফৌজ। এর প্রধান করা হয় কর্ণেল (পরবর্তীতে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানীকে।

অন্যদিকে তাজউদ্দিন ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সীগুলোর মাধ্যমে পূর্ব রণাঙ্গনের প্রতিরোধ সংগ্রামের এ সব ঘটনা ও সিদ্ধান্তের সংবাদ তাজউদ্দিনের কাছে পৌঁছতে শুরু করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।[১৫৭]

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার মানুষ ভারতে আশ্রয় নিলে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। দেশত্যাগী মানুষেরা নিজের অস্তিত্বের তাগিদে ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অনুপ্রেরণায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণের দাবী জানাতে থাকে। এ সময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবশালী ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। RAW এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় মুজিববাহিনী আর ভারতীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় মুক্তিযোদ্ধা। জুলাই মাসে মুক্তিফৌজ আর মুক্তিযোদ্ধা একীভূত করে গঠন করা হয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে জেনারেল ওসমানী থাকলেও মুজিববাহিনীর নেতৃত্ব দেন ভারতীয় জেনারেল ওবান।

---

১৫৭ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ১৪

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনীর সংগঠনকে এগারটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এ সেক্টরগুলোতে যারা যারা সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তারা হলেন--

টেবিল ১.৭

সেক্টর কমান্ডারগণের তালিকা

সেক্টর নম্বর	সেক্টর কমান্ডারের নাম	দায়িত্বকাল	
		শুরু	শেষ
০১	মেজর জিয়াউর রহমান	১০-০৪-১৯৭১	২৫-০৬-১৯৭১
	মেজর রফিকুল ইসলাম	২৮-০৬-১৯৭১	১৪-০২-১৯৭২
০২	মেজর খালেদ মোশাররফ	১০-০৪-১৯৭১	২২-১১-১৯৭১
	মেজর এটিএম হায়দার	২২-১১-১৯৭১	১৮-১২-১৯৭২
০৩	মেজর কেএম শফিউল্লাহ্	১০-০৪-১৯৭১	২১-০৭-১৯৭১
	ক্যাপ্টেন এএনএম নুরুজ্জামান	২৩-০৭-১৯৭১	১৪-০২-১৯৭২
০৪	মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত	১০-০৪-১৯৭১	১৪-০২-১৯৭২
	ক্যাপ্টেন এ রব		
০৫	মেজর মীর শওকত আলী	১০-০৪-১৯৭১	১৪-০২-১৯৭২
০৬	উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার	এপ্রিল'১৯৭১	১৪-০২-১৯৭২
০৭	মেজর নাজমুল হক	১০-০৪-১৯৭১	২৭-০৯-১৯৭১
	মেজর কাজী নুরুজ্জামান	২৮-০৯-১৯৭১	১৪-০২-১৯৭২
	সুবেদার মেজর এ রব		
০৮	মেজর আবু উসমান চৌধুরী	১০-০৪-১৯৭১	১৭-০৭-১৯৭১
	মেজর এম এ মঞ্জুর	১৪-০৮-১৯৭১	১৪-০২-১৯৭২
০৯	মেজর এম এ জলিল	১৭-০৭-১৯৭১	২৪-১২-১৯৭১
	মেজর এম এ মঞ্জুর		
	মেজর জয়নাল আবেদীন		
১০	নৌ কমান্ডারগণ	০৩-১২-১৯৭১	১৬-১২-১৯৭১
১১	মেজর জিয়াউর রহমান	২৭-০৬-১৯৭১	১০-১০-১৯৭১
	এম হামিদুল্লাহ খান	০২-১১-১৯৭১	১৪-০২-১৯৭২
	মেজর আবু তাহের	১০-১০-১৯৭১	০২-১১-১৯৭১

৩১ মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দেশ রক্ষার মন্ত্র নিয়ে তাদের বিবেচনায় দেশদ্রোহীদের শায়েস্তা করার শুরুর দিন থেকে মাত্র পাঁচ দিন পরেই 'পূর্ব বাংলার জনগণের

www.pathagar.com

সংগ্রামকে সাহায্য করার' জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা এক নির্দিষ্ট ও কার্যকর রূপ লাভ করতে পারে বলে তাজউদ্দিনের ধারণা জন্মায়। মাঈদুল হাসান বলেন "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয় ৩০ এপ্রিল। ৯ মে তাদের হাতে ন্যস্ত হয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু বাংলাদেশের তরুণদের সশস্ত্র ট্রেনিংদানের দায়িত্ব। এপ্রিল মাসে ভারতের 'সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী' (বিএসএফ) বিক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে অল্প স্বল্প সাহায্য করে চলেছিল তার উন্নতি ঘটে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত চার সপ্তাহ মেয়াদী এই ট্রেনিং কার্যক্রমের মান অবশ্য ছিল নেহাতই সাধারণ; মূলতঃ শেখানো হত সাধারণ হাল্কা-অস্ত্র ও বিস্ফোরকের ব্যবহার। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় দু'হাজার ছাত্র ও যুবকের প্রথম দলের ট্রেনিং।"[১৫৮]

তিনি আরো বলেন "তরুণদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে অবশ্য ভারতীয় প্রশাসনের সকল অংশের সমান উৎসাহ ছিল না। যেমন ট্রেনিং প্রদান এবং বিশেষত 'এই সব বিদ্রোহী ও বামপন্থীদের' হাতে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে উর্ধ্বতন ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের আপত্তি প্রথম দিকে ছিল অতিশয় প্রবল। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, নক্সালবাদী, নাগা, মিজো প্রভৃতি সশস্ত্র বিদ্রোহীদের তৎপরতা-হেতু পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা সম্পর্কে এদের উদ্বেগ। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত অস্ত্র এই সব সন্ত্রাসবাদী বা বিদ্রোহীদের হাতে যে পৌঁছবে না, এ নিশ্চয়তাবোধ গড়ে তুলতে বেশ কিছু সময় লাগে। মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং-এর ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে এই নিশ্চয়তাবোধ ক্রমে গড়ে ওঠে।"[১৫৯]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে "প্রথম দিকে রিক্রুটিং সীমাবদ্ধ ছিল কেবল আওয়ামী লীগ দলীয় যুবকদের মধ্যে।... এই সব শিবিরে ভর্তি করার জন্য যে স্ক্রীনিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তদনুযায়ী 'বহির্দেশীয় আনুগত্য' (Extra Territorial Loyalty) থেকে যারা মুক্ত, কেবল সে সব তরুণরাই আওয়ামী পরিষদ সদস্যদের দ্বারা সনাক্তকৃত হবার পর ভর্তির অনুমতি পেত। পাকিস্তানী রাজনৈতিক পুলিশের এই বহুল ব্যবহৃত শব্দ ধার করে এমন ব্যবস্থা খাড়া করা হয় যাতে এই সব শিবিরে বামপন্থী কর্মীদের প্রবেশের কোন সুযোগ না ঘটে।"[১৬০]

"স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানেচ্ছু অপর নানা দল ও মতের ছাত্র-যুবকদের জন্য রিক্রুটিং-এর ব্যাপারে আওয়ামী লীগের একাধিপত্য ছিল প্রবল ক্ষোভ ও হতাশার কারণ। দেশের ভিতরে পাকিস্তানী নির্যাতন যতই গ্রাম-গ্রামান্তরে বিশেষভাবে তরুণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে, ততই প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্র-যুবক ট্রেনিং লাভের আশায় ভারতে এসে ভিড় করেছে, মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে সাধারণ শরণার্থী শিবিরে অথবা সরকার অননুমোদিত ক্যাম্পের অবর্ণনীয় দুর্দশার পরিবেশে। মার্চ-এপ্রিলে

---

১৫৮ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ১৯-২০

১৫৯ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ২০

১৬০ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ২০-২১

www.pathagar.com

পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞের মুখে বিভিন্ন দল, মত ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য গড়ে উঠেছিল। মুক্তিযোদ্ধা মনোনয়ন ও ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে প্রদর্শিত বৈষম্য তরুণদের সেই একতাবোধকে বহুলাংশে বিনষ্ট করে। সেপ্টেম্বরে রিক্রুটিং-এর ক্ষেত্রে দলীয় বৈষম্যের নীতি অনেকখানি হ্রাস পেলেও মুক্তিযোদ্ধাদের পর্যায়ে অবিশ্বাস, রেষারেষি ও দ্বন্দের জের মূলত চলতেই থাকে।"[১৬১]

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মিত্রতা থাকা সত্ত্বেও ভারতে সমাজতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করুক ইন্দিরা গান্ধী তা চাইতেন না। তার নির্দেশেই ভারতীয় বাহিনী নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে আওয়ামী লীগের বাইরে অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীকে বিরত রাখা হয়। ইসলামপন্থী-মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলের নেতা-কর্মীতো দূরে থাক মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের নেতা-কর্মীদেরকেও কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, সামগ্রিক সমস্যার চাপে ভারত সরকারের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যখন দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব হ্রাস পায় এবং বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার মধ্যে তাজউদ্দিনের অবস্থান অপেক্ষাকৃত সবল হয়, তখন বাংলাদেশের বামপন্থী তরুণদের বিরুদ্ধে এই বিধি-নিষেধ বহুলাংশে অপসারণ করা হয়। মনি সিং এর তৎপরতার ফলে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে আলাদাভাবে একটি প্রশিক্ষণ শিবির চালু করা হয় অক্টোবর মাসে। তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পূর্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা আবু করিম[১৬২] বলেন, "গোকুলনগর থেকে আমাদের ৫০০ জনকে ভারতের কোন একটা জায়গায় প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হলো। যেদিন আমরা রওনা হবো তার আগেরদিন হঠাৎ ঘোষণা করা হলো অনিবার্য কারণে আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হতে আরও কয়েকদিন বিলম্ব হবে। এর মধ্যে শুনলাম পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শুনলাম ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদেরকে বলা হলো সবাই একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে দেশে ফিরবো কিন্তু তার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। আমার নোয়াখালীর বন্ধুরা প্রায় চুপচাপ বসে রইলো গোকুলনগর ক্যাম্পে। আমার মনে হলো দেশ যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বাধীন করে দিচ্ছে তখন আর বোকার মতো গোকুলনগর ক্যাম্পে বসে থেকে লাভ কি? অনেক ভেবেটেবে স্থির করলাম আমি প্রথমে ক্যাম্পের বন্ধন থেকে মুক্ত হবো, তারপর আগরতলা যাবো। আগরতলায় গিয়েই একটা সিনেমা দেখলাম--ছবির নাম "ইত্তেফাক"।[১৬৩]

---

১৬১ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ২১-২২

১৬২ আবু করিমের পুরো নাম আবু তাইয়েব মুহাম্মদ ফজলুল করিম। ছাত্র ইউনিয়ন ছেড়ে পরে জাসদ ছাত্রলীগ করেন। পরবর্তী সময়ে একজন আমলা হলেও তিনি লেখা চালিয়ে গেছেন আবু করিম নামেই। তার একটি প্রকাশিত কবিতার জন্য ২০০৯ সনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়।

১৬৩ আমাদের মুক্তিযুদ্ধঃ ফিরে দেখা, আবু করিম, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ, পৃঃ ৫৩৩-৫৩৪ (সংক্ষিপ্ত)

www.pathagar.com

প্রাথমিক পর্যায়ে (মার্চ-এপ্রিল) পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের মুখে জীবনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সকল দল-মত-ধর্ম-বর্ণের মানুষ ভারতে পাড়ি জমায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং গ্রহণ করতে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন। এটি ছিল স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য। কিন্তু "মুক্তিযোদ্ধা মনোনয়ন ও ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে প্রদর্শিত বৈষম্য তরুণদের সেই একতাবোধকে বহুলাংশে বিনষ্ট করে।"[১৬৪] বিশেষ করে দাড়ি-টুপীধারী শরণার্থীকে মারধর অথবা বন্দী করে রাখার ঘটনা ইসলামপন্থী-মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার মানুষদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী হওয়ার অপরাধে (?) ট্রেনিং থেকে বের করা সম্পর্কে মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, "এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। প্রথমে আমরা বুঝতেই পারিনি কী হয়েছে। আমাদের ব্যাচের একজনকে ডেকে পাঠানো হয়। বলা হয়, ঐ ছেলেটিকে উইথড্র করা হয়েছে। একটা চাপা গুঞ্জন শুনি, সে ইসলামী ছাত্র সংঘ করে।"[১৬৫]

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। জেনারেল ওসমানী এক সাক্ষাতে বলেন, এ সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তালিকায় এ সংখ্যা ১,০২,৪৫৮ জন উল্লেখ করা হয়।[১৬৬]

---

১৬৪ লেখার ধারাবাহিকতায় কারণে এ লাইনটি দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত করা হলো।

১৬৫ প্রান্তরভূমির মহাকাব্য, মহিউদ্দিন আহমদ, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ, পৃঃ ১২২

১৬৬ ২০০৩ সনে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তালিকা।

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই

স্বাধীনতা যুদ্ধে পক্ষ বিপক্ষ

ভৌগলিকভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে ছিল এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল মানুষই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। এ যুদ্ধের নেতৃত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নাম সর্বাগ্রে আসে, এর পর মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাপসহ কিছু ছোট ছোট রাজনৈতিক দল এবং মস্কোপন্থী অনেক বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি ভূমিকা রাখেন।

আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রশক্তি WARSAW block; বিপরীতে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল আমেরিকা, চীন এবং মুসলিমবিশ্ব। ব্রিটিশ পলিসি ছিল বরাবরই চতুর। ব্রিটেনের নীতিনির্ধারকদের একাংশ পাকিস্তানের পক্ষে আর অন্য অংশ বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য দেন।

চীনপন্থী রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী ব্যতিক্রম ছাড়া কেউ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কোন ভূমিকা রাখেননি। মাওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ভারতে গিয়ে বন্দী জীবন কাটান। রাশেদ খান মেনন[১৬৭] বলেন "তারপর মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মাওলানাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জানতাম তিনি আমাদের কাছেই আছেন। পত্রিকায় তাঁর বিবৃতি পড়েছি। আকাশবাণীতে সাক্ষাৎকার শুনেছি। প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সভার ছবিও দেখেছি পত্রিকায়। কিন্তু মওলানা যা আশংকা করেছিলেন --- তিনি সুভাস বসুর মতো বন্দী ভারত সরকারের হাতে। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে তিনি অবিচল ছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার তাকে বিশ্বাস করতো না তার স্বাধীনচেতা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী চরিত্রের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মুজিবের উর্দ্ধে কোন নেতার আবির্ভাব তাদের বাঞ্ছনীয় ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটির নেতা-কর্মীদের এবং তাদের বক্তব্য ভারত সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ভারত সরকার আশংকা করত ভারতের বাইরে গেলে তিনি হয়তো প্রগতিশীল বামপন্থীদের নিয়ে স্বাধীনতা শক্তির পক্ষে অপর একটি সরকার বা সংস্থান গড়ে তুলতে পারেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভ করুক এটাও ভারত সরকারের কাম্য ছিল না। সুতরাং এই সূর্য পুরুষকে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে গৃহ-অন্তরীণ থাকতে হয়। কিন্তু তারপরও মাওলানা ভাসানী ঐ অন্তরীণে থেকে মুক্তিযুদ্ধকে প্রভাবিত করেছেন। প্রবাসী সরকারের বিরুদ্ধে একদিকে খন্দকার মোশতাক অপরদিকে শেখ ফজলুল হক মণির আক্রমণ যখন চূড়ান্ত

---

১৬৭. রাশেদ খান মেনন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি। ২০০৮এর নির্বাচণে তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

তখন তিনি ঐ প্রবাসী সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধের ঐক্য রক্ষার জন্য তার পাশে এসে দাড়িয়েছেন দৃঢ়ভাবে।" [১৬৮]

সিরাজ সিকদার একজন চীনপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী নেতা; স্বাধীনতা যুদ্ধে তার একটি উপদল বাংলাদেশের পক্ষে আর অপর উপদল পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করে।[১৬৯] কমরেড আব্দুল হক (কমরেড হক হিসেবেই পরিচিত) স্বাধীনতা যুদ্ধের শুধু বিরোধিতাই করেননি, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তার দলের নাম ছিল "পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি"। শেখ মনির ভাষায় 'কমরেড হক ভাইয়ের সঙ্গেও আমার একটা যোগাযোগ হয়েছে। মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত ভাল। দেরিতে হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। মগর সিরাজ সিকদার ?'[১৭০]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় সকল বিহারি, ব্রিটিশ ভারতে হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত ও প্রতারিত বাংলাভাষী মুসলমান, রাজনৈতিকভাবে ভারত বিরোধী দলের নেতা-কর্মী, রাজাকার আইন অনুযায়ী সহায়তা বাহিনীতে চাকরিপ্রাপ্ত দরিদ্র মানুষ ছাড়া অন্য সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ভারতের মুসলমানগণ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ করার যুদ্ধকে নেতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। নিখিল ভারত ইত্তেহাদুল মোছলেমানের প্রেসিডেন্ট আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে কেউ অংশ গ্রহণ করলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক। [১৭১]

স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষ শক্তি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বকারী রাজনৈতিক দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ। এ যুদ্ধে যারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ১৬৭ জন ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮ জন সদস্যের অধিকাংশই ভারতে গমন করেন তবে এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। কতিপয় সদস্য মিয়ানমারে (বার্মায়) আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাকিস্তান সরকার ৭৭ জন জাতীয় পরিষদের ও ১৪৫ জন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদেরকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ইশতেহার জারী করে। ভারতে গমনকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ গণ পরিষদ গঠিত হয়। তাদের অনেককেই

---

১৬৮ মাওলানা ভাসানী, সম্পাদনায়ঃ হাসান আব্দুল কাইউম; 'মাওলানা ভাসানী স্বাধীনতার পিতৃপুরুষ' রাশেদ খান মেনন পৃঃ ৯০-৯১

১৬৯ আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল; পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৪
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কমরেড সিরাজ শিকদারের পার্টি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বরিশালের পেয়ারাবাগানে এ'ধরনের একটা রক্তাক্ত সংঘর্ষও হয়েছে। আবার এঁরা একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো। কেননা এঁদের বিশ্বাস ছিলো যে, মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছে 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল'।

১৭০ দৈনিক ইনকিলাব; তারিখঃ ২৯.০৭.২০০০

১৭১ www.liberationwarmuseum.org/in this month-in-1971/188-may-12-1971 accessed on 03.01.2012

www.pathagar.com

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় যা তারা পালন করেন। কোন কোন সদস্যের শরণার্থী হিসেবে ভারতে অবস্থান এবং ভারতে অবস্থানকালে কোন কোন সদস্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সার্বিকভাবে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধকে দিগ্ নির্দেশনা দেয়। (আওয়ামী লীগ সম্পর্কে অন্যত্র বিশদ বর্ণনা পৃষ্ঠা নং ৯৪-১১৬ তে রয়েছে)।

মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টি

দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামের দল হলেও আদর্শিকভাবে তারা ছিল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ধারক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ন্যাপের অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ আর কম্যুনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং যুগপৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের সঙ্গে কুটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দু'জন নেতা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে ছদ্মবেশে আগরতলা প্রেরণ ও বিভিন্ন সময় গোপন বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন ন্যাপ ও কমিউনিস্ট নেতারা।[১৭২]

তৎকালীন ন্যাপ নেতা ক্যাপ্টেন হালিমের নেতৃত্বে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ও বিক্রমপুর অঞ্চলে ৬ হাজার গেরিলা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব-পাক ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ, পাকিস্তান ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক দেওয়ান মাহবুব আলী জাতিসংঘসহ পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি সর্বোচ্চ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এক হয়ে মুজাফ্ফর ও কমরেড মণি সিংহ, সোভিয়েত পার্টিকে বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে কনভিন্স করেন। মুজাফ্ফর আহমদ কংগ্রেসের সোশ্যালিস্ট ফোরাম ও ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সর্বোচ্চ উপদেষ্টা পরিষদ, সচিব পরে মন্ত্রী ডিপি ধর, পিএন হাকসার প্রমুখ ক্ষমতাধর ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১৭৩]

ভাসানী ন্যাপ

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরবর্তী সময়ে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন এবং লেনিন ও মাও এর চিন্তাধারার ভিন্নতায় ন্যাপ দ্বিখন্ডিত হয়ে ভাসানী ন্যাপ ও মস্কোপন্থী ন্যাপ নামে দু'টি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ভাসানী পিকিংপন্থী হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের প্রতি ছিলেন দুর্বল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার স্বপ্ন তিনি ১৯৬৯ সন থেকেই দেখতেন বিধায় মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ভারতে পাড়ি জমান। ভারত প্রথম দিকে তাকে বন্দী ও পরে গৃহবন্দী করে রাখলেও মুক্তিযুদ্ধের উপদেষ্টা পরিষদে তাকে সভাপতি করে রাখা হয়। এ দলের মশিউর রহমান যাদু মিয়া, কাজী জাফরসহ শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতাই ভারতে গিয়ে ফিরে আসেন।

সামরিক বাহিনী

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু থেকে শেষাবধি সামরিক বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে মেজর জিয়ার "স্বাধীনতার ঘোষণা"

---

১৭২ 'বামপন্থীদের ঐতিহাসিক ভুল' প্রসঙ্গে কিছু কথা ; জ য় নু ল আ বে দী ন; দৈনিক যুগান্তর; ২২.১১.২০১০,

১৭৩ ঐ

www.pathagar.com

জাতিকে মুক্ত হওয়ার অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি করে। সামরিক বাহিনীর সকল শাখা, তৎকালীন ই পি আর, পুলিশ, আনসার তথা অস্ত্রধারী সকল বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত **"মুক্তিফৌজ"** যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে ও পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ছাত্র এবং ছাত্র সংগঠন

মুক্তিযুদ্ধের চালিকাশক্তি ছিল ছাত্ররা। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মুক্তিবাহিনীর সংজ্ঞাক ও যোদ্ধা হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সিরাজুল আলম খান, শেখ মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আসম আব্দুর রব প্রমুখ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে গঠিত মুজিববাহিনীর ছিল বিশেষ ভূমিকা। এ মুজিববাহিনী গঠন, প্রশিক্ষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ভারতের জেনারেল ওবান। ছাত্র ইউনিয়নের হাজার দুয়েক নেতা-কর্মী ১৯৭১ সনের অক্টোবরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলেও কোন যুদ্ধে তাদের অংশ গ্রহণ নিয়ে বির্তক আছে। কোন ছাত্র সংজ্ঞানের কর্মী ছিলেন না এমন বিপুল সংখ্যক ছাত্র শুধুমাত্র দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার বাসনায় ওপারে পাড়ি জমান এবং প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ মানুষ

মুক্তিযুদ্ধে বড় শক্তি ছিল সাধারণ মানুষ, যারা কোন রাজনীতি নয়, কোন আদর্শ নয় পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচার দেখে ওপারে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ[১৭৪] ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ যাদের তখন একটাই স্বপ্ন মুক্ত বাংলাদেশ, স্বাধীন বাংলাদেশ।

কাদেরিয়া বাহিনী

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর সশস্ত্র অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়লে এ অঞ্চলের মানুষেরা বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনী গড়ে উঠলেও দেশের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের নেতৃত্বে কয়েকটি বাহিনী গড়ে ওঠে; যার একটি হচ্ছে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কাদেরিয়া বাহিনী। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী প্রথম জীবনে সামরিক বাহিনীর সদস্য থাকার কারণে এবং রাজনৈতিকভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করার চিন্তা চেতনার মানুষ হিসেবে এবং অনেকের মতে তিনি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এর এজেন্ট[১৭৫] হিসেবে পূর্ব থেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বাহিনী তৈরি করে রেখেছেন। কাদের সিদ্দিকী বীর বিক্রম বলেন, "৩ রা এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ নাটিয়া পাড়া যুদ্ধের পর আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। পাক বাহিনী টাঙ্গাইল আসে। ১৯ শে এপ্রিল ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসরমান পাক বাহিনীকে কালিহাতিতে বাধা দেই। নেতৃত্ব ছিল ইপিআর-এর। এখানে আমি প্রথম গুলি ছুড়ি। পাক বাহিনীর একজন মেজরসহ অসংখ্য লোক মারা যায়।

---

১৭৪ কারো কারো মতে মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা ৯০- ৯৫ জন কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ ছিলেন।

১৭৫ বাংলাদেশে 'র', আবু রুশদ; পৃঃ ৪৮

www.pathagar.com

কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ১৭০০০। সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনার কিছু অংশ ছিল এর কর্মক্ষেত্র। একটি সেনাবাহিনীর মত শৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তিনি। এ বাহিনীর কোন যোদ্ধাই বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হিসেবে মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলে। ১৬ ডিসেম্বরের অনেক পূর্বেই তারা টাঙ্গাইল এলাকা মুক্ত করে সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা চালু করে।[১৭৬]

হেমায়েত বাহিনী

হেমায়েত উদ্দিন ছিলেন ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যখন মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তখন হেমায়েত জয়দেবপুর ছাউনিতে ছিলেন। ২৭ মার্চ মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ মর্টার প্লাটুন ও একটি কোম্পানী নিয়ে ব্যারাক থেকে বেড়িয়ে পড়লে হাবিলদার হেমায়েত ও আব্দুল আজিজকে ৩৮ জোয়ান দিয়ে পেট্রোল ডিউটিতে পাঠানো হলো। রাতে হেমায়েত ও আব্দুল আজিজের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ভোরে শিবিরে এসে দেখেন কয়েকজন পাঞ্জাবী জোয়ান গেট পাহারা দিচ্ছে। পাহারারত ৫ জন পাঞ্জাবী, ভেতরে আরও ৮ জন এবং অয়্যারলেস সেন্টারের ২ জন অপারেটর কে হত্যা করে শতাধিক অস্ত্র, প্রচুর গোলাবারুদ, ৩টি গাড়ী এবং কয়েকজন জোয়ান নিয়ে পূর্ব দিকে মারতা হাইস্কুলে চলে যান। হেমায়েত প্রথমে বাঘিয়ার বিলে তার ঘাটি স্থাপন করেন। ২৯ মে গৌরনদী থানার 'বাটরা বাজারে' আনুষ্ঠানিকভাবে হেমায়েত বাহিনীর উদ্বোধন করেন। ১ জুন বরিশাল ও ফরিদপুরের এই অঞ্চলে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। হেমায়েত বাহিনীর কর্মক্ষেত্র ছিল বরিশালের উজিরপুর ও গৌরনদী থানা, ফরিদপুরের কালকিনি, মাদারীপুর, রাজৈর, গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া। মকসুদপুর, কাশিয়ানী এবং খুলনার মোল্লারহাট থানার অংশ বিশেষও তার কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠেছিল এই হেমায়েত বাহিনী। তার দলে মুক্তিযোদ্ধা ছিল ৫,০৫৪ জন। তাদের মধ্যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর লোক ছিল ৩৪০ জন। এদের সাহায্যে তিনি কোটালীপাড়া থানার জহরের কান্দি হাই স্কুলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলেন এবং তিন মাসে প্রায় চার হাজার যুবককে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এদের মধ্যে দেড় হাজার গরীব শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৯৫ টাকা হিসেবে বেতনও দেয়া হতো।[১৭৭]

সরকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা

১৯৭১ সনে প্রায় ২০০ (দু' শ') জন সি এস পি ছিলেন যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মাত্র ১৩ জন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ই পি সি এস ৬২ জন অন্যান্য বিভাগের ৫১ জন[১৭৮] উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

---

১৭৬ বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী ; পৃঃ ৪০৮ । সংক্ষিপ্ত।

১৭৭ বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী ; পৃঃ ৪০৯ । সংক্ষিপ্ত।

১৭৮ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ১৩৯

www.pathagar.com

টেবিল ২.১
স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিএসপি কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	নাম	২৫ মার্চ ৭১ এ অবস্থান	স্বাধীনতা যুদ্ধে অবস্থান	সর্বশেষ অবস্থান / পদবী[১৭৯]
১	আব্দুস সামাদ	জেলা প্রশাসক, সিলেট	সচিব	সচিব
২	খন্দকার আসাদুজ্জামান	যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ	সচিব	সচিব
৩	নূরুল কাদের খান	জেলা প্রশাসক, পাবনা	সচিব	সচিব
৪	হোসেন তৌফিক (এইচ টি) ইমাম	জেলা প্রশাসক, পার্বত্য চট্টগ্রাম	কেবিনেট সচিব	প্রধানমন্ত্রীর জন-প্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা
৫	সৈয়দ আব্দুস সামাদ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পার্বত্য চট্টগ্রাম	আঞ্চলিক প্রশাসক	প্রধান মন্ত্রীর মূখ্য সচিব
৬	ডঃ আকবর আলী খান	মহকুমা প্রশাসক, হবিগঞ্জ	উপ-সচিব	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
৭	ডঃ খসরুজ্জামান চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ	সচিব	সচিব
৮	মামুন উর রশীদ	মহকুমা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম	সচিব	সচিব
৯	ডঃ কামাল (উদ্দিন) সিদ্দিকী	মহকুমা প্রশাসক, নড়াইল	সচিব	প্রধান মন্ত্রীর মূখ্য সচিব
১০	ওয়ালিউল ইসলাম	মহকুমা প্রশাসক, মাগুরা	সচিব	সচিব
১১	ডঃ তৌফিক এলাহী চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক, মেহেরপুর	সচিব	প্রধান মন্ত্রীর জ্বালানী বিষয়ক উপদেষ্টা
১২	কাজী রকিব উদ্দিন	মহকুমা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সচিব	প্রধান নির্বাচন কমিশনার
১৩	ডঃ সা'দত হুসাইন	সহকারী কমিশনার, যশোর	সচিব	চেয়ারম্যান পিএসসি

তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অনেক কর্মকর্তাকে পাকিস্তান সামরিক শাসকদের অধীনে চাকুরিরত থাকলেও তাদের কর্মকান্ডে সামরিক বাহিনীর সন্দেহ সৃষ্টি হলে যাদেরকে বন্দী করা হয় তাদের মধ্যে সিএসপি কর্মকর্তাদের তালিকা নিম্নরূপ--

---

১৭৯ আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

www.pathagar.com

টেবিল ২.২

বন্দী সিএসপি কর্মকর্তাদের তালিকা[১৮০]

ক্রমিক	নাম	২৫ মার্চ ৭১ এ অবস্থান	সর্বশেষ অবস্থান
১	আহমেদ ফজলুর রহমান	সিএসপি অবসরপ্রাপ্ত	
২	আইউব উর রহমান	জেলা প্রশাসক, বরিশাল	কেবিনেট সচিব
৩	এ এন এম ইউসুফ	জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর	সচিব
৪	শাহ ফরিদ	মহকুমা প্রশাসক, রাজবাড়ী	সচিব
৫	রেজাউল হায়াত	মহকুমা প্রশাসক, মাদারীপুর	সচিব
৬	নূর মোহাম্মদ	সেকেন্ড অফিসার, গোপালগঞ্জ	

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি

মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল বলেন "This must be the only country in the world where there are two views on the independence of the country." (পৃথিবীর এটিই একমাত্র দেশ যেখানে স্বাধীনতা নিয়ে দু'টি মত রয়েছে)। রাজনৈতিকভাবে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ওলামায়ে ইসলাম,পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), জাতীয় দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি (কে.এস.পি)সহ সকল ইসলামপন্থী, মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল ও মানুষ; এবং পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (সিরাজ সিকদার), কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দলসহ চীনপন্থী সমাজতন্ত্রী দল ও মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেন।

আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা-কর্মী যারা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজা ত্রিদিব রায়ের সকল চাকমা প্রজাসহ অন্যান্য উপজাতির প্রায় সকল মানুষসহ পাকিস্তান রক্ষায় ভূমিকা রাখেন। এ ছাড়া বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী সকল মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেন ও পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় তৎপর ছিলেন। যারা পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি সমর্থন জানান তারা মনে করেন--

- পাকিস্তান বৃহত্তম ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ, বিশ্ব মুসলিমের নেতৃত্ব এ দেশ দিচ্ছে।[১৮১]

---

১৮০ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, এ এস এম সামছুল আরেফিন, পৃঃ ৫১৮

www.pathagar.com

- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এ রাষ্ট্রের অগ্রগতি হবে, পূর্বাংশে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হবে।
- পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (কারো কারো মতে ভারতের সাহায্য নিয়ে) আলাদা একটি রাষ্ট্র হলে সে রাষ্ট্র হবে ভারতের আজ্ঞাবহ একটি রাষ্ট্র, যার জাতীয় পতাকা থাকবে, জাতীয় সঙ্গীত থাকবে, সরকার থাকবে; থাকবে না কোন সার্বভৌমত্ব।

পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি সমর্থনকারীদের শক্তিবিন্যাস--

১. **রাজনৈতিক শক্তিঃ** পাকিস্তান সামরিক শাসক, মালেক মন্ত্রীসভা, শান্তি কমিটি, পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপাত্র, রাজনৈতিক দলসমূহ।

২. **সামরিক শক্তিঃ** পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, পাকিস্তানের আধাসামরিক বাহিনীসমূহ, বাংলাভাষী পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী।

৩. **ধর্মীয় শক্তিঃ** ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী সকল দল, ইসলামী ব্যক্তিত্ব , বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

৪. **বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিঃ** বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ অন্যান্য পেশাজীবী ।

৫. **প্রশাসনিক শক্তিঃ** সরকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

৬. **অন্যান্য সহায়ক শক্তিঃ** বিহারি, আল বদর, আল শামস্ ও মুজাহিদ বাহিনী।

পাকিস্তান সামরিক শাসক

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী একাধারে রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে বেশী বিরোধিতাকারী। পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদগণ আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার কথা ভাবছিলেন। পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এম এ নাকভি ১৯৬৫ সনে বলেন, "পূর্ব

---

১৮১ "সৃষ্টিকালে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের পর মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই মুসলিম বিশ্বে এমন কোনো দেশ আবির্ভূত হয়নি, যার সংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ইতিহাসের অবস্থান থেকে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব দেবে। সেই শূণ্যতা পূর্ণ হলো।" লন্ডনের 'দ্য টাইমস' এর ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সনের সম্পাদকীয়ের অংশ।

www.pathagar.com

পাকিস্তান বোঝা। পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলা উচিৎ। কারণ এদের জনসংখ্যা বেশি, সম্পদ কম। এরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে, তা হতে পারে না।"[১৮২] পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে বোঝা মনে না করে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার কারণ

১. Geo-military strategic point এ পূর্ব পাকিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

২. পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার হিসেবকে কাজে লাগিয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা সহজ। এ সামরিক শক্তির পুরোটাই উপভোগ করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী।

৩. চিরশত্রু ভারতকে সামরিক দিক থেকে কাবু রাখার দ্বিমুখী আক্রমণ কৌশল ও সাধারণ সৈন্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান বিবেচিত হতে পারে।

সামরিক বাহিনীর চাপে পিপিপি প্রধান ভুট্টোর 'দুই পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রী' তত্ত্বও বাতিল হয়ে যায়। তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার হিসেবকে কাজে লাগিয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার নীতিতে বিশ্বাসী হলেও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। 'পূর্ব পাকিস্তানও থাকবে, ক্ষমতাও তাদের কুক্ষিগত থাকবে' এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল পাকিস্তান সামরিক বাহিনী। তাই ১৯৭০ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা মেনে নিতে পারেনি। সেনানিবাস ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে সামরিক বাহিনী operation searchlight পরিচালনা করে।

এ operation এর মূল পরিকল্পনাকারী হচ্ছেন তৎকালীন পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান যিনি সব সময়ই বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত রয়ে গিয়েছেন। পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজী, মেজর জেনারেল ওমর, মেজর জেনারেল আকবর, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা, মেজর জেনারেল আনসারীসহ অনেকেই জড়িত।

মালেক মন্ত্রীসভা

পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্ণর হচ্ছেন ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক। এটি সেনা শাসনের বেসামরিক অবয়ব। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় মালেক মন্ত্রীসভা। এ মন্ত্রীসভায় মুসলিম ও ইসলামী জাতীয়তাবদী দলসমূহের প্রতিনিধি ছাড়াও আওয়ামী লীগের তিন জন সংসদ সদস্য ছিলেন। উক্ত মন্ত্রীসভার পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো -

---

[১৮২] পাকিস্তানি মন, মুনতাসির মামুন, প্রথম আলো; তারিখঃ ০৬.১২.২০১০;

www.pathagar.com

টেবিল ২.৩
মালেক মন্ত্রিসভা

ক্রমিক	নাম	রাজনৈতিক পরিচয়
০১.	ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক	কাউন্সিল মুসলিম লীগ
০২.	আবুল কাশেম	কাউন্সিল মুসলিম লীগ
০৩	নওয়াজেশ আহমেদ	কাউন্সিল মুসলিম লীগ
০৪	আখতার উদ্দিন আহমেদ	কনভেনশন মুসলিম লীগ
০৫	মজিবুর রহমান	কাইউম মুসলিম লীগ
০৬.	ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ সদস্য
০৭.	শামসুল হক	আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য
০৮	আউং শু-প্রু চৌধুরী	আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং বুমাং উপজাতি প্রধান ছিলেন।
০৯.	এ এস এম সোলায়মান	কৃষক শ্রমিক পার্টি
১০.	মাওলানা মোঃ ইসহাক	নেজামে ইসলামী
১১.	জসিমুদ্দীন আহমেদ	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)
১২.	এ কে মোশারফ হোসেন	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)
১৩.	এ কে এম ইউসুফ	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), বাংলাদেশ হওয়ার পর জামায়াত করেন (চরমপত্র অনুযায়ী)।[১৮৩]
১৪	আব্বাস আলী খান	জামায়াতে ইসলামী

সূত্রঃ চরমপত্র ,এম আর আখতার মুকুল ; পৃঃ ৩৩০

পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপাত্র[১৮৪]

পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপাত্র হয়ে কিছু বাঙালি অংশগ্রহণ করেন। তারা বহির্বিশ্বে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলিকে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে প্রচারণা চালান এবং পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় সহযোগিতা কামনা করেন। তাদের একটি তালিকা--

১৮৩ আমাদের গবেষণা অনুযায়ী তিনি জামায়াতে ইসলামী করতেন।

১৮৪ চরমপত্র, এম আর আখতার মুকুল ; পৃঃ ৩৩১

www.pathagar.com

টেবিল ২.৪

পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপাত্র তালিকা

ক্রমিক	নাম	পরিচয়	মুক্তিযুদ্ধকালীন কার্যক্রম	সর্বশেষ কার্যক্রম
১.	হামিদুল হক চৌধুরী	মালিক, পাকিস্তান অবজার্ভার	দলনেতা, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদল	পাকিস্তানের নাগরিক
২.	মাহমুদ আলী	ভাইস প্রেসিডেন্ট, পিডিপি	সহকারী দলনেতা	
৩.	শাহ্ আজিজুর রহমান	নেতা, মুসলিম লীগ	সদস্য	প্রধানমন্ত্রী, ১৯৭৮
৪.	জুলমত আলী খান	নেতা, মুসলিম লীগ	সদস্য	প্রাক্তন মন্ত্রী,
৫.	মিসেস রাজিয়া ফয়েজ	নেতা, মুসলিম লীগ	সদস্য	প্রাক্তন মন্ত্রী, জাতীয় পার্টি সরকার
৬.	ড. ফাতিমা সাদিক	অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য	অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭.	এড. এ. টি. সাদী	আইনজীবী, ঢাকা হাইকোর্ট	সদস্য	আইনজীবীলাহোর হাইকোর্ট
৮.	মৌলভী ফরিদ আহমেদ	সহ-সভাপতি, পিডিপি	বিশেষ দূত, সৌদি আরব ও মিশর	নিহত
৯.	তবারক হোসেন	পরিচালক, পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী দলের চীন সফর	প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব
১০.	বিচারপতি নূরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রস	বিশেষ দূত, জেনেভা	প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট
১১.	ড. সাজ্জাদ হোসাইন	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিশেষ দূত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামী দেশ	মরহুম
১২.	মুজিবুর রহমান	নেতা, মুসলিম লীগ	সদস্য, নিউইয়র্ক প্রতিনিধিদল	

শান্তি কমিটি

১৯৭০ সনের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৭৪.৯ শতাংশ জনসমর্থন পেলেও সে সমর্থন ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে এ অঞ্চলকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতির ফল। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কথা ছিল না। ১৭৫৭ সনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর

www.pathagar.com

শাসনামল থেকে সুবে বাংলার মুসলমানের উপর চালানো হয় সীমাহীন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিপীড়ন। পট পরিবর্তনে হিন্দুদের ক্ষমতায়ন এবং গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলসহ অধিকাংশ হিন্দু নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাধীন বাংলার দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। এই চেতনা যাদের মধে প্রকট ছিল, তারা ভারতীয় আধিপত্যের আশংকা করে পাকিস্তানের অখন্ডতা সমর্থনে ভূমিকা রাখেন।

রাজনীতির এই মেরুকরণে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), মুসলিম লীগ (কনভেশন), মুসলিম লীগ (কাইউম), আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, জাতীয় দল এবং উপজাতিরা সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট এবং পরবর্তীতে ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করে।

শান্তি কমিটি গঠনসহ পুরো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন পিডিপির নূরুল আমীন[১৮৫]। নূরুল আমীনের নেতৃত্বে মৌলভী ফরিদ আহমেদ, সৈয়দ খাজা খায়েরুদ্দিন, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা নুরুজ্জামানসহ ১২ জন রাজনৈতিক নেতা ৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেন।[১৮৬] পরবর্তীতে নেতৃত্বের কোন্দলে মৌলভী ফরিদ আহমেদ ও নুরুজ্জামান[১৮৭] কোরবান আলী বার এট-ল, ওয়াজিউল্লাহ, আজিজুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ সিদ্দিকী, এ, কে নুরুল করিম ও মাহমুদ আলী সরকার প্রমুখ ৭৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল গঠন করেন।[১৮৮]

টেবিল ২.৫
কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ১৪০ সদস্যের কার্যকরী কমিটির মধ্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ৫৯ জনের তালিকা

ক্রমিক	নাম	রাজনৈতিক পরিচয়	মন্তব্য
১	সৈয়দ খাজা খায়েরুদ্দিন	কাউন্সিল মুসলিম লীগ	আহ্বায়ক
২	এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম	কাউন্সিল মুসলিম লীগ	কোষাধ্যক্ষ
৩	নূরুল হক মজুমদার		অফিস সম্পাদক

১৮৫ নূরুল আমীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ১৯৫২ সনের বাংলা ভাষা আন্দোলনকালে তার ভূমিকার কারণে তিনি সমালোচিত ও বিতর্কিত হন।

১৮৬ www.liberationwarmuseum.org / this-month-in-april 4, 1971 accessed on 02.01.2012

১৮৭ পূর্ব পাকিস্তান পিপিপি প্রধান।

১৮৮ একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযোদ্ধা চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পৃঃ ৩০। কমিটির সদস্য সংখ্যাটি নেয়া হয়েছে এম আর আখতার মুকুলের 'চরমপত্র' (পৃঃ ৪৩) থেকে। "আমাগো কক্সবাজারের প্রাক্তন মন্ত্রী মৌলবী ফরিদ আহম্মদ ৭৯টা নাম জোগাড় করতে পেরেছেন। এই ৭৯ টা নাম জোগাড় করে সেখানে একটা অশান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।"

www.pathagar.com

ক্রমিক	নাম	রাজনৈতিক পরিচয়	মন্তব্য
৪	মাওলানা নুরুজ্জামান	নেজামে ইসলামী	প্রচার সম্পাদক
৫	অধ্যাপক গোলাম আযম	জামায়াতে ইসলামী	সদস্য
৬	মাহমুদ আলী	পিডিপি	সদস্য
৭	আব্দুল জব্বার খদ্দর	আওয়ামী লীগ উদ্যোক্তাদের একজন এবং ৫৪ সনের নির্বাচনে ফেণী থেকে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সংসদ সদস্য। পরবর্তীতে পিডিপি করতেন।	সদস্য
৮	মওলানা সিদ্দিক আহমদ	নেজামে ইসলামী	সদস্য
৯	আবুল কাশেম	মুসলিম লীগ	সদস্য
১০	ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া	মুসলিম লীগ	সদস্য
১১	মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম	নেজামে ইসলামী	সদস্য
১২	আব্দুল মতিন	কাউন্সিল মুসলিম লীগ	সদস্য
১৩	অধ্যাপক গোলাম সারোয়ার		সদস্য
১৪	ব্যারিস্টার আফতাব উদ্দিন	পিডিপি	সদস্য
১৫	পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া	জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম	সদস্য
১৬	এ এস এম সোলায়মান	কৃষক শ্রমিক পার্টি	সদস্য
১৭	এ. কে রফিকুল হোসেন	আওয়ামী লীগ উদ্যোক্তাদের একজন	সদস্য
১৮	আতাউল হক খান	মুসলিম লীগ	সদস্য
১৯	তোয়াহা বিন হাবিব	খেলাফত আন্দোলন (পাকিস্তান আমলের)	সদস্য
২০	মেজর (অবসর প্রাপ্ত) আফসার উদ্দিন	এনডিপি	সদস্য
২১	দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী (হোসেন)	সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে মুহাজিরীন	সদস্য
২২	হাকিম ইরতেজাউর রহমান খান		সদস্য
২৩	আব্দুল খালেক	জামায়াতে ইসলামী	সদস্য
২৪	ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দিন	কনভেনশন মুসলিম লীগ	সদস্য
২৫	ইয়াহিয়া বাওয়ানী		সদস্য
২৬	সাত্তার কারওয়াদিয়া		সদস্য
২৭	আবু আহমদ শাহ		সদস্য
২৮	রাজা ত্রিদিব রায়	চাকমা রাজা	সদস্য
২৯	ফয়েজ বক্স	মুসলিম লীগ	সদস্য
৩০	মোঃ সিরাজউদ্দিন	মুসলিম লীগ	সদস্য
৩১	আলহাজ মোহাম্মদ আকিল	মুসলিম লীগ	
৩২	এডভোকেট এ টি সাদী		সদস্য
৩৩	মকবুলুর রহমান		সদস্য

www.pathagar.com

ক্রমিক	নাম	রাজনৈতিক পরিচয়	মন্তব্য
৩৪	ফজলুল হক চৌধুরী		সদস্য
৩৫	মকবুলার রহমান	মুসলিম লীগ	সদস্য
৩৬	সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া	পিডিপি	সদস্য
৩৭	মিয়া মফিদুল হক		সদস্য
৩৮	এডভোকেট আবদুন নঈম		সদস্য
৩৯	সাব্বির আলী		সদস্য
৪০	মোজাফ্ফর আহমেদ		সদস্য
৪১	এ এ মল্লিক		সদস্য
৪২	এস এম জিয়াউল হক		সদস্য
৪৩	আফতাব আহমেদ সিদ্দিকী		সদস্য
৪৪	মোঃ নূরুল আমিন (আঙ্গীন)		সদস্য
৪৫	আনকার মালিক		সদস্য
৪৬	মকবুল ইকবাল		সদস্য
৪৭	এস এইচ হাসান		সদস্য
৪৮	এ এন মালিক		সদস্য
৪৯	এ (আয়েশারুল) হক		সদস্য
৫০	আখতার হামিদ		সদস্য
৫১	হাসান রাজা		সদস্য
৫২	নূরুর রহমান		
৫৩	মাওলানা মফিজুল হক		
৫৪	আবু সালেক		
৫৫	সৈয়দ মোহসেন আলী		
৫৬	সুলমান ওসমানী		সদস্য
৫৭	কবি বেনজির আহমেদ		সদস্য
৫৮	বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো	বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু ও বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি	সদস্য
৫৯	জে আর বড়ুয়া	বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু ও বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের নেতা	সদস্য

শান্তি কমিটি প্রতিটি জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় কমিটি গঠন করে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের ধারণা ছিল ---

১. স্বাধীনতা যুদ্ধটি সাময়িক উন্মাদনা, পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিকভাবে এ সংঘাত বন্ধ করতে সক্ষম হবে। আর এ সংঘাত বন্ধ হলে এরাই হবে বিজয়ী শক্তি; আর বিজয়ী শক্তিই নিয়ন্ত্রণ করবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ক্রিয়া।

২. স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃতি ও যুদ্ধোত্তর অবস্থা সম্পর্কে এদের কোন ধারণাই ছিল না। এরা এদের Opportinuities গুলোই দেখেছে Threats গুলো বিবেচনায় আনেনি।

www.pathagar.com

৩. রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এদের অনেকেই অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত হয়। এদের অনেকেই ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সম্পত্তি দখল করতে শুরু করে।

৪. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক শক্তিকে এরা নগণ্য মনে করে, এদের ধারণায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে নস্যি। এদেরকে খতম করে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তারা পাকিস্তান বাহিনীকে সহায়তা করে।

এ কমিটিগুলো সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমদিকে নির্বিঘ্নে যে কোন স্থানে যাতায়াত করতে পারত; আগস্ট'৭১ থেকে সারা দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। কোন কোন কমিটির সকল সদস্য অথবা কোন কোন সদস্য পাকবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে ক্ষমতার দাপটে অপকর্ম করে আবার কোন কোন কমিটির সকল সদস্য বা কোন কোন সদস্য উপরে উপরে পাকবাহিনীর মিত্র হলেও তারা মূলতঃ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়ক শক্তি। তারা যে কাজগুলো করে --

১. যারা তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের পরিচিত নেতা কর্মী ছিলেন, সংগত কারণে ভারতে যেতে পারেননি তাদেরকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিরাট ভূমিকা রাখেন।

২. এদেশে অবস্থানকারী হিন্দুদেরকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্নমুখী কৌশল গ্রহণ করেন। তাদেরকে "কলেমা তাইয়েবা" শেখানো, মুসলিম নাম গ্রহণের মাধ্যমে চলাফেরা করা ইত্যাদি কৌশলে হিন্দু রক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

রাজনৈতিক দল

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তান স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল ছিল মুসলিম লীগ। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দলটি জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। তা ছাড়া এক পর্যায়ে এটি কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ ও কাইউম মুসলিম লীগে বিভক্ত হয়ে শক্তি হারিয়ে ফেলে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল ন্যাপ (মুজাফ্ফর), ন্যাপ (ভাসানী), মনি সিং এর কম্যুনিস্ট পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ওলামায়ে ইসলাম,পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), জাতীয় দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি (কে.এস.পি) পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (সিরাজ সিকদার), কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল। এ সব রাজনৈতিক দলগুলোকে মূলত চারভাগে ভাগ করা যায়–

১. **বাঙালি জাতীয়তাবাদী দল**-- আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়।

২. **কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দল**--ন্যাপ (মুজাফ্ফর), ন্যাপ (ভাসানী), মনি সিং এর কম্যুনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি

www.pathagar.com

(সিরাজ সিকদার)। এ সব দলের কেউ ছিল চীনপন্থী আবার কেউ-ছিল রাশিয়াপন্থী। রাশিয়াপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মুজাফ্ফর), ন্যাপ (ভাসানী) এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা-কর্মী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও তাদের অনেক নেতা-কর্মী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। বিপরীতে চীনপন্থী কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দলগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে।

৩. **ইসলামী দল**-- জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। এ সব দলের প্রায় সকলেই অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন।

৪. **মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল**-- কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাইউম মুসলিম লীগ, পিডিপি, কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল, জাতীয় দল। এ দলগুলোরও অখন্ডতা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল।

আওয়ামী লীগের একাংশ

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান বাহিনীর Operation searchlight এর পর বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। কারণ "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশের সরকারের সঙ্গে অলিখিত সমঝোতা আগেই হয়ে গিয়েছিল বলে সশস্ত্র অবস্থায় এসব বাঙালি সামরিক-বেসামরিক লোকজনের পক্ষে এভাবে সীমান্ত পাড়ি দেয়া সম্ভব হয়।"[১৮৯] এ ধরণের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে একমত না হয়ে আওয়ামী টিকিটে নির্বাচিত বেশ কিছু সংখ্যক জাতীয় পরিষদ সদস্য (MNA) ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (MPA)সহ দলের অনেক নেতা-কর্মী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকেই শুধু বিরত থাকেননি; পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ, শান্তি কমিটিতে নেতৃত্ব প্রদান, রাজাকার বাহিনীতে যোগদানসহ স্বাধীনতা বিরোধী সব ধরণের কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখেন; সংখ্যাগত দিক দিয়ে এটি তৎকালীন ইসলামী-মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের তুলনায় বেশী ছিল। হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর মেয়ে আক্তার সোলায়মান পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য প্রচারণা চালান এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারে বলেন যে, 'অধিকাংশ আওয়ামী লীগের সদস্যরাই আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনার কথা জানতেন না'। তিনি বলেন, 'আমরা জানি জনগণ নির্বাচনের সময় অধিকতর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ পাকিস্তান গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলো।'[১৯০] তা ছাড়া "তাঁর বিশ্বস্ত ড. কামাল হোসেন নির্মম গণহত্যা চালু হবার পরও কোন রহস্যজনক কারণে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ এক সপ্তাহ ধরে চলার পরও আত্মগোপনরত অবস্থান ত্যাগ করে তাঁর নেতা মুজিবের মতই কেনই বা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন তা আজো সকলের কাছে অজ্ঞাত।"[১৯১]

---

[১৮৯] বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ১৪৩

[১৯০] www.liberationwarmuseum.org / this-month-in-June 5, 1971 accessed on 11.07.2011

[১৯১] দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ১৬৮

www.pathagar.com

১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য (MNA) ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের (MPA) যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন নিম্নে তাদের তালিকা দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, দেশ স্বাধীন হবার পর এদের অধিকাংশই সদস্যপদ হারান

টেবিল ২.৬

আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য (MNA) যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন

ক্রমিক	আসন	সদস্যের নাম	সূত্র (তথ্য সূত্র নীচে দ্রষ্টব্য)
১	রংপুর ৬	আবু মোঃ সোলাইমান মন্ডল	১, ২,৩
২	রংপুর ৭ রংপুর রংপুর ৮	আজিজুর রহমান	১, ২,৩
৩	রংপুর ৮	মোঃ নূরুল হক	১, ২,৩
৪	বগুড়া ৪	মোঃ হাবিবুর রহমান	১, ২,৩
৫	বগুড়া ৫	মোঃ জাহিদুর রহমান	২
৬	পাবনা ৪	সৈয়দ হোসেন মনসুর	১, ২
৭	খুলনা ৪	এম এ গফুর	২
৮	খুলনা ৭	মোঃ আবদুল গাফ্ফার	১, ৩
৯	বাকেরগঞ্জ ৪	মোঃ আব্দুল বারেক	২
১০	বাকেরগঞ্জ ৭	আজাহারউদ্দিন আহমেদ	১, ২
১১	বাকেরগঞ্জ ৮	এ কে ফয়জুল হক	১, ২,৩
১২	পটুয়াখালী ২	গোলাম আহাদ চৌধুরী	২
১৩	ফরিদপুর ১	এবিএম নূরুল ইসলাম	১, ২
১৪	ফরিদপুর ৭	আদেল উদ্দিন আহমেদ	২
১৫	ফরিদপুর ৮	আমজাদ হোসেন খান	২
১৬	ঢাকা ১	মোঃ নুরুল ইসলাম	২, ৩
১৭	ঢাকা ৭	জহির উদ্দিন	১, ২,
১৮	নোয়াখালী ১	মোঃ ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	১, ২, ৩
১৯	চট্টগ্রাম	অধ্যাপক শামসুল হক	২, ৩

সূত্রঃ ১. এম আর আখতার মুকুল, চরমপত্র, পৃঃ ৩৩২-৩৩৩
২. বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১ ;এ এস এম সামছুল আরেফিন, পৃঃ ৫০২-৫১৭
৩. www.liberationwarmuseum.org/ this-month-in-1971

www.pathagar.com

টেবিল ২.৭

আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (MPA) যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন

ক্রমিক	আসন	সদস্যের নাম	সূত্র (তথ্য সূত্র নীচে দ্রষ্টব্য)
১	বগুড়া ৬	তাহেরুল ইসলাম খান	২
২	রাজশাহী ১০	রিয়াজউদ্দিন আহমেদ	২
৩	রাজশাহী ১৭	আব্দুস সালাম	২
৪	পাবনা ৫	কেবিএম আবু হেনা	২
৫	পাবনা ৬	এ কে এম মাহবুবুল ইসলাম	১, ২
৬	কুষ্টিয়া ১	জাহিরুল হক	২
৭	যশোর ৯	মোঃ মোশাররফ হোসেন	২
৮	খুলনা ৬	হাবিবুর রহমান খান	১, ২, ৩
৯	খুলনা ১০	মোহাম্মদ সায়ীদ	২, ৩
১০	পটুয়াখালী ৪	মজিবর রহমান তালুকদার	২
১১	বাকেরগঞ্জ ১	মোশারেফ হোসেন শাজাহান	১, ২, ৩
১২	ময়মনসিংহ ৫	আক্তারুজ্জামান	২
১৩	ময়মনসিংহ ৩২	সৈয়দ বদরুজ্জামান	২, ৩
১৪	বাকেরগঞ্জ ১৭	মোঃ নুরুল ইসলাম	৩
১৫	ঢাকা ১৭	আব্দুল হাকিম মাষ্টার	২
১৬	ঢাকা ২৮	মোঃ সাজেদ আলী মিয়া মোক্তার	২
১৭	ফরিদপুর ১	কাজী হেদায়েত হোসেন	২
১৮	সিলেট ৭	কাজী সিরাজউদ্দিন আহমেদ	২
১৯	সিলেট ১১	মাসুদ আহমেদ চৌধুরী	২
২০	সিলেট ১৯	ডাঃ আবুল হাশেম	২
২১	কুমিল্লা ৭	গোলাম মহিউদ্দিন আহমেদ	২
২২	কুমিল্লা ১০	মোহাম্মদ হাশেম	২
২৩	নোয়াখালী ৭	মোঃ সাখাওয়াতুল্লাহ এড.	২
২৪	চট্টগ্রাম ২	সামছুল হক	২
২৫	চট্টগ্রাম ৪	মির্জা আবু মনসুর	২
২৬	চট্টগ্রাম-১২	আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু	২

www.pathagar.com

ক্রমিক	আসন	সদস্যের নাম	সূত্র (তথ্য সূত্র নীচে দ্রষ্টব্য)
২৭	রংপুর	সিরাজুল ইসলাম	১, ৩
২৮	ময়মনসিংহ	এম, এ , হান্নান	৩
২৯	ময়মনসিংহ	শরীফ উদ্দিন	৩
৩০	ময়মনসিংহ	আব্দুল জলিল মিয়া	৩
৩১	চট্টগ্রাম	জাফর আলম চৌধুরী	৩
৩২	যশোর	মঈনুদ্দিন মিয়াজী	১, ৩
৩৩	চট্টগাম	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	১
৩৪	পিই[১৯২]-১৩৪	ইনসান আলী মোক্তার	১
৩৫	পিই-১৫০	আবদুল মতিন ভূইয়া	১
৩৬	পিই-১৯৯	আফজাল হোসেন	১
৩৭	পিই-৩০০	অং শু প্রু চৌধূরী	১
৩৮		সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	Internet

সূত্র : ১. এম আর আখতার মুকুল, চরমপত্র, পৃঃ ৩৩২-৩৩৩
২. বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১ ;এ এস এম সামছুল আরেফিন, পৃঃ ৫০২-৫১৭
৩. www.liberationwarmuseum.org/ this-month-in-1971/

আওয়ামী লীগের জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নন কিন্তু তৎকালীন বা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম দেয়া হলো--

ক্রম	নাম	মন্তব্য
১	খন্দকার নূরু হোসেন	শেখ হাসিনার মেয়ের শশুর ও মন্ত্রীসভার সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেনের পিতা, যার সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেছেন "তিনি রাজাকার ছিলেন কিন্তু যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না।"[১৯৩]
২	খন্দকার মোশারফ হোসেন	শেখ হাসিনার মেয়ের শশুর ও মন্ত্রীসভার সদস্য।
৩	মুসা বিন শমসের ওরফে নূইলা মুসা	শেখ সেলিমের বেয়াই।
৪	মীর্জা কাশেম	আওয়ামী যুবলীগের প্রাক্তন সভাপতি মীর্জা আজমের পিতা।

[১৯২] পিই PE – Provincial Electoral area
[১৯৩] আমার দেশ, ২২.০৪.২০১০

www.pathagar.com

চীনপন্থী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর জীবনধারা ছিল সমাজতন্ত্র যার কাল্পনিক চূড়ান্তরূপ ছিল কম্যুনিজম। কার্ল মার্ক্সের দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভ.ই.লেনিন বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র কায়েম করেন। পাশাপাশি মাও সেতুং তার চিন্তাধারা অনুযায়ী চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কোন রাষ্ট্রই সমাজতন্ত্রের চূড়ান্তরূপ কম্যুনিজমকে তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি বরং তত্ত্বের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে লেনিনবাদের মৃত্যু হয়েছে; লেনিনগ্রাদ থেকে ভ.ই. লেনিনের মূর্তি অপমানজনকভাবে অপসারণ করা হয়েছে; লেনিনগ্রাদকে সেন্ট পিটার্সবার্গ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> ১/ 3. A Bengali-printed document, reportedly published from Azad Press, Rajshahi, by East Pakistan Communist Party (Marxist-Leninist) was found recently in secret circulation amongst the party workers in Dacca. It is said to be a translation from the 'Liberation' dated 15-6-71, a mouthpiece of the Communist Party of India (Marxist-Leninist). The document, *inter alia*, says that the gambling on the East Pakistan issue by USA, USSR and India has failed because the Peoples' Republic of China has [illegible]ded full [illegible]pport [illegible] Gov[illegible] of [illegible]n for [illegible]

Source: Try the war criminals of '71 at a special tribunal,
Edited by Shahriar Kabir; annex-7

> 3. A Bengali-printed document, reportedly, published from Azad Press, Rajshahi, by East Pakistan Communist Party (Marxist-Leninist) was found recently in secret circulation amongst the Party workers in Dacca (Dhaka). It is said to be a translation from the 'Liberation' dated 15-6-1971, a mouthpiece of the Communist Party of India (Marxist-Leninist). The document inter alia, says that the gambling on the East Pakistan issue by USA, USSR and India has failed because the peoples' Republic of China has provided full support to Government of Pakistan for .....

অন্যদিকে চীন মাও-এর চিন্তাধারা থেকে সরে এসে আধুনিক চীনা রাষ্ট্র গঠনে দেং শিয়াও পিং এর নীতি অনুসরণ করলেও একদলীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলবৎ রাখতে তাদেরকে তিয়ানেনমেন স্কয়ারে এক অকল্পনীয় হত্যাকান্ড[১৯৪] চালাতে হয়েছে।

গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তর দশকে লেনিনবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের মাওবাদী সমাজতন্ত্রকে সংশোধনবাদী বুর্জুয়া সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করে; বিপরীতে চীন সোভিয়েতকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে গালি অব্যাহত রাখে। চীনের Red Book সোভিয়েতরা কোনভাবেই সহ্য করতে পারতো না; তাদের ভাষায়

---

[১৯৪] ১৫ এপ্রিল ১৯৮৯ তারিখে সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

"পিকিং নেতারা, সোভিয়েত বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে (মার্কিন) সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজস পরিহার করে না; (বাংলাদেশের) জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ ও স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।"[১৯৫] চীনপন্থী কোন নেতা-কর্মী (দূরদর্শী সিরাজ সিকদার ছাড়া) সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের কেউ স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি বরং সোভিয়েতের ভাষায় "পূর্ব পাকিস্তানে চীনা চররা প্রচারণামূলক কাজকর্ম শুরু করে। 'বাঙালী বিপ্লবীদের প্রতি' নামে একটি পুস্তিকা ছাড়া হয়। তাতে ছিল মাও ও লিন পিয়াওয়ের রচনা থেকে উদ্বৃতি, পাঞ্জাবী জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান। চীনপন্থীরা প্রচুর আর্থিক সাহায্য পায়। বস্তুত তারাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে চীনের হস্তক্ষেপের হাতিয়ার।" [১৯৬]

কম্যুনিস্ট পার্টি ৩১.০৮.১৯৭১ তারিখে যে রাজনৈতিক নীতিমালা প্রকাশ করে তাতেও চীনা নেতাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও শত্রুদের সাহায্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের থেকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয়

রাজনৈতিক নীতিমালা

দুই। আমাদের শত্রু

—এই সশস্ত্র লড়াইয়ে আমাদের শত্রু হইল : পাকিস্তানের সামরিক সরকার ও সামরিক বাহিনী, তাদের এদেশীয় দালালরা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তান সরকারের সহযোগি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

—শ্রেণীগতভাবে আমাদের শত্রু হইল : পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও সেখানকার সামন্ত-ভূস্বামীরা এবং এই উভয় শ্রেণীর সহযোগি দালালরা।

—দলগতভাবে আমাদের শত্রু হইল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

—মনে রাখিতে হইবে, চীনের নেতারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছে ও আমাদের শত্রুকে সাহায্য করিতেছে। দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী এখানকার চীন পন্থীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

সূত্রঃ http://www.cpb.org.bd/partycirculars.htm
accessed on 13.11.2011

[১৯৫] ইজভেস্তিয়া, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ (বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী ; পৃঃ ৫০৮ থেকে সংগৃহীত)

[১৯৬] প্রাভদা ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ (বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী ; পৃঃ ৫০৫ থেকে সংগৃহীত)

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয় রাজনৈতিক নীতিমালা
দুই। আমাদের শত্রু ---এই সশস্ত্র লড়াইয়ে আমাদের শত্রু হইলঃ পাকিস্তানের সামরিক সরকার ও সামরিক বাহিনী, তাদের এ দেশীয় দালালরা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তান সরকারের সহযোগি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ---শ্রেণীগতভাবে আমাদের শত্রু হইলঃ পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও সেখানকার সামন্ত-ভূস্বামীরা এবং এই উভয় শ্রেণীর সহযোগি দালালরা। ---দলগতভাবে আমাদের শত্রু হইল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ---মনে রাখিতে হইবে, চীনের নেতারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছে ও আমাদের শত্রুদের সাহায্য করিতেছে। দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী চীনপন্থীদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকিতে হইবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও চীনপন্থীদের উপর মুজিববাদীদের আক্রোশের বর্ণনা দিয়ে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া বলেন, "ঐদিন (১৫ জানুয়ারী ১৯৭২) ডঃ ইসহাক তালুকদার আমাকে আরো জানান যে, কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননের দলসহ পিকিংপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও কর্মীদের নিধন করা হবে বলে মুজিব বাহিনীর কর্মীরা হুমকি দিয়েছে। যার ফলে সম্ভাব্য হানাহানি ও রক্তপাত এড়ানোর লক্ষ্যে ঐ দলগুলোর নেতা ও কর্মীরা লুকিয়ে থাকছেন।"[১৯৭]

স্বাধীনতার পর বামপন্থীদের মধ্যে একটা বিতর্ক হয়েছিল; "দেশটা কতখানি স্বাধীন হয়েছে ? ... বামপন্থীরা[১৯৮] বলতেন, দেশটা মোটেই স্বাধীন হয়নি, পাকিস্তানের হাত থেকে তা ভারতের হাতে চলে গেছে।"[১৯৯]

১৯৭২ সালে ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা মুজাফফর আহমদ ঢাকায় এসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এই সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী'? জবাবে মুজাফফর আহমদ বলেছিলেন, 'আপনারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন মাত্র'। তিনি কিন্তু স্পষ্টভাবে স্বীকার করেননি যে, বাংলাদেশ একটা সত্যিকারের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করেছে।[২০০]

---

১৯৭ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃঃ ১৩৭

১৯৮ দৈনিক যুগান্তর, ০৫.১২.২০১০; বিজয়ের মাসে যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরী, বিভুরঞ্জন সরকার লেখেন- "বামদের একটা অংশ এবং মুসলিম লীগ বা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছে।

১৯৯ কতটা গণতান্ত্রিক হয়েছে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল? মাহমুদুর রহমান মান্না, আমাদের সময়, শনিবার, ০৮.০৮.২০০৯; ৩য় সংস্করণ

২০০ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ: পৃঃ ২৫১

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রধানত চিহ্নিত করা হয় চীনপন্থী বিভিন্ন কমিউনিস্ট সংগঠন ও তার কর্মীদেরকে। মোটিভেশন ক্লাসে এরকমও বলা হত যে, একজন রাজাকারকে যদি তোমরা ধর, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তাকে নানাভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে। বারবার করবে এরকম। এতেও যদি কাজ না হয়, প্রয়োজনে কিছু শারীরিক নির্যাতনও করবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে যত পার তথ্য সংগ্রহ করে তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। জিজ্ঞাসাবাদ ও শারীরিক নির্যাতনের পরে এদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। আর যদি একজন কমিউনিস্টকে ধরো সাথে সাথে তার প্রাণ সংহার করবে।[২০১]

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে চীনের বৈরী সম্পর্কের কারণেই ভারত সরকার ও RAW চীনা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এ ধরণের মনোভাব পোষণ করতো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চীনাপন্থী কমিউনিস্টরা ভারতের এ নীতির কথা ভাল করেই জানতেন; এবং এ কারণে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি; বরং পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালান।

এম আর আখতার মুকুল বলেন, "পিকিংপন্থী পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ব পাকিস্তানে 'ভারতীয় আগ্রাসন' বলে আখ্যায়িত করলো। যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে এদের নেতৃত্ব দান করেন কমরেড আবদুল হক, কমরেড সত্যেন মিত্র, কমরেড বিমল বিশ্বাস ও কমরেড জীবন মুখার্জী প্রমুখ। এতদঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের সময় পিকিংপন্থী হক গ্রুপের সংগে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়।"[২০২]

জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী দল

জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ছাড়াও ছোট ছোট কয়েকটি ইসলামী দল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতো। এ দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ছিল। পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার বিষয় নিয়ে জামায়াতের বিশ্লেষণগুলো- (১) পাকিস্তান রক্ষার নামে সামরিক বাহিনী যে অভিযান পরিচালনা করে তা কতটুকু যৌক্তিক ছিল? (২) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কি কি যুক্তি ছিল? (৩) ভারতে যাওয়ার ঝুঁকিগুলো কি কি? (৪) পাকিস্তান রক্ষার পক্ষে যাবার ঝুঁকি কি কি ছিল? এ রকম একটি স্পর্শকাতর রাজনৈতিক প্রশ্নে তারা ভারতের আধিপত্যবাদ ও ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় ভীত হয়ে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় এগিয়ে যায়।

নেজামে ইসলামী, ওলামায়ে ইসলামসহ ছোট ছোট ইসলামী দলগুলো জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে দ্বিমত থাকলেও পাকিস্তানের

---

[২০১] দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ৩০৯

[২০২] আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল; পৃঃ ৩৬৫

www.pathagar.com

অখন্ডতা রক্ষার বিষয় তাদের বিশ্লেষণও একই ছিল। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীর সঙ্গে নেজামে ইসলামীর মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, মাওলানা আতাহার আলীর চিন্তাধারাগত বিরাট পার্থক্য নিয়েও তারা পাকিস্তান ভাগ করার বিপক্ষে অবস্থান নেন।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল

১৯০৫ সনের পর থেকেই ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম চেতনার সকল মানুষ ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তাদের জন স্বতন্ত্র আবাসভূমি তৈরীর আন্দোলন শুরু করেন। সমাজতান্ত্রিক মানসকর্মে নিমগ্ন তরুণরা দীর্ঘদিনের তিনটি সভ্যতা তথা ইসলামী, খ্রিষ্টীয় ও বৈদান্তিক সভ্যতার দ্বন্দ্বে[২০৩] কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারেনি। ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা সভ্যতার দ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিষ্টীয় ও বৈদান্তিকরা ইসলামী সভ্যতার বিজয়কে মেনে নিতে পারেনি। তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র শুরু করে। যেমন- সুবে বাংলাকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আলাদা রাষ্ট্র হতে না দেয়া, ২৮২টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র ও ব্রিটিশ করদ রাজ্যকে ভারতের করদ রাজ্য হিসেবে সংরক্ষণ। ফলশ্রুতিতে তারা এক বছরের মধ্যে কাশ্মীর ছাড়া অন্য সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র ও ব্রিটিশ করদ রাজ্যকে দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এসব কাজ সফল করার লক্ষ্যে শুরুতেই তারা লর্ড মাউন্টবেটেনকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে বহাল রাখে। সকল বিবেচনায় মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলগুলোর মধ্যে হাজারো মতপার্থক্য থাকলেও পাকিস্তানের অখন্ডতার বিষয়ে তাদের সকলের চিন্তাধারা একই ছিল, মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সকলেই পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে ছিলেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কাইউম মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ; জাতীয় দল, পিডিপি, কৃষক শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি সকল দল পাকিস্তান রক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি অফিসারবৃন্দ

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী একাধারে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি থাকায় সকল বিবেচনায় সামরিক শক্তির আলোচনার সময় তাদের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য যাদের সকল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে এ যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন ঐ সকল বাঙালি অফিসারবৃন্দ[২০৪]

---

২০৩ Semuel Huntington তার Clashes of Civilization এ এভাবেই বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করেছেন।

২০৪ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, এ এস এম সামছুল আরেফিন; পৃঃ ৩৬২-৩৭৫

www.pathagar.com

টেবিল ২.৮

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সেনা ইউনিটে কর্মরত ও ছুটি ভোগকারী বাঙালি অফিসারদের তালিকা

নাম	২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত			সর্বশেষ		মন্তব্য
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থল	পদবী	কর্মস্থল	
মোঃ রেজাউল জলিল	লে. কর্ণেল	অধিনায়ক, ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	যশোর সেনানিবাস	লে. কর্ণেল' ৭৩	শুটিং ফেডারেশন	-
মোঃ এ.এফ.এম. আব্দুর রকিব	লে. কর্ণেল	অধিনায়ক, ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	জয়দেবপুর সেনানিবাস	লে. কর্ণেল' ৭২	ব্যবসা	-
মোঃ মাসুদুল হাসন	লে. কর্ণেল	অধিনায়ক (অপসারিত) ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	ঢাকা সেনানিবাস	লে. কর্ণেল' ৭৩	ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সেনা কল্যাণ সংস্থা	
খন্দকার মাহবুবুর রহমান	লে. কর্ণেল	জি-১ গভর্ণরের পরিদর্শন টিম	ঢাকা সেনানিবাস	সদস্য	পাবলিক সার্ভিস কমিশন	একই সাথে তিনি সামরিক আদালতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
ফিরোজ সালাউদ্দীন	লে. কর্ণেল	পারিচালক আর্মস সার্ভিসেস বোর্ড, ঢাকা	ঢাকা সেনানিবাস	বিগ্রেডিয়ার	সামরিক সচিব রাষ্ট্রপতি'৭৩	-
মোঃ মঈন উদ্দীন	লে. কর্ণেল	অধিনায়ক, ১০ম ইস্ট বেঙ্গল (ছাত্র রেজি.)	ঢাকা সেনানিবাস	লে. কর্ণেল' ৭২	জেনারেল ম্যানেজার ফাইজার বাংলাদেশ লিঃ	-
মোঃ আমজাদ আহমেদ চৌধুরী	মেজর	বি.এম.২৩ বিগ্রেড	রংপুর সেনানিবাস	মেজর জেনারেল	ব্যবসা	চেয়ারম্যান, প্রপার্টি ডেভেঃ
মোঃ আলী আহমেদ খান	মেজর	ডি.এস.ও-২ সদর দপ্তর পূর্বাঞ্চল	ঢাকা সেনানিবাস	জয়েন্ট সেক্রেটারী	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-
মোঃ মশিউদ্দৌলা	মেজর	স্টাফ অফিসার সদর দপ্তর পূর্বাঞ্চল	ঢাকা সেনানিবাস	বিগ্রেডিয়ার		-
মোঃ শরিফুল ইসলাম	মেজর	অধিনায়ক, ইঞ্জিনিয়ার কাম্পানী	রংপুর সেনানিবাস	বিগ্রেডিয়ার	চেয়ারম্যান, ওয়াসা, ঢাকা	-
মোঃ	মেজর	অধিনায়ক,	রংপুর	লে.	ব্যবসা,	-

www.pathagar.com

নাম	২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত			সর্বশেষ		মন্তব্য
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থল	পদবী	কর্মস্থল	
মাহতাবউদ্দীন		সিগনাল কোম্পানী	সেনানিবাস	কর্ণেল' ৭৪	প্রপার্টি ডেভেঃ লিঃ,	
মোহাম্মদ হোসেন	মেজর	সামরিক হাসপাতাল	কুমিল্লা সেনানিবাস	-	-	-
মোঃ আবেদীন জয়নাল	মেজর	সামরিক হাসপাতাল	কুমিল্লা সেনানিবাস	-	-	-
মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	মেজর	-	ঢাকা সেনানিবাস	-	-	-
মোঃ সৈয়দ আহমেদ	মেজর	সদর দপ্তর ১৪ ডিভিশন	ঢাকা সেনানিবাস	মেজর	জি. এম. আদমজী জুট মিল	-
আবু লায়েস আহমেদুজ্জামান	মেজর	৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট যশোর সেনানিবাস	কুমিল্লা সেনানিবাস ১৬ ডিসেঃ পর্যন্ত যুদ্ধরত	বিগ্রেডিয়ার	পাক সেনবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন।	
আব্দুল মান্নান	মেজর	৩, কমান্ডো ব্যাটেলিয়ান	চট্টগ্রাম সেনানিবাস	মেজর' ৭৩	রাজনীতিবিদ	মন্ত্রী'৯২
এস.এ. কাজী	মেজর	সামরিক হাসপাতাল	কুমিল্লা সেনানিবাস	-	-	-
গোলাম মাওলা	মেজর	অধিনায়ক, পদাতিক ওয়ার্কশপ	ঢাকা সেনানিবাস	মেজর জেনারেল	সেনা সদর	-
হামিদুর রহমান	মেজর	স্টাফ সার্জন সামরিক হাসপাতাল	ঢাকা সেনানিবাস	-	হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, ঢাকা	-
কাসেদুল ইসলাম চৌধুরী	মেজর	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী	কুমিল্লা সেনানিবাস	ডি.আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	ডিসেম্বর যুদ্ধে কুমিল্লা মিত্র বাহিনীর কাছে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ ।
ফরিদউদ্দীন	মেজর	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী	কুমিল্লা সেনানিবাস	মরহুম	ডিসেম্বরে যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে মারা যান।	কুমিরা যুদ্ধে পাক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন ।
আমজাদ হোসেন	মেজর	সহ-অধিনায়ক-২৪ এফ.এফ.রেজিমেন্ট	কুমিল্লা সেনানিবাস	মেজর' ৭৪	ব্যবসা	
ইউসুফ হায়দার	মেজর	ডি.এ.এ.জি.	ঢাকা	বিগ্রেডিয়ার	সংস্থাপন	

www.pathagar.com

নাম	২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত			সর্বশেষ		মন্তব্য
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থল	পদবী	কর্মস্থল	
			সেনানিবাস	এবং অতিরিক্ত সচিব	মন্ত্রণালয়	
মোঃ আবুল কাশেম (ই.বি.)	মেজর	এস.এম.ও.	ঢাকা সেনানিবাস	জেনারেল ম্যানেজার	সি.এস.ডি.	-
মোঃ আব্দুল হামিদ	মেজর	অধিনায়ক	ঢাকা সেনানিবাস	লে. কর্ণেল	-	অবসরপ্রাপ্ত, মিরপুর, ঢাকা
এ.বি.এম. রহমতুল্লাহ	মেজর	কোয়ার্টার মাস্টার ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	ঢাকা সেনানিবাস	প্রিন্সিপাল অফিসার	টি.সি.বি.	১৬ ডিসেম্বর' ৭১ পর্যন্ত ঢাকায় কর্মরত ছিলেন।
মির্জা রকিবুল হুদা	মেজর	আর্টিলারী রেজিমেন্ট	যশোর সেনানিবাস	অতিরিক্ত আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	-
হেসাম উদ্দিন আহমেদ	মেজর	সহ-অধিনায়ক ২২ এফ.এফ. রজিমেন্ট	যশোর সেনানিবাস	সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-
আজগর আলী খান	মেজর	সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট	ঢাকা সেনানিবাস	সংসদ সদস্য (প্রাক্তন)	জাতীয় পার্টি, গাইবান্ধা	-
আব্দুল হাকিম খান	মেজর	২০ বেলুচ রেজিমেন্ট	চট্টগ্রাম সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
আব্দুস সাত্তার	মেজর	সরবরাহ দপ্তর	কুমিল্লা সেনানিবাস	ডাইরেক্টর		
আব্দুস সাত্তার	মেজর	-	-	যুগ্ম সচিব	পাট মন্ত্রণালয়	
রুহুল কুদ্দুস	মেজর	৬ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট	যশোর সেনানিবাস	-	-	
মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	মেজর	-	-	যুগ্ম সচিব	চেয়ারম্যান, বি.জে.সি., পুলিশ সদর দপ্তর	
শহীদুল ইসলাম চৌধুরী	মেজর	৫৭ বিগ্রেড	কুমিল্লা সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
আব্দুল খালেক	মেজর	সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ	-	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
আহমেদ ফজলুল কবির	মেজর	সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট	ঢাকা সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
শামসুর রহমান খান	মেজর	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	-	-	-	
সৈয়দ আব্দুল	মেজর	এ্যাডজুটেন্ট	ময়মনসিংহ	ব্যবসা	ঢাকা	

www.pathagar.com

নাম	২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত			সর্বশেষ		মন্তব্য
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থল	পদবী	কর্মস্থল	
মান্নান		মুজাহিদ				
মোঃ শহীদুল্লাহ	ক্যাপ্টেন	জি-৩, ৫৭ বিগ্রেড	ঢাকা সেনানিবাস	-	-	
মোঃ আব্দুস সালাম	ক্যাপ্টেন	২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী	সৈয়দপুর সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
মোঃ আব্দুল্লাহ আল আজাদ	ক্যাপ্টেন	ই.পি.আর. সদর দপ্তর	ঢাকা	কর্ণেল	সেনা সদর	
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	ক্যাপ্টেন	২৩ বিগ্রেড সদর দপ্তর	রংপুর সেনানিবাস	অতিরিক্ত ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
এম.এ. সাঈদ	ক্যাপ্টেন	২৩ বিগ্রেড সদর দপ্তর	রংপুর সেনানিবাস	-	ব্যবসা	
অহিদুল হক	ক্যাপ্টেন	২৯ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট	রংপুর সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
মোঃ শহুদুল হক	ক্যাপ্টেন	২৯ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট	রংপুর সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
মোঃ সাঈদ আহমেদ	ক্যাপ্টেন	ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স	রংপুর সেনানিবাস	কর্ণেল	সেনা সদর	রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক'৮৮
মোঃ এমদাদ হোসেন	ক্যাপ্টেন	ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স	রংপুর সেনানিবাস			
মোঃ হাসমতুল্লাহ	ক্যাপ্টেন	ই.পি.আর.	সেক্টর সদর দপ্তর,যশোর	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
মোঃ মোসলেম আলী হাওলাদার	ক্যাপ্টেন	১০ম ইস্ট বেঙ্গল (ছাত্র রেজিমেন্ট)	ঢাকা সেনানিবাস	ডেপুটি ডাইরেক্টর	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	
মোঃ মোখলেছুর রহমান	ক্যাপ্টেন	৩য় কমান্ডো ইউনিট	কুমিল্লা সেনানিবাস	বিগ্রেডিয়ার	সেনা সদর	
মোঃ মুরাদ আলী খান	ক্যাপ্টেন	কোয়ার্টার মাস্টার সি.এম.এইচ.	কুমিল্লা সেনানিবাস	ডাইরেক্টর	বন উন্নয়ন শিল্প সংস্থা	
মোঃ আব্দুল হাকিম	ক্যাপ্টেন	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী	ঢাকা সেনানিবাস	ক্যাপ্টেন	ব্যবসা	১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর সাথে আত্মসমর্পণ ।
মোঃ আব্দুস সালাম	ক্যাপ্টেন	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	ঢাকা সেনানিবাস	ডি.আই.জি	পুলিশ সদর দপ্তর	
মোঃ খুরশীদ	ক্যাপ্টেন	৩১ ফিল্ড	ঢাকা	মেজর	অবসরপ্রাপ্ত	

www.pathagar.com

নাম	২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত			সর্বশেষ		মন্তব্য
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থল	পদবী	কর্মস্থল	
আহমেদ		রেজিমেন্ট আর্টিলারী	সেনানিবাস			
আব্দুস সালাম	ক্যাপ্টেন	জি.এস.ও.৩ পূর্বাঞ্চল কমান্ড	ঢাকা সেনানিবাস	মেজর জেনারেল	সেনা সদর, ঢাকা	
শাহেদুল আনাম খান	ক্যাপ্টেন	এ.ডি.সি.জি.ও. সি. ১৪ ডিভিশন	ঢাকা সেনানিবাস	বিগ্রেডিয়ার	সেনা সদর, ঢাকা	
ওবায়েছ তারেক	ক্যাপ্টেন	৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী	যশোর সেনানিবাস	কর্ণেল	পাকিস্তান সেনাবাহিনী তে কর্মরত	
এ.এল.এ. জামান	ক্যাপ্টেন	রেজিমেন্ট আর্টিলারী ৫৩ ফিল্ড আর্টিলারী	কুমিল্লা সেনানিবাস	বিগ্রেডিয়ার	পাকিস্তান সেনাবাহিনী তে কর্মরত	
এম.আই. তালুকদার	ক্যাপ্টেন	সি.এম.এইচ.	কুমিল্লা সেনানিবাস	কর্ণেল	সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা	
ডানিয়েল ইসলাম	ক্যাপ্টেন	ই.পি.আর. পিলখানা	সদর দপ্তর	বিগ্রেডিয়ার	সেনা সদর, ঢাকা	
ফজলুর রহমান ভূইয়া	ক্যাপ্টেন	৮৮ মর্টার রেজিমেন্ট	কুমিল্লা সেনানিবাস/ পিলখানা			
ফখরুল আহসান	ক্যাপ্টেন	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	কুমিল্লা		ডিসেম্বর মাসে পাকবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে মারা যান।	
এস.এম. মাহবুবুর রহমান	ক্যাপ্টেন	সরবরাহ অফিসার	কুমিল্লা সেনানিবাস	জেনারেল ম্যানেজার	বাংলাদেশ বিমান	
মোহাম্মদ ফিরোজ	ক্যাপ্টেন	সি.ও.ডি.	ঢাকা সেনানিবাস	ডাইরেক্টর	যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর	
মোঃ আশরাফুল হুদা	ক্যাপ্টেন	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান		ডি.আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
রফিকুল আলম	ক্যাপ্টেন	১৯ সিগনাল রেজিমেন্ট	ঢাকা সেনানিবাস	ডি.আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
এস.এ.এন.এম . ওকবা	ক্যাপ্টেন	১৯ সিগনাল রেজিমেন্ট	ঢাকা সেনানিবাস	জেনারেল ম্যানেজার	বাংলাদেশ বিমান	
এ.টি.এম. মনসুরুল আজিজ	ক্যাপ্টেন	১৯ সিগনাল রেজিমেন্ট	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত	ডি.আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
জামিলুর রহমান খান	ক্যাপ্টেন	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	ঢাকা	উপ-সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	
আব্দুল কুদ্দুস	ক্যাপ্টেন	২৩ ফিল্ড	সৈয়দপুর		কাসেম গ্রুপ	

www.pathagar.com

নাম	২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত			সর্বশেষ		মন্তব্য
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থল	পদবী	কর্মস্থল	
		রেজিমেন্ট	সেনানিবাস		অব ইন্ডাস্ট্রিজ	
মাজহারুল করিম	ক্যাপ্টেন	এ.ডি.সি. জেনারেল ইয়াকুব	জি.ও.সি. পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড	যুগ্ম-সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	
ওসমান আলী খান	ক্যাপ্টেন	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	ঢাকা	ডি.আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
গিয়াস উদ্দীন	ক্যাপ্টেন	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	ঢাকা	এস.পি	পুলিশ সদর দপ্তর	
মোতাহার হোসেন	ক্যাপ্টেন	প্রশাসনিক অফিসার	ঢাকা সেনানিবাস	লে. কর্ণেল	সেনা সদর	
মাহমুদ আল ফরিদ	লেফটেন্যান্ট	সি.ও.ডি., ঢাকা	ঢাকা সেনানিবাস	ডি.আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
মোদাব্বের চৌধুরী	লেফটেন্যান্ট	সি.ও.ডি., ঢাকা	ঐ	ডি.আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
শফি ওয়াসিউদ্দিন	লেফটেন্যান্ট	১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	যশোর সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার	পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত	লে. জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের পুত্র
ইরফান	ফ্লাইং অফিসার	সিএন্ডআর, ঢাকা	সামরিক বিমান ঘাঁটি, ঢাকা	এয়ার কমোডোর	সামরিক এ্যাটাচী, মস্কো	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত ঢাকায় কর্মরত ছিলেন।
কামাল উদ্দিন	স্কোয়াড্রন লিডার	আবহাওয়া বিভাগ	ঐ, ঢাকা	উইং কমান্ডার	অবসরপ্রাপ্ত,	
মনজুরুল হক	ফ্লাইং লেফটেন্যান্ট	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাডার বিভাগ	ঐ, যশোর	উইং কমান্ডার	-	কানাডা প্রবাসী
আব্দুল আজিজ	ফ্লাইং লেফটেন্যান্ট	-	ঐ, যশোর	ফ্লাইং লেফটেন্যান্ট		
মোশারফ হোসেন	ফ্লাইং অফিসার	-	ঐ, ঢাকা	ফ্লাইং লেফটেন্যান্ট	এ.ডি.সি. প্রেসিডেন্ট' ৭২/৭৩	কানাডা প্রবাসী
ইশফাক ইলাহী	ফ্লাইং অফিসার	-	ঐ, ঢাকা	এয়ার কমোডর		বর্তমানে ভারতপন্থী নিরাপত্তা বিশ্লেষক
কামাল উদ্দিন	ফ্লাইং লেফটেন্যান্ট	-	ঐ, ঢাকা	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	-	অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী
হাবিবুর রহমান	স্কোয়াড্রন লিডার	-	ঐ , ঢাকা	উইং কমান্ডার	-	অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী
আইয়ুব আলী	ফ্লাইং অফিসার	-	ঐ	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	-	অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী

www.pathagar.com

নাম	২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত			সর্বশেষ		মন্তব্য
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থল	পদবী	কর্মস্থল	
জাহিদুল হক	স্কোয়ার্ড্রন লিডার	-	ঐ	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	-	অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী
হাসানুজ্জামান	স্কোয়ার্ড্রন লিডার	-	ঐ	স্কোয়ার্ড্রন লিডার	মরহুম	-
খলিলুর রহমান	ফ্লাইং অফিসার	-	ঐ	গ্রুপ ক্যাপ্টেন' ৮৮	-	অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী
রব্বানী	স্কোয়ার্ড্রন লিডার	-	ঐ	১৫ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর বিমান হামলায় কর্তব্যরত অবস্থায় ঢাকায় নিহত	-	মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে কর্মরত ছিলেন।
ইমদাদ হোসেন	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	-	ঐ		-	
সাকলাইন	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	-	ঐ	-		১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে কর্মরত ছিলেন।
নাছির উদ্দিন	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	-	ঐ	১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিজয়ের পর মুক্তি বাহিনীর হাতে নিহত		
কে. এম. রহমান (এ.এম.সি.)	লে. কর্নেল	সভাপতি	বিশেষ সামরিক আদালত	ঢাকা অঞ্চল	সদস্য	পাবলিক সার্ভিস কমিশন
খুরশীদ আহমেদ	মেজর	সদস্য	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-৯	ঢাকা এলাকা	-	
আব্দুল আজিজ (ইঞ্জি.)	মেজর	সভাপতি	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-১	চট্টগ্রাম অঞ্চল	-	-
আব্দুল হামিদ (অর্ড.)	মেজর	সদস্য	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত	ঢাকা এলাকা	-	-
মির্জা মোহাম্মদ ইস্পাহানী	মেজর	আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক	-	ময়মনসিংহ এলাকা	-	-
আব্দুল কুদ্দুস (বেলচু)	ক্যাপ্টেন	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত	টাংগাইল	-	-
মুশফিকুর	ক্যাপ্টেন	সদস্য	ঐ	ঢাকা	-	-

www.pathagar.com

নাম	২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত			সর্বশেষ		মন্তব্য
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থল	পদবী	কর্মস্থল	
রহমান ভূইয়া						
এ.টি.এম. মন সুরুল আজিজ	ক্যাপ্টেন	সদস্য	ঐ	ঢাকা এলাকা	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর
মাহাবুবুর রহমান	লেফটেন্যান্ট	সদস্য	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-৫	কুমিল্লা এলাকা	জেনারেল ম্যানেজার	বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস্

পুলিশ বাহিনী

পুলিশ বাহিনী যুদ্ধাবস্থায় সামরিক বাহিনীর কমান্ডের অধীন পরিচালিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনী ২৫ মার্চ ১৯৭১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা যারা পাকিস্তানে সরকারের অধীন কর্মে নিয়োজিত থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করেছেন তাদের তালিকা–

টেবিল ২.৯
পাকিস্তান সরকারের অধীন কর্মে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান
১	টি আহমেদ	আই.জি	পুলিশ সদর দপ্তর	স্বরাষ্ট্র সচিব
২	আহমেদ ইব্রাহিম	অতিরিক্ত আই.জি	পুলিশ সদর দপ্তর	অতিরিক্ত সচিব
৩	এ রহিম	ডি.আই.জি	অধ্যক্ষ,সারদা পুলিশ একাডেমি	স্বরাষ্ট্র সচিব
৪	সৈয়দ ফজলুল কবির	ডি.আই.জি	পুলিশ সদর দপ্তর	সচিব
৫	এ বি এম সফদর	ডি.আই.জি	গোয়েন্দা বিভাগ	সচিব
৬	এস.মান্নান বক্স	ডি.আই.জি	ঢাকা	সচিব
৭	হোসেন আহমেদ	ডি.আই.জি	খুলনা	আইজিপি ও সচিব
৮	কে জি মহিউদ্দিন	ডি.আই.জি	রাজশাহী/খুলনা	অতিরিক্ত সচিব
৯	সৈয়দ আনিসুজ্জামান	ডি.আই.জি	পুলিশ সদর দপ্তর	ডি.আই.জি.
১০	এ এস মেজবাহউদ্দিন	ডি.আই.জি	এস.বি	সচিব
১১	সালাউদ্দিন আহমেদ	ডি.আই.জি	সি.আই.ডি	সচিব
১২	এ এইচ নুরুল ইসলাম	ডি.আই.জি	চট্টগ্রাম	আই.জি. পি
১৩	এম এম আহসান	ডি.আই.জি	চট্টগ্রাম(রেলওয়ে)	আই.জি.ও সচিব
১৪	এম এ আওয়াল	ডাইরেক্টর	সিভিল এভিয়েশন	ডি.আই.জি.
১৫	মহিউদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান	ই.পি. আই.ডি.সি.	-
১৬	এস এম আবু তালেব	এস.পি	দুর্নীতি দমন বিভাগ	এস.পি
১৭	আমিনুল হক বিশ্বাস	এস.পি	রেলওয়ে	এস.পি

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান
৮৫	জালালউদ্দিন আহমেদ	এস.ডি.পি.ও	কুড়িগ্রাম/ফরিদপুর	এ এস পি
৮৬	আব্দুল্লাহ চৌধুরী	এস.ডি.পি.ও	চুয়াডাঙ্গা	এ এস পি
৮৭	মুসলিম মিয়া চৌধুরী	এস.ডি.পি.ও	ফেনী	-
৮৮	সাজ্জাদ আলী	এস.ডি.পি.ও	মাদারীপুর	এ এস পি
৮৯	মো: ইসহাক	এস.ডি.পি.ও	নেত্রকোনা	-
৯০	মীর ফেরদৌস খান	এস.ডি.পি.ও	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এ এস পি
৯১	লোকমান হাকিম	এস.ডি.পি.ও	বগুড়া	এ এস পি
৯২	আনোয়ারুল হক	এস.ডি.পি.ও	ফরিদপুর/ দিনাজপুর	-
৯৩	মহিউদ্দিন খান	ডি এস পি	টাস্ক ফোর্স	এ এস পি
৯৪	আমিনুল ইসলাম চৌধুরী	ডি এস পি	এস বি	এ এস পি
৯৫	একেএম আব্দুল আওয়াল মিয়া	ডি এস পি	এস বি	এ এস পি এস বি
৯৬	এম এ শহীদ	ডি এস পি	সদস্য, গভর্ণর পরিদর্শক দল	এ এস পি
৯৭	মোজাফ্ফর হোসেন	ডি এস পি	যোগাযোগ	এ এস পি
৯৮	মকসুদ আলী মন্ডল	ডি এস পি	বেতার যোগাযোগ	এ এস পি
৯৯	হেদায়েত হোসেন	ডি এস পি	এস বি	এ এস পি
১০০	আব্দুল হাফিজ	ডি এস পি	শিল্প এলাকা খুলনা	এ এস পি
১০১	এ.রউফ	ডি এস পি	সদস্য, গভর্ণর পরিদর্শক দল	-

রাজাকার বাহিনী

'রাজাকার'[২০৫] শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক। ১৯৭১ সনে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আনসার আইন ১৯৪৮ বাতিল করে রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১ অনুযায়ী এ বাহিনী গঠন করে। জেনারেল নিয়াজী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে (মুনতাসীর মামুনকে) বলেছিলেন যে, রাজাকার বাহিনীর তিনিই স্রষ্টা।[২০৬] বিলুপ্ত আনসার বাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যরা সয়ংক্রিয়ভাবে নবগঠিত রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার ও রাজাকার সদস্য হিসেবে গণ্য হন জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে ১৩ মার্চ ২০১০ তারিখে প্রফেসর মুনতাসির মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক গ্রহণ করা সাক্ষাৎকারের অংশ তুলে দে'য়া হলো[২০৭]--

২০৫ মূল শব্দটি 'রেজাকার' তবে রাজাকার হিসেবেই সমাধিক পরিচিত বলে "রাজাকার" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সূত্রঃ শান্তি কমিটি, মুনতাসির মামুন।

২০৬ শান্তি কমিটি ১৯৭১, মুনতাসীর মামুন; পৃঃ ১২

২০৭ RAO FARMAN ALI র সাক্ষাৎকারের অংশ। সাক্ষাৎকারটি গত ১৩ মার্চ ২০১০ তারিখে গ্রহণ করেন প্রফেসর মুনতাসির মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ। সূত্রঃ We would like to ask you General Rao Farman Ali, how you initially got involved you in the operation in East Pakistan; Muhiuddin Ahmed.

www.pathagar.com

Q. Can you elaborate on the formation of the civil armed forces saying that you formed the Razakars?
A. I think it had been formed by the Martial Law Head Quarter.
Q. Whose brainchild was the Force?
A. Must have been the Core Commandant's
Q. Who was at that time?
A. Niazi.
Q. You had no control over the Razakars?
A. It was done by the Martial Law Headquarters.

এর বাইরে রাজনৈতিক কর্মী, স্থানীয় বখাটে, বেকার যুবকদের মধ্য থেকে প্রায় ৩৭০০০ জনকে এ বাহিনীতে রিক্রুট করা হয়। এ বিপুল সংখ্যায় রাজাকার রিক্রুট হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করেছিল। বাংলাদেশের সবগুলো ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলের কোনটিই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। ফলে তাদের সমর্থকদের মধ্য থেকে একটা অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজাকার বাহিনীতে শামিল হয়। তবে এ বাহিনীতে আদর্শবাদী লোকদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। প্রকৃত পক্ষে 'নিয়মিত ভাতা, রেশন, স্থানীয় ক্ষমতার ব্যবহার এবং সর্বোপরি হিন্দু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ সদস্যদের ঘরবাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি অবাধে লুটপাট ও ভোগ দখল করার' লোভে সমাজের সুযোগ-সন্ধানী এক শ্রেণীর লোক ব্যাপকহারে রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করেন[২০৮]। কামরুদ্দিন আহমদ তাঁর স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় গ্রন্থে এ বিষয়ের একটা প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন "বাঙ্গালীদের রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার কতকগুলো কারণ ছিল, তা হল --

১. দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সময় ঘোষণা করল, যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের দৈনিক নগদ তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক, যারা এতদিন পশ্চিমা সেনার ভয়ে ভীত হয়ে সন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছিল, তাদের এক অংশ এ বাহিনীতে যোগদান করল।
২. এতদিন পাক সেনার ভয়ে গ্রামে-গ্রামাঞ্চলে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম উপায় হিসেবে তারা রাজাকারদের দলে যোগ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।
৩. এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল করা এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার পর তাদের বুঝানো হলো যে, যুদ্ধে পাক সেনারা হারলে, পাক সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার অপরাধে মুক্তি বাহিনী তাদের

---

[২০৮] মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান; পৃষ্ঠাঃ ৫৯

www.pathagar.com

সকলকে হত্যা করবে। সুতরাং জীবন রক্ষা করার জন্য মুক্তি বাহিনীর গুপ্ত আশ্রয়স্থলের সংবাদ তারা পাক সেনাদের জানিয়ে দিতে শুরু করে। ১৯৭১-এর এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীতে অবাঙালীদের মধ্য থেকে ভর্তি করা হত। কারণ বাঙালীদের পাক সেনারা বিশ্বাস করতো না।"[২০৯]

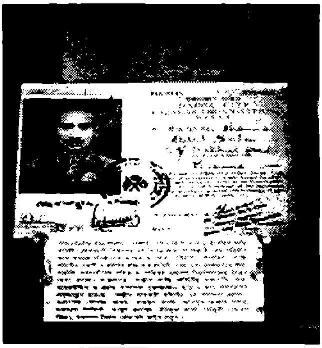

একজন রাজাকারের পরিচয় পত্র

খন্দকার আবুল খায়ের তার বই "১৯৭১-এ কি ঘটেছিলো রাজাকার কারা ছিলো"-এ লেখেন "আমি যে জেলার লোক সেই জেলার ৩৭ টি ইউনিয়নের থেকে জামায়াত আর মুসলীম লীগ মিলে ৭০ এর নির্বাচনে ভোট পেয়েছিল দেড়শতের কাছাকাছি আর সেখনে রাজাকারের সংখ্যা ১১ হাজার যার মাত্র ৩৫টি জামায়াতে ইসলামের ও মুসলিম লীগারদের। ...আমার কিছু গ্রামের খবর জানা আছে, যেখানে ৭১ এর ত্রিমুখী বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচার জন্য গ্রামে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দুই দিকেই ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে বাচার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত মুতাবিক যে গ্রামের শতকরা ১০০ জন লোকই ছিল নৌকার ভোটার, তাদেরই বেশ কিছু সংখ্যক ছেলেদের দেয় রাজাকারে। যেমন কলাইভাঙা গ্রামের একই মায়ের দুই ছেলের সাদেক আহমদ যায় রাজাকারে আর তার ছোট ভাই ইজহার যায় মুক্তিফৌজে। ...এটাই ছিলো অধিকাংশ অবস্থা। ...যারা ছিলো সুযোগসন্ধানী, তারা সুযোগ পেয়ে ব্যস রাজাকার হয়ে পড়েছে। ...এরপর এগার হাজার রাজাকার যারা নৌকা (আওয়ামী লীগ) থেকে নেমে এসেছিলো, তাদের সব দোষ গিয়ে আমাদের (ইসলামপন্থীদের) ঘাড়ে চাপলো।[২১০]

---

২০৯ স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দিন আহমদ; পৃষ্ঠা-১২৬,১২৭

২১০ ১৯৭১-এ কি ঘটেছিলো রাজাকার কারা ছিলো, খন্দকার আবুল খায়ের, (৩য় সংস্করণ), ১৯৯২, পৃঃ ৪৪-৪৫, ৬২। মুক্তিযুদ্ধকালে শেখ মুজিবের ভাই শেখ নাসের ৩৫ দিন লুকিয়ে ছিলেন এবং অনেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা আশ্রয় নিয়েছিলেন জামায়াত নেতা ও লেখক খন্দকার আবুল খায়েরের যশোরের বাড়িতে।

www.pathagar.com

রাজাকার বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদের মূল্যায়ন প্রায় একই; তিনি বলেন "বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদি হতে একথা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, রাজাকার রাজাকারই; তবে সব রাজাকার এক মাপের ছিলো না। প্রাথমিকভাবে রাজাকার বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের যুবক অন্তর্ভূক্ত হলেও তাদেরকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়–

১. যারা নিজেদের ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষা করার লক্ষ্যে পাক সামরিক বাহিনীকে সহায়তা, বাঙালী হত্যা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিলো। যারা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলো;
২. যারা হিন্দু সম্পত্তি দখল লুটপাট, ব্যক্তিগত গ্রামীণ রেষারেষিতে প্রাধান্য বিস্তার ও প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নানান অপকর্ম করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলো, এবং
৩. গ্রামের হাজার হাজার বেকার অর্ধশিক্ষিত যুবক যাদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশ ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল তাদের বেশিরভাগ পেটের তাড়নায় কর্মসংস্থানের জন্য এবং একই সাথে ভয়ভীতি এবং প্রলুব্ধ হয়ে রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখাতে বাধ্য হয়।

রাজাকার বাহিনী সুশৃঙ্খল বাহিনী ছিলো না। বরং এদেরকে পাক বাহিনী দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করেছে। অধিকাংশই হয়েছে বলির পাঠা। তাদেরকে সামনে রেখেই পাকবাহিনী সর্বত্র অগ্রসর হয়েছে।"[২১১] রাজাকার বাহিনীর প্রথম কমান্ডার ছিলেন পুলিশের DIG আবদুর রহিম[২১২] যাকে শেখ মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রধান ও পরবর্তীতে সচিব করেছিলেন। রাজাকার বাহিনীর অন্যান্য কমান্ডারদের নাম-পরিচয় নিম্নে দেয়া হল

টেবিল ২.১০
রাজাকার বাহিনীর কমান্ডের সদস্যদের নাম-পরিচয় [২১৩]

ক্রমিক	নাম	পদবী	কর্মস্থল
১	এ এস এম জহুরুল হক	পরিচালক	সদর দপ্তর
২	এম ই মৃধা, তমঘায়ী খেদমত	সহপরিচালক	সদর দপ্তর
৩	মফিজুদ্দিন ভূইঁয়া	সহ পরিবালক	পশ্চিম রেঞ্জ
৪	এম এ হাসনাত	সহ পরিচালক	কেন্দ্রীয় রেঞ্জ
৫	ফরিদ উদ্দিন	এডজুডেন্ট	সদর দপ্তর
৬	মোস্তাক হোসেন চৌধুরী	কমান্ডার	চট্টগ্রাম জেলা
৭	শামসুল হক	কমান্ডার	সিলেট জেলা

[২১১] সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযাম, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ; পৃঃ ৭৫।
[২১২] http://www.thedailystar.net/magazine/2011/04/01/cover.htm accessed on 12.02.2012
[২১৩] মুক্তিযোদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, এ এস এম সামছুল আরেফিন; পৃঃ ৪০৭-৪০৯

www.pathagar.com

ক্রমিক	নাম	পদবী	কর্মস্থল
৮	এ এস এম জহিরুল হক	কমান্ডার	ঢাকা জেলা
৯	এম মুজিবুর রহমান	কমান্ডার	বরিশাল জেলা
১০	সিরাজুদ্দিন আহমেদ খান	কমান্ডার	খুলনা জেলা
১১	আব্দুল হাই	কমান্ডার	যশোর জেলা
১২	আরিফ আলী সরদার	কমান্ডার	পটুয়াখালী জেলা
১৩	আসাদুজ্জামান তালুকদার	কমান্ডার	কুষ্টিয়া জেলা
১৪	এ কে এম আব্দুল আজিজ	কমান্ডার	পাবনা জেলা
১৫	এম হাবিবুর রহমান	কমান্ডার	রাজশাহী জেলা
১৬	শামসুজ্জামান	কমান্ডার	বগুড়া জেলা
১৭	আব্দুল ওয়াদুদ	কমান্ডার	দিনাজপুর জেলা
১৮	আফতাব উদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	রংপুর সদর
১৯	মোসলেম উদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	মেহেরপুর মহকুমা
২০	ফজলুল কবির	কমান্ডার	কুষ্টিয়া সদর মহকুমা
২১	সাইফউদ্দিন চৌধুরী	কমান্ডার	কুষ্টিয়া সদর মহকুমা
২২	এ টি এম ফজলুল করিম	কমান্ডার	কুষ্টিয়া সদর মহকুমা
২৩	ওয়াসিউদ্দিন তরফদার	কমান্ডার	চুয়াডাঙ্গা মহকুমা
২৪	সাইফউদ্দিন চৌধুরী	কমান্ডার	বরগুনা মহকুমা
২৫	মকবুল আলী খান	কমান্ডার	বরিশাল সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
২৬	তৈয়বুর রহমান	কমান্ডার	বরিশালসদর (দক্ষিণ) মহকুমা
২৭	খান জহিরুল হক	কমান্ডার	যশোর সদর মহকুমা
২৮	আব্দুস সোবহান	কমান্ডার	যশোর সদর মহকুমা
২৯	তৈয়বুর রহমান	কমান্ডার	কুড়িগ্রাম মহকুমা
৩০	নূর আহমেদ	কমান্ডার	গাইবান্ধা
৩১	আফজালউদ্দিন সিকদার	কমান্ডার	জয়পুরহাট মহকুমা
৩২	সোহরাব আলী মন্ডল	কমান্ডার	বগুড়া সদর মহকুমা
৩৩	মাহমুদ জং	কমান্ডার	নবাবগঞ্জ মহকুমা
৩৪	আব্দুল কাদির	কমান্ডার	নওগা মহকুমা
৩৫	খাজা ফকির মোহাম্মদ	কমান্ডার	সিরাজগঞ্জ মহকুমা
৩৬	তৈয়বুর রহমান	কমান্ডার	নড়াইল মহকুমা
৩৭	আশরাফউদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	নড়াইল মহকুমা
৩৮	মেসবাহউদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	বাগেরহাট মহকুমা
৩৯	মারুফ হোসেন	কমান্ডার	খুলনা মহকুমা
৪০	জয়নুদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	সাতক্ষীরা মহকুমা
৪১	তৈয়বুর রহমান খান	কমান্ডার	বরিশাল সদর মহকুমা

www.pathagar.com

ক্রমিক	নাম	পদবী	কর্মস্থল
৪২	আব্দুল সোবহান	কমান্ডার	ভোলা মহকুমা
৪৩	দেওয়ানআক্তারউদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	ঝালকাঠি মহকুমা
৪৪	আব্দুল মালেক খান	কমান্ডার	টাঙ্গাইল মহকুমা
৪৫	শমসের আলী	কমান্ডার	টাঙ্গাইল মহকুমা
৪৬	আনোয়ার উদ্দিন	কমান্ডার	জামালপুর মহকুমা
৪৭	শমসের আলী	কমান্ডার	ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
৪৮	সৈয়দ মোঃ শাজাহান	কমান্ডার	ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
৪৯	এ মালেক খান	কমান্ডার	ময়মনসিংহদর (উত্তর) মহকুমা
৫০	খসরুজ্জামান	কমান্ডার	কিশোরগঞ্জ মহকুমা
৫১	মতিউর রহমান খান	কমান্ডার	মানিকগঞ্জ মহকুমা
৫২	আব্দুল কাইয়ুম খান	কমান্ডার	মানিকগঞ্জ মহকুমা
৫৩	খলিলুর রহমান	কমান্ডার	মুন্সীগঞ্জ মহকুমা
৫৪	এন এ হাসনাত	কমান্ডার	ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমা
৫৫	চান্দ মিয়া	কমান্ডার	ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমা
৫৬	কাজী জহরুল হক	কমান্ডার	ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
৫৭	মুস্তাফিকুজ্জামান	কমান্ডার	ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
৫৮	ফরিদউদ্দিন	কমান্ডার	ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
৫৯	মোহাম্মদউল্লাহ	কমান্ডার	নারায়ণগঞ্জ মহকুমা
৬০	আবুল কাসেম খান	কমান্ডার	গোয়ালন্দ মহকুমা
৬১	আবুল কাসেম খান	কমান্ডার	ফরিদপুর সদর মহকুমা
৬২	আব্দুল লতিফ মিয়া	কমান্ডার	ফরিদপুর সদর মহকুমা
৬৩	মুনসুর আলী	কমান্ডার	গোপালগঞ্জ মহকুমা
৬৪	রুহুল আমিন খান	কমান্ডার	মাদারীপুর মহকুমা
৬৫	এ বি এম আশরাফ উদ্দিন	কমান্ডার	সিলেট সদর মহকুমা
৬৬	এ টি এম মহিউদ্দিন	কমান্ডার	হবিগঞ্জ মহকুমা
৬৭	সাঈদুর রহমান	কমান্ডার	ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা
৬৮	এস ইসমাইল চৌধুরী	কমান্ডার	কুমিল্লা সদর (উত্তর) মহকুমা
৬৯	সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান	কমান্ডার	কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
৭০	সাঈদ আলী	কমান্ডার	চাদপুর মহকুমা
৭১	আব্দুল হালিম চৌধুরী	কমান্ডার	ফেনী মহকুমা
৭২	সিরাজুল হক	কমান্ডার	নোয়াখালী মহকুমা
৭৩	সিরাজুল হক	কমান্ডার	চট্টগ্রাম সদর (উত্তর) মহকুমা
৭৪	এ এস এরশাদ হোসেন	কমান্ডার	চট্টগ্রাম সদর (দক্ষিণ) মহকুমা

সূত্রঃ দি ঢাকা গেজেট, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

www.pathagar.com

ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা (২৬ মার্চ ১৯৭১) ও এর নিকট-পূর্ব সময়ে এদেশের আলেমদের প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে [২১৪]–

১. বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা
২. বিভিন্ন সাধারণ রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা
৩. সরকারী অথবা আধা সরকারী মাদ্রাসাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা
৪. কওমী মাদ্রাসাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা
৫. বিভিন্ন খান্‌কাহ্‌, সিলসিলা ও পীর-মুরীদী সংশ্লিষ্ট উলামা ও
৬. ইমাম-মুয়াজ্জিন ও ব্যক্তি পর্যায়ের উলামা।

ড. তারেক মুহাম্মদ তওফীকুর রহমান তার গবেষণায় বলেন তখন ৯০ শতাংশ আলেম ছিলেন রাজনীতি অসচেতন ও রাজনীতি বিমুখ। ১৯৭১ সনে মাত্র ১০ শতাংশ আলেম রাজনীতি সচেতন[২১৫] ছিলেন যাদের মধ্যে --

১. নিশ্চল-নিষ্ক্রিয় ঃ ৭০ শতাংশ
২. শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী ইত্যাদির সাথে যুক্ত/সক্রিয় ঃ ১৬ থেকে ১৮ শতাংশ
৩. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয়/মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকে অগ্রহণযোগ্য ভাবেন ঃ ১২ থেকে ১৪ শতাংশ

১৯৭১ সনে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপক্ষে শুধু ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলসমূহ শুধু ছিল তা নয়, প্রায় সকল ধরনের ইসলামী ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। যারা কোন রাজনীতি করেননি এমনকি ইসলামী রাজনীতি হারাম বলে যারা মতামত ব্যক্ত করতেন সে ধরণের আলেম, পীর মাশায়েখ পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে ছিলেন। চর মোনাই–এর পীর, শর্ষীনার পীর থেকে শুরু করে ফুলতলীর পীর মাওলানা আব্দুল লতিফ ফুলতলী (সিলেট), মাওলানা সৈয়দ মোস্তফা আলী মাদানী, মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর,[২১৬] মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, মাওলানা আনিসুর রহমান, মাওলানা আশ্রাফ আলী, মাওলানা আমিনুল হক, মাওলানা মাসুম, মাওলানা নূর আহমদ, মাওলানা আব্দুল মান্নান (জমিয়াতুল মোদারেছীন), মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস, মাওলানা আজিজুল হকসহ শত শত আলিম পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ করার বিপক্ষে ছিলেন।

---

[২১৪] বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১), ড. তারেক মুহাম্মদ তওফীকুর রহমান; পৃঃ ২২

[২১৫] বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১), ড. তারেক মুহাম্মদ তওফীকুর রহমান; পৃঃ ২৪

[২১৬] যিনি পরবর্তীতে 'তওবার রাজনীতি' শুরু করেছিলেন।

www.pathagar.com

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী

ইসলামপন্থীদের মতই এ দেশে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগীরা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ ধর্মের ধর্মীয় গুরু ও বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো দেশব্যাপি দীর্ঘ ১৭ দিনের সফর শেষে বলেন,"পাঁচ লাখ বৌদ্ধের প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তান। চিরদিন পাকিস্তান বৌদ্ধদের পবিত্র স্থান হয়েই থাকবে। বৌদ্ধরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে দুস্কৃতিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবে।"[২১৭]

অক্টোবর (১৯৭১) মাসের শেষের দিকে অথবা নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো, প্রচার সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসার ননী গোপাল বড়ুয়া এবং সংঘের আরো কয়েকজন কর্মী নিয়ে কক্সবাজার আসেন। তার সঙ্গে ছিল পুলিশ ও কমান্ডো বাহিনী।[২১৮]

বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ৩ জুন পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ছিলেন একজন মুখ্য স্বাধীনতা বিরোধী। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি গণহত্যার সমর্থনে দেশের বৌদ্ধ প্রধান এলাকাগুলোতে সমাবেশ করে বেড়িয়েছেন। তিনি খান চক্রের সমন্বয়ে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষ— "পাকিস্তান ৫ লক্ষ বৌদ্ধের প্রিয় জন্মভূমি হিসেবে টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।" তিনি আরো উল্লেখ করেন—"বৌদ্ধ যারা এখানে আবহমানকাল ধরে বসবাস করছে তারা দেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের শেষ রক্ত বিন্দু দানে প্রস্তুত রয়েছে।"

সূত্রঃ http://www.nybangla.com/Weekly%201971/June/1st%20Week/June1_gbb.jpg accessed on 12.12.2011

সে সময় চট্টগ্রাম জেলার অনেক বৌদ্ধ গ্রামে 'চীনা বৌদ্ধ' বলে বড় বড় ব্যানার রাখা হতো। পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ শুরু হলে বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো পাকিস্তান সামরিক শাসকের আরেক সেবক যিনি (আওয়ামী ঘরানার বড় বুদ্ধিজীবী) পিজি হাসপাতালের তৎকালীন পরিচালক প্রফেসর নূরুল ইসলামের কৃপায় হাসপাতালে ভর্তি হন। পরিস্থিতি একেবারে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালেই ছিলেন।[২১৯]

বুদ্ধিজীবী, আইনজীবীসহ অন্যান্য পেশাজীবী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় সকল বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগী ভূমিকায় অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রায় সকল শিক্ষক পাকিস্তান শাসকের অধীনে নিয়োজিত থেকে

---

২১৭ www. liberationwarmuseum.org/ in this day/ June 4, 1971 acccessed on 15.11.2011

২১৮ স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম, এস এস চাকমা, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ: পৃঃ ৩১৭

২১৯ স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম, এস এস চাকমা, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ; পৃঃ ৩১৯

www.pathagar.com

সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সনের ১৪ ডিসেম্বর বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আবাসিক ভবন থেকে অপহৃত হওয়াই প্রমাণ করে তারা মূলতঃ পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন, আবার বাংলাদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত নৌকায় পা দিয়ে 'রীতিমত নভেল' সৃষ্টি করেছেন।

শিবনারায়ন দাশ[২২০] বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন "কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু তারা ব্যস্ত ছিলেন পাকিস্তানের সংহতি এবং তমদ্দুনকে বাঁচিয়ে রেখে আদমজী, ইস্পাহানীর পুরস্কার নেবার প্রতিযোগিতায়।"[২২১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ড. এম এন হুদা, ড. এ বি এম হাবিবুল্লাহ, ড. এম ইন্নাস আলী, ড. এ কে নজমুল করিম, ড. মফিজুল্লাহ কবির, অধ্যাপক আতিকুজ্জমান খান, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, ড. এস এম আজিজুল হক, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. এ কে রফিকুল্লাহসহ প্রায় সকল শিক্ষক কাজে যোগদান করেন[২২২]।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা বর্ননা করতে গিয়ে মহিউদ্দিন আহমদ[২২৩] বলেন "খবর পেলাম অনেক শিক্ষক ক্যাম্পাসে আসেন, অনেকে আসেন না। আমাদের ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক আনিসুর রহমান, ওয়াহিদুল হক ও রেহমান সোবহান দেশে নেই। বিভাগীয় প্রধান এম এন হুদাকে ইসলামী ছাত্র সংঘের একদল ছেলে রাস্তায় ধরে প্রচন্ড মেরেছে। বাংলা ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের মধ্যে আনোয়ার পাশা আর মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ক্যাম্পাসে আসেন না। আহমদ শরীফ একদিন মাত্র এসেছিলেন। তবে ক্লাস নেননি। দীন মুহাম্মদ, মুনির চৌধুরী আর নীলিমা ইব্রাহীম রোজ ক্যাম্পাসে আসেন এবং ক্লাস নেন।"[২২৪]

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষক কাজে যোগদান করেন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলীর পক্ষ থেকে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় "আমরা আমাদের প্রিয়ভূমি পাকিস্তানকে খন্ড করার অভিসন্ধির তীব্র নিন্দা করছি। রাজনৈতিক চরমপন্থীদের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণায় আমরা দুঃখ পেয়েছি ও হতাশ হয়েছি।[২২৫]

---

২২০ নিউক্লিয়াস সদস্য ছিলেন।

২২১ মনের মত যুদ্ধ করতে পারিনি, শিবনারায়ন দাশ, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ ; পৃঃ ১৭

২২২ www.liberationwarmuseum.org/ this day/ June 1, 1971 accessed on 14.11.2011

২২৩ নিউক্লিয়াসের সদস্য।

২২৪ প্লাবনভূমির মহাকাব্য, মহিউদ্দিন আহমদ, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ; পৃঃ ১৩৮

২২৫ www.liberationwarmuseum.org/ this day/ June 4, 1971 accessed on 14.11.2011

www.pathagar.com

বিচারপতি কে এম সোবহান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও কবি শামসুর রাহমান যারা পাকিস্তানকে তাদের প্রিয়ভূমি জেনে কর্মকান্ড পরিচালনা করেন অথচ পরবর্তীতে বড় বড় মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন তাদের সম্পর্কে ডঃ মাহবুবুল্লাহ বলেন "কে এই কে এম সোবহান? যিনি ১৯৭১ সালে দখলদার বাহিনীর সময় পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের বিচারক হিসেবে শপথ নিয়েছেন, সেই কে এম সোবহানের মুখে স্বাধীনতার স্বপক্ষ-বিপক্ষ উচ্চারণ শোভা পায় না।

কে এই কবীর চৌধুরী? কারণ তাঁর কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটি সরকারের সেবা করা। আইয়ুব খাঁ থেকে শুরু করে ইয়াহিয়া, মোনেম খাঁ পর্যন্ত প্রত্যেককে তিনি সেবাদান করেছেন। তিনি আজকে যখন স্বাধীনতার স্বপ করেন, তখন প্রশ্ন করতে হবে– কেন তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে ক্ষ-বিপক্ষের কথা উচ্চারণ ১৯৭১-এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন? আজকে শামসুর রাহমান যখন তালেবানী হামলার শিকার হন বলে দাবী করেন, মিথ্যাচার করেন, তখন প্রশ্ন করতে হবে– মুক্তিযুদ্ধের সময় শামসুর রাহমানকে যখন আমি বলেছিলাম সীমান্তের ওপার চলে যেতে এবং আমি তাকে সাহায্য করব, কেন তিনি ঢাকার মাটিকে আঁকড়ে ধরে দৈনিক পাকিস্তানে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় রচনা করেছিলেন?" [২২৬]

টেবিল ২.১১

স্বাধীনতা যুদ্ধে সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী এবং তাদের ভূমিকা

ক্রম	নাম	বিবরণ	সূত্র
১	বিচারপতি কে এম সোবহান	১৯৭১ সালে দখলদার বাহিনীর সময় পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের বিচারক হিসাবে শপথ নিয়েছেন	দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ১৯৭
২	কবীর চৌধুরী	বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসাবে ১৯৭১-এ দায়িত্ব সম্পাদন করেন।[২২৭]	
৩	শামসুর রাহমান	১৯৭১-এ 'দৈনিক পাকিস্তান' এর উপ-সম্পাদক হিসাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় রচনা করেন ।	
৪	বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী	পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হিসাবে জেনারেল টিক্কা খান এবং ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, গভর্ণর ডাঃ এ এম মালিককে শপথ বাক্য পাঠ করান।	www.liberationwarmuseum.org / this day/ June 1, 1971

---

[২২৬] দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ১৯৭-১৯৮

[২২৭] এম আর আখতার মুকুল তার প্রকাশিত বই চরমপত্রে ; কবীর চৌধুরীকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পৃঃ ৩৪৮

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	বিবরণ	সূত্র
৫	বিচারপতি নাঈম উদ্দিন আহমদ	১৯৭১ সালে কক্সবাজারের মুন্সেফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরে হাইকোর্টের বিচারক হিসাবে শপথ নেন।	আমাদের একাত্তর (সংকলন),সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ, এস এস চাকমার লেখা।
৬	আহমেদুল কবীর	মোজাফ্ফর ন্যাপের নেতা এবং দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি পিপিপিতে যোগদান করেন এবং পিপিপি-র টিকেটে উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।	www.liberationwar museum.org / this day/ October 12, 1971
৭	আনোয়ার জাহিদ	ভাসানী ন্যাপের নেতা , মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি পিপিপিতে যোগদান করেন এবং পিপিপি-র টিকেটে উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।	
৮	আব্দুল মতিন	১৯৭১ সালে দখলদার বাহিনীর সময় পূর্ব পাকিস্তানে মুন্সেফ (সহকারী জজ) হিসেবে চাকরি নেন।	নিজের সাক্ষাৎকার
৯	বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক	১৯৭১ সালের ০১ নভেম্বর দখলদার বাহিনীর সময় পূর্ব পাকিস্তানে মুন্সেফ (সহকারী জজ) হিসেবে চাকরি নেন। হাইকোর্টে কর্মরত।	আমাদের সময়ের পাঠক প্রতিক্রিয়া। ইন্টারনেট।
১০	বিচারপতি খন্দকার মুসা খালেদ		www.supreme court.gov.bd
১১	বিচারপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	১৯৭১ সালের ০৮ নভেম্বর দখলদার বাহিনীর সময় পূর্ব পাকিস্তানে মুন্সেফ (সহকারী জজ) হিসেবে চাকরি নিয়েছেন। হাইকোর্টে কর্মরত।	www.supreme court.gov.bd
১২	মুনীর চৌধুরী	১৯৭১ সনের ১৭ মে পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতিদানকারী ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের কয়েকজন। এদেরকে এম আর আখতার মুকুল তার প্রকাশিত বই চরমপত্রে (পৃঃ ৫১) দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।	বিবৃতিটি পরিশিষ্ট- ৯ দ্রষ্টব্য
১৩	ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী		
১৪	সাবিনা ইয়াসমীন		
১৫	ফতেহ লোহানী		
১৬	সরদার ফজলুল করিম		

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	বিবরণ	সূত্র
১৭	ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়া	১৯৭১ সালে দখলদার বাহিনীর সময় পাকিস্তান সরকারের অধীন আণবিক শক্তি কমিশনের চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া।
১৮	প্রফেসর নূরুল ইসলাম	১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকারের অধীন পি.জি.তে পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর আহত সদস্যদের চিকিৎসা সেবা দান করেছেন।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃঃ ১০৯
২০	ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন	মানিক মিয়ার এক ছেলেও মুজিবনগরে যাননি.. তখন মানিক মিয়ার এক ছেলে টিক্কার অনুমতি নিয়ে লন্ডনে এসেছিলেন।	ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; পৃঃ ৩১
২১	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু		
২৩	জিলুর রহমান সিদ্দিকী	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।	মহিউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'আমাদের একাত্তর' (সংকলন) এ প্রকাশিত নিজের লেখা।
২৪	সেলিনা হোসেন	বাংলা একাডেমীতে কর্মরত ছিলেন।	মহিউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'আমাদের একাত্তর' (সংকলন) এ প্রকাশিত নিজের লেখা।
২৫	এডভোকেট আবদুস সালাম খান	শেখ মুজিবের সম্পর্কে মামা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি পিপিপিতে যোগদান করেন এবং পিপিপি-র টিকেটে উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃঃ ১০৪ এবং www.liberationwarmuseum.org / this day/ october 12, 1971
২৬	লেঃ কর্ণেল ফারুক	১৯৭১ সনে রাজাকার ছিলেন। তাদের বাড়িতে রাজাকার ক্যাম্প ছিল। ১৯৭২/৭৩ সনে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি বর্তমানে মন্ত্রী।	আমার ফাঁসি চাই, মতিয়ুর রহমান রিন্টু; পৃঃ ১৭২

www.pathagar.com

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে এক যুক্ত বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করে; এর মধ্যে মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সাবিনা ইয়াসমীন ছিলেন।[২২৮] এম আর আখতার মুকুল বলেন, "এ্যাঁ-ঢাকার ৫৫ জন বাঙালী দালাল বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন খবরের কাগজে ছাপানো সম্ভব হয়নি।"[২২৯] স্বাধীনতার পর এ বিবৃতিদানকারীদের বিরুদ্ধে নীলিমা ইব্রাহীমকে দিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। তবে বিবৃতির কিছু বক্তব্য হচ্ছে[২৩০] ----

- নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সী বলে পরিচিত একটি সংস্থা তাদের ভাষায় 'ঢাকায় বিপজ্জনক ব্যাপক হত্যাকান্ডে' উদ্বেগ প্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছেন আমরা তা পাঠ করে হতবাক হয়ে গিয়েছি।
- আমাদের অনেকেই গুলীবিদ্ধ ও নিহতের তালিকায় তাদের নাম দেখতে পেয়ে হতবাক হয়েছেন.... আমাদের মৃত্যুর খবর যে অতিরঞ্জিত এটা জানিয়ে দিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং ছাত্রদের আশ্বস্ত করেছি।
- ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে গোলযোগ চলাকালে আমাদের অধিকাংশই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজ নিজ গ্রামে চলে গিয়েছিলাম, এ কারণেই হয়তো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকবে।
- নির্বাচনে জনগণের কাছ থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন আদায়ের ম্যান্ডেট পেয়ে চরমপন্থীরা স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে সম্প্রসারিত ও রূপায়িত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলো, যারাই জনতার অর্পিত আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের উপর দুর্দিন নেমে এসেছিল।
- বাঙালি হিন্দু বিশেষ করে কলকাতায় মারোয়াড়ীদের আধিপত্য ও শোষণ এড়ানোর জন্যেই আমরা বাংলার মুসলমানরা প্রথমে ১৯০৫ সালে বৃটিশ রাজত্বকালে আমাদের পৃথক পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেই এবং আবার ১৯৪৭ সালে ভোটের মাধ্যমেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম ভাইদের সাথে যুক্ত হওয়ার সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। উক্ত সিদ্ধান্তে অনুতপ্ত হওয়ার আমাদের কোন কারণ নেই।

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ওয়েব সাইট অনুসারে "হাইকোর্টের ৩৮ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের ঘরোয়া বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপকে 'নগ্ন ও নির্লজ্জ' অভিহিত করে এর প্রতিবাদ জানায় এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে দুষ্কৃতিকারীদের বাধাদানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়।"[২৩১]

---

[২২৮] একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ১৪২-১৪৬

[২২৯] চরমপত্র, এম আর আখতার মুকুল; পৃঃ ৫১

[২৩০] পরিশিষ্টঃ ৯। সূত্রঃ একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ১৪২- ১৪৬

[২৩১] www.liberationwarmuseum.org/ this day/ April 02 , 1971 accessed on 14.11.2011

www.pathagar.com

একই ওয়েব সাইট অনুসারে "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে বিবৃতি দেন- আব্দুল মতিন, মোহাম্মদ ইদ্‌রিস, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জালালুদ্দিন আহমদ, কে.এ.এম. তৌফিকুল ইসলাম, ফকরুদ্দিন আহমদ, এম. ইকবাল আহমদ, সৈয়দ শহিদুল হক, কলিমুদ্দিন আহমদ, সিরাজুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, মেসবাহ উদ্দিনসহ ৪১ জন আইনজীবী ।[২৩২]

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরীর আট ছেলে ও ছয় মেয়ের (চৌদ্দ জন) মধ্যে তিন জনের কথা মানুষ জানে। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও ফেরদৌসী মজুমদার। বাকীদের কথা জানা যায় না। জেনারেল খলিলের "পূর্বাপর ১৯৭১"[২৩৩] প্রকাশিত হবার আগ পর্যন্ত বিগ্রেডিয়ার কাইউম চৌধুরী নামে তাদের এক ভাই আছেন তা কেউ জানতো না। ১৯৭১ সনে কাইউম চৌধুরী পাকিস্তান সেনাবাহিণীতে কর্ণেল পদে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিণীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নিধনে ব্রত ছিলেন। পরে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিণীতে বিগ্রেডিয়ার পদে পদোন্নতি পান। তিনি সে দেশেই থেকে যান।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী পুরো নাম আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রী লাভ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয় বিষয়েই অধ্যাপনা করেন। 'মুনীর' বাংলা টাইপিং লে-আউট 'মুনীর অপটিমা' তার অমর সৃষ্টি। তিনি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে নিহত হন। তার মৃত্যু নিয়ে ধূম্রজাল রয়েছে। বাংলা ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী এবং পাকিস্তান শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বক্তব্যদানকারী হলেও তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন পাকিস্তানী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৫৫ জন বুদ্ধিজিবি-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের পক্ষে যে যুক্ত বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন এর মধ্যে মুনীর চৌধুরী অন্যতম। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান ছাড়াও যে ৭ (সাত) জন বিবৃতির কভার পেইজে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাদের মধ্যে তিনি এক জন। ১৯৬৬ সনে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রাপ্ত।

ড. নীলিমা ইব্রাহিম অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউ মার্কেটে যেতে রাস্তা পার হতেই বাঁ হাতে একটা পেট্রোল পাম্প আছে। ওটার নাম আমরা দিয়েছিলাম জয় বাংলা পাম্প। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এখানে আমাদের অনেক সংবাদ আদান-প্রদান হতো। নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একদিন খুব গম্ভীর মুখে ডাক্তার বললেন, চৌধুরী সাহেব আমাদের বিপদে ফেলবেন? বললাম-কোন চৌধুরী? বললেন-তোমার ভ্রাতা মুনীর চৌধুরী। আজ আমাদের চারটি ছেলে আমাকে পাম্পের পিছনে ডেকে বললো-এখনও সময় আছে, স্যারকে চলে যেতে বলেন, না হলে আমরা

---

২৩২ www.liberationwarmuseum.org/ this day/ April 10 , 1971 accessed on 14.11.2011

২৩৩ বইটির পুরো নাম "পূর্বাপর ১৯৭১ পাকিস্তানী সেনা গহ্বর থেকে দেখা, মেজর জেনারেল (অবঃ) মুহাম্মদ খলিলুর রাহমান; সাহিত্য প্রকাশ।

www.pathagar.com

ওর মুখ বেঁধে নিয়ে যাবো। যথাস্থানে খবর পৌঁছানো হলো। মুনীর কিছুটা শংকিত হয়েছিলেন এবং সব সময়ে বিভাগীয় পিয়ন লুৎফরকে সঙ্গে নিয়ে চলতেন।[২৩৪]

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তার ভাই অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর চেয়ে দু'বছরের বড়। তার পুরো নাম আবুল কালাম মোহাম্মদ কবির মানিক। তিনিও অন্য দুই ভাইয়ের মত পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। কবীর চৌধুরী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির পরিচালক (তখন মহাপরিচালক পদ সৃষ্টি হয়নি, পরিচালক ছিলেন প্রধান) ছিলেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মৃত্যু তার ভাই অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে দালাল আইনে অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।[২৩৫] শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় বইয়ে "কবীর চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের সিরাত সম্মেলন, আজাদী দিবস পালন ইত্যাদি সভায় অভ্যাগত করে বক্তৃতা করতে দিয়েছে।"[২৩৬]

কবীর চৌধুরীকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর একটি সূক্ষ্ম পাঁয়তারা অনেকদিন থেকেই চলছে। ফেরদৌসী মজুমদারের জীবনীতে উল্লেখ আছে, "স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে মাসে তাঁর পরিবারের সবাই মুনীর চৌধুরী ছাড়া দাউদকান্দি, চান্দিনা হয়ে কলকাতায় চলে যান।"[২৩৭] 'র' এর এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত এ এস এম সামছুল আরেফিন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কবীর চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠার জন্যে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় কবীর চৌধুরীর নাম উল্লেখ করেছেন।[২৩৮]

জাহানারা ইমাম

শফি ইমাম রুমীর মা হিসেবে শহীদ জননী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। তিনি ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তান থেকে ভারত বিরোধী 'আয়না' নুষ্ঠানের উপস্থাপিকা ছিলেন।[২৩৯] যে জন্যে ডঃ মাহবুবুল্লাহ বলেন, জাহানারা ইমামের সন্তান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শহীদ হয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জাহানারা ইমামের কী ভূমিকা ছিল, সেগুলো ওয়াকিবহাল মহল জানেন।[২৪০]

শাহরিয়ার কবির

শাহরিয়ার কবির পুর্বতন নোয়াখালী (বর্তমান ফেণী) জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২০ নভেম্বর এক আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

---

[২৩৪] '৭১-এর ছাবিবশে মার্চের এ্যালবাম: স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, নীলিমা ইব্রাহীম, দৈনিক আজকের কাগজ, ১২ চৈত্র ১৪০০

[২৩৫] র-এর ভয়াল থাবা, সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী; পৃঃ ৯৫

[২৩৬] একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ১১১

[২৩৭] http://www.bn.m.wikipedia.org/wiki/ফেরদৌসী_মজুমদার accessed 17.04.2014

[২৩৮] মুক্তিযোদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, এ এস এম সামছুল আরেফিন।

[২৩৯] Syeda Asifa Ashrafi Papia MP, Talk show, RTV. March 06, 2013

[২৪০] দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, মাহ্বুব উল্লাহ্ আফতাব আহমাদ পৃঃ ২৯৯

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে[২৪১] শাহরিয়ার কবির ১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন।[২৪২] আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে গিয়ে জেরার জবাবে তিনি বলেন, "আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলায় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে আর পড়ালেখা করিনি।"[২৪৩] অনার্সে তার সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট কি ছিল মনোবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এ সাবজেক্টগুলো তিনি শেষ করেছেন বলেও জেরার জবাবে উল্লেখ করেন।[২৪৪]

শাহরিয়ার কবির একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি হবার কারণেই আলোচিত সমালোচিত ব্যক্তি। তার সম্পর্কে বরেণ্য লেখক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মানবতা কর্মী ও নির্ভীক কণ্ঠস্বর ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। শাহরিয়ার কবির ২০০১ সনে গ্রেফতার হলে তার মেয়ে অর্পিতা শাহরিয়ার বলেন, "But the tragedy is, the collaborators, mostly known as 'Razakars', are still free -- and my father, a freedom fighter under Sector Nine, in jail."[২৪৫]

পাকিস্তানের DAWN পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, Two children held placards reading[246] "Free freedom fighter Shahriar Kabir," referring to his participation in the 1971 war of independence from Pakistan.[247]

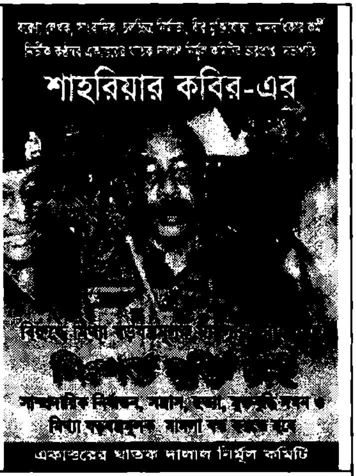

শাহরিয়ার কবির ২০০১ সনে গ্রেফতার হলে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যে পোস্টার ছাপায়।

Daily Star প্রতিবেদনে বলা হয়, Shahriar Kabir, a prominent freedom fighter, columnist, film director and writer was arrested last week by the special security forces at the airport on his way back home from Kolkata.

---

[২৪১] আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা অর্থ সচরাচর বুঝায় যে এক জন মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেছেন।

[২৪২] মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

[২৪৩] দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ আগষ্ট ২০১২

[২৪৪] সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা তৃতীয় বর্ষে উঠার পর দিতে হতো।

[২৪৫] http://socialhistory.org/nl/news/shahriar-kabir-prison accessed 15.04.2014

[২৪৬] http://www.muktadhara.net/page03.html accessed on 08.04.2014

[২৪৭] http://www.dawn.com/news/11817/protest-in-dhaka-for-release-of-journalist accessed on 08.04.2014

www.pathagar.com

'শাহরিয়ার কবির মুক্তিযুদ্ধের সময় নবম সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন', তার মেয়ের এমন দাবীর বিপরীতে "তিনি বলেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ২ মে পর্যন্ত আমি মহাখালীর বাড়িতে ছিলাম। এর পরে আমি ভারতে চলে যাই। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমি দেশে ফিরে আসি।"[২৪৮]

মুশতারি শফি[২৪৯] বলেন, শাহরিয়ার কবির ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেননি বরং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে তিনি মুরগি সরবরাহ করেছেন।[২৫০] পাকিস্তানের দালাল হিসেবে তাকে সকলে জানতেন। তিনি নিজেও তার অবস্থান জানতেন। এ ভয়ে তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পা মাড়াননি। শাহাদাৎ চৌধুরীর বোন ডানাকে[২৫১] বিয়ে করে সাপ্তাহিক বিচিত্রায়[২৫২] চাকরিতে যোগদান করেন। ঢাকা সেনানিবাস দখলের পর ভারতীয় বাহিনী শাহরিয়ার কবির সম্পর্কে এমন কিছু গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করে যা মাধ্যমে RAW তাকে blackmail করার সুযোগ পায়।

মুনতাসীর মামুন

মুনতাসীর মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। ১৯৭২ সনে ডাকসু নির্বাচনে তিনি বিভাগীয় সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একজন সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে সবাই মুক্তিযুদ্ধা হিসেবেই জানতো। ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দেওয়ার সময় তিনি স্বীকার করেন যে তিনি ১৯৭১ সনে টেকনিশিয়ানের পরিচয়পত্র নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার সংগঠক মহীউদ্দিন খান আলমগীরের ভাগ্নে।

সংবাদপত্র

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন সকল সংবাদপত্র পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালায়। দৈনিক আজাদ (বর্তমানে প্রকাশনা বন্ধ), দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক পাকিস্তান (পরবর্তীতে দৈনিক বাংলা, বর্তমানে প্রকাশনা বন্ধ), দৈনিক ইত্তেফাকসহ সকল পত্রিকাই পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে প্রচারণা চালায়। দৈনিক আজাদ ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী, দৈনিক সংগ্রাম ছিল ইসলামী মূল্যবোধ, দৈনিক পাকিস্তান ছিল সরকারী আর দৈনিক ইত্তেফাক ছিল আওয়ামী লীগের মুখপত্র।

---

২৪৮ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শাহরিয়ার কবির তাঁর জবানবন্দীর শুরুতে পরিচয় পর্বের পরে বলেন।

২৪৯ বেগম মুশতারি শফি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি ছিলেন।

২৫০ বেগম জাহানারা ইমামের স্মৃতির উদ্দেশে চিঠি, মুশতারি শফি; পৃঃ৩৬১

২৫১ মহাখালীতে ডানা প্রিন্টিংস নামে শাহরিয়ার কবিরের একটি প্রেস আছে।

২৫২ 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলার সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন, "ইত্তেফাক ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়নি। মানিক মিয়ার এক ছেলেও মুজিবনগরে যাননি। বরং গুজব প্রচার হয়েছিল যে, ইত্তেফাক অফিস পাকবাহিনীর হাতে ধ্বংস হওয়ায় জেনারেল টিক্কা মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। এমন কি সেই তীব্র মুক্তিযুদ্ধের সময় -- যখন কোন বাঙালিকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না, তখন মানিক মিয়ার এক ছেলে টিক্কার অনুমতি নিয়ে লন্ডনে এসেছিলেন। মুজিবনগর সরকার লন্ডনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং মুজিবনগরে গিয়ে তাকে ইত্তেফাক প্রকাশের অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি সেই সময়ে সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। এবং ঢাকায় ফিরে যান। এবং ঢাকা থেকে ইত্তেফাক প্রকাশ করেন। সে ইত্তেফাকে কি লেখা হত সে সব কথা এখানে না তোলাই ভালো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এবং বঙ্গবন্ধুর দেশে ফিরে আসার আগে কয়টা দিন ছিল ইত্তেফাকের জন্য চরম দুর্দিন। ইত্তেফাকের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকার জন্য সৈয়দ নজরুল এবং তাজউদ্দিন আহমেদ দু'জনেই ছিলেন মানিক মিয়ার দু'ছেলের উপরে বিরূপ। কিন্তু শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে ফিরে এসে মানিক মিয়ার দু'ছেলেকে ক্ষমা করে দেন।"[২৫৩]

দৈনিক সংগ্রাম এবং দৈনিক আজাদ ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী এবং দৈনিক পাকিস্তান সরকারী পত্রিকা হিসাবে পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে প্রচারণা চালায়। সবচেয়ে বেশী পাকিস্তানপন্থী প্রচারণা চালায় দৈনিক পূর্বদেশ।

যাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধিতার বড় অভিযোগ তারা হলেন পূর্বদেশ ও Pakistan Observer এর মালিক হামিদুল হক চৌধুরী, Pakistan Observer এর সম্পাদক মাহবুবুল হক, পূর্বদেশ সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, দৈনিক পাকিস্তান সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, দৈনিক আজাদ সম্পাদক সৈয়দ শাহাদাৎ হোসেন, দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আখতার ফারুক।

সরকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা

১৯৭১ সনে প্রায় ২০০ (দু' শ') জন সি এস পি ছিলেন যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, ড. আকবর আলী খানের মতে তাদের মধ্যে মাত্র ১৩ জন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ই পি সি এস- ৬২ জন (ড. আকবর আলী খানের মতে ১০০ জন) এবং অন্যান্য বিভাগের ৫১ জন[২৫৪] উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাকীরা পাকিস্তানী শাসকদের অধীনে চাকরি করেছেন। যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চাকরি করেছেন তাদের অনেকেই জেলা প্রশাসনে কর্মরত থেকে রাজাকার বাহিনী গঠন, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা করেছেন; যাদের কয়েকজনের নাম দেয়া হলো-[২৫৫]

---

২৫৩ ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী: পৃঃ ৩১-৩২

২৫৪ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ১৩৯

২৫৫ চরম পত্র , এম আর আখতার মুকুল , পৃঃ ৩৩৩- ৩৪৭

www.pathagar.com

টেবিল ২.১২

যুদ্ধকালে পাকিস্তান শাসকদের অধীনে চাকরি করেছেন এবং তাদেরকে সহায়তা করেছেন এমন কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৬]
১	শফিউল আজম	চীফ সেক্রেটারী	প্রাদেশিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান	মন্ত্রী
২	কফিল উদ্দিন মাহমুদ	চীফ সেক্রেটারী	প্রাদেশিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান	চীফ সেক্রেটারী
৩	এম.মজিবুল হক	সচিব	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	কেবিনেট সচিব
৪	কাজী আজহার আলী	সচিব	শ্রম বিভাগ	সচিব
৫	মোহাম্মদ আলী	সচিব	শিল্প বিভাগ	সচিব
৬	কিউ.এ.রহিম	সচিব	অর্থ/সংস্থাপন বিভাগ	সচিব
৭	মোহাম্মদ খোরশেদ আলম	সচিব	যোগাযোগ বিভাগ	মূখ্য অর্থ সচিব
৮	এম.এ সালাম	সচিব	রাজস্ব বিভাগ	সচিব
৯	ডঃ এ.কে.এম. গোলাম রব্বানী	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ	সচিব
১০	সিদ্দিকুর রহমান	সচিব	শ্রম বিভাগ	কেবিনেট সচিব
১১	মোজাফফর আহমেদ	সচিব	স্থানীয় সরকার বিভাগ	সচিব
১২	এম.এ.হাসান	সচিব	প্রাদেশিক সরকার	সচিব
১৩	মুফতি মাছুদূর রহমান	সচিব	শিক্ষা বিভাগ	সচিব
১৪	মাহাবুবুল ইসলাম	সচিব	ওয়ার হাউজ কর্পোরেশন	সচিব
১৫	এ.এইচ.এফ.কে.সাদেক	যুগ্ম সচিব	লোক প্রশাসন ইন্সটিটিউট	মন্ত্রী
১৬	হাবিবুর রহমান	যুগ্ম সচিব	আইন বিভাগ	অতিরিক্ত সচিব
১৭	আব্দুল হাই	যুগ্ম সচিব	অর্থ বিভাগ	-
১৮	এ.এ নাছিম উদ্দিন	যুগ্ম সচিব	যোগাযোগ বিভাগ	সচিব
১৯	সামছুদ্দিন মিয়া	যুগ্ম সচিব	গৃহ নির্মাণ বিভাগ	-
২০	ইনাম আহমেদ চৌধুরী	যুগ্ম সচিব	শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ	প্রাইভেটাইজেশন কমিশন চেয়ারম্যান
২১	সৈয়দ হাসান আহমেদ	যুগ্ম সচিব	যোগাযোগ বিভাগ	সচিব
২২	এ. হেনা	ডেপুটি সেক্রেটারী	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	সি ই সি
২৩	এ.জেড.এম.শামসুল আলম	ডেপুটি সেক্রেটারী	সংস্থাপন বিভাগ	সচিব
২৪	কে.এ.কবির	ডেপুটি সেক্রেটারী	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	সচিব

[২৫৬] আমাদের অনুসন্ধান অনুসারে।

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৬]
২৫	এ.এইচ.এম. আব্দুল হাই	ডেপুটি সেক্রেটারী	সংস্থাপন বিভাগ	সচিব
২৬	গোলাম মাহবুব	ডেপুটি সেক্রেটারী	যোগাযোগ বিভাগ	সচিব
২৭	এফ. আহমেদ	ডেপুটি সেক্রেটারী	খাদ্য বিভাগ	-
২৮	এম. আর ওসমানী	ডেপুটি সেক্রেটারী	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	সচিব
২৯	শাহেদ লতিফ	ডেপুটি সেক্রেটারী	পরিকল্পনা বিভাগ	-
৩০	কাজী জাহেদুর রহমান	ডেপুটি সেক্রেটারী	অর্থ বিভাগ	-
৩১	এ.রহিম	ডেপুটি সেক্রেটারী	শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ	সচিব
৩২	এম.এরফান আলী	ডেপুটি সেক্রেটারী	গৃহ নির্মাণ বিভাগ	-
৩৩	মোকাম্মেল হক	ডেপুটি সেক্রেটারী	কর বিভাগ	সচিব
৩৪	লুৎফুল্লাহিল মজিদ	ডেপুটি সেক্রেটারী	বিদ্যুৎ ও সেচ বিভাগ	সচিব
৩৫	ছলিম উদ্দিন আহমেদ	ডেপুটি সেক্রেটারী	প্রশিক্ষণ একাডেমী	যুগ্মসচিব
৩৬	ইমদাদ হোসেন	সেকশন অফিসার	কৃষি বিভাগ	-
৩৭	এম ওসমান	সেকশন অফিসার	খাদ্য বিভাগ	-
৩৮	জয়নুল আবেদীন	সেকশন অফিসার	শিক্ষা বিভাগ	-
৩৯	হিমাংশু রঞ্জন দত্ত	সেকশন অফিসার	শিক্ষা বিভাগ	-
৪০	নুরুল ইসলাম	সেকশন অফিসার	খাদ্য বিভাগ	চেয়ারম্যান সেরিকালচার বোর্ড
৪১	এস.এম. ফজলুল হক চৌধুরী	সেকশন অফিসার	বিদ্যুৎ ও সেচ বিভাগ	-
৪২	এ.কে.এম.নুরুল ইসলাম	সেকশন অফিসার	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	উপসচিব
৪৩	শেখ সদর উদ্দিন মুন্সী	সেকশন অফিসার	খাদ্য বিভাগ	-
৪৪	এম.এ.কুদ্দুস	সেকশন অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ	উপসচিব
৪৫	আব্দুল হাকিম	সেকশন অফিসার	খাদ্য বিভাগ	যুগ্মসচিব
৪৬	আবুল হোসেন	সেকশন অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ	সচিব
৪৭	এ.মান্নান	সেকশন অফিসার	শিক্ষা বিভাগ	-
৪৮	এ.জেড.এম.শামছুল হক	সেকশন অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ	সচিব
৪৯	সেলিম উদ্দিন আহমেদ	সেকশন অফিসার	-	-
৫০	নওয়াব আলী	সেকশন অফিসার	-	-
৫১	মাহবুব আলী খান	সেকশন অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ	-
৫২	আনিছ উদ্দিন আহমেদ	সেকশন অফিসার	বাণিজ্য বিভাগ	-
৫৩	এ.কে.কবির উদ্দিন	সেকশন অফিসার	কর বিভাগ	-
৫৪	কেরামত আলী	চেয়ারম্যান	কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	মন্ত্রী

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৩]
৫৫	এ.এম.আনিসুজ্জামান	চেয়ারম্যান	ওয়্যার হাউজ কর্পোরেশন	-
৫৬	আব্দুর রব চৌধুরী	চেয়ারম্যান	ওয়্যার হাউজ কর্পোরেশন	সচিব
৫৭	সুলতানুজ্জামান খান	চেয়ারম্যান	জুট মিল কর্পোরেশন	সচিব
৫৮	মনওয়ারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	বন উন্নয়ন কর্পেরেশন	-
৫৯	এম.আবুল খায়ের	-	ইপিআইডিসি	সচিব
৬০	আখতার আলী	পরিচালক	ইপিআইডিসি	সচিব
৬১	সফিউদ্দিন আহমেদ	পরিচালক	কর বিভাগ	-
৬২	বদিউল আলম	পরিচালক	সমাজকল্যাণ	-
৬৩	ফরিদ উদ্দিন	পরিচালক	সরবরাহ বিভাগ	সচিব
৬৪	মোহাম্মদ আশরাফ	পরিচালক	দুর্নীতি দমন বিভাগ	-
৬৫	সুলতান মোহাম্মদ চৌধুরী	পরিচালক	সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড	-
৬৬	এ.কে.এম জালালউদ্দিন	প্রশাসক	খুলনা পৌরসভা	সচিব
৬৭	কাজী মনজুর-এ-মাওলা	প্রশাসক	খুলনা পৌরসভা	সচিব
৬৮	মোজাম্মেল হক	প্রশাসক	নারায়নগঞ্জ পৌরসভা	-
৬৯	রফিক আহমেদ	সচিব	জেলা বোর্ড, খুলনা	-
৭০	আব্দুল কাইয়ুম	সচিব	জেলা বোর্ড, পাবনা	-
৭১	হোসেন আহমেদ	সচিব	জেলা বোর্ড, রাঙামাটি	-
৭২	সৈয়দ আহমেদ	জেলা প্রশাসক	সিলেট	সচিব
৭৩	হাসান আহমেদ	জেলা প্রশাসক	ময়মনসিংহ	সচিব
৭৪	এ.টি.এম.সামছুল হক	জেলা প্রশাসক	ঢাকা/কুষ্টিয়া	মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান।
৭৫	নূরুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক	খুলনা/রাজশাহী	সচিব
৭৬	রশীদুল হাসান	জেলা প্রশাসক	রাজশাহী/খুলনা	যুগ্ম সচিব
৭৭	আমিনুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক	চট্টগ্রাম	সচিব
৭৮	খান-ই-আলম খান	জেলা প্রশাসক	বগুড়া/ নোয়াখালী	অতিরিক্ত সচিব
৭৯	মনজুরুল করীম	জেলা প্রশাসক	নোয়াখালী/ বগুড়া	সচিব
৮০	কাজী জাহেদুর রহমান	জেলা প্রশাসক	কুষ্টিয়া	যুগ্ম সচিব
৮১	আনিসুজ্জামান খান	জেলা প্রশাসক	ফরিদপুর	সচিব
৮২	আব্দুল আওয়াল	জেলা প্রশাসক	পটুয়াখালী	সচিব
৮৩	জালাল উদ্দিন আহমেদ	জেলা প্রশাসক	টাঙ্গাইল	সচিব
৮৪	নূরুন নবী চৌধুরী	জেলা প্রশাসক	কুমিল্লা	সচিব

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৬]
৮৫	শামীম আহসান	জেলা প্রশাসক	রংপুর	সচিব
৮৬	শামসুদ্দিন মিয়া	জেলা প্রশাসক	নোয়াখালী	যুগ্ম সচিব
৮৭	হাবিবুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক	দিনাজপুর	যুগ্ম সচিব
৮৮	নাজমুল আবেদীন খান	জেলা প্রশাসক	পাবনা	যুগ্ম সচিব
৮৯	আব্দুল ফজল চৌধুরী	জেলা প্রশাসক	যশোর	সচিব
৯০	মোস্তাফিজুর রহমান	জেলা প্রশাসক	চট্টগ্রাম	-
৯১	আনোয়ার মাসুদ	এ ডি সি	টাঙ্গাইল	-
৯২	ফরাস উদ্দিন	এ ডি সি	ময়মনসিংহ	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৯৩	এইচ এন আশিকুর রহমান	এ ডি সি	টাঙ্গাইল	উপ সচিব (পদত্যাগী)
৯৪	এ এইচ মোফাজ্জল করিম	এ ডি সি	কুমিল্লা	সচিব
৯৫	আব্দুর রশীদ	এ ডি সি	সিলেট	সচিব
৯৬	মহিউদ্দিন খান আলমগীর	এ ডি সি	ময়মনসিংহ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
৯৭	আব্দুল হাকিম	এ ডি সি	পাবনা	সচিব
৯৮	আবুল হাসেম	এ ডি সি	ঢাকা	সচিব
৯৯	মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ	এ ডি সি	ঢাকা	সচিব
১০০	মশিউর রহমান	এ ডি সি	চট্টগ্রাম	প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
১০১	ইকরামুল হক	এ ডি সি	বরিশাল	সচিব
১০২	মাহে আলম	এ ডি সি	চট্টগ্রাম	সচিব
১০৩	শফিউর রহমান	এ ডি সি	বরিশাল	সচিব
১০৪	শফি সামী	এ ডি সি	খুলনা	সচিব
১০৫	শহীদ হোসেন	এ ডি সি	খুলনা	সচিব
১০৬	এম সামসুদ্দিন	এ ডি সি	খুলনা	উপ সচিব
১০৭	মোশাররফ হোসেন তালুকদার	এ ডি সি	নোয়াখালী	-
১০৮	এম আর চৌধুরী	এ ডি সি	পাবনা	-
১০৯	মোজাম্মেল হক	এ ডি সি	রাজশাহী	-
১১০	ইনামুল হক	এ ডি সি	যশোর	সচিব
১১১	শওকত আলী	এ ডি সি	সিলেট	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
১১২	এম.আলীমুজ্জামান	মহকুমা প্রশাসক	সিরাজগঞ্জ	যুগ্ম সচিব
১১৩	আব্দুল হালিম	মহকুমা প্রশাসক	দিনাজপুর	-
১১৪	আব্দুস সাত্তার	মহকুমা প্রশাসক	ঠাকুরগাও	-

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[১৫৬]
১১৫	ফারুক আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	ঠাকুরগাও	-
১১৬	আমিন উদ্দিন চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	নীলফামারী	সচিব
১১৭	এম মারগুব মোর্শেদ	মহকুমা প্রশাসক	নওগা	সচিব
১১৮	আব্দুল আজিজ	মহকুমা প্রশাসক	নওগা	উপ সচিব
১১৯	সামছুল হুদা	মহকুমা প্রশাসক	রংপুর সদর	-
১২০	আব্দুর রহিম(২)	মহকুমা প্রশাসক	রংপুর সদর	উপ সচিব
১২১	আব্দুর রহিম চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	কুড়িগ্রাম	যুগ্ম সচিব
১২২	নজরুল ইসলাম	মহকুমা প্রশাসক	পাবনা সদর	উপ সচিব
১২৩	সিদ্দিকুর রহমান	মহকুমা প্রশাসক	সিরাজগঞ্জ	উপ সচিব
১২৪	আব্দুল জব্বার	মহকুমা প্রশাসক	নাটোর	উপ সচিব
১২৫	খান গোলাম বাকী	মহকুমা প্রশাসক	কুষ্টিয়া সদর	উপ সচিব
১২৬	এম এম আবু বকর	মহকুমা প্রশাসক	রাজশাহী সদর	-
১২৭	এ বি এম আব্দুস শাকুর	মহকুমা প্রশাসক	বান্দরবান/ রাঙামাটি	অতিরিক্ত সচিব
১২৮	মাহবুব হোসেন খান	মহকুমা প্রশাসক	গাইবান্ধা	যুগ্ম সচিব
১২৯	জিয়াউদ্দিন মো: চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	চাঁদপুর	যুগ্ম সচিব
১৩০	এম এইচ খান	মহকুমা প্রশাসক	রাজশাহী সদর	-
১৩১	আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	নীলফামারী	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
১৩২	কে এম ইজাজুল হক	মহকুমা প্রশাসক	বাগেরহাট	অতিরিক্ত সচিব
১৩৩	আকমল হোসেন	মহকুমা প্রশাসক	মেহেরপুর	অতিরিক্ত সচিব
১৩৪	বজলুর রহমান চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	চুয়াডাঙ্গা	অতিরিক্ত সচিব
১৩৫	এ কে এম রুহুল আমীন	মহকুমা প্রশাসক	পার্বত্য চট্টগ্রাম	উপ সচিব
১৩৬	খোরশেদ আলম	মহকুমা প্রশাসক	ফরিদপুর	উপ সচিব
১৩৭	আব্দুল হাই খন্দকার	মহকুমা প্রশাসক	নারায়ণগঞ্জ	যুগ্ম সচিব
১৩৮	মোহাম্মদ নাসিম	মহকুমা প্রশাসক	বাগেরহাট	যুগ্ম সচিব
১৩৯	ইসমাইল হোসেন	মহকুমাপ্রশাসক	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সচিব
১৪০	এম সিরাজুল ইসলাম	মহকুমা প্রশাসক	মেহেরপুর	যুগ্ম সচিব
১৪১	সাইফুল হক	মহকুমা প্রশাসক	চুয়াডাঙ্গা	-
১৪২	এম মুছা	মহকুমা প্রশাসক	যশোর সদর	-
১৪৩	আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	ঝিনাইদহ	যুগ্ম সচিব
১৪৪	মতিউর রহমান	মহকুমা প্রশাসক	মাগুরা	যুগ্ম সচিব

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৬]
১৪৫	আব্দুল করিম	মহকুমা প্রশাসক	নড়াইল	-
১৪৬	আবদুল হালিম	মহকুমা প্রশাসক	নড়াইল	-
১৪৭	খন্দকার সাইফুল ইসলাম	মহকুমা প্রশাসক	খুলনা সদর	-
১৪৮	কাজী শামছুল হুদা	মহকুমা প্রশাসক	খুলনা সদর	-
১৪৯	শাহজাহান আলী	মহকুমা প্রশাসক	সাতক্ষীরা	-
১৫০	এনায়েত হোসেন	মহকুমা প্রশাসক	ফরিদপুর	-
১৫১	খুরশীদ আলম	মহকুমা প্রশাসক	ফরিদপুর সদর	-
১৫২	এ রাজ্জাক মজুমদার	মহকুমা প্রশাসক	মাদারীপুর	-
১৫৩	আব্দুল মতিন	মহকুমা প্রশাসক	মাদারীপুর	-
১৫৪	হাবিবুদ্দিন আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	গোয়ালন্দ	-
১৫৫	ফজলুল ওয়াহেদ	মহকুম প্রশাসক	গোয়ালন্দ	-
১৫৬	এস খাজা আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	বরিশাল সদর(উ)	-
১৫৭	আব্দুর রহিম	মহকুমা প্রশাসক	বরিশাল সদর(উ)	-
১৫৮	আব্দুল হাই	মহকুমা প্রশাসক	পটুয়াখালী	-
১৫৯	এম আনোয়ার হোসেন	মহকুমা প্রশাসক	বরগুনা	-
১৬০	আব্দুল হাই	মহকুমা প্রশাসক	ঢাকা সদর (দ)	-
১৬১	নূরুজ্জামান	মহকুমা প্রশাসক	ঢাকা সদর (উ)	-
১৬২	বাহাদুর মুন্সী	মহকুমা প্রশাসক	মানিকগঞ্জ	যুগ্ম সচিব
১৬৩	দেওয়ান আবুল কাদির	মহকুমা প্রশাসক	টাঙ্গাইল	-
১৬৪	জি এম মাওলা	মহকুমা প্রশাসক	ময়মনসিংহ (দ)	-
১৬৫	এম এন আনোয়ার	মহকুমা প্রশাসক	ময়মনসিংহ (উ)	-
১৬৬	এম মুনিরুজ্জামান	মহকুমা প্রশাসক	ময়মনসিংহ (উ)	-
১৬৭	এম এ কাশেম	মহকুমা প্রশাসক	কুমিল্লা সদর(দ)	-
১৬৮	মঈনুদ্দিন আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	কুমিল্লা সদর (দ)	-
১৬৯	এম ইসলাম চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	কুমিল্লা সদর (উ)	-
১৭০	মোহাম্মদ হোসেন	মহকুমাপ্রশাসক	সিলেট সদর	-
১৭১	এ জেড এম ওয়াহিদুজ্জামান	মহকুমা প্রশাসক	হবিগঞ্জ	-
১৭২	সুলতান আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	যশোর সদর	-
১৭৩	হারুনুর রশীদ	ডেপুটি ডাইরেক্টর	রাজশাহী	-
১৭৪	নজরুল ইসলাম	ডেপুটি ডাইরেক্টর	খুলনা	-
১৭৫	সাদাত হোসেন	অতিরিক্ত কমিশনার	রাজশাহী বিভাগ	অতিরিক্ত সচিব

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৬]
১৭৬	আইয়ুব কাদরী	সহকারী কমিশনার	পটুয়াখালী	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
১৭৭	ফয়সাল মফিজুর রহমান	সহকারী কমিশনার	ঢাকা	-
১৭৮	সাইফুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার	বগুড়া	সচিব
১৭৯	এ বি এম হক	সহকারী কমিশনার	-	-
১৮০	ফজলুর রহমান	সহকারী কমিশনার	রংপুর	সচিব
১৮১	আজাদ রুহুল আমীন	সহকারী কমিশনার	সিলেট	সচিব
১৮২	আমিনুর রহমান	সহকারী কমিশনার	নোয়াখালী	সচিব
১৮৩	আকমল হোসেন	সহকারী কমিশনার	গাইবান্ধা	সচিব
১৮৪	ওমর ফারুক	সহকারী কমিশনার	চট্টগ্রাম	সচিব
১৮৫	বদিউর রহমান	সহকারী কমিশনার	রংপুর	সচিব
১৮৬	কে এম আশফাকুর রহমান	সহকারী কমিশনার	ঢাকা	কাউন্সিলর
১৮৭	মাহফুজুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার	ফরিদপুর	সচিব
১৮৮	মাহবুব কবির	সহকারী কমিশনার	চট্টগ্রাম	সচিব
১৮৯	শহীদুল আলম	সহকারী কমিশনার	যশোর	সচিব
১৯০	মাহবুব হোসেন খান	সহকারী কমিশনার	রাজশাহী	যুগ্ম সচিব
১৯১	মো: আলাউদ্দিন	সহকারী কমিশনার	ঢাকা	প্রবাসী
১৯২	ইকবাল সোবহান	সহকারী কমিশনার	নোয়াখালী	প্রবাসী
১৯৩	সৈয়দ আমিনুর রহমান	সহকারী কমিশনার	নোয়াখালী	সচিব
১৯৪	এম আহমেদ	-	সিলেট	-
১৯৫	হাবিবুর রহমান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব
১৯৬	কে ফজলুর রহমান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুমিল্লা	উপ সচিব
১৯৭	এ জেড এম রফিক ভূইয়া	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	সিলেট	অতিরিক্ত সচিব
১৯৮	আব্দুল মতিন আকন্দ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ	-
১৯৯	এ জে শামসুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	অতিরিক্ত কমিশনার
২০০	গোলাম মর্তুজা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	যুগ্ম সচিব
২০১	এস এম শামসুল আলম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	যুগ্ম সচিব
২০২	জামাল উদ্দিন আহমেদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	সিলেট	উপ সচিব
২০৩	দাউদ উজ জামান চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নোয়াখালী	যুগ্ম সচিব
২০৪	এ এইচ এম সাদেকুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	টাঙ্গাইল	যুগ্ম সচিব
২০৫	মোশারফ হোসেন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বরিশাল	একান্ত সচিব

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৬]
২০৬	এ এস এম আব্দুল হালিম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বগুড়া	কেবিনেট সচিব
২০৭	আবু আবদুল্লাহ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুষ্টিয়া	-
২০৮	আব্দুর রাজ্জাক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	টাঙ্গাইল	উপ সচিব
২০৯	আব্দুর রব খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	অতিরিক্ত সচিব
২১০	এ এস এম রেজা-ই রাব্বী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম	অতিরিক্ত সচিব
২১১	সাইফুদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুমিল্লা	যুগ্ম সচিব
২১২	নজরুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	অতিরিক্ত সচিব
২১৩	কে এম শহীদুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	পরিচালক
২১৪	নাজমুল আলম সিদ্দিকী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	যশোর	সচিব
২১৫	এম আশরাফ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নোয়াখালী	যুগ্ম সচিব
২১৬	আব্দুর রশীদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	অতিরিক্ত সচিব
২১৭	মোস্তাফিজুর রহমান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	উপ সচিব
২১৮	বদরে আলম খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রংপুর	যুগ্ম সচিব
২১৯	আবুল হাশেম খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	খুলনা	অতিরিক্ত সচিব
২২০	লুৎফুর রহমান চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	যুগ্ম সচিব
২২১	জুলফিকার হায়দার চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ	অতিরিক্ত সচিব
২২২	তারাচাঁদ চাকমা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম	ডেপুটি ডাইরেক্টর
২২৩	এম আব্দুল লতিফ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বরিশাল	জেলা প্রশাসক
২২৪	খান সাহাব উদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	খুলনা	কমিশনার
২২৫	ইয়াকুব আলী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	অতিরিক্ত কমিশনার
২২৬	এম কামাল উদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রংপুর	উপ সচিব
২২৭	এম আব্দুস সাত্তার	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	অতিরিক্ত কমিশনার
২২৮	এ রশীদ খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুষ্টিয়া	পরিচালক
২২৯	রুস্তম আলী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	-	
২৩০	নুরুল আমীন পাটোয়ারী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ	পরিচালক
২৩১	মোদাচ্ছের আলী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নোয়াখালী	উপ সচিব
২৩২	এম নুরুন নবী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	অতিরিক্ত সচিব
২৩৩	এম আবুল কাসেম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রংপুর	যুগ্ম সচিব
২৩৪	আব্দুল হালিম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	খুলনা	অতিরিক্ত সচিব
২৩৫	কে এম মহিউদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুমিল্লা	-
২৩৬	মনসুরুদ্দিন আহমেদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	দিনাজপুর	-

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৬]
২৩৭	আজমল চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব
২৩৮	জালালউদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	উপ সচিব
২৩৯	আহ্বাব আহমেদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব
২৪০	আনোয়ারুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	যুগ্ম সচিব
২৪১	সিরাজুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নওগা	যুগ্ম সচিব
২৪২	এ এন এম হাফিজুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	অতিরিক্ত সচিব
২৪৩	আজিজ আহমেদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুষ্টিয়া	অতিরিক্ত সচিব
২৪৪	হুমায়ূন কবির	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব
২৪৫	ওবায়দুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	যুগ্ম সচিব
২৪৬	এ এফ এম ইমাম হোসেন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ	যুগ্ম সচিব
২৪৭	রফিকুল ইসলাম ভূইয়া	-	-	-
২৪৮	সৈয়দ খায়রুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নাটোর	যুগ্ম সচিব
২৪৯	নুরুজ্জামান মিয়া	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	দিনাজপুর	যুগ্ম সচিব
২৫০	মোশাররফ হোসেন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বরিশাল	অতিরিক্ত সচিব
২৫১	খাদেমুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী/ দিনাজপুর	যুগ্ম সচিব
২৫২	আজিজুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	যুগ্ম সচিব
২৫৩	তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	অতিরিক্ত সচিব
২৫৪	একরামুল্লাহ চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	যুগ্ম সচিব
২৫৫	খোরশেদ আনসার খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম	অতিরিক্ত সচিব
২৫৬	মোহাম্মদ নুরুন নবী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	যুগ্ম সচিব
২৫৭	শরদিন্দু শংকর চাকমা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম	অতিরিক্ত সচিব
২৫৮	রফিকুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	যুগ্ম সচিব
২৫৯	সৈয়দ মুনির উদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব
আমাদের অনুসন্ধানে আরো যাদের নাম পাওয়া গিয়েছে				
২৬০	এ জেড এম নাসিরউদ্দিন	উপ সচিব	ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সচিব
২৬১	আতাউল হক	উপ সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২৬২	এম এ মালেক	উপ-সচিব	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সচিব
২৬৩	সৈয়দ আহমেদ	জেলা প্রশাসক	সিলেট	সচিব
২৬৪	মুহাম্মদ ফয়জুর রাজ্জাক	অতিঃ জেলা প্রশাসক	ময়মনসিংহ	সচিব
২৬৫	এম কে আনোয়ার			মন্ত্রী
২৬৬	ড. মোঃ আব্দুর রশিদ	অতিঃ জেলা প্রশাসক	সিলেট	সচিব

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	পদবী	কর্মস্থল	সর্বশেষ অবস্থান/ পদবী[২৫৬]
২৬৭	ড. এ টি এম শামসুল হুদা	অতিঃ জেলা প্রশাসক	ময়মনসিংহ	প্রধান নির্বাচন কমিশনার
২৬৮	মোহাম্মদ মাহে আলম	অতিঃ জেলা প্রশাসক	চট্টগ্রাম	সচিব
২৬৯	আব্দুল আওয়াল	জেলা প্রশাসক	পটুয়াখালী	
২৭০	জগন্নাথ দে	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	সচিব
২৭১	মঞ্জুরুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রংপুর	অতিরিক্ত সচিব
২৭২	বদিউজ্জামান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	সিলেট	অতিরিক্ত সচিব
২৭৩	মোঃ নাজমুল ইসলাম চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	দিনাজপুর	অতিরিক্ত সচিব
২৭৪	সৈয়দ আব্দুর রশিদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	অতিরিক্ত সচিব
২৭৫	হিরা লাল বালা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	সচিব
২৭৬	আব্দুল কাদের মুন্সী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	অতিরিক্ত সচিব
২৭৭	মোল্লা মোঃ আব্দুল মতিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	সিলেট	অতিরিক্ত সচিব
২৭৮	মোঃ সফিউদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	সচিব
২৭৯	নুরুল ইসলাম অনু	টিক্কা খানের পি এস		শেখ মুজিবের পি এস। বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেতা ও ব্যাংক এশিয়ার ভাইস চেয়ারম্যান

টেবিল ২.১৩

পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অফিসারদের তালিকা

নাম	পদবী	অবস্থান	সর্বশেষ পদবী
মনজুর আহমেদ চৌধুরী	মিনিষ্টার	প্যারিস	অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব
এ এইচ এস আতাউল করিম	প্রথম সচিব	রোম	সচিব
ফারুক আহমেদ চৌধুরী	ডাইরেক্টর	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র সচিব
এ কে এইচ মোরশেদ	প্রথম সচিব	অটোয়া	চেয়ারম্যান বি আই এস এস
রিয়াজ রহমান	প্রথম সচিব	নতুন দিল্লী	পররাষ্ট্র সচিব
ফারুক রহমান	প্রথম সচিব	প্যারিস	রাষ্ট্রদূত
আবদুল মোমেন চৌধুরী	৩য় সচিব	দারেস সালাম	রাষ্ট্রদূত
খুরশীদ হামিদ	৩য় সচিব	বেইজিং	রাষ্ট্রদূত
মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ	৩য় সচিব	জাকার্তা	রাষ্ট্রদূত
এ কে এম ফারুক	৩য় সচিব	ব্যাংকক	রাষ্ট্রদূত
আহমেদ তারেক করিম	৩য় সচিব	তেহরান	রাষ্ট্রদূত
জিয়াউস সামাদ চৌধুরী	৩য় সচিব	ক্যানেবেরা	রাষ্ট্রদূত
এস এম রাশেদ আহমেদ	৩য় সচিব	বেলগ্রেড	ডাইরেক্টর জেনারেল
মোহাম্মদ জমির	৩য় সচিব	কায়রো	ডাইরেক্টর
আজিজুল হক চৌধুরী	৩য় সচিব	লন্ডন	কাউন্সিলর

www.pathagar.com

নাম	পদবী	অবস্থান	সর্বশেষ পদবী
মাহবুব আলম	৩য় সচিব	রোম	রাষ্ট্রদূত
তোফায়েল করিম হায়দার	৩য় সচিব	বন	রাষ্ট্রদূত
রেয়াজুল হোসেন	৩য় সচিব	মস্কো	যুগ্ম সচিব
মোতাহর হোসেন	৩য় সচিব	প্যারিস	ডেপুটি হাই কমিশনার
জামিল মজিদ	৩য় সচিব	প্যারিস	
কামাল উদ্দিন আহমেদ	রাষ্ট্রদূত	প্রাগ	পাকিস্তানে অবস্থানরত
এস মোতাহার হোসেন	রাষ্ট্রদূত	টোকিও	পাকিস্তানে অবস্থানরত
সলিমুজ্জামান	ডেপুটি হাই কমিশনার	লন্ডন	পাকিস্তানে অবস্থানরত
আজহারুল ইসলাম চৌধুরী	ট্রেড কমিশনার	হংকং	-
এল মাসুদ	রাষ্ট্রদূত	ব্রাসেলস	
হুমায়ুন খান পন্নী	রাষ্ট্রদূত	ইরাক	ডেপুটি স্পীকার জাতীয় সংসদ
নাছের আহমেদ	তৃতীয় সচিব	জাপান	-
মুফলেহ আর ওসমানী	কর্মকর্তা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র সচিব
আমিনুল ইসলাম	দ্বিতীয় সচিব	কুয়ালালামপুর	রাষ্ট্রদূত

বিহারি জনগোষ্ঠী

১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বর, অক্টোবরের ভারতে বিহারি হত্যাযজ্ঞে প্রায় ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) বিহারি মুসলিমকে হত্যা করা হলে বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, ত্রিপুরা এবং সিকিম থেকে হাজার হাজার উর্দূভাষী মানুষ এ দেশে চলে আসে। এরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তথা সুবে বাংলার অধিবাসী ছিলেন। আর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত সুবে বাংলার শেষ স্বাধীন সুবেদার ছিলেন নবাব সিরাজুদ্দৌলা। পূর্ব বাংলা মুসলমান নিয়ন্ত্রিত স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ হওয়ায় জীবনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বিহারের বিহারি এবং উড়িষ্যার অচ্ছ্যুতদের[২৫৭] অনেকেই ভারতে তাদের সকল সহায় সম্পদ ফেলে নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে পূর্ব অংশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। অচ্ছ্যুতরা উড়িয়া ভাষা বা 'খিচুরি উর্দূতে' কথা বলতো, অনেকেই এদেরকেও বিহারি হিসাবে গণ্য করতো। হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত এসব মানুষেরা অতীত জীবনের অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় ফিরে যেতে চাননি বলেই তাদের অধিকাংশ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন বা মৌন থেকেছেন; ব্যতিক্রমী কিছু সংখ্যক স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণও করেছেন।[২৫৮]

---

২৫৭ অচ্ছ্যুতরা মুসলিম নন কিন্তু উড়িয়া ভাষা বা 'খিচুরি উর্দূতে' কথা বলতো। হিন্দুদের দ্বারা এরা তখনও নিগৃহীত ছিল এখনও নিগৃহীত। এরা বাঁচার তাগিদে এ দেশে চলে আসেন।

২৫৮ কালের কণ্ঠ, তারিখঃ ১৫.১২.২০০৯

www.pathagar.com

পার্বত্য উপজাতি

সকল উপজাতি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করে। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়[২৫৯] পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যই শুধু দেখাননি, তিনি পাক সামরিক বাহিনীকে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যান[২৬০] এবং বাংলাদেশ হবার পরও পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানেই মৃত্যু বরণ করেন। এইচ টি ইমাম যদিও বলেন "বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী চাকমা ব্যতীত বেশির ভাগ উপজাতিও এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়"।[২৬১] কিন্তু মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর সাক্ষাৎকারে বলেন,"Phantom of Chittagong the 5th Army in Bangladesh বইয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্বপালনরত ভারতীয় স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জেনারেল এস এস ওবান, যিনি পরে তৎকালে মুজিব বাহিনী ও রক্ষী বাহিনীকে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, বৌদ্ধ, চাকমা উপজাতিরা সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। কিছু মিজু উপজাতি একাত্তরে পাকিস্তানী সেনাদের সহায়তা করেছে। তাদের রাজা ত্রিদিব রায় তৎকালীন পাকিস্তানে মন্ত্রী পর্যায়ে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি তার সমর্থকদের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বারবার বলেছেন।"[২৬২]

আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও বুমাং উপজাতি নেতা আউং শু প্রু চৌধুরী পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ডাঃ মালেক মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। এস এস চাকমা[২৬৩] তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন "মন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন পরে আউং শু প্রু চৌধুরী কক্সবাজার আসেন। তার সঙ্গে ছিল একটি কমান্ডো বাহিনী ও তার দুই বড় ছেলে। হিলটপ সার্কিট হাউজে চা-নাস্তা খাওয়া এবং অধিকাংশ অভ্যর্থনাকারীগণ চলে যাওয়ার পর আমি ও এসডিও, তৎকালীন মুন্সেফ নাঈম উদ্দিন আহমদ (পরবর্তীতে হাইকোর্টের বিচারপতি) এবং আরো দু'একজন মন্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছিলাম। গল্পের এক পর্যায়ে আমি তার কাছে গিয়ে খুব নিচুস্বরে বলি যে, আর কিছুদিন পরতো পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে, আপনি কেন এ সময় মন্ত্রী হলেন। আমার কথা শুনে তিনি অনেকটা চিৎকার করে বলেন, আপিনি কী বলেন, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে ? পাকিস্তান ভারত যুদ্ধে কি ভারত জিতবে বলে মনে করেন? তারপর তার সাথে আসা কমান্ডো বাহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, এরকম কমান্ডো বাহিনীর সঙ্গে কি ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধে জিতবে আপনি মনে করেন ইত্যাদি।"[২৬৪]

---

২৫৯ রাজা ত্রিদিব রায় বর্তমান চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়ের পিতা।

২৬০ www.liberationwarmuseum.org/ in this day/ April 15 , 1971 accessed on 14.11.2011

২৬১ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ৫৬

২৬২ মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, সাপ্তহিক জনতার চোখ; তারিখঃ ০৫.০২.২০০৯

২৬৩ এস এস চাকমা (শরদিন্দু শংকর চাকমা) ১৯৭১ সনে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে চাকরি জীবন শেষ করেন।

২৬৪ স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম, এস এস চাকমা, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ; পৃঃ ৩১৫

www.pathagar.com

উপজাতিরা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখেও বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেয়নি। www.thedailystar.net এ বলা হয়,"Some Bihari (paramilitary) gangs and other elements were active in pockets of Dhaka (Mirpur), North Bengal and Chittagong Hill Tracts until February 1972 and after 'negotiation' surrendered their arms."[২৬৫]

(কিছু বিহারি প্যারামিলিটারী বাহিনী এবং অন্যান্য শক্তি ঢাকা শহরের কিছু কিছু এলাকায় যেমন, মিরপুর, উত্তরবঙ্গ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পর তারা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজী হয়।)

পার্বত্য জেলা সমূহের সকল উপজাতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এতটাই বিরোধী ছিল যে, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী ও তার সহায়তাকারী বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করলেও তারা এ ঘটনায় নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি। পরবর্তীতে তারা যে সকল শর্তে আত্মসমর্পণ করে–

১. স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য উপজাতিসমূহের কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না।
২. বাঙালিরা যাতে তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য ভারতীয় বাহিনীকে তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।
৩. তাদের রাজ পরিবার সমূহের উপর কোন আক্রমণ করা যাবে না বা তাদের মর্যাদা বিনষ্ট করা যাবে না।
৪. নাগা ও মিজো দমনের নামে ভারতীয় বাহিনী কোন উপজাতি সদস্যকে হয়রানী করতে পারবে না।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেন, তারা তাদের সদস্য পদ হারালেও উল্লেখিত চুক্তির ফলে বুমাং উপজাতি নেতা আউং শু প্রু চৌধুরী যিনি আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন তার পদ বহাল রাখা হয়। তাছাড়া "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তাকে (চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়) ফিরিয়ে আনার জন্য তার মা বিনীতা রায়কে নিউইর্য়কে পাঠিয়েছিলেন। ত্রিদিব রায় তখন জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ত্রিদিব রায় দেশে ফেরৎ আসতে অস্বীকার করেন।"[২৬৬]

Amnesty International Document এ Bangladesh: Human rights in the Chittagong Hill Tracts নিবন্ধে দেখা যায় যে, উপজাতি নেতৃবৃন্দ ১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের মৌলিক চারটি দাবী পেশ করেন; তা হলো ---

"In February 1972, a tribal delegation called on Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman to accept four basic demands --

---

২৬৫ http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=117851 accessed on 02.06.2011

২৬৬ স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম, এস এস চাকমা, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ; পৃঃ ৩২১

www.pathagar.com

1. autonomy for the Chittagong Hill Tracts, together with provisions for a separate legislative body;
2. retention of the provision of the 1900 Regulation in the Bangladesh Constitution which allowed a form of self government;
3. the continuation of the offices of the traditional tribal chiefs;
4. a constitutional provision restricting amendment of the 1900 Regulation; and the imposition of a ban on the influx of non-tribals into the area."[২৬৭]

(১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে চারটি মৌলিক দাবী নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। দাবীগুলো হলো ঃ

(১) চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের জন্য আলাদা আইন পরিষদের সুযোগ রেখে এ অঞ্চলকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান,
(২) ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের বিধি-বিধান সংরক্ষণ করে স্ব-শাসিত সরকার গঠনের সুযোগ প্রদান,
(৩) উপজাতি প্রধানদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা এবং
(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০ সনের রেগুলেশন সংরক্ষণার্থে সংবিধানে ধারা সংযোজনসহ এ অঞ্চলে অউপজাতিদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা।)

আল বদর, আল শামস্ ও মুজাহিদ বাহিনী

আল বদর, আল শামস্ ও মুজাহিদ বাহিনী সরকারের আইন দ্বারা গঠিত রাজাকার বাহিনীর মত কোন স্বীকৃত বাহিনী ছিলনা। পাকিস্তান সরকার বা প্রাদেশিক সরকার এ প্রতিষ্ঠান গঠন করেনি। পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য সরকারকে সমর্থন করে জামায়াতে ইসলামী। অভিযোগ রয়েছে এ দলটি আল বদর গঠন করে। কারো কারো মতে জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা আশরাফ হোসেন এর প্রতিষ্ঠাতা।[২৬৮] অভিযোগ রয়েছে যে নেজামে ইসলামী আল শামস্[২৬৯] এবং বিহারিরা মুজাহিদ[২৭০] নামে বেসরকারী বাহিনী গঠন করে।

আল বদর, আল শামস্ ও মুজাহিদের সদস্য সংখ্যা কত ছিল তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান কোন সরকারই প্রকাশ করেনি। 'দৈনিক সংগ্রামে' আল বদরের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশ করে; যা থেকে ধারণা করা হয় যে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি বড় আকার ধারণ করেছিল। মূলতঃ এর সদস্য সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশ') এর উপর ছিলনা; War Crimes Fact Finding Committee (WCFFC) তার website-এ এর সদস্যের নাম প্রকাশ করেছে; তবে একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার লিপিবদ্ধ হওয়াতে মূলতঃ এ সংখ্যা দাড়ায় ৪৬ (ছেচল্লিশ)। অন্যদিকে আল শামস্ ও মুজাহিদ নিয়ে অতীতে বা বর্তমানে কোন আলোচনা না থাকায় এ বিষয়ে কারো কোন চিন্তা ভাবনা নেই। এদের সংখ্যা সম্পর্কে তাই কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

---

২৬৭ http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA13/001/2000/en/a40d7d31-df83-11dd-8abb-118b2e919ec0/sa1 30012000en.html accessed on 02.06.2011

২৬৮ http://shahinbdpolitics.blogspot.com/2009/07/bangladesh-jamaat-e-islami.html accessed on 01.08.2012

২৬৯ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্ষ ও বিপক্ষ, শাহরিয়ার কবির; পৃঃ ১২১

২৭০ Sun Set at Midday, Mohiuddin Chowdhury

www.pathagar.com

অধ্যায় : তিন

স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি

মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতি ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সরাসরি অংশগ্রহণ

পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য যত বেশী তৎপরতা চালানো হয় সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও জনাতঙ্ক ততই বৃদ্ধি পায়। তরুণদের কেউ জীবনের নিরাপত্তার সন্ধানে কেউ বা দেশকে স্বাধীন করার উদ্দীপনা নিয়ে ভারতে পাড়ি জমান। দেশে যারা রয়ে যান তারাও আতঙ্ক আর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন। মানুষের স্বাভাবিক আচরণের অংশ হিসেবেই তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আত্মিক রায় প্রদান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করার বিপরীতে পাকিস্তান বাহিনীকে অসহযোগিতা ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা প্রায় প্রতিটি মানুষের আচরণে দেখা যায়। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ পরিচালনার সকল সহায়ক উপাদান মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটাতে ভূমিকা রাখে। সকল গেরিলা যুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ এবং সাহস বৃদ্ধি করে, বিপরীতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে হতাশা সৃষ্টি করে।

ভারতীয় সামরিকবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীতে কর্মরত RAW এর এজেন্ট, মুক্তিযোদ্ধা ও সে দেশে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের মাধ্যমে এ অঞ্চলের সার্বিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করে। সামগ্রিক পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার পর তারা এ যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণের দিনক্ষণ ঠিক করেন। অক্টোবর ৭১ এর শেষ প্রান্তে মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত সকল বাহিনী তথা মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী ইত্যাদির কমান্ড ভারতীয় বাহিনী গ্রহণ করে এবং জেনারেল ওসমানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও যৌথবাহিনী গঠন করে।[২৭১] ভারতীয় বাহিনী সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে দখলদার সৈন্যদেরকে পরিশ্রান্ত ও হতোদ্যম করে তোলার পর মুক্তিবাহিনীর আট মাসের দীর্ঘ সংগ্রামকে চূড়ান্তভাবে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে ৪ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় স্থলবাহিনীর সম্মুখ অভিযান শুরু হয় চারটি অঞ্চল থেকে–

১. পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিন ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ৪র্থ কোর সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা-নোয়াখালী অভিমুখে

২. উত্তরাঞ্চল থেকে দু' ডিভিশনের সমবায়ে গঠিত ৩৩তম কোর রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া অভিমুখে

---

২৭১ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ১২৭

www.pathagar.com

৩. পশ্চিমাঞ্চলে থেকে দু' ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ২য় কোর যশোর-কুষ্টিয়া-খুলনা-ফরিদপুর অভিমুখে এবং

৪. মেঘালয় রাজ্যের তুরা থেকে ডিভিশনের চাইতে ছোট আর একটি বাহিনী জামালপুর-ময়মনসিংহ অভিমুখে।[২৭২]

এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভারতের বিমান ও নৌশক্তি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচ্ছন্ন কিন্তু সদা-তৎপর সহযোগিতা এবং স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সক্রিয় সমর্থন। এই সমুদয় শক্তির সংমিশ্রণ ও সমন্বিত আক্রমণ বাংলাদেশে পাকিস্তানী আধিপত্য স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলোপ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। বস্তুত যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ মিলিত বাহিনীর বিজয় সম্পর্কে কোন মহলেই সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি প্রদান

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে তৃতীয় দফা যুদ্ধ শুরু হয়। ৪ ডিসেম্বর সিকিম[২৭৩] বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি জানায়। ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতীয় পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেন।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ

১৯৭১ এর অক্টোবরের নজরুল-ইন্দিরা চুক্তির দ্বিতীয় ২য় দফায় উল্লেখ ছিল যে, বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী মিলে একটি যৌথ কমান্ডের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হবে। ভারতের সেনাপ্রধান উক্ত যৌথ কমান্ডের প্রধান হবেন এবং তার কমান্ড অনুসারে যুদ্ধে শামিল হওয়া বা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সে অনুসারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল বাহিনী (সামরিক বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী, মুক্তি ফৌজ, মুজিব বাহিনীসহ অন্যান্য আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী) কার্যতঃ ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী[২৭৪] যাকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়, তাকে ভারতীয় একজন লেঃ জেনারেলের (অরোরা) অধীনে কমান্ড গ্রহণ করতে হয়।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে তৃতীয় দফায় যুদ্ধ বাধে[২৭৫]। পূর্বের দু'দফা যুদ্ধে ভারতের মনোবল দুর্বল থাকলেও এবার তার মনোবল

---

[২৭২] মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ১৬২

[২৭৩] সিকিম তখন স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। ১৯৭৪ সনে ভারত তার সংবিধানে ৩৬তম সংশোধনীতে সিকিমকে তার অঙ্গরাজ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সনের ১০ এপ্রিল ভারত তা দখল করে নেয়। সিকিম ভারতের একটি প্রদেশের মর্যাদা পাওয়াতে ভারতকেই সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

[২৭৪] যিনি ছিলেন ১৯৭০ সনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সিলেট-৬ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য এবং যাকে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের একজন মন্ত্রী পদমর্যাদা দেয়া হয়।

[২৭৫] ১৯৪৮-এ প্রথম দফা, ১৯৬৫ সনে দ্বিতীয় দফা এবং ১৯৯৯ সনে চতুর্থ দফা।

www.pathagar.com

ছিল তুঙ্গে। যুদ্ধের কৌশলগত দিক দিয়ে ভারত ছিল অগ্রগামী। পাকিস্তান বাহিনীকে যে সকল কারণে পরাজিত হতে হয়--

১. সাধারণ মানুষ পাকিস্তানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন এবং ভারতের সহযোগিতার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়া।

২. অবস্থানগত কারণে রণ-সরঞ্জামসহ সকল সরবরাহ লাইন বন্ধ হয়ে যাওয়া।

৩. তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও শাসকদের প্রতি আস্থাহীনতা।

৪. পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে ব্যাপকহারে ভারতীয় RAW এর এজেন্ট সৃষ্টি।

অক্টোবর ৭১ থেকে ঢাকা শহরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেয় এবং মাঝে মধ্যে গেরিলা আক্রমণ শুরু করে। ডিসেম্বরে তারাই অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে দৃশ্যমান হতে থাকে। ১১ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে পুলিশ রাজাকারসহ পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যা ছিল অনধিক পাঁচ হাজার। ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে ঢাকার গভর্ণর ভবন বিধ্বস্ত হলে ডাঃ মালেকের তথাকথিত বেসামরিক প্রাদেশিক সরকার পদত্যাগ করে এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণ Hotel Intercontinental (বর্তমান রূপসী বাংলা)-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের ইষ্টার্ণ কমান্ডের প্রধান লেঃ জেঃ নিয়াজী আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করছেন।[২৭৬]
পেছনে বেসামরিক পোশাকে মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান ও বর্তমান মন্ত্রী এ কে খন্দকার (গোল চিহ্নিত)

জেনারেল নিয়াজীকে আত্মসমর্পণ করার আহবান জানালে সকল পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কূটনৈতিক ও সামরিক যোগাযোগের মাধ্যমে আত্মসমর্পণের তারিখ, সময় এবং দলিল (Instrument of Surrender)

---

২৭৬ পরিশিষ্টঃ ১৩ --আত্মসমর্পণের দলিল।

www.pathagar.com

ঠিক করা হয়। পুরো বিষয়টি ভারতীয় বাহিনীর সদস্য ও RAW এর এজেন্টগণ, পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে স্থির করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে রাখা হয় অন্ধকারে।

১৬ ডিসেম্বর জেনারেল ওসমানী আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে এক সাক্ষাতকারে বলেন "ঐদিন ও এর আগের দিন আমি ময়নামতির রণাঙ্গনে ১৬ই ডিসেম্বর দুপুরে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজন করি। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে তদানীন্তন লেঃ কর্নেল সফিউল্লাহর 'এস' ফোর্স রণাঙ্গন পরিদর্শন করার জন্য আমার যাবার কথা ছিল। জেনারেল জগজিং সিংহ সেদিন না যেতে অনুরোধ করে বলেন, সেদিন 'এস' ফোর্স পরিদর্শনে অসুবিধা হতে পারে, যেহেতু তারা অগ্রসর হচ্ছেন। আমি তখন আমার সফরসূচী পরিবর্তন করে সিলেট 'জেড' ফোর্স পরিদর্শনে যাবার সিদ্ধান্ত নেই।....বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানতেন আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাছাড়া মিত্র বাহিনীর উচ্চতম কর্মকর্তারাও জানতেন আমি কোথায়।"[২৭৭] এ প্রসঙ্গে কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী[২৭৮] বলেন --

১. তার সাথে আলোচনা না করে দিন-তারিখ নির্ধারণ করায় তিনি মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন।
২. ভারতীয় সমরনায়ক লেঃ জেনারেলের জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তানের সমরনায়ক লেঃ জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী আত্মসমর্পণ করবে তা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। বা তিনি হয়ত চেয়েছিলেন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে তাঁর কাছেই নিয়াজী আত্মসমর্পণ করুক।[২৭৯]

পাকিস্তান ইষ্টার্ণ কমান্ড প্রধান লেঃ জেঃ নিয়াজী ভারতের ইষ্টার্ণ কমান্ড প্রধান লেঃ জেঃ অরোরার নিকট ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দীর উদ্যানে) আত্মসমর্পণ করেন। পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পরাজয় স্বীকার করে; আর এমনি একটি মাহিন্দ্রক্ষণের জন্য ভারতকে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ পচিশটি বছর। আবেগ-আপ্লুত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী তার প্রধান সেনাপতিকে এমন একটি সুযোগকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আহবান জানান। কিন্তু সেনাপতি তার আসনের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে সে আহবান প্রত্যাখান করে বলেন[২৮০]--

---

২৭৭ সাপ্তাহিক বিক্রম; তারিখঃ ১২.১২.১৯৮৮

২৭৮ বর্তমানে তিনি জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার (২০০৯-২০১৪)।

২৭৯ বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও আমার কিছু কথা, কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, আমাদের একাত্তর (সংকলন), সম্পাদনায় ঃ মহিউদ্দিন আহমদ, পৃঃ ৩১

২৮০ আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রাদেশিক মূখ্যমন্ত্রী, আমাদের মন্ত্রী ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং আমাদের সচিবগণ ভারতের প্রাদেশিক সচিবদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে নিজের ও দেশের মর্যাদাকে বিবেচনায় নেন না।

www.pathagar.com

When Gandhi asked him to go to Dhaka and accept the surrender of Pakistani forces, Manekshaw declined, magnanimously saying that honour should go to his army commander in the East (Lt Gen Jagjit Singh Aurora). Manekshaw said he would only go if it were to accept the surrender of the entire Pakistani army. [২৮১]

(যখন মিসেস গান্ধী ফিল্ড মার্শাল মানেকশ' কে ঐতিহাসিক আত্মসমপর্ণের অনুষ্ঠানের উপস্থিত থেকে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমপর্ণ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন তখন মানেকশ' তা অস্বীকার করে বলেন যে, এ সম্মান ইষ্টার্ন কমান্ড অধিনায়ক লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরার প্রাপ্য। তিনি আরো বলেন যখন পুরো পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে তখনই কেবল আমি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারি।)

প্রবাসী সরকারের দেশে আগমন

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। ২২ ডিসেম্বর একটি ভারতীয় বিমানে করে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিসহ মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগণ ঢাকা আসেন। কি কারণে প্রবাসী মন্ত্রীসভা ছ'দিন পর প্রত্যাবর্তন করে তা পরিস্কার নয়। এ সময়ে ভারতীয় বাহিনী সকল সেনানিবাস ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার (KPI) নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ভান্ডারের অধিকাংশ ভারতে স্থানান্তরের সুযোগ পায়। এ সময়ই ভারতীয় বাহিনীর লুটতরাজের বিরোধিতা করায় সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিলকে[২৮২] গ্রেফতার করা হয়।

অনেকের বক্তব্য হচ্ছে প্রবাসী সরকার তাদের জীবনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই ছ'দিন পর দেশে ফিরে। তবে মঈনুল হাসান বলেন (১) ভারতের সাথে অর্থনৈতিক (সম্পদ) ও কারিগরি সহায়তার বাস্তব আয়োজন এবং (২) ভারত থেকে এক কোটি শরণার্থী ফেরত আনার নির্দিষ্ট আয়োজন করেই প্রবাসী সরকার দেশে প্রত্যাবর্তন করে। [২৮৩]

শেখ মুজিবুর রহমান ঃ বাংলাদেশের স্থপতি

বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ মুজিব একটি অনন্য ইতিহাস। ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণকারী শেখ মুজিব ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দুর্দান্ত সাহসী ছাত্রকর্মী হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে

---

২৮১ http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-06-27/india/ 27752774_1_manekshaw-field-marshal-sam-bahadur// accessed on 29.05.2011

২৮২ তিনি জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং পরে ইসলামী চিন্তাধারায় 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' গঠন করেন।

২৮৩ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, পৃঃ ১৯৯

www.pathagar.com

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। কলকাতা কেন্দ্রীক রাজনীতিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। তার রাজনীতি শুরু হয় মুসলিম ছাত্রলীগের প্লাটফর্মে। কোলকাতায় থাকাকালীন স্বাধীন বাংলা (সুবে বাংলার পুরোটাই) আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে সুভাষ বসুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার তৎকালীন উদীয়মান সকল নেতা-কর্মীর উপর প্রভাব ফেলে। শেখ মুজিব ছিলেন একাধারে পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় লালিত মানুষ। মূলতঃ তিনটি সমসাময়িক স্রোতধারা তাকে প্রভাবিত করে এবং আমৃত্যু এ তিনটি মূল্যবোধ তিনি সমান্তরাল ভাবে লালন করেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি মুসলিম প্রধান বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম রেখে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। তৃতীয়তঃ পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোও তার পছন্দ ছিল।[২৮৪]

১৯৪৭ সনে এ অঞ্চল পাকিস্তানের অংশ হলে তিনিসহ হাজারো উদীয়মান নেতা-কর্মী কোলকাতা ছেড়ে পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানে) চলে আসেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদেরকে হিন্দু নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য থেকে যান; পরে ১৯৪৯ সনে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পাকিস্তানে চলে আসেন।

পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের মধ্যে তখনই বেশ কিছু ধারার সৃষ্টি হয়; একটি ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা; যারা শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। শেখ মুজিব ছিলেন এ দলেরই একজন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও হিন্দুদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ তার নাম পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ ধারণ করে। সুভাষ বসুর স্বরাজ পার্টির গঠনতন্ত্রকে এ দলের গঠনতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে মুসলিম লীগের বিপরীতে একটি শক্তিশালী পার্টি গঠন করা হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের শ্লোগান গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৬৬ সনে আওয়ামী লীগ এ অঞ্চলের মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে ৬ দফা ঘোষণা করে। ১৯৭০ সনে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৩০০ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে

---

২৮৪ ❶ শেখ মুজিব ৭ মার্চ ১৯৭১ ভাষণের শেষ করেন "জিয়ে পাকিস্তান" বলেন। এ ব্যাপারে ০১.১২.২০১০ তারিখের দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'স্বায়ত্বশাসনের দাবী থেকে স্বাধীনতার ডাক' প্রবন্ধে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন "৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ডাক দিলে তার ভাষণের শেষে 'জিয়ে পাকিস্তান' শব্দ দু'টি পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি শেষ শুভেচ্ছা- সম্ভাষণ বিলয়বিন্দুতে নিভে গেল চিরতরে একটিবার দপ করে জ্বলে উঠে। কবি শামসুর রাহমান এর লেখা আত্মজীবনী যা দৈনিক জনকণ্ঠ এ "কালের ধুলোয় লেখা" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও তিনি বলেছেন "শেখ মুজিবুর রহমানের শেষ কথা ছিল "জিয়ে পাকিস্তান"।
❷ আমাদের অনুসন্ধানে পাই যে, তিনি "জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান" বলেছিলেন।

www.pathagar.com

জয়লাভের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসনভার লাভ করার অধিকার লাভ করে এ দল। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পান।

২৫ মার্চ ১৯৭১ এর Operation Searchlight শুরু করার মুহূর্তে ইয়াহিয়া সরকার শেখ মুজিবকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তিনি কিছুই জানতেন না, গত ১০ মাস এ মাটিতে কি ঘটেছে তাও ছিল তার অজানা। বিবিসি'র প্রবীণ সাংবাদিক সিরাজুর রহমানের কাছ থেকে শোনা ঘটনা– লন্ডনে মুজিবকে যখন সাংবাদিকরা 'ইউর এক্সিলেন্সি' সম্বোধন করছিলেন, তখন মুজিব বিস্ময় প্রকাশ করলে সিরাজুর রহমানসহ অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনরা তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানকে কূটনৈতিক শিষ্টাচারে 'ইউর এক্সিলেন্সি' বলেই সম্বোধন করা হয়। প্রত্যুত্তরে মুজিব নাকি বলেছিলেন, 'অ্যা..... আমরা না অটোনমি চাইছিলাম..... ।' [২৮৫] কম্যুনিস্ট নেতা জয়নুল আবেদীন বলেন- "বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দেশে ফিরে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন।"[২৮৬]

ভারত শেখ মুজিবকে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের বিষয়টি অবহিত করলে তিনি ভারতে পালিয়ে যাওয়ার কোন চিন্তা করেননি। জ্যোতি সেন গুপ্ত বলেন "The night before i.e. on March 24, 1971 [Indian] Intelligence sources informed Awami League leaders of the imminent attack by the Pakistani army. General Osmani came to see Sheikh Mujib at his Dhanmondi residence and informed him of this secret message. Together they discussed, until the late hours of that night, about their upcoming plans. It was decided that they would flee to India. But [on March 25, 1971] when Tajuddin Ahmed came to see Mujib around 7:30PM, he found Mujib ready with his bed and bedding to go to jail. Mujib told him that he would stay back and surrender."[২৮৭].

(১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ রাতে ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্র আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অতিসত্বর আগত আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করে। জেনারেল ওসমানী এই গোপন খবর অবগত করাতে শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় স্বশরীরে হাজির হন। তারা দুজন শেষরাত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তারা দুজনেই ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত সাড়ে সাতটায় তাজউদ্দিন আহমেদ যখন

---

২৮৫ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ ; পৃঃ ৪৭৮

২৮৬ 'বামপন্থীদের ঐতিহাসিক ভুল' প্রসঙ্গে কিছু কথা; জয়নুল আবেদীন ; দৈনিক যুগান্তর , তারিখঃ ২২.১১.২০১০

২৮৭ "Bangladesh: In Blood And Tears" by West Bengal journalist Jyoti Sengupta; Ref: http:// www.topix.com/forum/world/bangladesh/TJB1Q2IQBSQT18CPH accessed on 29.05.2011

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে, তিনি তার বিছানাপত্র নিয়ে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। মুজিব তাজউদ্দিনকে বলেন যে, "তিনি আত্মসমর্পণের জন্য বাড়িতেই অবস্থান করছেন।)

বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান পিপিপি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ভুট্টো শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে দেখা করেন। ড. কামালের ভাষায় "ভুট্টো এসেছিলেন দেখা করতে। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি বন্দী অবস্থায় এসেছ? সে বলল না, না, আমি তো প্রেসিডেন্ট। বঙ্গবন্ধু বললেন তুমি প্রেসিডেন্ট হলে কি করে? আমি তো নির্বাচনে তোমার চেয়ে দুই গুণ বেশী সিট পেয়েছিলাম। এ কথা শুনে ভুট্টো লজ্জাই পেয়েছে। লজ্জা পেয়ে বলেছে যে, ঠিক আছে আপনিই প্রেসিডেন্ট হয়ে যান।"[২৮৮]

৪০ বছর পরে ড. কামাল হোসেন জাতিকে জানালেন যে, ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটনাবলী শেখ মুজিবসহ তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি ভেবেছিলেন ইয়াহিয়া তাকে যেমন করে বন্দী করেছে, ভুট্টোকে তেমনই বন্দী করেছে। তখনো তিনি জানতেন ভুট্টো নন তিনি হচ্ছেন পাকিস্তানের প্রধান। আর এগুলো তার সহকর্মীরা অনেকেই জানতেন বলেই তার আর এক সহকর্মী ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম ও মার্ক্সবাদী মঈদুল হাসান তাকে 'রাজাকার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "মঈদুল হাসান, ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম--- এরাই মূল ভূমিকা পালন করেছেন। তাজউদ্দীন আহমদকে এরা বলেছেন, 'আপনিই সব।' এমন কি তাকে এইভাবে মটিভেট করা হয়েছিল যে 'শেখ মুজিব ধরা দিয়েছেন। শেখ মুজিব আত্মসমর্পণ করেছেন। শেখ মুজিব রাজাকার।"[২৮৯] '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে প্রথম 'আত্মসমর্পণকারী রাজাকার' বলে উল্লেখ করেন।[২৯০] শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি সেদিন ধরা না দিলে ওরা আমাকে খুঁজে বের করার নামে সারা বাংলাদেশকে তামা করে ফেলতো।"[২৯১]

---

২৮৮ সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক ২৮ অক্টোবর ২০১০. আত্মজৈবনিক সাক্ষাতকার ড. কামাল হোসেন।

২৮৯ বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক; পৃঃ ১৫৬

২৯০ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ ; পৃঃ ৪৬২

২৯১ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ ; পৃঃ ৪৬২
Sheikh Mujib was telephoned and warned that something was happening, but he refused to leave his house. "If I go into hiding they will burn the whole of Dacca to find me," he told an aide who escaped arrest.
Ref: BANGLADESH GENOCIDE and WORLD PRESS, Compiled and edited by FAZLUL QUADER QUADERI; p 64

www.pathagar.com

১৯৭১ সনে শেখ মুজিব তার বিচারের সময় বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলেন "আমি এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, বরং আপনারাই হচ্ছেন বিশ্বাসঘাতক।" [২৯২]

তারপরও বাংলাদেশ একটি বাস্তবতা। ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে কোন মানুষ এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি। আদর্শিক ভিন্নতার কারণে আওয়ামী লীগ মুজিববাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা ঐ দলেরই একাংশ বিরোধিতা করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' কায়েম করতে চেয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি (CPB) ও মস্কোপন্থী ন্যাপ (NAP) সহ অন্যান্য দল এ দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আলোকে সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসেন। সে সময় ইসলামপন্থী মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলসমূহ নিষিদ্ধ ছিল আর চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর যাচ্ছিল দুর্দিন।

কিন্তু সকল দল, মত ও বিশ্বাসের মানুষ বাংলাদেশকে নিজের দেশ হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করে। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন, হয়েছেন বন্দী অথবা পলাতক তারাও বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। সকল মানুষই তাকিয়ে ছিলেন শেখ মুজিবের Statesmanship এর দিকে। এখানে তিনি কখনো সফল হয়েছেন আবার কখনো ব্যর্থ হয়েছেন; যেমন তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন ২৫ মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণায়। কিন্তু তার নেতৃত্বকে ছাপিয়ে অন্য কারো নেতৃত্ব তখন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। মেজর জিয়া (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি) স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেও তাকে শেখ মুজিবের পক্ষে এ ঘোষণা দিয়ে মানুষের কাছে এটিকে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করতে হয়েছে। ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে কি ঘটেছে তা তার অজানা থাকলেও স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার গঠন, যুদ্ধ পরিচালনাসহ অন্যান্য সকল কর্মকান্ডই তার নামেই হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান গঠনে তার ভূমিকা, মুসলিম লীগের জনসম্পৃক্ত অংশে (Peoples oriented) তিনি ছিলেন একজন যুবনেতা, মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী লীগ গঠন, ১৯৫২, ৫৬, ৬২, ৬৬, ৬৯ এর বিভিন্ন আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ৬ দফা দাবীর আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি মানুষকে তিনি একটি অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব মানুষ বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার কাধে তুলে দেয়, ১৯৭০ সনের নির্বাচনে তিনিই ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। তাই তিনি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ছাপিয়ে হয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।

মুক্তিযুদ্ধের গৌরবে কালিমা লেপন

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। বিশ্বের ইতিহাসে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল উত্থানের দিন। পাকস্তান সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ ন'মাসের

---

[২৯২] পাঞ্জাবের গভর্ণর সরদার লতিফ খোসার সাক্ষাৎকার। দৈনিক আমার দেশ, তারিখঃ ১২.০৪.২০১১

www.pathagar.com

সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান হয়। বারুদের গন্ধ বন্ধ হবার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা হয়নি। যারা মুক্তিযোদ্ধা বা রাজাকার কোনটাই ছিলেন না, এমন অনেক সুযোগ সন্ধানী মিলে গড়ে তুলে সিক্সিটিন্থ ডিভিশন (16th Division)। তারাই আত্মগোপনকারী পলাতক রাজাকারদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যে মুক্তিবাহিনী-মুজিববাহিনীর সদস্যরা যার যার এলাকায় ফিরে এসে এসব হত্যাকান্ড, লুণ্ঠন, নির্যাতন বন্ধ করার কোন পদক্ষেপ না নিয়ে তাদের অনেকেও সিক্সিটিন্থ ডিভিশন সদস্যদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোকে ম্লান করে দেয়।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ : স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় লাভের পর স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ এ ব্লকের অন্যান্যদেশ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে অক্টোবর ১৯৭১ সনে স্বাক্ষরিত ৭ দফা চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিচালিত হতে থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সকল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকার পরিচালনার অংশ হিসেবে ভারতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পুলিশ, পোস্টাল সার্ভিসের কর্মকর্তা বাংলাদেশে নিয়োগ দেয়।[২৯৩]

অপরদিকে মুক্তিবাহিনীর একাংশ স্বাধীনতাবিরোধী শান্তি কমিটির সদস্য, আল বদর সদস্য, যোগসাজশকারীদের বিচারের জন্য আটক করে জেলে প্রেরণ করে। অপর দিকে মুক্তিবাহিনী কোন কোন অংশ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের বিনা বিচারে হত্যা, গুম, নির্যাতন করতে থাকে। তাদের বাড়িঘরের সহায় সম্পত্তি লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সরকারী সম্পত্তি ও উর্দুভাষী পাকিস্তানী ও বিহারিদের সম্পদ অবৈধ দখলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতেই আইন-শৃঙ্খলার অবনতিসহ প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ জুলফিকার আলী ভূট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ২১ ডিসেম্বর তিনি শেখ মুজিব ও ড. কামাল হোসেনকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখ রাত তিনটায় ভূট্টো রাওয়ালপিন্ডি বিমান বন্দরে তাদেরকে বিদায় জ্ঞাপন করেন। পাকিস্তানী পাসপোর্ট[২৯৪]

---

২৯৩ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ৩৫৩

294 সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক-এ ড. কামাল হোসেনের ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

দিয়ে পিআইএর বিমানে[২৯৫] তাদেরকে লন্ডন প্রেরণ করা হয়। (সূত্রঃ ড. কামাল হোসেন) লন্ডনে তাদেরকে বাংলাদেশী পাসপোর্ট দেয়া হয় এবং ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের বিমানে তাদেরকে ভারতে পালাম বিমান বন্দরে প্রেরণ করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবকে বহন করে ঢাকায় আনার জন্য ভারতীয় বিমানের ব্যবস্থা রাখলেও তিনি ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের বিমানে ঢাকায় আসেন।[২৯৬]

১০ জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন

তিনি ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন "বাংলাদেশের স্বাধীনতা অপরিবর্তনীয়, পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্বতন সম্পর্ক আর পুনঃপ্রতিষ্ঠার নয়।"

---

২৯৫ পিআইএ স্ট্র্যাটেজিক কার্গো।

২৯৬ অনেকের মতে তিনি ধারণা করেন যে, ভারত তাকে বিমান ক্রাশের মাধ্যমে হত্যা করবে অনুমান করে তিনি ভারতীয় বিমানে ঢাকায় আসেননি।

"১০ই জানুয়ারী থেকেই ভারত বিরক্ত হতে থাকে। শেখ সাহেব যেদিন নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা এলেন সেদিন পাকিস্তান থেকে শেখ সাহেব প্রথমে গেলেন লন্ডন। তারপর দিল্লী হয়ে ঢাকা। দিল্লী যখন এলেন, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী খবর পাঠালেন, শেখ সাহেব যেন বৃটিশ এয়ার ফোর্সের বিমানে ঢাকা না যান। তিনি যেন ভারতীয় বিমানে যান এই ছিল অনুরোধ। ভারত বলল, বৃটিশ সরকার যেখানে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, সেখানে শেখ সাহেব কি করে তাদের বিমানে ঢাকা যান। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ শেখ সাহেবকে ভারতের এই ইচ্ছার কথা যখন জানালেন, তখন শেখ সাহেব কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই বললেন, আমি বৃটিশ বিমানেই যাব। ওদের বলে দিও আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এতে কোন হেরফের হবে না।"
সূত্রঃ 'শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন'- মতিউর রহমান চৌধুরী ঃ নাঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত, বাড়ী ৫০ সড়ক ২ এ ধানমন্ডি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কাগজ', ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৯০

www.pathagar.com

শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। ১১ জানুয়ারী অস্থায়ী সংবিধান জারী করেন[২৯৭] এবং ১৯৭০ সনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করেন। স্বাধীন দেশের সরকার প্রধান হিসেবে কাজ চালাতে গিয়ে ওয়াশিংটন, মস্কো, পিন্ডি বা দিল্লীর অধীনতা মানতে অস্বীকার করেন।

বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োজিত ভারতীয় উপদেষ্টাসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দেশ ত্যাগ করার ব্যবস্থা করেন। এতে মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যকার ৭ দফা চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে। সদ্য স্বাধীন দেশে যুদ্ধাপরাধী ও কলাবরেটরদের বিচার, পাকিস্তানে আটক সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কয়েক লক্ষ বাংলাদেশীকে নিরাপদে ফেরৎ আনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইত্যাদি বহুমাত্রিক সমস্যা মাথায় নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন।

---

২৯৭ পরিশিষ্ট : ৭

www.pathagar.com

অধ্যায় : চার

স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কত মানুষ মারা গিয়েছে ৪০ বছরেও তার কোন জরিপ বা শুমারী হয়নি যা প্রতিটি সরকারের জন্য ব্যর্থতা; আর এ দেশের মানুষের জন্য দুঃখজনক। সংসদে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম ২৬. ০৯. ২০১০ তারিখে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে তা গণনার কোন পরিকল্পনা এ সরকারের নেই।[২৯৮] বিদেশের অনেক ব্যক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য দিলেও আমরা বরাবরের মত নির্বিকার। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রর্ত্যাবর্তনের পথে ১৯৭২ সনের ৮ জানুয়ারী হীথ্রো বিমানবন্দর থেকে Claridge's Hotel এ যাবার সময় সাংবাদিকদের সাথে আলাপে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩ (তিন) লক্ষ মানুষ মারা যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে ৩ (তিন) মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন।[২৯৯] কিন্তু ১৯৭২ সনের ১০ জানুয়ারী ভারতের পালাম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ৩ (তিন) মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছে; আজোবধি ৩ (তিন) মিলিয়ন তথা ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে[৩০০] এ সংখ্যাই প্রচলিত আছে। এ ব্যাপারে ১৫.০৬. ১৯৯৩ সংসদে আলোচনায় কর্নেল আকবর হোসেন বলেন যে, আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩ (তিন) মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছে উল্লেখ করে যা মূলতঃ প্রকৃত সংখ্যার ১০ (দশ) গুণ। তখন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ বলেন যে, জিয়াউর রহমানসহ কেউ এ সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করেননি; আমাদের নেতা শেখ মুজিব যেহেতু সংখ্যাটি বলেছেন ধরে নিতে হবে এটিই সঠিক।

যুদ্ধের পরপর ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ শিং দাবী করেন যে, যুদ্ধে এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) মানুষ মারা যায়। Swaran Singh quickly claimed that a million people had been killed in Bangladesh[301]। A senior Indian official put the Bengali death toll at three hundred thousand[৩০২] (300,000) অর্থাৎ ভারতীয় এক জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা দাবী করেন যে, তিন লক্ষ বাঙালি এ যুদ্ধে মারা যায়।

---

[২৯৮] আমাদের সময়, তারিখঃ ২৭.০৯.২০১০

[২৯৯] http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/24/mujib-confusion-on-bangladeshi- deaths accessed on 08.06.2011

[৩০০] ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা গেলে পাকিস্তান সামরিকবাহিনী ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১১,৪৯৪ জন করে মানুষ হত্যা করেছে।

[৩০১] The Blood Telegram India's Secret War in East Pakistan, Gary J. Bass, p- 322

[৩০২] The Blood Telegram India's Secret War in East Pakistan, Gary J. Bass, p- 322

www.pathagar.com

বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে এ সংখ্যা ২৬ হাজার, সর্মিলা বসু বলেন এ যুদ্ধে ৩৬ হাজার[৩০৩] কল্যাণ চৌধুরীর মতে ১২,৪৭,০০০ জন[৩০৪] এবং সম্প্রতি British Medical Journal এ প্রকাশিত "Fifty Years of Violent War Deaths from Vietnam to Bosnia: Analysis of Data from World Health Survey Programme" বলা হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ২,৬৯,০০০ (দু' লক্ষ উনসত্তর হাজার) জন মানুষ মারা গিয়েছে।[৩০৫]

সর্মিলা বসু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে সে হিসাব দিতে গিয়ে শাখারীবাজারের (তার ভাষায় শাখারীপাড়া) বর্ণনা দিয়েছেন " In Shakharipara an estimated 8,000 men,women and children were killed when the army, having blocked both ends of winding street, hunting them down house by house. The description is entirely false. Survivors of the attack on Shakharipara on March 26 testify that about 14 men and one child (carried by his father) were killed inside a single house that day."[৩০৬]

(শাখারীবাজারে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে প্রায় আট হাজার নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছে। হত্যাকান্ড সম্পর্কে উপরোক্ত বিবৃতিটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ উক্ত আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের থেকে জানা যায় উক্ত অভিযানে শুধুমাত্র একটি বাড়িতে ১৪ জন পুরুষ ও একজন শিশুকে পাকিস্তানী বাহিনী হত্যা করে।)

ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ টিভি ভাষণে বলেন,"দশ লক্ষাধিক মানুষের আত্মাহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালী রক্তিমবলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি।"[৩০৭]

শেখ মুজিব ২৯ জানুয়ারী ১৯৭২ ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব পুলিশ আব্দুর রহিমকে প্রধান করে মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন ---

১. জনাব আব্দুর রহিম, ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব পুলিশ	--	সভাপতি
২. প্রফেসর খোরশেদ আলম, গণপরিষদ সদস্য, কুমিল্লা	--	সদস্য
৩. জনাব মাহমুদ হোসেন খান, গণপরিষদ সদস্য, বগুড়া	--	ঐ
৪. জনাব আব্দুল হাফিয, গণপরিষদ সদস্য, যশোর	--	ঐ
৫. জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, ন্যাপ	--	ঐ
৬. জনাব জালাল উদ্দিন মিয়া, প্রাক্তন পুলিশ সুপার,	--	ঐ

[৩০৩] Sarmila Bose, 'Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan', Economic and Political Weekly, October 8th, 2005,

[৩০৪] Kalyan Chaudhuri, Genocide in Bangladesh (Bombay: Orient Longman 1972)

[৩০৫] পরিশিষ্টঃ ২০

[৩০৬] Anatomy of Violence/ Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971 by Sarmila Bose/ Economic and Political Weekly/ October 08, 2005/ p 44-65

[৩০৭] দৈনিক বাংলা তারিখঃ ০৪ জানুয়ারী ১৯৭২

www.pathagar.com

৭. জনাব মুহাম্মদ আলী, উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় -- ঐ
৮. জনাব টি হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী -- ঐ
৯. জনাব মহিউদ্দিন, পরিচালক, শিক্ষা বিভাগ -- ঐ
১০. জনাব মুবাররক হোসেন, উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ -- ঐ
১১. উইং কমান্ডার কে এম ইসলাম, বিমান বাহিনী -- ঐ
১২. জনাব এম এ হাই , উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -- ঐ

৩০ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা, ক্ষয়-ক্ষতিসহ এর সাথে জড়িতদের অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কমিটিকে পরে কাজ করতে দেয়া হয়নি।

তা ছাড়া ১৯৭২ সনে শেখ মুজিব সরকার শহীদ পরিবারকে প্রতিজন শহীদের বিপরীতে ২০০০ (দু'হাজার) টাকা করে অনুদান দেয়ার ঘোষণা করে। সারাদেশ থেকে প্রায় ৭২০০০ আবেদন জমা পড়লে যাচাই বাছাই করে রাজাকারদের নাম বাদ দিয়ে করে মোটামুটি ৫০০০০ শহীদ পরিবারকে ২০০০ (দু'হাজার) টাকা করে অনুদান দেয়ার হয়।[৩০৮]

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব স্ট্রাট্রেজিক স্ট্যাডিজের ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসের জার্ণালে বলা হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের মেয়াদ ছিল ৮ মাস ৩ দিন। এ যুদ্ধে নিহত হয় ৫০ হাজার মানুষ।

১৯৭১ সনের পরিসংখ্যান অনুসারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ৪,৪৭২ টি ইউনিয়ন, ৬৮,৩৮৫ টি গ্রাম, ১২,৬৭৩,০০০ খানায় (households) মোট ৬৯,৭৭৪,০০০ জন মানুষ বসবাস করতেন। এ হিসাব অনুসারে স্বাধীনতার যুদ্ধে মানুষ মারা যাওয়ার হার হবে নিম্নরূপ--

টেবিল ৪.১

বিভিন্ন হিসাব অনুসারে স্বাধীনতার যুদ্ধে মানুষ মারা যাওয়ার হার

	প্রতি ১০০০ জন মানুষে	প্রতি১০০ খানায় (household)	প্রতি গ্রামে	প্রতি ইউনিয়নে
ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে হিসেবে	৪২.৯৯	২৩.৬৭	৪৩.৮৬	৬৭০.৮৪
দশ লক্ষ জন মানুষ মারা গিয়েছে হিসেবে	১৪.৩৩	৭.৮৯ ⏩	১৪.৬২	২২৩.৬১
এক লক্ষ জন মানুষ মারা গিয়েছে হিসেবে	১.৪৩	০.৭৮ ⏩	১.৪৬	২২.৩৬

⏩ প্রথম সংস্করণে অসাবধানতাবশত তথ্য ভুল মুদ্রিত হয়।

৩০৮ Abdul Muhaimin, the Ministry of Finance, Government of Bangladesh, had informed him that, "Only 72,000 claims were received. Of them relatives of 50,000 victims had been awarded the declared sum of money. There had been many bogus claims, even some from the Razakars, within those 72,000 applications."

www.pathagar.com

উপরে হত্যাকান্ড বা নিহতের যে হিসেব দেয়া হয়েছে তা শুধু পাকিস্তান সামরিকবাহিনী, এর সহযোগী বাহিনী বা দালাল কর্তৃক বাঙালি হত্যার সংখ্যা। এভাবে বিষয়টি একপেশে প্রচারণার শিকার; মুক্তিযোদ্ধা ও সিক্সটিন্থ ডিভিশন কর্তৃক অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী বাঙালি, বিহারি ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী নিহত হওয়ার বিষয়টি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। যুদ্ধে পাকিস্তান ও ভারতের সামরিকবাহিনীর সদস্য নিহত হওয়ার বিষয়টিও আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। যুদ্ধে পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর প্রায় ৪৫০০ সদস্য নিহত ও প্রায় ৮০০০ জন আহত হয়েছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ১৪২১ সদস্য নিহত ও ৪০৫৮ জন আহত হয়েছে।[৩০৯]

কোন যুদ্ধেই শুধু একপক্ষের মানুষ মারা যায় না, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের মানুষই মারা যায়। যুদ্ধোত্তরকালে কোন পক্ষের কত জন নিহত বা আহত হয়েছে তার হিসেব বের করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর হতাহতের সংখ্যা বিভিন্নভাবে নিরূপণ করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার জন্য দেশে এ রকম একটি শুমারী করা যেতো। প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর হতাহতের সংখ্যার পরিসংখ্যান নীচে দেয়া হলো--

টেবিল ৪.২
প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর হতাহতের সংখ্যা

Demographic Unit এর গণনানুসারে যুগোশ্লাভিয়ায় হতাহতের সংখ্যা		
মোট ১০৪,৭৩২	বসনিয়াক	৬৮,১০১
	সার্ব	২২,৭৭৯
	ক্রোয়েট	৮,৮৫৮
	অন্যান্য	৪,৯৯৫
মোট বেসামরিক ব্যক্তি ৩৬,৭০০	বসনিয়াক	২৫,৬০৯
	সার্ব	৭,৪৮০
	ক্রোয়েট	১,৬৭৫
	অন্যান্য	১,৯৩৫
মোট সামরিক সদস্য ৬৮,০৩১	বসনিয়াক	৪২,৪৯২
	সার্ব	১৫,২৯৮
	ক্রোয়েট	৭,১৮২
	অন্যান্য	৩,০৫৮

সূত্রঃ http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_War accessed on 16.06.2012

---

৩০৯ Dead Reckoning Memorics of thc 1971 Bangladcsh War, Sarmila Bose; p 179

www.pathagar.com

শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন তার সংখ্যা নিয়ে তেমন কোন আলোচনা হয় না। কারণ এ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা হলে যুদ্ধকালে ত্রিশ লাখ মানুষ মারা যাবার তথ্যটি সকলের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়বে। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোট ৬৬২৯ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হচ্ছে ১,৫১১ জন।

টেবিল ৪.৩

শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জন)
সেনাবাহিনী	১,৫৪৪
নৌবাহিনী	২১
বিমানবাহিনী	৪৭
ইপিআর (বিডিআর)*	৮১৭
পুলিশ*	১২৬২
বেসামরিক	২,৯৩৮
মোট	৬,৬২৯

*সূত্র : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় * হিসাব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের webpage থেকে নেয়া।*

ধর্ষণ

হত্যার সংখ্যা নিয়ে যেমন অসততার আশ্রয় নেয়া হয়েছে, ধর্ষণের সংখ্যা নিয়েও তেমনই অসত্য বর্ণনা দেয়া হয়েছে । ২ (দুই) লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে যে প্রচারণা চলছে তারও কোন জরিপ করা হয়নি। যুদ্ধকালে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে তা হয়তো এখনো নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু ঐ সময়ের ধর্ষণের হিসাব এখন নির্ণয় করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

ফিরোজ মাহবুব কামাল বলেন, "নারী ধর্ষণ যে হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক নেই। বিতর্ক হলো মূলতঃ তিনটি বিষয়ে

১. ধর্ষণের সংখ্যা কত ?

২. কারা সে ধর্ষণের শিকার?

৩. এ ধর্ষণ কি সরকারিভাবে পরিকল্পিত ছিল, নাকি দুই পক্ষের সুযোগ সন্ধানী সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা মওকা বুঝে নারী ধর্ষণের সুযোগ নিয়েছে ?

শেখ মুজিব ও তার সরকার এ নিয়ে তদন্তের কোন প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। কোন রূপ গবেষণা বা তদন্ত না করেই শেখ মুজিব সরকার উপরের তিনটি প্রশ্নের তড়িৎ জবাব দেন। সেগুলো হলো–

www.pathagar.com

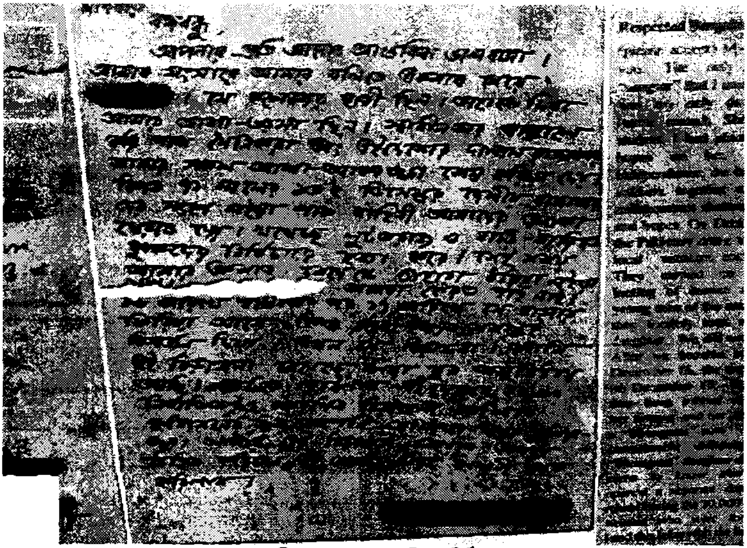

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে রক্ষিত চিঠি

১. ধর্ষিতা হয়েছে তিন লাখ।

২. যারা ধর্ষিতা হয়েছিল তারা ছিল বাঙালি।

৩. নারী ধর্ষিত হয়েছে পরিকল্পিতভাবে এবং পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় নীতির অংশরূপে।"[৩১০]

যারা ধর্ষিতা হয়েছিল তারা ছিল বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে রক্ষিত একটি চিঠিতে একজন নির্যাতিতার পিতা শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন যে, বিশ হাজার মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। তার মেয়েও ধর্ষিতা, তার জন্য সাহায্যের আবেদন করেছেন।

সর্মিলা বোস বলেন "60000 Pakistan Army to kill three million and rape three hundred thousand women, each and everyone of them had to kill 50 persons and rape 5 women."

(পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিল ৬০,০০০ ; তারা যদি ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরে থাকে ও তিন লক্ষ মহিলাকে ধর্ষণ করে থাকে , তা হলে প্রতিজন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য গড়ে ৫০ জন মানুষ মেরেছে ও ৫ জন করে মহিলাকে ধর্ষণ কররেছে।)

ধর্ষণের বিভিন্ন হিসাব ধরে একটি পর্যালোচনামূলক পরিসংখ্যান দেয়া হল-

---

৩১০ একাত্তরের-আত্মঘাতের ইতিহাস (e-book), ফিরোজ মাহবুব কামাল through Dr feroz Mahbub Kamal www. Drferozmahbubkamal.com accessed on 10.10.2010

www.pathagar.com

টেবিল ৪.৪

বিভিন্ন হিসাব অনুসারে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় ধর্ষণের হার

	প্রতি জন সামরিক সদস্য কর্তৃক কত জন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে	প্রতি গ্রামে কত জন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে	প্রতি ইউনিয়ন কত জন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে
চার লক্ষ মহিলা ধর্ষিত হয়েছে হিসেবে	৬.৬৬	৫.৮৫	৮৯.৪৪
তিন লক্ষ মহিলা ধর্ষিত হয়েছে হিসেবে	৫.০০	৪.৩৮	৬৭.০৮
দুই লক্ষ মহিলা ধর্ষিত হয়েছে হিসেবে	৩.৩৩	২.৯২	৪৪.৭২
বিশ হাজার মহিলা ধর্ষিত হয়েছে হিসেবে	০.৩৩	০.২৯	৪.৪৭

বাংলাদেশে একাত্তরে যত নারী-ধর্ষণ হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে সত্যধর্ষণ। গবেষক সর্মিলা বোস তেমনটাই মনে করেন। নারী ধর্ষণ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণার পর তার মনে এ ধারণা দৃঢ়মূল হয় যে বাংলাদেশে একাত্তরে নারী ধর্ষণ ঠিকই হয়েছে,তবে,কেবল বাঙালি রমনীরা ধর্ষিতা হয়নি বরং বিপুল সংখ্যক অবাঙালি মহিলাও বাঙালিদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে তার কোন উল্লেখই নেই।

ধর্ষণ নিয়ে ড. সর্মিলা বোস তার নিজের গবেষণায় যে উপসংহারটি টেনেছেন তা হলো, "একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় আমি দেখলাম, বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারীগণ এবং যারা ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তারা যুদ্ধের বর্ণনা দিল। গুলি করে হত্যার বর্ণনাও দিল। কিন্তু তারা আমাকে এ কথাও বললো, "আর্মি মহিলাদের কোন ক্ষতি করেনি। তবে যদি কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রস ফায়ারে পড়ে যায় তবে অন্যকথা।" একাত্তরে ধর্ষণের যে বিশাল সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছিল সে প্রেক্ষিতে এটি আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে। আমার কেস স্টাডিজে আমি একটি মাত্র ঘটনারও প্রমাণ পেলাম না। (Bose, Sarmila: 2005)।

সর্মিলা বোস আরো লিখেছেন, "একাত্তরের যুদ্ধের উপর প্রকাশনার উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম ২ লাখ থেকে ৪ লাখ ধর্ষিতার যে সংখ্যা বাংলাদেশে বলা হয় তার হিসাব নিকাশের কোন ভিত্তি নেই। এটি অবশ্যই অপ্রত্যাশিত নয় যে ভূক্তভোগীদের সংখ্যার একটি অনুমান (estimate) করা হবে। তবে প্রতিটি অনুমানের মূলেও মাঠ পর্যায়ের কিছু সাক্ষী প্রমাণ থাকতে হয় যার ভিত্তিতে একটি পরিসংখ্যান বের করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে একাত্তরে তেমন কিছুই ছিল না। এ ব্যাপারে কোন সরকারি পরিসংখ্যানও নাই। পরিসংখ্যানের একটা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি হতে পারতো মাঠপর্যায়ের তদন্ত, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষতিপূরণ থেকে। পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির যে তথ্য

www.pathagar.com

প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো বরং বাংলাদেশ সরকারকে আরো বিপদে ফেলেছে। সেগুলো ইঙ্গিত দেয়, সরকার কি যেন লুকাচ্ছে। সরকার ধর্ষিতার যে সংখ্যা পেশ করেছে তা পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর তথ্য থেকে আদৌ প্রমাণিত হয় না।"

বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্ষণের আরেক প্রমাণ রূপে খাড়া করা হয়েছে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীকে। শাহরিয়ার কবির তার সম্পাদিত "একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি" বইতে তার জবানবন্দীকে দলিলরূপে পেশ করেছেন। সর্মিলা বোসের গবেষণা থেকে সে বিষয়ে কিছু জানা যাক। "ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত মহিলা এবং পেশায় ভাস্কর। তার কাজের স্থান ছিল খুলনার এক জুটমিলের অফিসে। ফেরদৌসীর অভিযোগ তাকে প্রথমে তার আগাখানী জেনারেল ম্যানেজার ধর্ষণ করে। তারপর সে ১৫ জন পাকিস্তানী সামরিক অফিসারের নাম নেয় যাদের অবস্থান ছিল যশোর ও খুলনায়। তাদের মধ্য থেকে একমাত্র দুইজন বাদে সবার বিরুদ্ধে হয় ধর্ষণ অথবা ধর্ষণের চেষ্টা বা অন্য প্রকার যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছে যা করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে। তার নিজের ভাষ্য মতে সে একজন তালাকপ্রাপ্তা তিন সন্তানের মা। তার সন্তানেরা খুলনায় ফেরদৌসীর নানীর কাছে থাকতো আর নিজের মা এবং ৭ জন ভাই-বোন নিয়ে সে খালিশপুরে থাকতো। যেখানে সে জুটমিলে কাজ করতো। আহসান উল্লাহ আহমেদ নামে ফেরদৌসীর একজন পুরুষ বন্ধু ছিল এবং সে ছিল পার্শ্ববর্তী আরেকটি জুটমিলের লেবার অফিসার। মিলিটারি এ্যাকশনের পর আহসান উল্লাহ তার নিজের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলে। ফেরদৌসীর মা এবং তার ভাই-বোনেরাও চলে যায়। তখন ফেরদৌসী একা থেকে যায় তবে মাঝে মধ্যে তার কোন ভাই বা বোন বেড়াতে আসতো। তখন তার পুরুষ প্রেমিকটি পাশেই কাজ করতো। ফেরদৌসীর যুক্তি হলো, সে ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি তাই তাকে খালিশপুরে থাকতে হয়েছিল। তার মতে যেদিন সে প্রথম ধর্ষণের শিকার হয় সেদিন সে তার ম্যানেজারের সাথে দুপুরের খানা খেতে গিয়েছিল, কাজ শেষে সে তার সাথে তার এপার্টমেন্টেও গিয়েছিল। এবং সেখানেই সে ধর্ষণের শিকার হয়। পরের দিন সে আবার কাজে গিয়েছিল।" এখানে প্রশ্ন হলো, যে ধর্ষণ নিয়ে একাত্তরের পর সে এতবড় জবানবন্দী পেশ করলো এবং ইতিহাসের বইয়ে প্রকান্ড সাক্ষীতে পরিণত হলো, যেদিন সে ধর্ষিতা হলো সেদিন তার নিজের আচরণটি কেমন ছিল? সে যখন ধর্ষিতা হওয়ার মুখে তখনও সে বাধা দেয়নি। প্রতিবাদও করেনি। ধাক্কাধাক্কি করে সে ধর্ষণ থেকে বাঁচবার বা পলায়নেরও চেষ্টা করেনি। যেখানে ধর্ষণকারি হলো স্বয়ং ম্যানেজার, সে স্থান কোন অবস্থাতেই তার জন্য নিরাপদ ছিল না। অথচ সে বিপদজনক স্থান থেকে সেদিন বা পরের দিন পলায়নও করেনি। পরবর্তী নয় মাসেও সে পলায়নের চেষ্টা করেনি। বরং পরের দিন আবার সে অফিসেই কাজে গেছে। অথচ কোন অবস্থাতেই এ বিশ্বাস করা যাবে না যে ফেরদৌসী বন্দী ছিল। নিরাপদ স্থানে সে চলে যেতে পারতো। কিন্তু সে অফিসারটির সাথে ফেরদৌসী একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল এ মর্মে যে তার সাথে সে থাকবে না, তবে যখনই ডাকবে তখনই সে আসবে।

www.pathagar.com

ধর্ষণের ইতিহাস কিভাবে বিকৃতি করা হয়েছে তার একটি নমুনা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আর জেয়াদ আল মালুমের কথোপকথন থেকেই অনুমান করা যায়[৩১১]--

"জেয়াদ আল মালুম বলেন, নুরেমবার্গের পর ১৯৭৩ সালে আমাদের এই আইন হয়েছে। সে সময় প্রতিবেশী দেশ, আইনবেত্তা, যারা আমাদের যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলেন, আইন করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল। মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ সে সময় তারা ঢাকাতে আসেন, বঙ্গবন্ধুর আহবানে ঢাকায় এসে কাজ করেন, তাদেরও ভূমিকা ছিল। তিনি বলেন, আমাদের আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যের জায়গাটা হলো, সাধারণ ফৌজদারী সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয় থাকে, আমাদের ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের আইনে শুধুমাত্র ব্যক্তি সাক্ষী তাই নয়, এমনও হতে পারে, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, এটাতো নিজেই একটা সাক্ষী। টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরের একটা অঞ্চলে রেপের ঘটনা রয়েছে। ছাব্বিশাতে বহু রেপ ভিকটিম আছে।

এ সময় কাদের সিদ্দিকী প্রবল আপত্তি তুলে ধরে বলেন, এখানে আমার আপত্তি আছে। ইতিহাস বিকৃত করা অত্যন্ত অন্যায়। ছাব্বিশাতে একটি রেপও হয়নি। ছাব্বিশা মুক্তিযুদ্ধে আমার নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছিল। ছাব্বিশা গ্রামটি সমস্ত পুড়ে ছারখার করে দিয়েছিল। তাই আমি বলবো, বিভ্রান্ত করা ভালো কাজ না। এটা বিরক্তিকর।

জিয়াদ আল মালুম বলেন, আমি বিভ্রান্ত করছি না। আমাদের কাছে সে ধরনের তথ্য-উপাত্ত আছে। কাদের সিদ্দিকী এ পর্যায়ে বলেন, তথ্য যদি ওই রকম বিভ্রান্তিকর হয় তা হলেতো হবেই। যুদ্ধ করলাম আমি। ছাব্বিশা গ্রামে এক দিনে ৩৬ জন রেপ, যে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা হলো, তখন কেউ রেপ করে?"

পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী বাঙালি ও বিহারি হত্যাকান্ড

বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বলতম দিক হচ্ছে হত্যাকান্ড, নিহত ও ধর্ষণের সংখ্যার অবিশ্বাসযোগ্যতা। একই সঙ্গে ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সনে উর্দূভাষী ও অখন্ড পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী বাঙালিদের মারা যাওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ না করা।

এটাকে ঐতিহাসিকদের উদাসীনতা বলা হবে, না ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাস বিকৃত বলা হবে তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সত্য কথা বলার সাহস এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দিন দিন লয় হচ্ছে তা এক নিমিষেই বলা যায়। সত্য বলার পেছনে মূলতঃ তিন ধরনের ভয় কাজ করে, প্রথমতঃ দশ জনের মধ্যে নয়জন মিলে তাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবে; দ্বিতীয়তঃ সত্যবাদী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এমন সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ; তৃতীয়তঃ সত্যবাদিতার জন্য তাকে অপদস্থ হতে হবে, সহজভাষায় তাকে 'রাজাকার' উপাধি পেতে হবে, এর সম্ভাবনাও প্রায় শতভাগ। জাতি "telling unnecessary lie" অবস্থায় পতিত হয়েছে।

---

[৩১১] RTV Talk show, তারিখঃ ০৬.১০.২০১১

www.pathagar.com

১৯৭৪ সনে আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী দৈনিক জনপদ পত্রিকায় "সাহস করে সত্য কথা বলতে হবে" বলেই তিনি পাড়ি জমান লন্ডনে। (প্রবন্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে এ প্রশ্ন উত্থাপন করে কি কারণে দেশ ত্যাগ করে লন্ডনে বসবাস করছেন তা এখনো রহস্যাবৃত। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়)। ফিরোজ মাহবুব কামাল[৩১২] বলেন "পুলিশ, উকিল বা বিচারকের ভূমিকায় নামা ইতিহাসের লেখকের কাজ নয়।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগের কোন নেতা মারা গেছেন অথবা তাদের আত্নীয়-স্বজনরা মারা গিয়েছেন এমনটা শুনা যায়নি। শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার বলেন "আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোন নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি।"[৩১৩] এর বিপরীতে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে মুক্তিযোদ্ধারা তার বাড়িতেই হত্যা করে। পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের আহবায়ক মৌলভী ফরিদ আহম্মেদকে গুম করা হয়। মুসলিম লীগ নেতা আজিজুল হক চৌধুরী, আব্দুল জব্বার আমীন ও ছোলায়মান পাইকার (চরমপত্র; পৃঃ ৬০৪) কে হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধারা। সাবেক মন্ত্রী জহুরুল হক (লাল মিয়া), সিলেট পিডিপি সভাপতি জসিমউদ্দিন, প্রাক্তন এমএনএ আবদুল হামিদ(চরমপত্র; পৃঃ ৪৩), মুসলিম লীগ নেতা সিরাজুল হক (চরমপত্র; পৃঃ ৪৩), বগুড়ার খোরশেদ আলম (চরমপত্র; পৃঃ ৪৩)সহ শত শত নেতা কর্মীকে যুদ্ধ কালেই হত্যা করা হয়।

সাড়ে ছয় কোটি মানুষ যারা দেশ ত্যাগ করে শরণার্থী হননি (এক কোটি দেশত্যাগী মানুষের মধ্যে ৬০,০০০ জন ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আর বাকীরা ছিলেন শরণার্থী) তারা পড়েছেন বিপদে। মোনায়েম খান মন্ত্রীসভার মন্ত্রী বগুড়ার ফজলুল বারীর মত অনেককেই প্রাণ দিতে হয় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে, আবার ১৬ ডিসেম্বরের পর মারা যেতে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। পাকিস্তান বাহিনীর কাছে বাঙালি এসব মানুষেরা ছিলেন অবিশ্বাসী, মুক্তিযোদ্ধাদের দালাল। পরবর্তীতে এরা হলেন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর দালাল।

ইতিহাসবিদগণ নয় মাসের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হতাহতের সংখ্যা নিয়েই আলোচনা করেন, গবেষকরা তাদের নিয়েই গবেষণা করেন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে ও পরে যে সব বিহারি এবং যুদ্ধকালে বা পরে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য ও তাদের সমর্থনকারী কত জন বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে তার কোন সংখ্যা নির্ণয় করা হয়নি।

---

[৩১২] তিনিও লন্ডন থাকেন। তার e-book 'একাত্তরের আত্মঘাতের ইতিহাস'

[৩১৩] একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ২৩

www.pathagar.com

১৯৭০ সনের নির্বাচনের পূর্বেই বিহারিরা ভীত হয়ে পড়ে। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসরত বিহারিরা দলবদ্ধভাবে থাকা শুরু করে। তারপরও তারা নিজেদেরকে বা পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষা করতে পারেননি। স্কুল-কলেজ ও কর্মস্থলে যাতায়াতকালে তাদের উপর আক্রমণ হতে শুরু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপর, লালমনিরহাট, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য স্থানে ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখ হতেই বিহারি ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানীদের আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ১৯৭১ সনের ঘটনার উপর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে এসব ঘটনায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ১ (এক) লক্ষ উল্লেখ করা হয়।[৩১৪]

১৬ ডিসেম্বরের পর বিহারি হত্যা

সূত্র : http://www.defence.pk/forums/bangladesh-defence/ 135989-old-bangla-photos-74.html accessed on 04.08.2012

---

৩১৪ Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh War, Sarmila Bose; p 180

www.pathagar.com

অধ্যায়: পাঁচ

বাংলাদেশের রাজনীতি ও ঘটনাপ্রবাহ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ এদেশের রাজনীতির একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। ১৯৭২ সনে আদর্শ বা মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যবস্থাপনায় একটি বড় অংশ দখল করলে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি এদেশের রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর জনসমর্থন বাড়তে থাকে। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির (সিপিবি) ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন ডাকসু নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেলে তরুণ সমাজকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে ধাবিত করে। আওয়ামী লীগ থেকে বিভক্ত হয়ে গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" শ্লোগান নিয়ে সারাদেশে গণজোয়ার আনতে সক্ষম হয়। এ সময় দেশে ইসলামপন্থী বা মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের কোন দল, সংগঠন বা ব্যক্তির কথা বলার অধিকার ছিল না।[৩১৫] ১৯৭৫ সনের পট পরিবর্তন ও ১৯৮৯ তে বিশ্বব্যবস্থাপনায় সমাজতন্ত্রের পতন[৩১৬] হলে এখানকার রাজনীতিতে নতুন মোড় পরিলক্ষিত হয়। ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের সবচেয়ে বড় দল হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), দ্বিতীয় বড় দল হচ্ছে জাতীয় পার্টি এবং ইসলামপন্থী সবচেয়ে বড় দল হচ্ছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হবে, তবে আওয়ামী লীগ যেহেতু এ দেশের সবচেয়ে আলোচিত দল এবং যুদ্ধাপরাধী ইস্যু নিয়ে সোচ্চার, তাই এ দল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

মুসলিম লীগ

১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাজ্যের প্রশংসার মাধ্যমে এ দেশের মানুষের অধিকারের দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। জাতীয় কংগ্রেস মুখে সকল মানুষের কথা বললেও তাদের আচার-আচরণে হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে তারা বিশেষভাবে মনোযোগী ছিল। তাই হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে এ সংগঠনে সম্পৃক্ত করতে অনীহা প্রদর্শন করে। ফলে তার প্রথম কংগ্রেসে ৭২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র দু'জন মুসলমানকে উপস্থিত দেখা যায়।

---

৩১৫ ১৯৭২ সনের বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল।

৩১৬ ১৯৮৯ সনে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া ও রুমানিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে তার রিপাবলিকগুলো আলাদা আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

আলিগড় থেকে পাশ করা মুসলিম নেতৃবৃন্দসহ সর্ব ভারতের মুসলমানগণ নিজেদের অস্তিত্বের লক্ষ্যে পথের সন্ধান করছিলেন। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর আহবানে ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় All India Mohamedans Education Conference-এ তিনি All India Muslim League গঠনের প্রস্তাব করেন। এ অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ৬৫০ জন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে এ প্রস্তাবের সমর্থন করেন হাকিম আজমল খান, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, জাফর আলী খানসহ আরো আনেকে। তৃতীয় আগা খানকে (Sir Agha Khan III) সভাপতি এবং নবাব ভিখারুল মুলক (Nawab Waqar-ul-Mulk) ও নবাব মহসানুল মুলককে (Nawab Muhasan-ul-Mulk) যৌথভাবে সেক্রেটারী করে গঠিত হয় মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বভারতীয় সংগঠন All India Muslim League (মুসলিম লীগ)। ১৯১৩ সনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাব মুসলমানদের স্বাধীন ভূমি জন্মের সূতিকাগার হিসেবে চিহ্নিত হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকারী দল মুসলিম লীগের ক্ষমতার কোন্দল দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই সংগঠনকে দুর্বল করে দেয়। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী ফজলুল হক হলে এক ছাত্র সভায় গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। আহ্বায়ক নিযুক্ত হন নঈমুদ্দিন আহমদ। সদস্য হলেন- বরিশালের আব্দুর রহমান চৌধুরী, ফরিদপুরের শেখ মুজিবুর রহমান, কুমিল্লার অলি আহাদ, নোয়াখালীর আজিজ আহমদ, পাবনার আব্দুল মতিন, দিনাজপুরের দবিরুল ইসলাম, রংপুরের মফিজুর রহমান, খুলনার শেখ আব্দুল আজিজ, ঢাকার নওয়াব আলী, ঢাকা নগরীর নূরুল কবীর, কুষ্টিয়ার আব্দুল আজিজ, সৈয়দ নুরুল আলম ও আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী প্রমুখ।[৩১৭]

গৌরবের ৫৫ বছর নামক স্মারকগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে "এ সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী[৩১৮] ঢাকা হাইকোর্টে দবিরুল ইসলামের হেবিয়াস কার্পাস মামলাটি পরিচালনার জন্য ঢাকা আসেন। তখন বিরোধী বিক্ষুব্ধদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ইতোমধ্যে তিনি মুসলিম লীগের বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পক্ষে নতুন করে দল গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। তিনি ঢাকার নেতা কর্মীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে, যাতে করে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং একমাত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই জনগণের ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব। আওয়ামী লীগ নামটিও তার দেয়া।[৩১৯] কিন্তু আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন "শহীদ সাহেব

---

৩১৭ গৌরবের ৫৫ বছর, স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ; পৃঃ ২১

৩১৮ আওয়ামী লীগ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এ দলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করে।

৩১৯ গৌরবের ৫৫ বছর, স্মারকগ্রন্থ ,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, পৃঃ ২২

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান এবং মিয়া ইফতেখারউদ্দিনের সঙ্গে মিলে জিন্নাহ মুসলিম লীগ গঠন করেন। সুতরাং যারা মনে করেন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের স্থপতি সোহরাওয়ার্দি তারা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার সঠিক ইতিহাস জানে না।"[৩২০]

অন্য বর্ণনা মতে আসাম হতে আগত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দক্ষিণ টাংগাইল নির্বাচনী কেন্দ্র হতে করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী ও অপর দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনী ত্রুটির অপরাধে গভর্ণরের এক আদেশ বলে মাওলানা ভাসানী, খুররম খান পন্নী ও অন্যান্য প্রার্থীকে ১৯৫০ সাল অবধি নির্বাচনী প্রার্থী হবার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

উপরোক্ত শূন্য আসন পূর্ণ করার প্রয়োজনে সরকার ২৬ এপ্রিল ১৯৪৯ উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে। এবারের মুসলিম লীগ সরকার স্বীয় স্বার্থেই খুররম খান পন্নীর পূর্ব ঘোষিত অযোগ্যতা বাতিল করে তাকে অনুষ্ঠিতব্য উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায়। আনুষ্ঠানিক ভাবে পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধী দল জন্ম না নিলেও মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী তরুণদের সক্রিয় নেতৃত্বে ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে অবস্থিত পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবির কাজ করে। তরুণ নেতা জনাব শামসুল হক উক্ত কর্মী শিবিরের নেতা ছিলেন। তিনিই এ উপনির্বাচনে সরকারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। সেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সকাল ১০টার সময় কে.এম. দাশ লেনের কে এম বশিরের রোজ গার্ডেনে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন দল প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন আতাউর রহমান খান, সাখাওয়াত হোসেন, আলী আহমেদ এমএলএ, আলী আমজাদ খান অ্যাডভেকেট, আব্দুস সালাম খান অ্যাডভোকেট। সাধারণ সম্পাদক হলেন টাঙ্গাইলের শামসুল হক। যুগ্ম সম্পাদক হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। দু'জন সহকারী সম্পাদক খন্দকার মোশতাক এবং এ কে এম রফিকুল হোসেন[৩২১]। কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম মেনিফেস্টোতে বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কাজ ও কর্তব্য হলো আল্লাহর নির্দেশ ও পদ্ধতি অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামগ্রিক সুখ-শান্তি, উন্নতি, কল্যাণ, এবং তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সাধনা করা এবং সংগ্রাম করা। পাকিস্তানের খেলাফত অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিকস ব্রিটিশ সরকারের বাইরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হবে।[৩২২]

---

৩২০ ইতিহাসের রক্তপলাশ, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, পৃঃ ১৬৬

৩২১ এ কে এম রফিকুল হোসেন স্বাধীনতা বিরোধী কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন।

৩২২ গৌরবের ৫৫ বছর, স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ; পৃঃ ২৩

www.pathagar.com

১৯৫২ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাবস্থায় শামসুল হক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত[৩২৩] অবস্থায় কারামুক্তি লাভ করেন। শামসুল হক ১৯৫২ সালে কারান্তরালে থাকায় যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে[৩২৪] তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নতুন নামকরণ করা হয় "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ"।

আওয়ামী লীগের শাসনামল (যুক্তফ্রন্ট) (১৯৫৪-৫৭)

১৯৫৩ সনে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, খিলাফত-ই-রব্বানী পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টি ইত্যাদি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। একই সনের ১১ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে ২১দফা অনুমোদিত হয়, যা পরে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিণত হয়।

১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৩০৯ টি আসনের মধ্যে সাধারণ আসনের সংখ্যা ২৩৭ টি যার যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩ টি (পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় একশত তেতাল্লিশটি আসন), মুসলিম লীগ ৯টি এবং স্বতন্ত্র ৫টি। অন্যদিকে সংখ্যালঘু আসনে জাতীয় কংগ্রেস ২৫টি, সিডিউল কাস্ট (তফশীলী) ফেডারেশন ২৭টি, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি আসন এবং গণতন্ত্রী দল ৩টি আসন।

শাসকদল মুসলিম লীগের ভরাডুবি ও যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় শাসকগোষ্ঠীর কাছে এ অঞ্চলের মানুষের 'নতুন ম্যাসেজ' ছিল। যুক্তফ্রন্টের একতরফা জয়ে হতভম্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল প্রমাদ গুণলেও ২৫ মার্চ ১৯৫৪ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে ২ এপ্রিল ১৯৫৪ তারিখে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের পার্লামেন্টারী সভায় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে নেতা নির্বাচিত হন। ৩ এপ্রিল শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। শেরে বাংলার সঙ্গে আবু হোসেন সরকার ও শেরে বাংলার ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) শপথ গ্রহণ করেন। সর্ব বৃহৎ অংগদল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ হতে কাউকেও মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হয়নি। ফলে অনৈক্যের সৃষ্টি হলো। শেরে বাংলার আচরণে বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেরে বাংলার সরকারকে বেকায়দায় ফেলার সুযোগ অন্বেষণে লিপ্ত হয়।

---

৩২৩ প্রচলিত আছে যে, শামসুল হক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাবস্থায় দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়নে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

৩২৪ রূপমহল সিনেমা হলটি সদরঘাটে ছিল, বর্তমানে তা ভেঙে মার্কেট করা হয়েছে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক musical chair খেলায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান। পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের প্রশ্নে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। বিভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির একাংশ আওয়ামী লীগ দলীয় মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বিরুদ্ধে উপদল গঠনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মাওলানা ভাসানী ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এ ত্রিশুঙ্ক অবস্থা লক্ষ্য করে দ্বিধাবিভক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টি অভ্যন্তরীণ কোন্দল ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সৈয়দ আজিজুল হক স্বীয় নেতৃত্বের দাবী ত্যাগ করে পার্লামেন্টারী নেতা সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের পক্ষে আস্থা জ্ঞাপন করেন। গভর্ণর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান সরকারের প্রতি সংখ্যাগুরু সদস্যের আস্থা নেই অজুহাতে তাকে পদচ্যুত করেন এবং আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানান। এদিকে সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূন ৩১ মার্চ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হককে গভর্ণর পদ হতে অপসারণ করেন এবং ১ এপ্রিল প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী অস্থায়ী গভর্ণরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এক ঘন্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে পদচ্যুত করেন। পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আতাউর রহমান খান নয় সদস্য বিশিষ্ট সরকার গঠন করেন। নীতিজ্ঞান বর্জিত ও ক্ষমতার লালসায় এই রাজনীতির খেলা দেশবাসীকে হতবাক ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলশ্রুতিতে সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়।

দলের নিম্নমুখী জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী অবাঙালি বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মূখ্য মন্ত্রী আতাউর রহমান খান ৪ জুন ১৯৫৮ করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, কেন্দ্রীয় সামরিক বেসামরিক চাকরিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন।

১৮ জুন ১৯৫৮ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে তেত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট ন্যাপ নিরপেক্ষ থাকার দরুণ আতাউর রহমান খান সরকার সংখ্যাধিক্য হারিয়ে ফেলে এবং ১৯ জুন আবু হোসেন সরকার পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু ২২ জুন ১৯৫৮ অনাস্থা ভোটে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আটাশজন সদস্য মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার ফলে আবু হোসেন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ২৫ জুন ১৯৫৮ পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। ২২ জুলাই ১৯৫৮ আতাউর রহমান খান পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানের নবম সরকার গঠন করেন। সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহুত হয়। সরকার দলীয় স্পীকার আবদুল হাকিমের সঙ্গে ন্যাপের সংসদ সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলীর মতবিরোধ দেখা দেয়ায় স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। এ প্রস্তাব পাশ

www.pathagar.com

হলে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে পরিষদ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৩ সেপ্টেম্বরে ভারপ্রাপ্ত স্পীকার শাহেদ আলী পরিষদ অভ্যন্তরে ছুড়ে মারা চেয়ারের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন[৩২৫] এবং ২৬ সেপ্টেম্বরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয় এবং ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারী ঘটে।

আওয়ামী শাসনের একটি চিত্র তুলে ধরে অলি আহাদ বলেন "যেহেতু অন্যায়ের মানসিকতা লইয়াই মন্ত্রীত্বের গদিতে আসীন হইয়াছিলেন সেহেতু শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্মীদেরকে অন্যায় প্রশ্রয় দিতে সামান্যতম বিবেক দংশনবোধ করিতেন না। নেতা কর্তৃক অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ ও প্রশ্রয় দানে সচ্চরিত্র আদর্শবাদী একনিষ্ঠ কর্মীকূল কালের বিবর্তনে হতাশা ও নিরাশার শিকারে পরিণত হন। শুধু তাই নয় পরিশেষে তাহার ঘুণে ধরা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্কার ও ব্যবসা প্রবর্তন এর দৃঢ় সংকল্প পরিহার করিতে বাধ্য হন। এভাবেই নৈতিক, চারিত্রিক, ও মানসিক শক্তি হারাইয়া সরল প্রাণ কর্মীদের সামগ্রিক অবস্থার বিপাকে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয় এবং অনেক কর্মী লোভ লালসার বশবর্তী হইয়া সরকারী আনুকূল্যে সহজপথে অর্থোপার্জনে আত্মনিয়োগ করেন। দূর্নীতির বিষ ফণার ছোবলে সমগ্র সমাজদেহ বিষে জর্জরিত হয়ে ওঠে। অথচ দুর্নীতি দমন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই হুঙ্কার ছাড়িতেন যে, তিন পয়সার পোষ্টকার্ড এ লিখিয়া পাঠাইলে তিনি দুর্নীতিবাজদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। হুঙ্কার এর তুবড়ীতে দুর্নীতি কতটুকু মুলোৎপাটিত হইয়াছে দেশবাসী উত্তম ভাবেই তাহা অবগত আছেন। ঢাকার ধানমন্ডীতে তাহার তেতলা বাড়িটি তার দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টার এক দুর্বোধ্য ও বিচিত্র নজীর"।[৩২৬]

আওয়ামী লীগের ৬ দফা (১৯৬৬)

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী নেজামে ইসলাম পার্টির প্রধান লাহোরের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে পাকিস্তানের সবগুলো বিরোধী দলের সভা বসে। কিন্তু তার আগে ৫ ফেব্রুয়ারী সরকার ঐ বৈঠকের সকল খবরাখবর প্রকাশ নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারি করে। বৈঠকে নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ যোগদান করে। এ বৈঠকেই শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি পেশ করেন। কিন্তু বিরোধীদলগুলো কোন অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন নিয়ে কথা না তোলার জন্য আহ্বান জানায়। আওয়ামী লীগ বৈঠক বর্জন করে। ঐ দিনেই তিনি লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলন করে ৬ দফা ঘোষণা করেন। ১৯৬৬ সালের ৭ মার্চ পাকিস্তানের সকল পত্র পত্রিকায় ৬ দফার খবর ছাপা হয়। ১৯৬৬ সালের ১১ মার্চ শেখ মুজিব

---

৩২৫ কথিত যে, শেখ মুজিব প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশনে ভারপ্রাপ্ত স্পীকার শাহেদ আলীকে লক্ষ্য করে চেয়ার ছুড়ে মারেন।

৩২৬ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, অলি আহাদ, পৃঃ ২৫৬

www.pathagar.com

ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দফার ব্যাখ্যা করেন। তিনি এটাকে বাঙালীর বাঁচার দাবী বলে আখ্যায়িত করেন।

৬ দফার বিবরণ--

১. পাকিস্তান একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। আইন সভা সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে গঠিত হইবে।

২. ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে শুধুমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি থাকিবে। অবশিষ্ট সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩. প্রথমত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময় যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করা হবে। অথবা দুই প্রদেশের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে তবে ফেডারেল ব্যাংকের হাতে মুদ্রা থাকিবে এবং এমন বিধান করিতে হইবে যেন পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে।

৪. খাজনা, ট্যাক্স, আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে তবে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই আদায়কৃত করের অংশ পাইবে।

৫. প্রাদেশিক সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থা রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র হিসাব থাকিবে। বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রাদেশিক সরকার বিদেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে।

৬. প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের নিরাপত্তার জন্য প্রাদেশিক সরকার প্যারা-মিলিটারী বাহিনী গঠন করিতে পারিবে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র এবং এ নিয়ে মামলা

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে বাঙালি সদস্যদের অস্বস্তিকর অবস্থার ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন কর্মকর্তা বা সৈনিক নিজেদের এ অবস্থা কিভাবে পরিবর্তন করা যায় তা চিন্তা করতে থাকেন। নৌ-বাহিনীর লেফটেন্যান্ট[৩২৭] মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠিত হয়। এ বিপ্লবী সংস্থার কয়েকজন ১৯৬৪ সনের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে করাচীতে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন। ধীরে ধীরে সেনা বাহিনীর কিছু অফিসার ও জোয়ানদের সঙ্গে বিপ্লবী সংস্থার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বিপ্লবী সংস্থার প্রতি শেখ মুজিব সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করলে সামরিক বাহিনীর ঐ সকল সদস্য অতি উৎসাহী হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার

---

[৩২৭] সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদের সমান।

www.pathagar.com

আসামী কর্ণেল শওকত আলী[৩২৮] বলেন "আমরা ষড়যন্ত্রকারী ছিলাম না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আমরা বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বাঙালীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবকটি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে আক্রমণ চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অস্ত্র কেড়ে নেব, তাদের বন্দী করব, এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করব।"[৩২৯]

আগরতলায় গিয়ে ভারতীয় লেঃ কর্ণেল মিশ্র, মেজর মেনন[৩৩০] এব আরো কয়েকজনের সঙ্গে তাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার বিষয়টি স্বীকার করে কর্ণেল শওকত আলী বলেন "স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান[৩৩১] এবং মোহাম্মদ আলী রেজা[৩৩২] ১২ থেকে ১৫ জুলাই ১৯৬৭ তারিখের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সম্ভাব্য ভারতীয় সাহায্যের বিষয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আগরতলা যান। সরকারি এই ভাষ্য সত্যি হলেও আমাদের প্রতিনিধিদ্বয়ের আগরতলা সফরের ফলে কোন ভারতীয় সাহায্য আমাদের কাছে বা অন্য কারো কাছে আসার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"[৩৩৩]

১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ১৯ জনকে গ্রেফতার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চালু করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের এক অর্ডিন্যান্সে জানানো হয় যে, পাকিস্তান পেনাল কোডের ১২১ এবং ১৩১ ধারায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্যদের বিচার করা হবে। এ জন্য ঢাকায় বিশেষ একটি আদালত গঠন করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এস এ রহমান ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি মুজিবর রহমান ও মকসুদুল হাকিমের সমন্বয়ে গঠিত কুর্মিটোলা সেনানিবাসের বিশেষ আদালতে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বিচার শুরু হয়।[৩৩৪]

---

৩২৮ বর্তমান সংসদের (২০০৮-২০১৩) ডেপুটি স্পীকার।

৩২৯ সত্য মামলা আগরতলা,কর্ণেল শওকত আলী; ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৩০ শঙ্কর নায়ারের ছদ্ম নাম কর্ণেল মেনন যিনি পরবর্তীতে 'র' এর একজন পরিচালক ছিলেন।

৩৩১ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী নং -৩, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যাকে মুজিব বাহিনী হত্যা করে।

৩৩২ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী নং- ৩৩

৩৩৩ সত্য মামলা আগরতলা,কর্ণেল শওকত আলী; পৃঃ ১৫

৩৩৪ অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন: শেখ মুজিবুর রহমান, লে.কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মজিবর রহমান, এল এস সুলতান আহমদ, এলএসডিআই নূর মোহাম্মদ, আহমদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ, প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন, ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, খন্দকার রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, বিভূতি ভূষণ ওরফে মানিক চৌধুরী, বিধান কৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ খুরশীদ, খান এম শামসুর রহমান সিএসপি, হাবিলদার একেএম শামসুল হক, মেজর শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন এএন এম রহমান, প্রাক্তন সুবেদার এএকে তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ ও ফার্স্ট লে. আবদুর রউফ।

www.pathagar.com

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আওয়ামী লীগের প্রচারণার কারণে এবং পশ্চিমাদের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে এ অঞ্চলের মানুষ মামলাটিকে মিথ্যে ও এ অঞ্চলের মানুষকে দাবিয়ে রাখার অপকৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকারের পক্ষে প্রশাসনের কাজ চালিয়ে যাওয়াটা প্রায় মুশকিল হয়ে উঠেছিল। সরকার বেসামাল হয়ে ওঠে।

ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, এনএসএফ'র একাংশ এবং ডাকসুর সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর নেতৃত্বে গণআন্দোলন ২৪ জানুয়ারী গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের থেকে ১৯৬৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয় যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা না পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট ফজলুল হক ও সার্জেন্ট জহিরুল হকের ওপর গুলি চালায়। সার্জেন্ট জহিরুল হক ঘটনাস্থলে নিহত হন। কেউ কেউ এটা আইউব বিরোধী সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্র বলেন। যা হোক খবরটি ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে। ১৮ ফেব্রুযারী কারফিউ ভেঙে রাজপথে নেমে আসে ছাত্র জনতা। পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬৯ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী আইউব খান এক বেতার ভাষণে আগরতলা মামলা খারিজ করার ঘোষণা দেন। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা বলে এতদিন প্রচার করার ফলে মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে এটি একটি ষড়যন্ত্র মামলা। কিন্তু বর্তমান সংসদের ডেপুটি স্পীকার কর্ণেল শওকত আলী সত্য মামলা আগরতলা উল্লেখ করে বলেন "তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কৌশলগত কারণে বঙ্গবন্ধুসহ আমরা সবাই বিশেষ ট্রাইবুনালে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছিলাম। বাঙালি জাতিও মামলাটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অবহিত করে তা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিল। তা ছিল ১৯৬৮-৬৯ সালের কথা। কিন্তু এখনতো ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৩৩৫]

প্রশ্ন হচ্ছে পার্বত্য চট্টগামের শান্তি বাহিনী অথবা সেখান থেকে নিয়োগকৃত সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ যদি অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগামের অঞ্চলের সবকটি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশী সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, তাদের বন্দী করে এবং শন্তু লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগামের অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা হলে তাকে আমরা কোনভাবে গ্রহণ করব?

শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসনামল (১৯৭২-৭৫)

স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসে। একটি নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের প্রশাসন চালানোর দায়িত্ব পড়ে শেখ মুজিবের উপর।

---

৩৩৫ সত্য মামলা আগরতলা, কর্ণেল শওকত আলী পৃঃ ভূমিকা

www.pathagar.com

গবেষকদের বিশ্লেষণে প্রতীয়মান যে গোড়াতেই শেখ মুজিবের উপলদ্ধি ছিল ভারতের সহায়তায় পাকিস্তান ভাঙা সঠিক হয়নি।[৩৩৬] তাকে দেখলে যেখানে পাকিস্তানী জেনারেলরা দাঁড়িয়ে স্যালুট করতো, আজ একজন ভারতীয় মেজরকে দেখলে তাকেই উঠে দাড়াতে হয়। তার সিভিল প্রশাসন চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টরা।[৩৩৭] তার দেশে চলছে ভারতীয় মুদ্রা। ভারতীয় পচা জিনিসে বাজার সয়লাব। তার দেশের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। মুসলিম বিশ্ব থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সাত দফা চুক্তি হয় তা স্বাক্ষর করার পর মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন, সেই চুক্তিকে অলিখিতভাবে ভঙ্গ করে শেখ মুজিব একজন স্বাধীন রাষ্ট্রপতি হিসাবে দেশ চালাতে গিয়ে কোন দিন মুজিবনগর সফর করেননি। ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশে ভিন্ন মুদ্রা চালু করেন।

১৯৭২ সনের ৬ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব কলকাতা সফরে যান। দমদম বিমান বন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাকে অভ্যর্থনা জানান। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তিনি বিশাল জনসভায় ভাষণে ভারতের সরকার ও জনগণকে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতা দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। "জনসভা শেষে রাজভবনে ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন। উক্ত বৈঠকে প্রথম সুযোগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধী উক্ত বিষয়ে এ পর্যায়ে বলেন,' বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি তো এখনও পর্যন্ত নাজুক রয়েছে। পুরো সিচুয়েশন বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই করা হবে।' যাহোক, এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিত আলাপের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ ১৯৭২ তারিখ থেকে ২৫ মার্চ তারিখের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।"[৩৩৮]

মতিউর রহমান চৌধুরী[৩৩৯]বলেন, "ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার নিয়ে শেখ সাহেব মিসেস গান্ধীকে এক বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন কলকাতার গভর্নর হাউসে। মিসেস গান্ধীর সাথে কথা হচ্ছে নানা বিষয়ে। পাশে ভারতের সমরনায়করা উপস্থিত। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনটিতে শেখ সাহেব হঠাৎ বললেন, আমি একটি কথা বলতে চাই... আপনি কবে আপনার সৈন্য আমার দেশ থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

---

[৩৩৬] 'শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন'– মতিউর রহমান চৌধুরী ঃ নাঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত, বাড়ী ৫০ সড়ক ২ এ ধানমন্ডি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কাগজ', ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৯০

[৩৩৭] দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ৩৫৩

[৩৩৮] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ , ড. এম এ ওয়াজেদ : পৃঃ ১৪০

[৩৩৯] দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক।

www.pathagar.com

আমাকে অনেক কথা শুনতে হচ্ছে এজন্যে। মিসেস গান্ধী জেনারেল মানেকশ'র দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, আপনি যেদিন বলেন সেদিনই।...ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট জৈল সিং সম্প্রতি বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা ঠিক হয়নি। মিসেস গান্ধী শেখ সাহেবের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার কারণে চটজলদি সম্মতি দিয়েছিলেন।....পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও শেখ সাহেব ভারতের চাপিয়ে দেয়া নীতি মেনে নেননি। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার লাহোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। ভারত চায়নি শেখ সাহেব লাহোর যান। মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে ভিন্নমতও ছিল। শেখ বলেছিলেন, আমি লাহোর যাব এবং ও আই সি'র সদস্যপদ লাভ করব। কে কি বলল তাতে কিছু যায়-আসে না। (দিল্লীর) সাউথ ব্লকের একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করেছিলেন, শেখ মুজিব বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছেন। শেখ সাহেবকে যখন এ মন্তব্য অবহিত করা হলো তখন শেখ সাহেব বলেছিলেন, সবে তো শুরু, ওরা কি পেয়েছে?"[৩৪০] ১৫ মার্চ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয় এবং "১৯৭৪-এর মাঝামাঝি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার থেকে সব ইন্ডিয়ান কনটিজেন্ট উইথড্র করে নিয়ে যাওয়া হয়।" [৩৪১] কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তির বীজ তারা তখনই বপন করে যায়।

শেখ মুজিব মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রথম সুযোগ হিসাবে ১৯৭৪ সনে লাহোরে OIC সম্মেলনে যোগদান করেন। তাজউদ্দিন সেখানে যাওয়ার পূর্বে ইন্দিরার অনুমতি নেয়ার কথা বললে, শেখ মুজিব প্রচন্ড বিরক্তিসহ বলেন "ইন্ডিয়া কি তোর বাপ?"[৩৪২] আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন "এই সময় বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে যে খবরটা প্রচারিত হয়নি, তা হচ্ছে, ইসলামী সম্মেলনে মুজিবের যোগদানের আগে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার যে বৈঠক হয়েছিল, তাতে অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন এবং তার মতের[৩৪৩] মন্ত্রীরা শেখ সাহেবকে লাহোরে যেতে নিষেধ করেন। তাদের প্রস্তাব ছিল, শেখ সাহেবের পরিবর্তে অন্য একজন প্রবীণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলকে লাহোরে পাঠানোই যথেষ্ট হবে।"[৩৪৪]

১৯৭৪ সনে বামপন্থীরা যখন মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের জন্য উঠে পড়ে লাগে, মস্কোপন্থীরা যখন সরকারের অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন শেখ মুজিব মিষ্টির হাঁড়িতে ভাসানীকে ছোট্ট চিরকুট পাঠালেন - "মাওলানা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে বাঁচান।" সে সময়ে বিলুপ্ত 'ইসলামিক একাডেমী' ও 'বায়তুল মোকারম সোসাইটি'কে একত্রিত করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামে পুনর্জ্জীবিত করার আদেশ প্রদান করেন। তিনি

---

৩৪০ শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন, মতিউর রহমান চৌধুরী, সাপ্তাহিক 'কাগজ'; সম্পাদক নঈমুল ইসলাম খান; ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা , ১১.০১,১৯৯০

৩৪১ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি , ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ; পৃঃ ৩৬-৩৭

৩৪২ নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ রাজনীতিক এ তথ্য দেন।

৩৪৩ ১০০% ভারতীয়।

৩৪৪ ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; পৃঃ ১৫

www.pathagar.com

আরো উপলব্ধি করেছিলেন দেশে মানুষে মানুষে বিভাজন এনে দেশকে উন্নতির দিকে নেয়া সম্ভব নয়, তাই তিনি বিভাজনের হাতিয়ার পাক বাহিনীর সহযোগী সকলকে সাধারণ ক্ষমা করে দেন।

শেখ মুজিবের উপলব্ধি আর অন্যান্য নেতা-কর্মীদের উপলব্ধি সমান্তরাল না হওয়াতে দেশে অরাজকতা শুরু হয়। RAW শেখ মুজিবের উপলব্ধির বিপরীতে অবস্থান নিয়ে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিহারিদের বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা দখলে মেতে ওঠে। থানা আওয়ামী লীগ অফিস, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ অফিস, ওয়ার্ডের শাখা আওয়ামী লীগ অফিস ইত্যাদি সাইনবোর্ড টানানোর মাধ্যমে দখলী কার্যক্রম শুরু করে তারা। ধীরে ধীরে সাইনবোর্ড সরিয়ে ব্যক্তি মালিকানায় প্রায় কয়েক লাখ বাড়ি ঘর দখল করে। ১৯৮৬ সনে প্রকাশিত গেজেটে বিহারিদেরকে বিতাড়িত করা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা বাড়ির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,৪২৭টি।[৩৪৫]

বাড়ি দখল করতে গিয়ে হাজার হাজার নিরীহ বিহারিকে হত্যা ও মহিলাদের উপর নির্যাতন করা হয়। একই সময় ভারতীয় বাহিনী বিহারিদের বাড়িঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি --স্বর্ণালঙ্কার, টাকা, টেলিভিশন, ফ্রীজ সৌখিন তৈজসপত্র লুট করে নিয়ে গিয়েছে। ১৯৭১ সনের নিহত বুদ্ধিজীবীদের একজন ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র (জি সি) দেবের বাড়ি দখল করে আওয়ামী লীগের তৎকালীন কর্মী ও বর্তমানের বড় নেতা।[৩৪৬] শেখ কামাল ধানমন্ডির বিহারি ক্রীড়া সংগঠক কামালের কামাল স্পোর্টিং ক্লাব দখল করে নেয় এবং পরবর্তীতে তার নাম বদলিয়ে করা হয় আবাহনী ক্রীড়াচক্র।

বিহারিদের সম্পত্তি ২৩, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ যা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত সেটিকে গত ৩৮ বছর যাবৎ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। খালেদা জিয়ার বাড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করে পরে কোন বিপদে পড়তে হয় ভেবে সম্প্রতি অবৈধ পন্থায় বাড়িটি তারা ক্রয় করে। আওয়ামী লীগের সকল নেতা-কর্মীর আবদার মিটাতে গিয়ে শেখ মুজিব তার প্রশাসনিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। 'চাটার গোষ্ঠীরা' সব চেটে খেলেও শেখ মুজিবের কিছুই করার থাকে না। অপশাসনে তলিয়ে যেতে থাকে শেখ মুজিবের শাসনামল।

আওয়ামী লীগের অপশাসনের প্রতিবাদে, সে দল থেকেই জন্ম নেয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। কয়েক মাসের মধ্যেই জাসদ শক্তিশালী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আর জাসদের ৩২ হাজার নেতা কর্মীকে তাই জীবন দিতে হয় এদের হাতে । তারপরও যখন ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই এবং ফলাফল বদল করে তাকে জিতাতে হয় ।

---

[৩৪৫] বাংলাদেশ গেজেট; অতিরিক্ত সংখ্যা; তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

[৩৪৬] সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখ ০১.০৪.২০১০

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের আদেশে খন্দকার মোশতাক আহমদকে জয়ী আর আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ারকে হারানোর জন্যে দাউদকান্দি থেকে ব্যালট বাক্স হেলিকপ্টারে করে গণভবনে আনা হয় [৩৪৭]; সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবের শাসনামলের এ কীর্তি অবাক চোখে দেখতে থাকে ।

১৯৭৩ সনের ১ জানুয়ারি ঢাকার প্রেস ক্লাবের বিপরীতে সামনে মিছিল করলে পুলিশের গুলিতে মতিউল ইসলাম ও মির্জা কাদিরুল ইসলাম নামে ছাত্র ইউনিয়নের দুজন কর্মী মারা যায় । এর প্রতিবাদে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম শেখ মুজিবকে দেয়া ডাকসুর আজীবন সদস্য পদ দেয়ার সম্মাননা পত্রটি পল্টন ময়দানে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন । এবং যে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করা হয়-

পল্টনের ঘোষণা (নিজস্ব বার্তা পরিবেশক): গতকাল মঙ্গলবার পল্টন ময়দানের জনসমাবেশে শহীদ মতিউল ইসলাম ও শহীদ মির্জা কাদিরুল ইসলামের লাশকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম নিম্নোক্ত ঘোষণা পাঠ করেন । " এই সমাবেশের সামনে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি যে, বিগত ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা যে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলাম ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আজ সেই 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রত্যাহার করে নিলাম । আমরা দেশের আপামর জনসাধারণ, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' বিশেষণ ব্যবহার করবেন না । একদিন ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা আখ্যা দিয়েছিলাম । কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আবার ছাত্রের রক্তে তার হাত কলঙ্কিত করায় আমরা ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, আজ থেকে কেউ আর জাতির পিতা বলবেন না । শেখ মুজিবুর রহমানকে একদিন ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেয়া হয়েছিল । আজকের এই সমাবেশ থেকে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি, আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ বাতিল করে দেয়া হলো ।[৩৪৮]

এই সময়ে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট বাক্স হাইজ্যাক করে শেখ কামাল ইতিহাস তৈরী করেন । শেখ কামালের অপকর্ম এখানেই শেষ নয় । বাংলাদেশ ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ার বিষয়টি ১৯৭৫ পূর্ব সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ছিল । জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শেষে ঐ পুলিশের কি হয়েছে তা আজো অজানা, নিন্দুকেরা বলে এ অপরাধে তাকে জীবন দিতে হয়েছে ।

---

[৩৪৭] দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ ১১.১০.২০০১

[৩৪৮] দৈনিক সংবাদ; ০৩.০১.১৯৭৩

www.pathagar.com

রক্ষী বাহিনীর নির্যাতন

বাংলাদেশ-ভারত ৭ দফা চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশে নিয়মিত সামরিক বাহিনীর পরিবর্তে প্যারামিলিটারী বাহিনী থাকার কথা। শেখ মুজিব প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে সামরিক বাহিনী গঠনের দিকে মনোনিবেশ করলেও ভারতীয় কুটনীতির কাছে তাকে নতি স্বীকার করতে হয়। জেনারেল ওবানের তত্ত্বধানে রক্ষীবাহিনী নামে শক্তিশালী প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করা হয়। রক্ষীবাহিনীর বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতার দাপট সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশী ছিল। ধীরে ধীরে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ কমিয়ে রক্ষীবাহিনীতে নিয়োগ বাড়ানো হয়। সামরিক বাহিনীর মনোবল একদিকে ক্ষীণ হতে থাকে, অন্যদিকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার দিন দিন বাড়তে থাকে। জাসদের নিহত ৩২ হাজার নেতা কর্মীর ২০ হাজারই এদের হাতে মারা যায়। এ বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা যত মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা সমকালীন ইতিহাসে বিরল। শেখ মুজিব এ বাহিনীকে 'লাল ঘোড়া' আখ্যা দিয়ে বাকশাল গঠনের পূর্বে বিরোধী দলকে দমন করার জন্য "লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দিমু" বলে প্রকাশ্যে হুংকার দেন। অস্ত্র উদ্ধারের নামে ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়িতে যুবকদের উপর (সে সময়ে অধিকাংশ যুবকই জাসদপন্থী ছিলেন) যে অত্যাচার করেছে ঐ স্মৃতি কেউ ভুলতে পারে না।

আলাউদ্দিন আরিফ[৩৪৯] এর লেখা 'আমার দেশ' পত্রিকায় ১৫.০১.২০১১ তারিখে প্রকাশিত "রক্ষীবাহিনীর নৃশংসতা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছিল" লেখাটি তুলে দেয়া হলো---

"১৯৭২ সাল থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর নৃশংসতা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছিল। নির্যাতনে ২৭ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে। এছাড়াও ওই সময় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় ১৯ হাজার মানুষ। গুম ও খুন হয় এক লাখ। পিটিয়ে মারা হয় ৭ হাজার মানুষকে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে যেসব প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার ও তার নীতির বিরোধিতা করেছে ঐ সব দলের মতে সে আমলে ২৫ হাজার ভিন্ন মতাবলম্বীকে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। এ হতভাগাদের হত্যা করা হয়েছে চরম নিষ্ঠুর ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে।

ওই সময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী রক্ষীবাহিনীর নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন। তাদের মধ্যে জাতীয় কৃষক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা নবাবগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান খান (সিদ্দিক মাস্টার) খুন হন ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর। ৭৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রক্ষীবাহিনীর হাতে শত শত লোকের সামনে খুন হন জাসদ ছাত্রলীগ নেতা বাবলু,

---

[৩৪৯] আলাউদ্দিন আরিফ সাংবাদিক-কলামিস্ট

www.pathagar.com

রবি, এবাদত আলী, মোতালেব, কালু ও সম্পদসহ অনেকে। রক্ষীবাহিনীর হাতে খুন হওয়া জাসদ কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস জাহাঙ্গীর, গণবাহিনীর দারাজ, মুয়র, আসাদ, মাসুদ হারুন, জাহাঙ্গীরনগরের শাহ বোরহান উদ্দিন রোকন, বুয়েটের নিখিল চন্দ্র সাহা, নরসিংদীর জাসদ নেতা আলাউদ্দিন, গাজীপুরের আক্রাম, জয়নাল, সামসু, বাদল, আনোয়ার, মানিকগঞ্জের সাহাদাত হোসেন বাদল, দেলোয়ার হোসেন হারাজ, আবদুল আউয়াল নাজু, নাজিম, জামালপুরের পেট্রোল, গিয়াসউদ্দিন মাস্টার, নেত্রকোণার আবদুর রশিদ, হাছু মিয়া, ময়মনসিংহের মাসুদুজ্জামান, আবদুল জব্বার, মাদারীপুরের জাহাঙ্গীর, সাদাম, আলী হোসেন, মফিজুর, ফরিদপুরের কামালুজ্জামান, আবদুল হাকিম, রাজশাহীর মনিরুদ্দীন আহমদ, সালাম মাস্টার, রফিক উদ্দিন আহমেদ সেলিম, বগুড়ার আতা, রঞ্জু, মানিক দাশগুপ্ত, তোতা, রানা (কর্ণেল) খলিল, রাজ্জাক (কক), নাটোরের নাসির উদ্দিন, পাবনার আসফাকুর রহমান কালাসহ অনেকে।

মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক হক কথায় ২৬ মে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার প্রোগ্রাম এ দেশে কাজ করে যাচেছ। তাদের হিসাব হলো বাংলাদেশে সোয়া লক্ষ বামপন্থী কর্মীদের হত্যা করতে হবে। তা না হলে শোষণের হাতিয়ার মজবুত করা যাবে না।

রক্ষীবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ছিল খুবই নির্মম ও ভয়াবহ। তারা বাবার সামনে ছেলেকে গুলি করে হত্যার পর বাবার ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে ছেলের গলা কেটে দিতে বাধ্য করে। তাদের উক্তি ছিল 'নিজহাতে তোর ছেলের গলাকেটে দে, ফুটবল খেলব তার মাথা দিয়ে। লেখক আহমেদ মূসা তার 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ' বইয়ের উৎসর্গনামায় মুজিববাদী ঘাতক বাহিনীর অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার বাজিতপুরের ইকুরটিয়া গ্রামের বৃদ্ধ কৃষক আবদুল আলীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা তুলে ধরে লিখেছেন, '....ঐখানে আমাকে (আবদুল আলী) ও আমার ছেলে রশিদকে হাত-পা বেঁধে তারা খুব মারলো। রশিদকে আমার চোখের সামনে গুলি করলো। ঢলে পড়লো বাপ আমার। একটা কসাই আমার হাতে একটা কুড়াল দিয়ে বলল, তোর নিজের হাতে ছেলের গলা কেটে দে, ফুটবল খেলবো তার মাথা দিয়ে। আমার মুখে রা নেই। না দিলে বলল তারা তোরও রেহাই নেই। কিন্তু আমি কি তা পারি? আমি যে বাপ। একটানা দেড় ঘন্টা মারার পর আমার বুকে ও পিঠে বন্দুক ধরলো। শেষে নিজের হাতে কেটে দিলাম ছেলের মাথা। আল্লাহ কি সহ্য করবে?

সাপ্তাহিক হক কথার ২ জুন ১৯৭২ সংখ্যায় লেখা হয়েছে, 'ঢাকা জেলার (বর্তমানে নরসিংদী জেলা) মনোহরদী থানার পাটুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্মকর্তারা দলীয় কর্মীদের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন্ত কবর দিয়েছে। এই অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করিয়া নারায়ণগঞ্জ থানায় চালান দিলে জনৈক এমসিএ হস্তক্ষেপ করিয়া এই নরঘাতকটিকে মুক্ত করিয়াছেন।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহে ১৫শ কিশোরকে হত্যার বর্ণনা দেন লেখক আহমেদ মূসা। ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে '......রক্ষীবাহিনী গত জানুয়ারীতে এক ময়মনসিংহ জেলাতেই অন্তত ১ হাজার ৫শ কিশোরকে হত্যা করেছে। এদের অনেকেই সিরাজ সিকদারের পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি (ইবিসিপি)-এর সদস্য ছিল। অন্যদের মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এমনকি অনেক যুবক যারা রাজনীতিতে ততটা সক্রিয় ছিল না তারাও এই অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন। ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সাবেক ও বর্তমানে সিপিবি নেতা হায়দার আকবর খান রনো 'বাম রাজনীতি: সংকট ও সমস্যা' বইতে লিখেছেন, 'মুজিববাদীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হলো সন্ত্রাসের রাজনীতি, প্রকাশ্য হত্যা, গুপ্ত হত্যা, গুন্ডামি। এগুলো ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পগুলো ছিল হত্যাযজ্ঞের আখড়া। যশোরের কালীগঞ্জ থেকে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প উঠে গেলে সেখানে গণকবর আবিস্কৃত হয়েছিল। যাতে ৬০টি কঙ্কাল পাওয়া যায়। টঙ্গী থানার সামনে মেশিনগান স্থাপন করে শ্রমিক কলোনীর ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হলো। শতাধিক নিহত হলেন।

রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন সম্পর্কে শরিয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার কার্তিকপুরের অরুণা সেনের একটি প্রতিবেদন ছাপা হয় সাপ্তাহিক হলিডের ১৭ মার্চ ১৯৭৪ সংখ্যায়। এছাড়াও মাসিক সংস্কৃতি পত্রিকার ১৯৭৪ এর মে-জুন সংখ্যায় তার একটি বিবৃতি ছাপা হয়েছে। এতে তিনি নড়িয়া ও ডামুঢ্যা ক্যাম্পসহ কয়েকটি ক্যাম্পে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন ও মানুষ হত্যার লোমহর্ষক বর্ণনা দেন। অরুণা সেন বিবৃতিতে বলেন, ১৭ আশ্বিন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা তাদের গ্রামে প্রথম হামলা করে। গ্রামের লোককে মারধর করে তাকে ও লক্ষণ সেন নামে এক কলেজ ছাত্রকে ধরে নিয়ে যায়। তারা অরুনার স্বামী শান্তি সেন ও পুত্র চঞ্চলের অবস্থান জানতে চায়। তাদেরকে মারধর করে ছেড়ে দেয়। এর কিছুদিন পর ৩ ফেব্রুয়ারী রাতে রক্ষীবাহিনীর বিশাল একটি দল তাদের গ্রাম ঘিরে ফেলে। আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক হোসেন খাঁর নেতৃত্বে গ্রামের বালক ও পুরুষ লোকদের এনে হাজির করে। তারা কলিমদ্দি ও মোস্তফাসহ ২০ জন হিন্দু যুবককে ধরে নিয়ে যায়। অরুনা সেন নিজে এবং রীনা ও হনুফা নামে তিন মহিলাকে বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে বলেন, বিপ্লব, মতি ও কৃষি ব্যাংকের পিয়ন আলতাফকে পিটিয়ে মেরে জল্লাদ গর্ব করে বলে দেখ এখনও হাতে রক্ত লেগে আছে। আলতাফকে মারা হয় পিটিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দোতলার ছাদ থেকে ফেলে। ৯ ফেব্রুয়ারী শীতের মধ্যে হনুফা, রীনা ও অরুনা সেনসহ কয়েকজনকে দিনভর পানিতে রেখে মারধর করা হয়। তাদের মধ্যে করিম মারধরে মারা গেছে। অপর একটি ছেলেকেও মেরে ফেলার কথা উল্লেখ করেন অরুনা। টানা কয়েকদিন নির্যাতনের পর ১৯ ফেব্রুয়ারী ডামুঢ্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে নেয়া হয় অরুণা সেন ও রীনাকে। কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ ও হরিপদকে রেখে দেয়। রক্ষীবাহিনী বলছিল তাদের মেরে ফেলা

www.pathagar.com

হবে। অরুণা সেন বের হয়ে আসার পর চারটি গুলির আওয়াজ শোনা যায়। ডামুড্যা ক্যাম্প থেকে তাকে নেয়া হয় মাদারীপুর ক্যাম্পে। শেষ রাতে নেয়া হয় ঢাকায়।"

রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর পরিবারের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন এভাবে, "আমরা তখন থাকি বাবর রোডের একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ির একতলায়। সরকার শহীদ পরিবার হিসেবে আমার মাকে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই নিয়েও লঙ্কাকাণ্ড। এক রাতে রক্ষীবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করল। তাদের দাবি- এই বাড়ি তাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা এখানে থাকবেন। মা শহীদ পরিবার হিসেবে বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার চিঠি দেখালেন। সেই চিঠি তারা মায়ের মুখের ওপর ছুড়ে ফেলল। এরপর শুরু হলো তাণ্ডব। লেপ-তোষক, বইপত্র, রান্নার হাঁড়িকুড়ি তাঁরা রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে শুরু করল। রক্ষীবাহিনীর একজন এসে মায়ের মাথার ওপর রাইফেল তাক করে বলল, এই মুহূর্তে বাড়ি ছেরে বের হন, নয়তো গুলি করব। মা বললেন, গুলি করতে চাইলে গুলি করুন। আমি বাড়ি ছাড়ব না। এত রাতে ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব?

আমার ছোটভাই জাফর ইকবাল[৩৫০] তখন মায়ের হাত ধরে তাঁকে রাস্তায় নিয়ে এল। কী আশ্চর্য দৃশ্য! রাস্তায় নর্দমার পাশে অভুক্ত একটি পরিবার বসে আছে। সেই রাতেই রক্ষীবাহিনীর একজন সুবেদার মেজর ওই বাড়ির একতলায় দাখিল হলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে পড়লেন।"[৩৫১]

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, "আমার বাবর রোডের বাসার কথাই বলি। বেতারে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একতলায় রক্ষীবাহিনীর সুবেদার পালিয়ে গেলেন। তাঁর দুই মেয়ে (একজন গর্ভবতী) ছুটে এল মা'র কাছে। তাদের আশ্রয় দিতে হবে। মা বললেন, তোমাদের আশ্রয় দিতে হবে কেন? তোমরা কী করেছ? তাঁরা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, খালাম্মা, এখন পাবলিক আমাদের মেরে ফেলবে।

এই ছোট্ট ঘটনা থেকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার এবং তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণাও টের পাওয়া যায়।"[৩৫২]

লাল বাহিনীর নির্যাতন

রক্ষী বাহিনীর বাইরে শেখ মুজিব আরো একটি বাহিনী গঠন করেন যার নাম ছিল "লাল বাহিনী"। শ্রমিকলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মীদের দিয়ে গঠিত এ বাহিনীর পোষাক ছিল লাল (বর্তমানে সদরঘাটে কুলিরা যে রং এর জামা পরিধান করে)। প্রতিদিন বিকেলে এদের প্যারামিলিটারী প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ লাল

---

[৩৫০] জাফর ইকবাল সিলেটের শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সময়ের পরিবর্তনে বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগ ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের নেতা।

[৩৫১] দেয়াল, হুমায়ূন আহমেদ পৃঃ ৯৪

[৩৫২] দেয়াল, হুমায়ূন আহমেদ পৃঃ ১০৭

www.pathagar.com

বাহিনীর হাতে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ও ভিন্ন মতাবলম্বী নিহত হন।[৩৫৩] কিছু হলেই শেখ মুজিব হুংকার দিয়ে বলতেন "লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দিমু।"[৩৫৪] শ্রমিক লীগ নেতা আবদুল মান্নানকে ডাকা হতো 'লাল ঘোড়া'।[৩৫৫] অবাক করার বিষয় যে, দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর পর ২০১২ সনের ১২ মার্চ বিএনপির ঢকা চলো মহাসমাবেশকে প্রতিরোধের কাজে বুড়িগংঙ্গায় যেসব আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী সক্রিয় ছিলেন তাদেরকেও লাল বাহিনী নামেই উল্লেখ করা হয়েছে ।[৩৫৬]

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সময়ের অপশাসন ও দুর্বিনীত কর্মকান্ড আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সীমাহীন দুর্নীতি; আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা-কর্মীদের লুটতরাজের প্রতিযোগিতা, প্রশাসন পরিচালনায় চরম ব্যর্থতা দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষের বুভুক্ষ মৃত্যু আর আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের বেওয়ারিশ লাশ দাফনের মিছিল শাসক দলকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে। আওয়ামী লীগের নামে রাজনীতি করা দুষ্কর হয়ে পড়লে ভারত ও রাশিয়ার পরামর্শে শেখ মুজিবকে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (Bangladesh Krishak Sramik Awami League – BAKSAL) বাকশাল নামে নতুন দল গঠন করতে হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মানুষকে এ নতুন দলে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৭ জুন প্রকাশিত ইত্তেফাকসহ কয়েকটি দৈনিকের প্রধান শিরোনাম

---

৩৫৩ দৈনিক আমার দেশ, তারিখঃ ১৩.০৩.২১০১২

৩৫৪ লাল বাহিনী ছিল শেখ মুজিবের লাল ঘোড়া।

৩৫৫ সরকার ৭১, এইচ টি ইমাম; পৃঃ ১৮

৩৫৬ আমার দেশ, ১৩ মার্চ ২০১২

www.pathagar.com

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে সরকার নিয়ন্ত্রিত ৪ (চার) টি পত্রিকা[৩৫৭] ছাড়া সকল পত্রিকা বন্ধ করে দে'য়া হয়। দল নেই কথা নেই, মানুষ এ অবস্থাকে বলতো 'বাক' (মুখ বা কথা) এ দিয়েছে 'শাল' (খুটি বা ছিপি)--বাকশাল গঠন করে সকল দলের নেতা কর্মী, সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে ঐ দলের নেতা কর্মী হিসাবে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়। জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন ছাড়া তৎকালীন সকল রাজনীতিবিদ[৩৫৮], বেসামরিক আমলা বিশেষতঃ সিএসপিগণ, সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাগণের অধিকাংশই মনের ভিতর ক্ষোভ পোষণ করেই ঐ দলে যোগদান করেন। তৎকালীন শ্বাসরূদ্ধকর অবস্থার বর্ণনা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করার ক্ষমতা কোন লেখকের আছে কি না সন্দেহ আছে; যাদের বয়স পঞ্চাশোর্ধ ও সমাজ সচেতন কেবল তারাই সে সময়কার অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন। বাকশাল প্রতিষ্ঠিত থাকলে তথ্য প্রাপ্তি অধিকার (RTI) আইন , গোটা ত্রিশেক টিভি চ্যানেল, শত শত পত্রিকা ও হাজার হাজার সংবাদকর্মী সৃষ্টি কোনটাই সম্ভব ছিল না ।

বাকশাল শাসনের পতন

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার ছিল আওয়ামী লীগের। যুদ্ধ পরবর্তী সকল সমস্যাই তখন বিরাজমান। ভারতীয় মিত্র বাহিনীকে দেশে ফেরৎ পাঠানো[৩৫৯], প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকৃত শরণার্থী পুনর্বাসন, বাংলাদেশী মুদ্রা প্রচলনের মত কাজে সরকার সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু দেশ পুনর্গঠনের সকল ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ সরকার ব্যর্থ হয়। আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগিতার অর্থ ব্যবহারেও তারা ব্যর্থতায় পরিচয় দেয়। সিভিল প্রশাসনের সিএসপি ও ইপিসিএস অফিসারগণ নজরুল-ইন্দিরা ৭ (সাত) দফা চুক্তির ১ম দফার আতঙ্কে কোন নীতি নির্ধারণে সহযোগিতা করেননি। বিপরীতে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত সংস্থা প্রধানদের সীমাহীন দুর্নীতি মানুষের দুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলে। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি জনগণের বিতৃষ্ণা বাড়তে থাকে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দুর্নীতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, স্বয়ং শেখ মুজিব আফসোস করে বলেন যে, "সবাই পায় সোনার খনি আর আমি পাই চোরের খনি" অথবা "চাটার গোষ্ঠীরা সব খাইয়া ফেলে।"

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা চোরাকারবারে জড়িয়ে পড়লে তা বন্ধ করার জন্য শেখ মুজিবের নির্দেশে সেনাবাহিনী নামানো হয়। সেনাবাহিনীর তৎপরতায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগের শত শত নেতা-কর্মী চোরাকারবারের দায়ে ধরা পড়লে শেখ মুজিব ঐ অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সে সময়ের হাজারো দুঃস্বপ্নের মাঝে মানুষের একটি ভাল স্বপ্নকে এভাবেই হত্যা করে শাসকগোষ্ঠী।

---

[৩৫৭] ১৬.০৬.১৯৭৫ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, Bangladesh Observer, Bangladesh Times ছাড়া সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দে'য়া হয়।

[৩৫৮] বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে বাকশালের কোন কমিটিতে রাখা হয়নি।

[৩৫৯] পার্বত্য জেলা সমূহে ভারতীয় সেনা থেকে যায়।

www.pathagar.com

৭২ সনে নতুন নতুন শব্দ যুক্ত হয় আমাদের সমাজে; 'হাইজ্যাকিং' ছিল তখনকার দিনের বহুল প্রচলিত নতুন শব্দ। পত্রিকার পাতা জুড়ে ছিল শত শত হাইজ্যাকিং-এর কাহিনী; রিকসা চালকের সারা দিনের অর্জন হাইজেকিং হওয়া থেকে শুরু করে মানুষের স্থাবর-অস্থাবর সকল ধরণের সম্পদ অবৈধভাবে হাইজ্যাকিং করা ছিল সাধারণ চিত্র।

স্বাধীনতার পর পর অরাজকতার মূল কারণ ছিল অবৈধ অস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা সৎ জীবনযাপনে বিশ্বাসী ছিলেন তারা সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র জমা দেন, বাকীরা হয় কোন অস্ত্র জমা দেননি বা একটি জমা দিয়ে একাধিক অস্ত্র নিজের দখলে রেখেছেন। এদের অনেকেই এ অস্ত্র ব্যবহার করতো হাইজ্যাকিং-এ অথবা জমি দখল, বাড়ি দখল এমনকি নারী দখলে। অস্ত্রধারীদের অধিকাংশই আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় তারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বেপরোয়া হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতা হওয়া এক কথা আর ভাল প্রশাসক হওয়া ভিন্ন কথা। শেখ মুজিব দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় তার দক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি রাও ফরমান আলী ভাল করে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ৭০ সনের নির্বাচনের পর তার (শেখ মুজিব) হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ দিয়ে বলেন I recommend that you hand over power to Mujib. I assure that he will be the most unpoular man in East Pakistan within six month.[৩৬০] (আমি মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুরোধ করছি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, তিনি (শেখ মুজিব) ৬ মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা হারাবেন।)

নেতা-কর্মীদের ব্যাপক দুর্নীতি, চোরাকারবার, ক্ষমতার অপব্যবহার আওয়ামী লীগকে ইমেজ সঙ্কটে ফেলে। জাসদসহ অন্যান্য বামপন্থী দলের আন্দোলন জনপ্রিয়তার লাভ করে ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। তখন শেখ মুজিব বাকশাল গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা সংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় চার খলিফা বলে খ্যাতদের অন্যতম নুরে আলম সিদ্দিকী বাকশাল গঠনের সিদ্ধান্তকে মানতে না পেরে বলেন, "বঙ্গবন্ধু আপনি যদি আমাকে চোখ তুলে আপনার পায়ের সামনে রাখতে বলেন তা হলে তা করতে রাজি আছি কিন্তু আপনার এ সিদ্ধান্তকে মানতে পারলাম না।"[৩৬১] সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ফজিলাতুন্নেসা মুজিবও এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। ড. এম এ ওয়াজেদ বলেন,"এক পর্যায়ে রেহানা ও রাসেলকে উদ্দেশ্য করে শাশুড়ি বলেন, 'তোদের আচার-আচরণ ও মেজাজ তো এখন এরকম

---

[৩৬০] ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে রাও ফরমান আলীর কথোপকথন। বাংলাদেশের জন্ম, রাও ফরমান আলী, অনুবাদঃ মুনতাসির মামুন,পৃঃ ভূমিকা XV

[৩৬১] বাংলাভিশনে টক শোতে নুরে আলম সিদ্দিকীর দেয়া তথ্য।

www.pathagar.com

হবেই। কারণ তোরা তো এখন পে-সিডেন্টের ছেলে-মেয়ে।' শাশুড়ি 'প্রেসিডেন্ট' শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবেই বিকৃত করে উচ্চারণ করলেন বলে আমার মনে হলো।"[৩৬২]

আওয়ামী লীগ বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে বাকশাল গঠিত হলেও শেখ মুজিব সরকারের (তা যে প্রক্রিয়াতেই হোক না কেন) পতন রোধ করা কঠিন তা সকলেই উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর ভাষায় "আপনি জাতীয়তাবাদী নেতা। আমরাও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সাংবাদিক। আপনার নিন্দা বা প্রশংসা যাই করি আপনার সঙ্গেই আমাদের ভাগ্য জড়িত। আপনার উত্থানে আমাদের উত্থান এবং পতনে আমাদের পতন। সর্বশক্তি দিয়ে এই পতনের দিকটি ফেরাতে চাচ্ছি মাত্র।[৩৬৩] কিন্তু পতনের দিকটি ফেরাতে পারেননি কেউ। শেখ মুজিব আর তার বাকশাল শাসনের পতন হয় ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট।

মানুষ একদিকে না খেয়ে মারা যাচ্ছে অন্য দিকে রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অত্যাচারে ঘর-বাড়ি ছাড়া হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু বলার সুযোগ নেই- এ অবস্থায় ১৫ আগস্ট এর পরিবর্তনকে দেশবাসী স্বাগত জানায়। শেখ মুজিবের মৃত্যুতে সে সময়ের কোন মানুষ "ইন্নালিল্লাহ..." পর্যন্ত পড়েননি[৩৬৪] বরং আনন্দ করেছেন, মিষ্টি বিতরণ করেছেন আর ঐদিন শুক্রবার ছিল বিধায় মসজিদে বেশী বেশী মানুষ হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছেন।[৩৬৫]

খন্দকার মোশতাকের আওয়ামী শাসন (১৫ আগস্ট - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫)

১৫ আগষ্ট ১৯৭৫। আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর ভাষায় "সম্পূর্ণ একা এবং অসহায়"[৩৬৬] নেতা শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যাবেন। প্রচারিত আছে এ অনুষ্ঠানে তাকে আজীবন ও বংশ পরম্পরায় রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ "বাকশালীয় রাজতন্ত্র" ঘোষণা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা এ ব্যবস্থায় দ্বিমত পোষণ করে সেনাবহিনীর একটি অংশের সাথে গোপনে আতাতের মাধ্যমে ঐ দিন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সংবিধান স্থগিত করা হয় এবং খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে গঠিত নতুন আওয়ামী লীগের সামরিক সরকারকে দেশের সকল মানুষ স্বাগত জানায়। কারণ --

---

৩৬২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃঃ ২৩৯

৩৬৩ ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী; পৃঃ ৬৬

৩৬৪ ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী; পৃঃ ৩৩। যদিও তিনি বলেছেন কাউকে "ইন্নালিল্লাহ..." পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হয়নি।

৩৬৫ জাতি দীর্ঘ দিন ১৫ আগস্টকে শুকরানা বা নাজাত দিবস হিসেবে পালন করে।

৩৬৬ ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী; পৃঃ ৯০। "উনিশশো চুয়াত্তর সালের তেরই জুন বৃহসপতিবার। খবরের কাগজ হাতে ভাবতে বসলাম শেখ মুজিবের অবস্থা। এমন জনপ্রিয় অথচ এমন নিঃসঙ্গ নেতা আজ সম্ভবত পৃথিবীতে আর দুটি নেই। জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ গড়ার কাজে মুজিব আজ সম্পূর্ণ একা এবং অসহায়।"

www.pathagar.com

১. সামরিক শাসন জারীর প্রথম দিনেই চালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে কমে আসে; দুঃস্প্রাপ্য সামগ্রী সেদিনই বাজারে সহজলভ্য হয়ে পড়ে।
২. ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫ তারিখ থেকে কার্ফ্যু উঠিয়ে নিলে সর্বত্র নিরাপত্তাজনিত স্বস্তির সহজাত পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়; হাইজেকিং বন্ধ হয়ে যায়।
৩. বাংলাদেশে সফরকারী ভারতীয় শিল্পীদের অনুকরণে একশ্রেণীর মহিলাদের অর্ধনগ্ন পোষাক পরিধান বন্ধ হয়।
৪. দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ সরকারী মালিকানা থেকে পূর্বতন মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দিলে গণমাধ্যমে আস্থার সৃষ্টি হয়।
৫. পি. ও. ৯ বাতিল করে সরকারী চাকরিজীবিদের মধ্যে নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
৬. ৬১ জেলার গভর্ণর নিয়োগ আদেশ বাতিল করে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।
৭. দাড়ি-টুপিধারীদের দেখলেই তাদেরকে রাজাকার আলবদর বলার রেওয়াজ বন্ধসহ আলেম ওলামাদের উপর হয়রানী বন্ধ হয়।
৮. রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার বন্ধ হয় এবং সামরিক বাহিনী তার পূর্ব মর্যাদা ফিরে পায়।
৯. সরকারী চাকরিজীবিরা বাকশালে যোগদানের মাধ্যমে অতিমাত্রায় রাজনীতি প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে নিরপক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ পান।

খন্দকার মোশতাকের ৮১ দিনের শাসনামলে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তাতে শেখ মুজিব মন্ত্রীসভা ও আওয়ামী লীগের নেতারাই ছিলেন। সে সময়ের অন্য কোন রাজনৈতিক নেতা যেমন আতাউর রহমান, অলি আহাদ, মোজাফ্ফর আহমদ, মনি সিং, কমরেড ফরহাদ অথবা খান এ সবুর, শাহ আজিজ, মাওলানা মান্নান কোন ধারার নেতাকেই তার মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়া হয়নি। তার ২৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভায় যারা ছিলেন তারা হলেন...

টেবিল ৫.১

খন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভা

ক্রমিক	নাম	মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	মন্ত্রণালয়	মন্তব্য
১.	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	রাষ্ট্রপতি		
২.	মোহাম্মদউল্লাহ	উপরাষ্ট্রপতি		
৩.	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	মন্ত্রী	পররাষ্ট্র	
৪.	মনোরঞ্জন ধর	মন্ত্রী	আইন	৭৯ সনে আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

ক্রমিক	নাম	মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী	মন্ত্রণালয়	মন্তব্য
				এমপি প্রার্থী ছিলেন।
৫.	অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	মন্ত্রী	পরিকল্পনা	
৬.	ড. আজিজুর রহমান মল্লিক	মন্ত্রী	অর্থ	
৭.	ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী	মন্ত্রী	শিক্ষা	
৮.	আবদুল মান্নান	মন্ত্রী	স্বাস্থ্য	
৯.	আবদুল মোমিন	মন্ত্রী	কৃষি ও খাদ্য	৭৯ সনে আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন।
১০.	ফণিভূষণ মজুমদার	মন্ত্রী	এল জি আর ডি	
১১.	আসাদুজ্জামান খান	মন্ত্রী	নৌপরিবহন	
১২.	মোঃ সোহরাব হোসেন	মন্ত্রী	গণপূর্ত ও গৃহায়ণ	
১৩.	কে এম ওবায়দুর রহমান	প্রতিমন্ত্রী	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	
১৪.	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	প্রতিমন্ত্রী	ভূমি ও বিমান	
১৫.	নুরুল ইসলাম মঞ্জুর	প্রতিমন্ত্রী	রেল ও যোগাযোগ	
১৬.	তাহের উদ্দিন ঠাকুর	প্রতিমন্ত্রী	তথ্য	
১৭.	নুরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রতিমন্ত্রী	শিল্প	
১৮.	ডা. ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল	প্রতিমন্ত্রী	ত্রাণ ও পুনর্বাসন	
১৯.	রিয়াজউদ্দিন আহমদ ভোলা মিয়া	প্রতিমন্ত্রী	মৎস্য ও পশু-সম্পদ	
২০.	সৈয়দ আলতাফ হোসেন	প্রতিমন্ত্রী	যোগাযোগ	
২১.	মোমিনউদ্দিন আহমদ	প্রতিমন্ত্রী	সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	শেখ মুজিব মন্ত্রীসভায় ছিলেন না
২২.	দেওয়ান ফরিদ গাজী	প্রতিমন্ত্রী	বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদ	আওয়ামী লীগের ২০০৯ এ নির্বাচিত এম পি
২৩.	মোসলেম উদ্দিন হাবু মিয়া	প্রতিমন্ত্রী	পাট	

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত

২৪.	আবদুল মালেক উকিল	স্পিকার	৭৯ সনে আওয়ামী লীগের এমপি প্রার্থী ছিলেন।
২৫.	সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী	মন্ত্রীর সমমর্যাদায় প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা	৭৯ সনে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ছিলেন।
২৬.	মহিউদ্দিন আহমদ	বিশেষ দূত	৭৯ সনে আওয়ামী লীগের এমপি প্রার্থী ছিলেন। বর্তমান এমপি।

www.pathagar.com

শেখ মুজিব পতন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

আবদুল মালেক উকিল লন্ডনে বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে মুজিবের নিহত হওয়ার ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ শোকর আলহামদুলিল্লাহ। দেশ ফেরাউনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে।[৩৬৭] মহিউদ্দিন আহমদ মস্কোতে বলেন "নমরূদের মৃত্যু হয়েছে।"

তাজউদ্দীন উত্তেজিত হয়ে বলেন, "বোকার দল লাল বাহিনী বানায়, নীল বাহিনী বানায়। কোনো বাহিনী তাঁকে বাঁচাতে পারল?'[৩৬৮]

এন্থনী মাসকারেনহাস বলেন, "১৯৭২ সালে নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন। দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছরে তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে।....মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চ মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ দুশমনে পরিণত হলেন।"[৩৬৯]

অলি আহাদ বলেন "মুজিবের অভিশপ্ত ও সর্বনাশা নেতৃত্ব হতে বাংলাদেশ মুক্তি পায় ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট। এ দিন বাংলাদেশের ইতিহাসে সংযোজিত হয় এক নবতর অধ্যায়।"[৩৭০] কবি শামসুর রাহমানের পত্রিকা দৈনিক বাংলায় লেখা হয় "সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হলো না শেখ মুজিবের।"

মানুষ একদিকে না খেয়ে মারা যাচ্ছে অন্য দিকে রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অত্যাচারে ঘর-বাড়ি ছাড়া হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু বলার সুযোগ নেই- এ অবস্থায় ১৫ আগস্ট এর পরিবর্তনকে দেশবাসী স্বাগত জানায়। শেখ মুজিবের মৃত্যুতে সে সময়ের কোন মানুষ "ইন্নালিল্লাহ-------" পর্যন্ত পড়েননি[৩৭১] বরং আনন্দ করেছেন, মিষ্টি বিতরণ করেছেন আর ঐদিন শুক্রবার ছিল বিধায় মসজিদে বেশী বেশী মানুষ হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছেন।[৩৭২]

শেখ মুজিবের মৃত্যুতে কর্ণেল তাহেরের প্রতিক্রিয়া মহিউদ্দিন আহমেদের ভাষায় "১৯৭১ সালে নঈম ১১ নম্বর সেক্টরে তাহেরের সহযোদ্ধা ছিলেন এবং প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। তাহের আক্ষেপ করে নঈমকে বললেন, ওরা বড় রকমের একটা ভুল করেছে। শেখ মুজিবকে কবর দিতে অ্যালাও করা ঠিক হয়নি। এখন তো সেখানে মাজার হবে। উচিত ছিল লাশটা বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেয়া।"[৩৭৩]

---

[৩৬৭] দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ ; পৃঃ ৪৫৯

[৩৬৮] আমি সবাইকে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছি, মহিউদ্দিন আহমেদ; প্রথম আলো ১৩ আগস্ট, ২০১৪

[৩৬৯] এন্থনী মাসকারেন হাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, তারিখঃ ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫

[৩৭০] জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, অলি আহাদ; পৃঃ ৫৩৩

[৩৭১] ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; পৃঃ ৩৩। যদিও তিনি বলেছেন কাউকে "ইন্নালিল্লাহ-----------" পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হয়নি।

[৩৭২] জাতি দীর্ঘ দিন ১৫ আগস্টকে শুকরানা বা নাজাত দিবস হিসেবে পালন করে।

[৩৭৩] প্রথম আলো, ১৩।০৮।২০১৪, ফিরে দেখা পাঁচাত্তর, মহিউদ্দিন আহমেদ

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের কাল্ট তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন যে সিরাজুল আলম খান, তাঁর (শেখ মুজিব) নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তিনি (সিরাজুল আলম খান) দুঃখ পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তবে তিনি মনে করতেন, এটা ছিল অনিবার্য। মুজিব নিজেই এই পরিণতি ডেকে এনেছিলেন।[৩৭৪]

মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, "১৫ই আগস্ট গণবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি লিফলেট প্রচার করা হয়। লিফলেটের শিরোনাম ছিল, 'খুনী মুজিব খুন হয়েছে---অত্যাচারীর পতন অনিবার্য।'[৩৭৫]

হুমায়ুন আহমেদ বলেন, "রাস্তায় মিছিল বের হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেই মিছিল আনন্দ মিছিল। শফিক বাংলামোটর গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। কিছু অতি উৎসাহী ট্যাংকের ওপর উঠে নাচের ভঙ্গি করছে।"[৩৭৬]

সোহরাব হাসান বলেন, প্রবীণ রাজনীতিক আতাউর রহমান খান স্বেচ্ছায় বাকশালের সদস্য হয়েও পরবর্তীকালে ১৫ আগস্টকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে পালন করেছিলেন।[৩৭৭]

শেখ হাসিনার আওয়ামী শাসন (১৯৯৬-২০০০)

একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে থেকে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় বসেই আওয়ামী লীগ নিজের চরিত্রে ফিরে যায়, শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক[৩৭৮]সহ সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমদের উপর নিযার্তন শুরু করে। কুকুরের মাথায় টুপী পড়িয়ে আল্লাহর ধর্ম ইসলাম ও মুসলিমদেরকে অবমাননা করে।

এ পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ফেণীর জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের তাহের, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, গফরগাও এর গোলন্দাজ আর লালবাগের হাজী সেলিমসহ হাজারো সন্ত্রাসী ব্যাপক সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশকে নরকে পরিণত করেছিল।

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ১৯৯৬ নির্বাচনে জামায়াতের সহায়তায় বিজয় লাভ করতে আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধী ইস্যু সামনে আনেনি; কারণ RAW তখনও এ বিষয়টি সামনে আনা প্রয়োজন মনে করেনি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৯৫ সন একটি দিক পরিবর্তনের সময়। ২০ বছরের যুবক জানে না বিশ বছর আগে এ দেশে কি ঘটেছিল; তার কাছে বর্তমানই সব।

---

৩৭৪ প্রথম আলো, ১৩.০৮.২০১৪, ফিরে দেখা পাঁচাত্তর, মহিউদ্দিন আহমেদ

৩৭৫ প্রথম আলো, ১৩।০৮।২০১৪, ফিরে দেখা পাঁচাত্তর, মহিউদ্দিন আহমেদ

৩৭৬ দেয়াল, হুমায়ুন আহমেদ; পৃঃ ১০৭

৩৭৭ মুজিব হত্যা, খুনি মেজররা ও আমাদের দ্বিচারিতা;সোহরাব হাসান প্রথম আলো ১৫ আগস্ট, ২০১৪

৩৭৮ শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক ০৮.০৮.২০১২ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে------রাজিয়ুন)।

www.pathagar.com

শেখ মুজিব পতন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

আবদুল মালেক উকিল লন্ডনে বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে মুজিবের নিহত হওয়ার ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ শোকর আলহামদুলিল্লাহ । দেশ ফেরাউনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে ।[৩৬৭] মহিউদ্দিন আহমদ মস্কোতে বলেন "নমরূদের মৃত্যু হয়েছে ।"

তাজউদ্দীন উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'বোকার দল লাল বাহিনী বানায়, নীল বাহিনী বানায় । কোনো বাহিনী তাঁকে বাঁচাতে পারল?'[৩৬৮]

এন্থনী মাসকারেনহাস বলেন, "১৯৭২ সালে নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন । তিনি তখন সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা । গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন । দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছরে তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে ।....মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চ মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ দুশমনে পরিণত হলেন ।"[৩৬৯]

অলি আহাদ বলেন "মুজিবের অভিশপ্ত ও সর্বনাশা নেতৃত্ব হতে বাংলাদেশ মুক্তি পায় ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট । এ দিন বাংলাদেশের ইতিহাসে সংযোজিত হয় এক নবতর অধ্যায় ।"[৩৭০] কবি শামসুর রাহমানের পত্রিকা দৈনিক বাংলায় লেখা হয় "সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হলো না শেখ মুজিবের ।"

মানুষ একদিকে না খেয়ে মারা যাচ্ছে অন্য দিকে রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অত্যাচারে ঘর-বাড়ি ছাড়া হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু বলার সুযোগ নেই- এ অবস্থায় ১৫ আগস্ট এর পরিবর্তনকে দেশবাসী স্বাগত জানায় । শেখ মুজিবের মৃত্যুতে সে সময়ের কোন মানুষ "ইন্নালিল্লাহ-------" পর্যন্ত পড়েননি[৩৭১] বরং আনন্দ করেছেন, মিষ্টি বিতরণ করেছেন আর ঐদিন শুক্রবার ছিল বিধায় মসজিদে বেশী বেশী মানুষ হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছেন ।[৩৭২]

শেখ মুজিবের মৃত্যুতে কর্নেল তাহেরের প্রতিক্রিয়া মহিউদ্দিন আহমেদের ভাষায় "১৯৭১ সালে নঈম ১১ নম্বর সেক্টরে তাহেরের সহযোদ্ধা ছিলেন এবং প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন । তাহের আক্ষেপ করে নঈমকে বললেন, ওরা বড় রকমের একটা ভুল করেছে । শেখ মুজিবকে কবর দিতে অ্যালাও করা ঠিক হয়নি । এখন তো সেখানে মাজার হবে । উচিত ছিল লাশটা বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেয়া ।"[৩৭৩]

---

৩৬৭ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি , ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ ; পৃঃ ৪৫৯
৩৬৮ আমি সবাইকে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছি, মহিউদ্দিন আহমেদ; প্রথম আলো ১৩ আগস্ট, ২০১৪
৩৬৯ এন্থনী মাসকারেন হাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, তারিখঃ ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫
৩৭০ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, অলি আহাদ; পৃঃ ৫৩৩
৩৭১ ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী: পৃঃ ৩৩ । যদিও তিনি বলেছেন কাউকে "ইন্নালিল্লাহ----------" পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হয়নি ।
৩৭২ জাতি দীর্ঘ দিন ১৫ আগস্টকে শুকরানা বা নাজাত দিবস হিসেবে পালন করে ।
৩৭৩ প্রথম আলো, ১৩ ।০৮ ।২০১৪, ফিরে দেখা পাঁচাত্তর, মহিউদ্দিন আহমেদ

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের কাল্ট তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন যে সিরাজুল আলম খান, তাঁর (শেখ মুজিব) নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তিনি (সিরাজুল আলম খান) দুঃখ পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তবে তিনি মনে করতেন, এটা ছিল অনিবার্য। মুজিব নিজেই এই পরিণতি ডেকে এনেছিলেন।[৩৭৪]

মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, "১৫ই আগস্ট গণবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি লিফলেট প্রচার করা হয়। লিফলেটের শিরোনাম ছিল, 'খুনী মুজিব খুন হয়েছে--- অত্যাচারীর পতন অনিবার্য।'[৩৭৫]

হুমায়ুন আহমেদ বলেন, "রাস্তায় মিছিল বের হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেই মিছিল আনন্দ মিছিল। শফিক বাংলামোটর গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। কিছু অতি উৎসাহী ট্যাংকের ওপর উঠে নাচের ভঙ্গি করছে।"[৩৭৬]

সোহরাব হাসান বলেন, প্রবীণ রাজনীতিক আতাউর রহমান খান স্বেচ্ছায় বাকশালের সদস্য হয়েও পরবর্তীকালে ১৫ আগস্টকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে পালন করেছিলেন।[৩৭৭]

শেখ হাসিনার আওয়ামী শাসন (১৯৯৬-২০০০)

একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে থেকে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় বসেই আওয়ামী লীগ নিজের চরিত্রে ফিরে যায়, শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক[৩৭৮]সহ সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমদের উপর নিযার্তন শুরু করে। কুকুরের মাথায় টুপী পড়িয়ে আল্লাহর ধর্ম ইসলাম ও মুসলিমদেরকে অবমাননা করে।

এ পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ফেণীর জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের তাহের, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, গফরগাও এর গোলন্দাজ আর লালবাগের হাজী সেলিমসহ হাজারো সন্ত্রাসী ব্যাপক সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশকে নরকে পরিণত করেছিল।

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ১৯৯৬ নির্বাচনে জামায়াতের সহায়তায় বিজয় লাভ করতে আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধী ইস্যু সামনে আনেনি; কারণ RAW তখনও এ বিষয়টি সামনে আনা প্রয়োজন মনে করেনি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৯৫ সন একটি দিক পরিবর্তনের সময়। ২০ বছরের যুবক জানে না বিশ বছর আগে এ দেশে কি ঘটেছিল; তার কাছে বর্তমানই সব।

---

[৩৭৪] প্রথম আলো, ১৩.০৮.২০১৪, ফিরে দেখা পাঁচাত্তর, মহিউদ্দিন আহমেদ

[৩৭৫] প্রথম আলো, ১৩।০৮।২০১৪, ফিরে দেখা পাঁচাত্তর, মহিউদ্দিন আহমেদ

[৩৭৬] দেয়াল, হুমায়ুন আহমেদ; পৃঃ ১০৭

[৩৭৭] মুজিব হত্যা, খুনি মেজররা ও আমাদের দ্বিচারিতা;সোহরাব হাসান প্রথম আলো ১৫ আগস্ট, ২০১৪

[৩৭৮] শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক ০৮. ০৮.২০১২ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে------রাজিয়ুন)।

www.pathagar.com

ডিজিটাল আওয়ামী সরকার (২০০৮-২০১২)

২০০৭ সনে জেনারেল মঈন[৩৭৯] ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজনীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে লেজে গোবরে করে ফেলেন। দু'টি বড় দলের প্রধানকে বন্দী করে 'মাইনাস টু'র রাজনীতি খেলতে গিয়ে নিজের জালে নিজেই আটকা পড়েন। নিরাপদ EXIT তার প্রয়োজন যা দিতে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন।[৩৮০] এ আশ্বাস পেয়ে জেনারেল মঈন তার নির্বাচনী ছক অনুযায়ী নির্বাচন ঘোষণা করেন। বি এন পি এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না ঘোষণা দিয়েও শেষে জেনারেল মঈনের সাজানো নির্বাচনে কেন অংশ গ্রহণ করলো তা জাতির কাছে আজো প্রশ্ন। ২০০৮ সনের এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল আসনে জয় লাভ করার প্রেক্ষাপট হলো-

- জেনারেল মঈনের নির্বাচনী ছক, যাতে অবদান রেখেছে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন
- RAW কর্তৃক জেনারেল মঈনের নির্বাচনী ছক অনুমোদন, আর্থিক আনুকূল্য[৩৮১]
- নতুন প্রজন্ম আওয়ামী লীগের ৭২-৭৫ সনের দুঃশাসনের কথা জানে না
- 'দিন বদলের পালা' ও 'Digital Bangladesh' শ্লোগানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে একটি মোহ সৃষ্টি করা হয়

১৯৯৬-২০০০ সময়ে যতটুকু প্রশাসনিক সফলতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখিয়েছিল তারা এবার তাতেও ব্যর্থ হয়। বিপুল ভোটে জয়ী এ দল দিন বদলের নামে ভারতীয়করণ (Indianization) করার কাজটি সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করছে। ভারতকে শুল্কমুক্ত (প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান বলেন," ট্রানজিটের নামে ভারতের কাছে ফি চাওয়া অসভ্যতা; সূত্রঃ আমার দেশ, ০১. ০৪. ২০১১) করিডোর ও ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে, 'বাংলাদেশ ভারত-বাংলা গেমসের' নামে বাংলাদেশকে ভারতের একটি প্রদেশের মর্যাদায় নামিয়ে এনেছে। প্রশাসনের সকল স্তরে মুসলমান কর্মকর্তাদের সরিয়ে আওয়ামী লীগের বিশ্বস্ততার প্রতীক হিন্দুদের পদোন্নতি ও পদায়ন দিয়ে এমন পর্যায়ে এনেছে যে, আওয়ামীপন্থী মুসলমান কর্মকর্তারাও এতে ক্ষিপ্ত। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সংসদ সচিবালয়সহ যে কোন কার্যালয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ বর্তমানে হিন্দুদের দখলে। কর্মকর্তারা একে তামাসা করে বলেন বাংলা নামের কর্মকর্তা আর এখন বলেন Banglalink officer।

---

[৩৭৯] ২০০৭ সনে জেনারেল মঈন সরকার ছিল। ইয়াজুদ্দিন আর ফখরুদ্দিনসহ সকল উপদেষ্টা ছিলেন তার পাপেট। জেনারেল মঈন ফোনে কথা বলবেন শুনলে কতিপয় উপদেষ্টা ভয়ে দাড়িয়ে যেতেন।

[৩৮০] ১২ জুন ২০০৮ তারিখের সকল জাতীয় সংবাদপত্র।

[৩৮১] The Economist, date Jul 30th 2011; wrote "Ever since 2008, when the Awami League, helped by bags of Indian cash and advice, triumphed in general elections in Bangladesh, relations with India have blossomed."

www.pathagar.com

এবার ক্ষমতা গ্রহণের পর তাদের রাজনৈতিক সফলতা একটিই; শেখ মুজিব হত্যার দৃশ্যমান আসামী তথা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা।

বিপরীতে তাদের ব্যর্থতার পাল্লা এতটাই ভারী হয়েছে যে, আওয়ামী ঘরাণার বুদ্ধিজীবীরাও মাঝে মাঝে সত্য কথা বলা শুরু করেছেন যা শেখ হাসিনার কাছে 'টক' লাগছে। যে মিডিয়া তাদের জন্য গলাপানিতে নামে সেই মিডিয়ার গলা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে আওয়ামী আদালতের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। শীর্ষ কাগজ সম্পাদক একরামুল হককে মিথ্যে মামলায় বন্দী, যমুনা টিভি বন্ধ আর যারা মন্ত্রীদের দুনীর্তির মিথ্যা (?) সংবাদ ছাপাবে তাদেরকে (আওয়ামী) আদালতের মাধ্যমে শায়েস্তা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভায় ঘোষণা দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আর ফারুক খানের দুর্নীতির তথ্য সংরক্ষণ করার অপরাধে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনিকে জীবন দিতে হলো বলে বহুল প্রচারণা রয়েছে। আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলো

১. ১৯৯৬ সনে কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে যোগসাজশ করে মারোয়ারীদের মাধ্যমে পুঁজিবাজার নষ্ট করা হয়। কিন্তু এবার (২০১১) আওয়ামী লীগের নেতা-ব্যবসায়ীরা পুঁজিবাজার থেকে প্রায় ১ লক্ষ কোটি (১০০০ বিলিওন) টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় পাচার করে এ বাজার ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে ৩৫ লক্ষ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে পথে বসিয়ে দিয়েছে।
২. পুঁজিবাজার নষ্ট করার কারণ নির্ধারিণ করার জন্য আওয়ামী ঘরাণার ব্যাংকার (বর্তমানে কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান) ইব্রাহীম খালেদকে দিয়ে তদন্ত করা হলে কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতার নাম বের হয়ে আসে। এ তদন্ত করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করা হয়। এতে করে পুঁজি বাজারকে নষ্ট করা থেকে ধ্বংস করার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যকোন কর্মকর্তা নিরপেক্ষ ও সত্য তদন্ত করতে সাহসী হবেন না।
৩. অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবুল মুহিত পুঁজি বাজারকে ফট্কা বাজার এবং এর repairing এর কোন পথ জানা নেই বলে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা হারিয়েছেন।
৪. আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, পুলিশ লীগের সীমাহীন ঘুষবাজি, দখলবাজি, ছিনতাইবাজি, ভর্তিবাজি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ধর্ষণবাজি, খুনবাজি ইত্যাদি দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে আওয়ামী ঘরানার বিচারপতি (অবঃ) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান[৩৮২] বলেন "দেশ এখন বাজিকরদের হাতে বন্দী"।

[৩৮২] বিচারপতি (অবঃ) হাবিবুর রহমান শেলী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এব ১৯৯৬ সনে কেয়ার টেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

www.pathagar.com

৫. বড় ধরণের একটি দুর্নীতি করার জন্য কোন ধরনের feasibility test ছাড়াই মুন্সীগঞ্জের আড়িয়ল বিলে "বঙ্গবন্ধু বিমান বন্দর" তৈরী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। হাজার হাজার টন মাছ আর ধান উৎপাদন বন্ধ করে কোটি কোটি ঘনফুট মাটি দ্বারা বিল ভরাট করার হিসেব দিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের মহাপরিকল্পনা ভেস্তে যায় মানুষের প্রতিরোধের মুখে।

৬. পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করার পূর্বেই দুর্নীতি আশ্রয় নেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার খ্যাত যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন। প্রাক্কলনজনিত ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান (SAHCO) জনিত দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়।

৭. যোগাযোগমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির কারণে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। নৌ-পরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খান যিনি মূলতঃ শ্রমিক নেতা তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার এ অরাজক অবস্থার জন্য সমভাবে দায়ী।

৮. বাণিজ্যমন্ত্রী কর্ণেল ফারুক খান তার নিজস্ব ব্যবসার সফলতার জন্য ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে তেল-চিনি-লবণসহ প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস আনেন।

৯. মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি করায় সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বে জনশক্তি রফতানী বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া ছোট খাট অজুহাতে অনেক শ্রমিককে তারা বিতাড়িত করলে Remittence আসা ব্যাপকভাবে কমে যায়।

১০. আওয়ামী লীগ সরকার জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি দলীয় বিবেচনায় করতে গিয়ে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে সরকারের আনুগত্যের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য করতে বাধ্য করছে। একই সঙ্গে যোগ্য, মেধাবী ও অনেক সৎ কর্মকর্তাকে দলীয় বিবেচনায় পদোন্নতি না দিয়ে অথবা OSD[৩৮৩] রেখে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, পদলেহী, অসৎ কর্মকর্তাদেরকে পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করে জনপ্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

১১. দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দলীয় কর্মীর আচরণ সম্পন্ন বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে এবং বিচার ব্যবস্থা উন্নয়নের নামে বহুজাতিক সংস্থার লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ করে দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যে প্রধান বিচারপতি বলেছেন "জেলা জজ নাজিরের (একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী) সাথে ভাগাভাগি করে ঘুষ নেন" সেই প্রধান বিচারপতি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে অনুদান গ্রহণ করে নিম্নরুচির পরিচয় দিয়েছেন।" বারিস্টার রফিকুল হক বলেন, "বর্তমানে আদালতে মুখ দেখে বিচার ও অবিচার দুটিই হচ্ছে।"[৩৮৪]

---

৩৮৩ এইচ টি ইমামের তার বই 'সরকার ৭১' এ OSD কে 'ঐ শালারে ধর' হিসেবে বর্ণনা দেন।

৩৮৪ দৈনিক আমার দেশ; তারিখঃ ২৭.১১.২০১১

www.pathagar.com

১২. এ সরকারের সবচেয়ে বড় অপকর্ম হলো দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা। দলীয় নেতাদের মাধ্যমে বিডিআর-এর জোয়ানদেরকে উত্তেজিত করে তথাকথিত বিদ্রোহের মাধ্যমে ৫৭ জন দেশপ্রেমিক ও ভারতীয় স্বার্থবিরোধি অফিসারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং হত্যার অপরাধে হাজার হাজার বিডিআর জোয়ানকে বন্দী ও বিচার প্রক্রিয়ার শাস্তি দিয়ে দেশের First line defense ধ্বংস করা হয়। বড়াইগ্রামে ভারতের বিরুদ্ধে বিডিআর এর কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের অপরাধে (?) বিডিআর বাহিনীর নাম পরিবর্তন করা হয়।

১৩. প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের দেশে 'জঙ্গিবাদ' দমনের বার বার অঙ্গীকার "বাংলাদেশ একটি জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র" এ ধরনের একটি বিরূপ ইমেজ তৈরী হয়েছে। বিদেশের শ্রম বাজার, বাণিজ্যিক যোগাযোগ, ইউ.এন. মিশনে সামরিক বাহিনীর সদস্য প্রেরণসহ নানা সংকট দেখা দেয় এই প্রচারণায়।

১৪. আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি যখন বলেন চীনে দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার সুবাদে সৈয়দ আবুল হোসেন মন্ত্রী হয়েছেন তখন মন্ত্রীদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। আওয়ামী লীগের অযোগ্য মোসাহেবদেরকে মন্ত্রী করা এবং ত্যাগী ও যোগ্য নেতাদের পরিবর্তে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের মন্ত্রী করার মাধ্যমে দেশকে ইসলাম শূন্য করতে গিয়ে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়ন এবং জাসদ ছাত্রলীগের নেতাদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে ঘিতে আগুন ঢালার কাজটি করা হয়েছে।[৩৮৫]

১৫. কোরআন-হাদীস-ইসলামী বই[৩৮৬] নিয়ে রাস্তায় চলাচল করা বা তা বাসায় রাখার অপরাধে এগুলোকে জিহাদী বই অপব্যাখ্যা দিয়ে শত শত ইসলাম প্রিয় মানুষকে হাজতে প্রেরণ করা হয়।

১৬. প্রচার মাধ্যম সব সময়ই আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করলেও তারা প্রচার মাধ্যমকে সব সময়ই ভয় পায়। বাকশাল গঠনের মাধ্যমে ৪টি পত্রিকা রেখে সকল পত্রিকা বন্ধ করার ইতিহাস তাদেরই। আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, শীর্ষ কাগজের সম্পাদক একরামুল হককে বন্দী এবং যমুনা টিভি বন্ধ করে দিয়ে তাদের অপকর্মের প্রচারণার হাত থেকে বাঁচতে চাচ্ছে। টক শো বন্ধ করা, প্রতিদিন সংবাদপত্র অফিসে গোয়েন্দা প্রেরণ, বাকশালীয় সম্প্রচার নীতিমালা এ আমলের কালো অধ্যায়।

---

[৩৮৫] কট্টর বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাসদ ছাত্রলীগের নেতারা হলেন-- এইচ টি ইমাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, নুরুল ইসলাম নাহিদ, দিলীপ বড়ুয়া, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শাহজাহান খান, আবদুল মান্নান খান, মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান, ড. শওকত হোসেন জুলিয়াস, আবু আলম শহীদ খান। তাছাড়া গোলাম আরিফ টিপু, আবুল বারাকাত, ডঃ আতিয়ার রহমান প্রমুখ বামপন্থী ব্যক্তিত্ব।

[৩৮৬] কোরআন-হাদীস-ইসলামী বইকে জিহাদী বই হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

www.pathagar.com

১৭. Digital Bangladesh গড়ার পরিবর্তে Digitally Bangladesh Map পরিবর্তন করে ২৮১ একর জমি ভারতের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশকে ছোট করার প্রক্রিয়া শুরু করে।[৩৮৭]

১৮. আওয়ামী লীগ-যুবলীগ-ছাত্রলীগ অন্যান্য দলীয় নেতা-কর্মীদের হত্যা-গুম-নির্যাতন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজ দলীয় নেতা-কর্মীদেরও হত্যা-গুম-নির্যাতন করে ইতিহাস গড়েছে।

১৯. পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো তথা বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক, অধ্যাপক আনু মাহমুদ প্রমুখদের উপর আক্রমণ, জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক তাসনীম আনমকে ডান্ডা বেড়ী পড়িয়ে আদালতে হাজির করা[৩৮৮], মিছিলকারীর বুকে বুট চাপা, পথচারীকে ধরে হত্যা করার জন্য সন্ত্রাসীদের নিকট হস্তান্তরসহ হাজারো অপকর্ম এ বাহিনীকে পুলিশ লীগে পরিণত করেছে।

২০. ১৯৯৬ সনে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগের কাজ ছিল "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন" বাস্তবায়ন করা। সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তারা ক্ষমতা হারায়। ২০০৯ সনে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ "বঙ্গবন্ধুর (কোন) স্বপ্ন" বাস্তবায়নের কথা বলেনি। মুখে উচ্চারণ না করলেও তারা এবার তাজউদ্দিনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ভারতকে ট্রানজিট-করিডোর দেয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থমন্ত্রী বলেন "ভারতকে ট্রানজিট দেয়া আওয়ামী লীগের স্বপ্ন ছিল"।[৩৮৯]

২০১১ সনের ৬ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে সফরে আসলে ভারতের সঙ্গে তিস্তা নদীর পানি চুক্তি, ট্রানজিট চুক্তিসহ আরো কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা ছিল। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় না আসার অজুহাতে সে চুক্তি না হওয়াতে বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি বলে দাবী করে। কিন্তু পরদিন থেকেই আশুগঞ্জ নৌবন্দরসহ আখাউড়া সীমানা দিয়ে ভারতীয় মালামাল ঐ দেশের অন্য অংশ ত্রিপুরা রাজ্যে চলাচল শুরু করে।

ভারত বাংলাদেশকে করিডোর[৩৯০] হিসেবে ব্যবহার করে তার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে হাজার হাজার টন ভারী মালামাল বহন করছে অথচ

---

৩৮৭ ইতোমধ্যে সিলেট এলাকায় ১৫.০৮.২০১১ তারিখে ২৮১ একর জমি ভারতের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি পত্যার্পণের নামে আরো ৬ লক্ষ একর জমি ভারতের হাতে হস্তান্তরের কাজ চলছে।

৩৮৮ ২৯.০৯,২০১১ তারিখে এটিএম আজহারুল ইসলাম ও তাসনীম আলমকে বন্দী করা হয় এবং পরে আদালতে হাজির করার সময় তাদেরকে ডান্ডা বেড়ী পড়িয়ে আদালতে হাজির করা।

৩৮৯ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পরই অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন।

৩৯০ একই দেশ অন্য একটি দেশের ভৌগলিক সীমায় প্রবেশ করে ঐ দেশের অন্য একটি অংশে মালামাল পরিবহণ করলে তাকে বলে করিডোর, যেমন তিন বিঘা করিডোর। এ করিডোর প্রদানের সঙ্গে আরো যে সকল ক্ষতি

www.pathagar.com

কোন প্রকার শুল্ক দিচ্ছে না ও নেয়াও হচ্ছে না। শুল্কের প্রশ্ন উত্থাপন করলে অর্থমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা 'এটি একটি অভদ্রজনের কথা' এবং 'এটি ছোট লোকের বিষয়' উল্লেখ করে প্রতিদিন শত শত টন মালামাল বিনা শুল্কে পরিবহনের সুযোগ করে দিচ্ছেন। প্রথম আলো তাই একটি কার্টুন প্রকাশ করে 'আমরা হাতেম তাঈ'। যেখানে আমার নিজের গাড়ি রাস্তায় চলতে, মালামাল পরিবহণ করতে শুল্ক দিচ্ছি, সেখানে অন্য দেশের ৪২ চাকার গাড়িতে করে হাজার হাজার টন মালামাল পরিবহণ করা হচ্ছে, দেশের রাস্তাঘাট নষ্ট করা হচ্ছে সেখানে কোন শুল্ক নেওয়া হচ্ছে না, এমন একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত মানুষকে হতাশ করেছে।

২১. আওয়ামী লীগের এ সরকারের আমলে দেশে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট চরম আকার ধারণ করে। সরকার বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে আবাসন শিল্পকে ধংসের প্রান্তে নিয়ে আসে, মানুষকে চরম ভোগান্তিতে ফেলে। পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাবীতে মিছিল করলেও সরকারের অস্ত্র "যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাধাগ্রস্ত করছে" ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের উপর দলন নির্যাতন শুরু করে।

২২. ভারত আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে ৫৪ টি নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার ভয়াবহ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে অধিকতর ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে কৃষিকাজ চালিয়ে আপাততঃ খাদ্য সংকট মোকাবেলা করলেও অদূর ভবিষ্যতে গভীর ভূগর্ভে পানির অভাব দেখা দিবে। তখন বাংলাদেশ কৃষি বিপর্যয়সহ ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ে নিপতিত হবে।

ফ্যাসীবাদের স্মারকশক্তি ছাত্রলীগ-যুবলীগ

এবার ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকেই ছাত্রলীগ আর যুবলীগ এমন কোন অপকর্ম নেই যার সঙ্গে জড়িত হয়নি। আধিপত্য বিস্তার করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ বনাম ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ বনাম যুবলীগ, ছাত্রলীগ বনাম আওয়ামী লীগ, যুবলীগ বনাম যুবলীগ, যুবলীগ বনাম আওয়ামী লীগ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। খুন, রাহাজানী, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, খাসজমি ও মানুষের জমি-জিরাত দখলবাজি, হিন্দু সম্পত্তি দখল, ছাত্রী ধর্ষণ প্রভৃতি ছাত্রলীগের নৈমিত্তিক কর্মকান্ড, প্রতিদিনের সংবাদ শিরোনাম। ছাত্রলীগ হচ্ছে আওয়ামী লীগের গলার কাঁটা। শেখ হাসিনা প্রথমে ছাত্রলীগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে এ সংগঠনের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করলেও ছাত্রলীগ তাকে ত্যাগ করেনি।

বাংলাদেশ সম্মুখীন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে তা এখানে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই বলে শুধু ইঙ্গিত দেয়া হলো।

www.pathagar.com

১৫.০৩.২০১০ তারিখে দৈনিক আমাদের সময়ে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ইডেন কলেজের ছাত্রলীগ নেত্রী তার দলের নেতাদের মনোরঞ্জন আর ব্যবসার স্বার্থে ঐ কলেজের নিরীহ ছাত্রীদের জোর করে অনৈতিক কাজে পাঠানোর কথা এখন আর অপ্রকাশ্য নয়। সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক এর ২৫.০৩.২০১০ তারিখের প্রতিবেদনে বলা হয়, "(ইডেন) কলেজের সভাপতি জেসমিন শামীমা নিঝুম ও সাধারণ সম্পাদক ফারজানা ইয়াসমিন তানিয়াসহ কয়েকজন প্রথম সারির নেত্রী ছাত্রীদের অসামাজিক কাজে বাধ্য করছে। আবার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলছে, যারা ছাত্রীদের দিয়ে অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করাতেই তাদের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছে তাদের প্রতিপক্ষ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি গ্রুপ জানায়, কলেজের জেবুন্নেসা হলের ২০৮ নম্বর কক্ষের এক ছাত্রীকে ও খোদেজা বেগম হলের ২০৫ নম্বর কক্ষের এক ছাত্রীকে ছাত্রলীগ ও এক মন্ত্রীর বাসায় যাওয়ার প্রস্তাব করে সভাপতি নিঝুম ও সাধারণ সম্পাদক তানিয়া গ্রুপ। প্রস্তাবে রাজি না হলে ওই দুই ছাত্রী বিষয়টি অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেন। ফলে মধ্যরাতে তাদের রড দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে হল থেকে সকালে বের করে দেয় তারা।" এ অবস্থায় অভিভাবক আর ছাত্রীরা কলেজ ছাড়ার জন্য আবেদন করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "এ সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। স্বাধীন বাংলাদেশে এ জাতীয় ঘটনা ঘটবে তা অনভিপ্রেত। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এই ঘটনা ঘটে চলছে। মারামারি, হল দখল, চাঁদাবাজি এবং সবকিছু ছাপিয়ে ইডেন কলেজের মেয়েদেরকে ছাত্রলীগ নেতাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে এটি খুবই মর্মান্তিক ঘটনা।" [৩১]

ছাত্রলীগ সম্পর্কে সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিকের প্রতিবেদনে বলা হয়, "গত ২ এপ্রিল সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ সভাপতি আউয়াল কবির জয় গ্রুপের ক্যাডার কাওসার আহমেদ বাংলা বিভাগের এক ছাত্রীকে ছাত্রাবাসে নিয়ে যাওয়ার অনৈতিক প্রস্তাব দেয়। এতে ঐ ছাত্রী রাজি না হলে কাওসার ও তার ক্যাডার বাহিনী তাকে রিক্সা থেকে নামিয়ে ব্যাপক মারধর করে। এর আগে আরো এক ছাত্রীকে একই প্রস্তাব দিয়ে সাড়া না পেয়ে লাঞ্ছিত করা হয়। পরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে তখন প্রক্টরের নিকট মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পায় কাওসার। নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগে কাওসারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কারও করা হয়। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আরিফ। সভাপতি গ্রুপের ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ক্যাম্পাসে প্রায় প্রতিটি অপকর্মের সঙ্গে সে সম্পৃক্ত। আরিফের দৌরাত্মে অসহায় হয়ে পড়ছে সাধারণ ছাত্রীরা। এদিকে খোদ সভাপতির বিরুদ্ধেও নৈতিক স্খলনের অভিযোগ উঠেছে। আর এ কাজের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাজলা এবং তালাইমারীতে দুটি ছাত্রাবাসে কক্ষ বরাদ্দ

---

[৩১] সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক এর ২৫.০৩.২০১০ তারিখে প্রকাশিত ছাত্রলীগ সার্কাস শীর্ষক প্রতিবেদনে ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার।

www.pathagar.com

নিয়েছেন বলে জানা যায়। সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। মাসুদ ওরফে ভাগ্নে মাসুদ অপু গ্রুপের প্রথম সারির একজন নেতা। জয় গ্রুপের কর্মী আরিফের সাবেক প্রেমিকার সঙ্গে মাসুদ জোর করে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ নিয়ে ছাত্রমৈত্রীর সঙ্গে আরিফ গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও বাধে। ছাত্রলীগের অপকর্মের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ছাত্রী আজ জিম্মি হয়ে পড়েছে। সংগঠনের নেতাকর্মীদের নৈতিক স্খলনের বিষয় নিয়ে সম্প্রতি নারী নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর অভিযোগও দাখিল করেছেন।"[৩৯২]

ছাত্রলীগের ক্ষমতার দাপট এতটাই যে তার কোন নেতা পাতি নেতাকে না চিনলেও বিপদ আছে। "গত ৮ জুন ড. শামসুজ্জোহা হলের প্রভোস্ট ড. মুর্তজা খালেদ সভাপতি জয়কে চিনতে না পারায় তার হাতে লাঞ্ছিত হন। ওই দিন রাতে ছাত্রলীগ কর্তৃক সাধারণ শিক্ষার্থীর সিট দখলের চেষ্টা করা হলে প্রভোস্ট খালেদ বাধা প্রদান করেন। পরে সভাপতি জয় নিজেই ড. খালেদকে তিনতলা থেকে জামার কলার ধরে নামিয়ে তার কক্ষের সামনে মারধর করে। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাকে পায়ের জুতা দিয়েও প্রহার করে।[৩৯৩] বাংলা বিভাগের সভাপতি ড. রফিকুন্নবী সামাদী ছাত্রলীগ সভাপতি আওয়াল কবির জয়কে চিনতে না পারায় তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে ড. সামাদী সভাপতি জয়ের হাতে লাঞ্ছিত হন।"[৩৯৪]

ভর্তি বাণিজ্যর জন্যে কলেজের অধ্যক্ষ বন্দী, ছাত্রলীগ নেতাকে না চেনার অপরাধে প্রক্টরকে মারধর, ছাত্রলীগ নেতার ডাকে না যাওয়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধানকে লাথি মারা প্রতিদিনকার ঘটনায় আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকরাও আতংকিত হয়ে লেখা শুরু করেছেন--প্রধান মন্ত্রী! ছাত্রলীগ সামলান, লাগাম টানুন ছাত্রলীগের ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্বের ইতিহাসে ছাত্রের হাতে শিক্ষকের এহেন নির্যাতন কোনদিন শোনা যায়নি। ক্ষমতার দাপটের এখানেই শেষ নয়।"ছাত্রলীগ নেতার বাইকের কাগজপত্র দেখতে চাওয়ায় সার্জেন্টের ওপর হামলা।"[৩৯৫]

০৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ৩০ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে রাতে ছাত্রলীগ আয়োজন করে ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানে পাচঁশ (৫০০) নারীকে যৌন নির্যাতন করা হয়।

সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক - এর ১৪ জানুয়ারী ২০১০ সংখ্যায় আবারো বেপরোয়া ছাত্রলীগ লেখায় "প্রকাশ্যে দিনের বেলায় এক ডজন পুলিশের সামনে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ছাত্রমৈত্রীর পলিটেকনিক শাখার সহ-সভাপতি সানিকে

---

৩৯২ সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, ১২ আগষ্ট ২০১০
৩৯৩ সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, ১২ আগষ্ট ২০১০
৩৯৪ সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, ১২ আগষ্ট ২০১০
৩৯৫ আমার দেশ, ১৬.০৩.২০১০

www.pathagar.com

হত্যা করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। ....। এদিকে বিকেলে যুবলীগের নেতা আসাদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৈত্রী নেতাদের ওপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থীর নিকট ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ছাত্রলীগের উপ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এমদাদ হোসেন তার মূল কাগজপত্র কেড়ে নেয়। এ ঘটনায় ওই ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী তার নিকটাত্মীয় ফোকলোর বিভাগের শিক্ষক ড. অনুপম হীরাকে অবহিত করেন। পরে ড. হীরা কাগজ ফেরৎ চাইতে গেলে সন্ত্রাসী এমদাদ তাঁকে বেদম প্রহার করে। শিক্ষক প্রহারের প্রতিবাদে ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রলীগকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনকারীদের দমন করার চেষ্টা করে।

ছাত্রলীগের অপকর্ম থেকে বিরত হয়নি বরং তার মাত্রা ও ধরণ বদলিয়েছে। মিডিয়া এদের অপকর্মের ফিরিস্তি দিতে দিতে হয়রান হয়ে গিয়েছে এবং হাইকমান্ড থেকে অপকর্মের ফিরিস্তি প্রকাশে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাতে তা অতটা প্রকাশিত হচ্ছে না। তারপরও প্রতিনিয়ত ছিটেফোটা যে সংবাদ পাওয়া যায় তাতেও শিউরে উঠতে হয় সমগ্র জাতিকে। গত ০৬.০১.২০১২ তারিখের যুগান্তরের সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে সাতক্ষীরায় কলেজছাত্রী নৃত্যশিল্পীর শ্লীলতাহানি করল ছাত্রলীগ নেতারা। এর পরদিনের যুগান্তরের প্রতিবেদনের শিরোনাম হচ্ছে "ছাত্রলীগ ফের বেপরোয়া, শ্লীলতাহানি, টেন্ডারবাজি, মারধর তাদের নিত্যদিনের ঘটনা।

ছাত্রলীগের অপকর্মকাণ্ড শেষ হয়নি। তিনটি বড় ঘটনা ছাত্রলীগের অপতৎপরতার মাত্রার মর্যাদাকে (?) বৃদ্ধি করেছে।

১. ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ০৭ জুলাই ২০১২ সিলেটের শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মুরারী চাঁদ কলেজ যা এমসি কলেজ হিসেবে সবার নিকট পরিচিত, এর ছাত্রাবাস আগুন দিয়ে পুড়ে দেয়। ঐ ছাত্রাবাসের শিবির কর্মী অধ্যুষিত ৩ টি ব্লকের ৪২ টি রুমে তারা আগুন দেয়। "তারা আগুন দিল এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই কৃতিত্বের দাবিদার ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। ছাত্রাবাসে আগুন লাগিয়ে লাঠি হাতে পাহারা দিয়েছে, মিছিল করেছে। যাতে কেউ আগুন নেভাতে আসতে না পারে। ছবি প্রমাণ করে এ সব অভিযোগের সত্যতা। আগুনে পুড়ে যাওয়া ধ্বংস স্তুপের সামনে দাড়িয়ে কান্নাকাটি করেছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ।"[৩৯৬] কিন্তু যারা আগুন লাগিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেননি তিনি।
২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রোভিসির পদত্যাগের দাবীতে শিক্ষকগণ আন্দেলন করলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ১৯.১১.২০১২ তারিখে শিক্ষকদের

---

[৩৯৬] সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, ১৯.০৭.২০১২

www.pathagar.com

উপর আক্রমণ চালায়। এতে ৩০ জন শিক্ষক আহত হয়। পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

৩. ০৮ জানুয়ারি ২০১৩ ছিল বিএনপি আহুত অবরোধ দিবস। এ দিনে প্রকাশ্যে দেশের প্রায় ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সামনে পুরনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের নিকট ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিশ্বজিৎকে হত্যা করে। বিশ্বজিৎকে হত্যা করার দু'টি উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে বিশ্লেষকগণ মত দিয়েছেন। প্রথমতঃ বিশ্বজিৎকে বিএনপি বা শিবিরের কর্মী ধারণা করা হয়। সে ধারণা থেকে তাকে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বজিৎকে হত্যাকারী শাকিল ভাল করেই চিনতো ও জানতো। শাকিল বিশ্বজিতের দোকানে তার জামা কাপড় তৈরী করতো। বিশ্বজিৎকে মেরে বিএনপি ও শিবির সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করছে তা প্রচার করার একটি পরিকল্পনা থেকে তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু মিডিয়ার কারণে তা বুমেরাং হয়। তারপরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন বিশ্বজিৎ হত্যাকারীরা ছাত্রলীগের কেউ নয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বজিৎকে হত্যাকারীদের আত্মীয়-স্বজন বিএনপি-জামায়াত করে।

আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধিতা

১৯৪৭ সনের পূর্বেই মুসলিম লীগের ভিতর সমাজতন্ত্রী-ইসলাম বিরোধী একটি উপদল গড়ে উঠে, যারা পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম কর্মী সংঘ নামে সংগঠিত হতে থাকেন। ১৯৪৯ সনে মুসলিম লীগ ভাগ করে[৩৯৭] আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে।[৩৯৮] ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির মধ্য দিয়ে "মুসলিম" এরও পতন শুরু হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ তার দলের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটিকে বিদায় করে প্রকাশ্যে মুসলিম চেতনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৫২ সনের বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আন্দোলনের নেতৃত্ব তমদ্দুন মজলিসের হাত থেকে তথাকথিত মুক্ত চিন্তার অধিকারীদের হাতে চলে গেলে তার সুফল আওয়ামী লীগের সফলতার পালে যুক্ত হতে থাকে। এ আন্দোলন ইসলাম ও মুসলিম চেতনার ধারক পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হওয়াতে ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদেরকে বাংলা ভাষার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা শুরু হয়। বাংলা ভাষা আন্দোলনের সকল কৃতিত্ব আওয়ামী লীগ দাবী করলেও রহস্যজনকভাবে তার দলের উর্দু-ইংরেজীতে মিশ্রিত নামে (আওয়াম-উর্দূ শব্দ যার অর্থ জনতা, লীগ-ইংরেজী শব্দ যার অর্থ সংগঠন, দল) পরিবর্তন করে বাংলায় রূপান্তরিত করেনি। অবশ্য এক সময়ের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম দল থেকে বহিস্কৃত হয়ে 'জনতা দল' নামে একটি দল তৈরী করার চেষ্টা করে

[৩৯৭] সেদিনই পাকিস্তান ভাগ করার কাজ শুরু হয়

[৩৯৮] তখন মানুষের মনোভাব বুঝেই 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিতে পারেননি।

www.pathagar.com

সফল হতে পারেননি। 'স্বরাজ পার্টির' গঠনতন্ত্রকেই আওয়ামী লীগ গঠনের সময় তার গঠনতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে।[৩৯৯] স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যাচ্ছে একটি হিন্দু সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মসূচীকেই স্বজ্ঞানে যে দল তার লক্ষ্য ও কর্মসূচী গ্রহণ করে সে দল যে ইসলাম বিরোধী হবে তাতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

১৯৭১ সনের পূর্বেই আওয়ামী লীগ যেমন দলীয় কাঠামোতে ইনার সার্কেল (Inner Circle)[৪০০] ও আউটার সার্কেল (Outer Circle)[৪০১] রাখে তেমনি এর পরিকল্পনাতেও ইনার প্ল্যান (Inner Plan) যা ইসলাম বিরোধী ও আউটার প্ল্যান (Outer Plan) যা ইসলাম বিরোধী নয়, পক্ষেও নয়; বিরাজমান ছিল। অখন্ড পাকিস্তান আমলেই আওয়ামী লীগ একটি ইসলাম বিরোধী দল হিসেবে পরিচিত লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী তার বই "বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ" এ ১৯৫৪-৫৫ সনে আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধিতার নমুনা নীচের ৬ টি পয়েন্ট দিয়ে তুলে ধরেছেন।[৪০২] এগুলো আওয়ামী চিন্তায় ইসলাম বিরোধিতার বিশ্বস্ত দলিল।

১. ১৯৫৫ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় যখন শেরে বাংলা কোরান পাঠ শুরু করেন তখন আওয়ামী এম,পি,এ বরিশালের ফরমুজ্জল হক তাহাতে বাধা দেয় এবং অন্যান্য আওয়ামীগণ তাহার সঙ্গে চীৎকার শুরু করে, ফলে কালামে পাক পড়া সম্ভব হয় নাই।
২. আতাউর রহমান সরকার নবী দিবসে পল্টন ময়দানে মিলাদ মাহফিল বন্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করে।
৩. যুক্ত নির্বাচন বিরোধী পল্টনের সভা ভাঙ্গিয়া, জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া, আওয়ামী দল ধর্ম্মভীরু মুসলমানদিগের দাড়ি পাগড়ী ছিড়িয়া ছিল- তাহার সাক্ষী কেবল ঢাকাবাসী জনগণ।
৪. ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিরোধীতা করিতে যাইয়া জনাব সোহরাওয়ার্দি জাতীয় পরিষদে ইসলামের বিরুদ্ধে যে জঘন্য লজ্জাস্কর উক্তি করিয়াছিলেন, দুনিয়ায় শুধু ইসলামের শত্রুরাই ঐ ধরনের উক্তি করিয়াছে।
৫. আতাউর রহমান মন্ত্রীসভা মন্দির মেরামতে টাকা দিতে পারিল কিন্তু মসজিদ মেরামতে কেন পয়সা খরচ করিলেন না, এ প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী ক্বাওমের একদিন দিতেই হবে।
৬. যে মনোরঞ্জন ধর পরিষদে কোরান পাঠে বাধা দিল তাহাকে লইয়া মন্ত্রীসভা গঠন।"

---

৩৯৯ বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী; পৃঃ ভূমিকা vii

৪০০ পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান এ বি এস সফদার, সিএসপি আহমেদ ফজলুর রহমান, সিএসপি রুহুল কুদ্দুস ইনার সার্কেলের সদস্য ছিলেন।

৪০১ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ।

৪০২ বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী; পৃঃ ২৪৩

www.pathagar.com

১৯৭২ সন থেকে আওয়ামী লীগ ও তার মুক্ত চিন্তার বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করা শুরু করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর ইসলামী চেতনা এক নয়। ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন তাই তাদের এ প্রচারণা এ দেশের নব্বই শতাংশ মানুষের মতই বিপক্ষে যাক তারা তাদের ঐ প্রচারণার বিপক্ষে চুপ থেকেছেন। এ সুযোগে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোগ্রাম থেকে কোরআনের উদ্ধৃতি "রাব্বি জিদ্‌নি ইলমা", সলিমুল্লাহ 'মুসলিম' হল ও ফজলুল হক 'মুসলিম' হল থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়। দার্শনিক ইকবালের নামে নামকরণ করা 'ইকবাল' হলের নাম বদলিয়ে রাখা হয় 'জহুরুল হক' হল। ইসলামের প্রতি রুষ্টতা এতোই বেশী ছিল যে, 'কবি নজরুল ইসলাম' কলেজের নাম বদলিয়ে রাখা হয় 'কবি নজরুল' কলেজ।

১৯৭২ সনে প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিমন্ডলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসৃতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৭২ সনের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।

১৯৭৫ সনের পট পরিবর্তন মানুষের সহজাত ইসলামী চেতনার পথ খুলে দিলে মানুষ এটাকে স্বাগত জানায়। আওয়ামী লীগ তখন হিসাব কষে কষে অগ্রসর হতে থাকে। তারা ইনার প্ল্যানকে স্থগিত রেখে আউটার প্ল্যানকে আনুষ্ঠানিক ইসলামমুখী করে প্রকাশ ও প্রচার করতে থাকে।

১৯৯৬ সনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগ ধীরে ধীরে তার আসল মূর্তি প্রকাশ করতে থাকে। তাদের ঘরাণার বুদ্ধিজীবিরা ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম চেতনাকে আঘাত হেনে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়ে প্রদর্শন করারও সাহস দেখায়।

২০০৯ সনে ক্ষমতা লাভ করে তারা পুরাপুরিভাবে ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করে। সৈয়দ আশরাফ বলেন "আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই।"[৪০৩] তার কথাই সত্য; একজন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী মুসলমানও হতে পারেন না, হিন্দু বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী হতে পারেন না। তারা সব ধর্মেরই বিরোধিতা করেন। যখন তারা বলেন আমরা ইসলাম ধর্মের পক্ষে তখন তারা আর যাই হোক সত্য কথা বলেন না।

---

[৪০৩] দৈনিক আমার দেশ, তারিখ ঃ ১৪.০৭.২০১১

www.pathagar.com

তাবলীগ জামাতের ইজতেমাকে বাদ দিয়ে ইসলাম ধর্মীয় সকল কর্মকান্ড এমনকি ওয়াজ মাহফিলও বন্ধ করে দিয়েছেন। ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি চালু করেন।। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মেধা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও নানা অযুহাতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ভয়াবহ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ইতিবাচক প্রণোদনার পরিবর্তে আধুনিকায়নের নামে ধর্মমুখী শিক্ষা ও গবেষণা থেকে মুক্ত করার নিরন্তর চেষ্টা চালানো হয়েছে। 'মাদ্রাসা শিক্ষাকে জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্র' হিসেবে চিত্রায়িত করার জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। দালাল ও নাম সর্বস্ব মাওলানাদেরকে দিয়ে দেশের প্রথিতযশা, বরেণ্য ও গণস্বীকৃত ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিষোদগার, মিথ্যাচার, চরিত্রহরণমূলক অভিযান নিয়মিত কার্যক্রমে রূপ নিয়েছে।

আওয়ামী লীগপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম বিরোধিতা

এ দেশে ষাটের দশক থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তবুদ্ধির চর্চার[৪০৪] নামে আল্লাহ বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত হওয়াকে আধুনিকতা ও প্রগতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে আসছে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা হচ্ছে আধুনিক, পুঁজিবাদ হচ্ছে বুর্জুয়া প্রতিক্রিয়াশীল আর ধর্ম হচ্ছে আফিম, এমন চিত্তাকর্ষক শ্লোগান সে সময়ের তরুণদেরকে আকৃষ্ট করে। সে সময়ের অনেক তরুণই পরিণত বয়সে বিশ্বাসের দিক পরিবর্তন করে 'ফেরেশতার ডানায়' চড়েছেন।[৪০৫] কিন্তু অনেকেই তাদের পূর্ব বিশ্বাসেই আস্থাশীল থেকে ধর্মহীনতার বিষ সমাজে ছড়ান।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই দাউদ হায়দার ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মকে আঘাত হানলে মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করে; শেখ মুজিব তাকে রক্ষা করার জন্য জার্মানীতে প্রেরণ করেন। একই ধারায় লিখতে গিয়ে তসলিমা নাসরিনকেও জনরোষে পড়তে হয়। তিনিও দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রচারিত আছে যে আহমদ শরীফ তার ক্লাসে বলতেন, "এতদিন তোমরা কোরআন শরীফের কথা শুনেছ, হাদীস শরীফের কথা শুনেছ; এখন শোন আহমেদ শরীফের কথা।" নামাজের আজানকালে ক্লাসে মেয়েরা মাথায় কাপড় দিলে তিনি বলতেন "আল্লাহ কি তোমাদের ভাসুর যে মাথায় কাপড় দিতে হবে?"

হুমায়ুন আজাদ তার 'আমার অবিশ্বাস' বইতে বলেন "বিশ্বাসের জগতটি পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশ্বাসের বইগুলো অন্ধকারের বই, ওগুলোর কাজ মানুষের

---

৪০৪ মুক্তবুদ্ধির চর্চা অর্থ হলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু বলা কিছু লেখা যা গত শতকের চল্লিশের দশকে শুরু করেন কবি হুমায়ুন কবির। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা কবি সাহিত্যিকরা এতে উৎসাহিত হয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় বেশী করে আত্মনিয়োগ করেন।

৪০৫ কবি আল মাহমুদ।

www.pathagar.com

মনকে গভীর অন্ধকারে আবৃত করা।"[৪০৬] "চারপাশে ধর্ম দেখে মনে হতে পারে যে মানুষ ধর্ম ছাড়া বাঁচতে পারে না, সত্য হচ্ছে ধর্মের মধ্যে মানুষ বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। মানুষ মর্মমূল ধর্মবিরোধী, মানুষের পক্ষে বেশী ধর্ম সহ্য করা অসম্ভব; ধার্মিকেরাও যতোটা ধার্মিক তার থেকে অনেক বেশি অধার্মিক। মানুষের সৌভাগ্য মানুষ বেশি ধর্ম সহ্য করতে পারে না, তাই বিকাশ ঘটেছে মানুষের। বেশি ধর্মে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে (দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তিনি নিজেই অতিরিক্ত মদ পান করে বেশি বেশি অধর্মীয় কাজ করে জার্মানীতে মৃত্যুবরণ করেন) ধার্মিক মানুষ অসুস্থ মানুষ।"[৪০৭] "ধর্মের বইগুলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।"[৪০৮] "পরলোক হচ্ছে জীবনের বিরুদ্ধে এক অশ্লীল কুৎসা; পরলোকের কথা বলা হচ্ছে জীবনকে অপমান করা। পরলোকে বিশ্বাস জীবনকে করে তোলে নিরর্থক।[৪০৯]

শামসুর রাহমান বলেন, "তসলিমা নাসরিনকে তো দেশেই থাকতে দেয়া হয়নি। সে দেশে আসতে পারছে না। তার অপরাধ সে লিখেছে। সে নারী জাগরণের কথা লিখেছে। নারী স্বাধীনতার কথা লিখেছে। কতগুলো ধর্মান্ধ, স্বাধীনতাবিরোধী, মানবতাবিরোধী, কূপমন্ডূক, বদমাশ এদেশকে অন্ধকারে রাখতে চায়। এদের কারণে দেশে মুক্ত সাহিত্যচর্চার জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত হচ্ছে না। বর্তমানে গোলটুপির সংখ্যা বেড়ে গেছে। ..মোল্লারা তো মেয়েদের মানুষই মনে করে না।"[৪১০]

আওয়ামী লীগপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ইসলামী তাহজীব তমদ্দুনকে পরিহার করে সকল জায়গায় মঙ্গল প্রদীপের নামে অগ্নি পুজো চালু করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পন্ন না হয়ে অসাম্প্রদায়িকতার নামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে তুলে। ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারিতে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'এর দাবীতে যারা প্রাণ হারান তাদের স্মরণে যিনি প্রথম শহীদ মিনার গরেছিলেন সেই ভাষা সৈনিক অলি আহাদের মৃত্যুর পর তার নামাজে জানাজা শহীদ মিনারে পড়াতে গেলে এ সকল বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িকতা-সাম্প্রদায়িকতা বলে একদিকে ভাষা সৈনিক অলি আহাদকে যেমন অবমাননা করেছে অন্যদিকে তারা ইসলামকেও অবমাননা করেছে।

ধর্ম নিয়ে আওয়ামী প্রতারণা

আওয়ামী লীগ একটি ধর্মনিরপেক্ষ, ইসলাম বিরোধী দল। কিন্তু মুসলিম সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করতে এ দল কখনো ভুল করেনি। তাই তারা আওয়ামী

---

৪০৬ আমার অবিশ্বাস, হুমায়ুন আজাদ; পৃষ্ঠা-৬৩

৪০৭ আমার অবিশ্বাস, হুমায়ুন আজাদ; পৃষ্ঠা-৭৯

৪০৮ আমার অবিশ্বাস, হুমায়ুন আজাদ; পৃষ্ঠা-৯২

৪০৯ আমার অবিশ্বাস, হুমায়ুন আজাদ; পৃষ্ঠা-১০৩; এ অবিশ্বাসী মানুষটিকে পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছায় "মিল্লাতে রাসুলিল্লাহ" বলে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে।

৪১০ সাক্ষাৎকার, কবি শামসুর রাহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এম. সহিদুল ইসলাম। সাক্ষাৎকার (বই), সম্পাদনায় ঃ এম. সহিদুল ইসলাম, মৃদুল প্রকাশন; পৃঃ ৪৭

www.pathagar.com

ওলামা লীগ গঠন করে ধর্মনিরপেক্ষ-ইসলাম (Secular-Islam) এর প্রচারণা চালাচ্ছে। ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী এ দল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তার কাছে ধর্ম-অধর্ম সব সমান।

একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে থেকে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করেন। পবিত্র কাবা শরীফ থেকে ওমরাহ্ শেষে হিযাব পরিহিতা তজবীহ হাতে একজন সাচ্চা মুসলিম নারী হিসেবে ৭৫ পূর্ব শেখ মুজিবের অপশাসনের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশীরা তার বাহ্যিক পরিবর্তনকে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসায়। ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের কারণে ২০০১ সনে ক্ষমতাহারা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, যেখানে ইসলামী অইন অনুসরণের অংগীকার করা হয়।

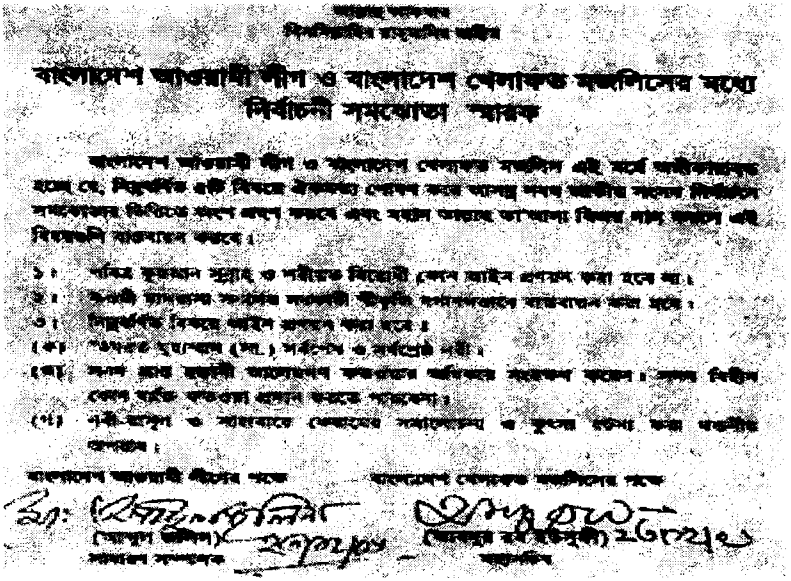
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মধ্যে
নির্বাচনী সমঝোতা স্মারক

১। পবিত্র কুরআন সুন্নাহ ও শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না।

গণতন্ত্রের লেবাসে ফ্যাসীবাদী দল আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগের ইতিহাসে দু'টি বিপরীতমুখী অধ্যায় পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে, এটা একটি গৌরবোজ্জ্বল দিক; বিপরীতে গণতন্ত্র হত্যায় আওয়ামী লীগ বার বার ন্যাক্কারজনক ভূমিকা রেখেছে। দলের ভেতর এ দলটি কখনও গণতন্ত্র চর্চা করেছে এমন নজির নেই।

www.pathagar.com

১৯৫৬ সনে সংসদের ডেপুটি স্পীকারকে হত্যা করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যার যাত্রা শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সনে জেনারেল আইয়ুব সামরিক শাসন জারী করেন এবং এগার বছর সামরিক আইন জারী থাকে দেশে।

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত দেশের প্রথম সংবিধানে গণতন্ত্রকে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক[৪১১] গণতন্ত্র রাখলেও মানুষ সমাজতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্রে বেশী প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে জোর করে কেন্দ্র দখল ও নির্বাচনের ফলাফল বদল সেই গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। এই কুঠারাঘাতেও যখন গণতন্ত্র মরে যায়নি তখন ১৯৭৫ সনের জানুয়ারীতে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে কবর দেয়া হয়।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্ট মেজরদের সামরিক অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র হত্যার মূলধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে এ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারী ছিল আওয়ামী লীগেরই একাংশ। কিন্তু ১৯৭৫ সনের ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের মূলধারা খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলেও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নভেম্বর ৬ ও ৭ তারিখে over trum করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু আওয়ামী লীগের Thesis এবং জাসদের Antithesis এর মাঝখান দিয়ে Synthesis হিসেবে জেনারেল জিয়া আবির্ভূত হন।

১৯৮১ সনের ৩০ মে তারিখে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করার পিছনে আওয়ামী লীগের হাত ছিল বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। কারণ প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকান্ডের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে জানতে চান যে, শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা?[৪১২] ১৯৮২ সনে ২৪ জানুয়ারী গণতন্ত্র হত্যা করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করলে শেখ হাসিনা এতে স্বাগত জানান।

১৯৯৬ সনে জেনারেল নাসিমকে দিয়ে এক সেনা অভ্যুত্থান ঘটাতে গিয়ে তা ব্যর্থ হলে গণতান্ত্রিক ধারা সেবারের মত অব্যাহত থাকে। কিন্তু ২০০৭ সনে ফখরুদ্দিন-মঈনুদ্দিনের সামরিক শাসনের ছদ্মাবরণে জরুরী অবস্থার তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল হিসেবে ঘোষণা দেন।[৪১৩]

---

৪১১ সমাজতন্ত্র হচ্ছে একদলীয় ব্যবস্থা।

৪১২ বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার ১২ বছর, শওকত মাহমুদ, দৈনিক দিনকাল, তারিখঃ ২০.০৫.১৯৯৩

৪১৩ দৈনিক আমার দেশ, তারিখঃ ১৬.০৩.২০০৭

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সনের ৬ মার্চ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি কলকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেসে মিলিত হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত প্রতিনিধিগণ আলাদা সেশনে বসে কম্যুনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৮ সনে ৪র্থ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটি ঐ সম্মেলনকে তার প্রথম কংগ্রেস ঘোষণা দিয়ে দলের নাম রাখেন পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি (EPCP)। বাংলাদেশ হওয়ার পর যার নাম রাখা হয় বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (CPB)। ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনে এর ভূমিকা ছিল উর্দূর পক্ষে।[৪১৪] কিন্তু ১৯৬৯ সনে আইউব খান বিরোধী আন্দোলনে এর ভূমিকা ছিল স্মরণ করার মত। ১৯৭১ সনের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপে প্রথম মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে CPB-NAP-BSU[৪১৫] যৌথভাবে মুক্তি বাহিনীর আলাদা ফোর্স গঠন করে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ও মুজাফ্ফর)

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ তারিখে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পার্টির[৪১৬] কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি আওয়ামী লীগ ঘোষিত নির্বাচনী মেনিফেস্টো উপেক্ষা করে মার্কিন ঘেষা পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করলে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে মতদ্বৈততা দেখা দেয়। দল থেকে সোহরাওয়ার্দীকে মার্কিন ঘেষা পররাষ্ট্র নীতি ত্যাগ করার অনুরোধ করলে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে তুমুল বাক-বিতন্ডা সৃষ্টি হয়। বামপন্থীদের পরামর্শে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন।

মাওলানা ভাসানীর ১৭ জুন ১৯৫৭ ঘোষণা অনুসারে ২৫ ও ২৬ জুলাই ১৯৫৭ ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরই সভাপতিত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে[৪১৭] এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের শত বাধা বিপত্তির ঝড় ও ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।[৪১৮] এটি পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আস্থাশীল আওয়ামী লীগের অংশ এবং পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তান ব্যাপি জাতীয় রাজনৈতিক দল; এ দলে বামপন্থীদের সমাবেশ ঘটে। মাওলানা ভাসানী সভাপতি,

---

৪১৪ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তৎকালীন রাজনীতি, খন্ড -১ ;বদরুদ্দিন উমর; পৃঃ ২৬৫

৪১৫ CPB-NAP-BSU Comunist Party of Bangladesh, National Awami Party, Bangladesh Student Union

৪১৬ রিপাবলিকান পার্টির সভাপতি ছিলেন খান আবদুল জাব্বার খান যিনি ডাঃ খান সাহিব হিসেবে পরিচিত ছিরেন।

৪১৭ সম্ভবতঃ তখন রূপমহল সিনেমা হলের নাম ছিল নিউ পিক্চার পালেস। সিনেমা হলটি সদরঘাটে ছিল, বর্তমানে তা ভেঙ্গে মার্কেট করা হয়েছে। আমানিটোলার শাবিস্তান সিনেমা হলের নাম ছিল পিক্চার প্যালেস।

৪১৮ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, অলি আহাদ; পৃঃ ২৮২-২৮৬

www.pathagar.com

হাজী মোহাম্মদ দানেশ সহ-সভাপতি এবং গণতন্ত্রী দলের সভাপতি সিলেটের মাহমুদ আলী[৪১৯] সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান।

আওয়ামী লীগের মুখপত্র দৈনিক ইত্তেফাক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আবির্ভাবকে বাঁকা চোখে দেখে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি NAP কে বিকৃত করে Nehru Aided Party আখ্যা দিয়ে জনগণের নিকট হেয় করতে প্রচারণা চালায়।

১৯৬২ সনে চীন-ভারত যুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষাবলম্বন করলে চীন ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সে বিরোধের জের ধরে এ দেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। ১৯৬৭ সনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি রাশিয়াপন্থী ও চীনপন্থীতে ভাগ হয়ে যায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) চীনপন্থী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মুজাফ্ফর) রাশিয়াপন্থী রাজনীতি শুরু করে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

শেখ মুজিবের স্ববিরোধী রাজনৈতিক চরিত্র ও আওয়ামী লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে ঐ দলের তরুণদের নিয়ে সিআইএ তার পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে থাকে। শেখ মুজিবের সমাজতন্ত্রের[৪২০] জবাবে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নামক এক চটকদারী শ্লোগানকে হাতিয়ার করে মাঠে নামানো হয় এই তরুণদের নিয়ে। প্রক্রিয়াটা শুরু হয় ছাত্রলীগের ভাঙনের মধ্য দিয়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রলীগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২১, ২২ এবং ২৩ জুলাই। ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রটস্কি লাইনের সিরাজুল আলম খান, সম্মেলন করে পল্টন ময়দানে। অপর গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি যিনি বলেন, "আমরা আইনের শাসন চাইনা, চাই শেখ মুজিবের শাসন"[৪২১]; সম্মেলন হয় রেসকোর্স ময়দানে। দুই গ্রুপই শেখ মুজিবকে সম্মেলন উদ্বোধনের আমন্ত্রণ জানায়। শেখ মুজিব রেসকোর্সকেই বেছে নেন।

পল্টন ময়দানে সিরাজুল আলম খান গ্রুপের সম্মেলন মুজিব বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যোগ দেয়। আ স ম আব্দুর রব, হাসানুল হক ইনু, শাহজাহান সিরাজ, সেনা কর্মকর্তাদের থেকে কর্ণেল তাহের, মেজর জলিলসহ হাজার হাজার তরুণ নেতা ও কর্মী সম্মেলনে যোগদান করে। তখন এমন অবস্থা হয়েছে, যুদ্ধ ফেরত তরুণদের রক্ত টগবগ করছে। আর সেভাবে তো বিপ্লবী সরকার হয়নি - একটা সাধারণ পার্লামেন্টারি সরকার। সেখানেও কিছু গোলমাল শুরু হয়েছে। তখন ওই ছেলেদেরকে বোঝানো সহজ হয়েছে যে, এদেরকে দিয়ে হবে না। ছেলেরা কিন্তু অত্যন্ত সাচ্চা মনে সমাজতন্ত্র করার জন্য, সমাজবিপ্লব করার জন্য তৈরি হয়েছিল।

---

৪১৯ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম বিরোধিতাকারী।

৪২০ যার অপর নাম 'মুজিববাদ'

৪২১ ইতিহাসের রক্তপলাশ ১৫আগস্ট ১৯৭৫,আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; পৃঃ ৯৩

www.pathagar.com

পল্টন ময়দানে সিরাজুল আলম খান গ্রুপের সম্মেলন শেষ হলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় দীপ্ত শ্লোগানের মধ্য দিয়ে এবং এই সম্মেলন থেকেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলো। ঐ বছর ৩১ অক্টোবর আহবায়ক কমিটি গঠিত হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তৈরির চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আত্মপ্রকাশে দেশের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এর পতাকা তলে এসে জড় হলো সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সৎ এবং দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা। যখন কেউ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি উচ্চারণে সাহসী হচ্ছিল না, তখন এরাই সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হল। স্বাভাবিক কারণেই এরা দ্রুত জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে এবং জনগণের কাছাকাছি চলে যায়। দলের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে আকৃষ্ট হয় দেশের হাজার হাজার সৎ দেশপ্রেমিক তরুণ। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সৃষ্ট রক্ষী বাহিনী মোকাবিলায় গড়ে জাসদ গড়ে তোলে গণবাহিনী।

আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেয়ে শেখ মুজিব বিরোধিতার উপর এরা জোর দেয়। আওয়ামী লীগের হাতে এ দলের প্রায় ত্রিশ হাজার নেতা কর্মী প্রাণ হারায়। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ভারতপন্থীদের ক্ষমতার কাছাকাছি আনলে কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান জাসদকে ক্ষমতার কাছাকাছি এনে দেয়। কিন্তু জাসদের হঠকারী সিদ্ধান্তে তাদের সে সুযোগ হাত ছাড়া হয়। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বিরোধিতার লক্ষ্যবস্তু না থাকায় ধীরে ধীরে জাসদের রাজনীতি স্তিমিত হয়ে আসে। জাসদ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে বর্তমানে একটি মৃতপ্রায় দলে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি

সলিম জাতীয়তাবাদী বা মধ্য ডানপন্থীদের সবচেয়ে বড় দল হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। জেনারেল জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির[৪২২] ভিত্তিতে গড়ে উঠা এ দলে মুসলিম লীগ, ভাসানী ন্যাপ, মুসলিম চেতনার আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলের নেতা কর্মীরা যোগদান করে। জিয়ার ব্যক্তিগত ইমেজ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সর্বোপরি বাকশাল মতাদর্শ বিরোধী মনোভাব এ দলের জনপ্রিয়তার উৎস। জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর পরও এ দলটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকে কিন্তু জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন এ দলের ক্ষমতা ও দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছেদ আনে। জেনারেল এরশাদের পতনের পর এ দল পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। কতিপয় নেতার কার্যকলাপ ও দুর্নীতি দলের ইমেজে কালো দাগ ফেলার কারণে তরুণ প্রজন্মের নিকট আওয়ামী লীগের

---

[৪২২] পরিশিষ্টঃ ২১

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়; ফলে এ দল ক্ষমতার রাজনীতির দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীক এ দেশের রাজনীতির মেরুকরণ হলে পড়ায় ছোট ছোট দলগুলোকে এদের সঙ্গে জোট বাধতে হয়।

জাতীয় পার্টি

মুসলিম জাতীয়তাবাদী বা মধ্য ডানপন্থীদের দ্বিতীয় বড় দল হচ্ছে জাতীয় পার্টি। জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এ দল গঠন করেন। উপজেলা পদ্ধতি ও ১৯ টি জেলা ভেঙে ৬৪ টি জেলা গঠনের মাধ্যমে এ দেশে বিরাট প্রশাসনিক পরিবর্তন আনেন। সামরিক ও দলীয় শাসন অবসান হলে এ দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, তবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত দল। ১৯৪১ সনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে এ দল বির্তকে জড়িয়ে পড়ে। 'ইসলাম কোন ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' দলের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদীর ইসলামের এ দর্শনের সঙ্গে তৎকালীন অনেক আলেম ভিন্ন মত পোষণ করেন। সে সময়ের অধিকাংশ আলেম ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে কেবল ধর্ম মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মত ইসলামে কোন রাজনীতি নেই মতামত দিলেও আজ মাওলানা মাওদূদীর সে ব্যাখ্যার সাথে একমত পোষণ করেন। ইসলামে রাজতন্ত্রের কোন সুযোগ নেই ঘোষণা দিয়েও এ দলকে ব্যাপক ঝামেলায় পড়তে হয়। ইসলামী রাষ্ট্র বনাম মুসলিম রাষ্ট্র বিতর্কে পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বিরোধিতায় আবারো বির্তকে জড়িয়ে পড়ে। জামায়াত নিজেকে একটি ইসলামী আদর্শবাদী আন্দোলন (Islamic Movement) দাবী করে; কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কে বার বার জড়িয়ে এটি মূলতঃ একটি রাজনৈতিক দলের পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের বিভিন্নমুখী গবেষণার মাধ্যমে এ দল ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার গড়ে তুলে।

১৯৭১ সনে জামায়াতে ইসলামী কি খুব বড় দল ছিল, এমন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এস এম আলী; বলেছেন "Around that time, such smaller parties as Nizam-e-Islam and Jamat-e-Islam—two right wing religious parties—and the Muslim League, the remnant of the countries once all-powerful party, hardly mattered in East Pakistan."[৪২৩] (সে সময়ে, নেজামে ইসলামী ও জামায়াতে ইসলামী-- দু'টি ডানপন্থী ধর্মীয় দল ও অন্যান্য ছোট ছোট দল এবং এক সময়ের প্রবল প্রভাবশালী মুসলিম লীগের ক্ষুদ্র অপভ্রংশ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল না।) ১৯৭০ সনের

[৪২৩] After The Dark Night, S M Ali; p 21

www.pathagar.com

ডিসেম্বরের নির্বাচনে এ দলটি ভোট পেয়েছে প্রদত্ত (casting) ভোটের মাত্র ৩ শতাংশ।[৪২৪] আর এ ভোটও এসেছে যারা মুসলিম লীগের শাসনে আস্থা হারিয়েছেন এবং আওয়ামী লীগকে যারা বিশ্বাসযোগ্য দল হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি, তাদের একটি বিরাট অংশ থেকে।

জামায়াত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অন্যান্য ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলগুলোর মতই পাকিস্তানের অখন্ডতার জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখে। ১৯৭২ সনে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সকল ধর্মীয় দল নিষিদ্ধ হলে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, জমিয়তে ওলামা ইসলামসহ জামায়াতের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৬ সনে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হলে এ সকল দল তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

জামায়াতের তার সংগঠনে একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম এবং অন্যদিকে কলেজ বিশ্বদ্যিালয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সফল সমাবেশ ঘটাতে পেরেছে। ১৯৭৭ সনে আত্মপ্রকাশ করে তাদের ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র শিবির' সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক নাড়া দেয়। এভাবে সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকে জামায়াত ১৯৭০-৭১ সনের চেয়ে অনেকটাই শক্তিশালী।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তন

৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ঃ আওয়ামী আনুকূল্যে সামরিক অভ্যুত্থান

১৯৭৫ সনে ২৫ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ সংবিধানে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সকল দল বিলুপ্ত করে বাকশাল নামে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। এ বছরের ১৫ আগষ্ট একই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অন্যতম বাকশালের পলিট ব্যুরোর সদস্য ও মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাকশাল শাসনের অবসান ঘটিয়ে সামরিক শাসনের নামে আমেরিকাপন্থী আওয়ামী লীগের শাসন চালু করা হয়। ভারতপন্থী বাকশালের শ্বাসরুদ্ধ নৈরাজ্যকর শাসন ব্যবস্থার পতন মানুষকে নতুন প্রশ্বাস নিতে সুযোগ করে দেওয়ায় জনগণ এ সরকারকে স্বাগত জানায়। শেখ মুজিবের পতনের পর ভারতীয় সরকার ও সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে পিছিয়ে যায়। 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় সমর বিশারদ রবি রিখি লেখেন "শেখ মুজিবুর রহমান যখন নিহত হন, তখন ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে ঠিক করেছিলেন হস্তক্ষেপ করবেন। এ জন্য সেনাবাহিনীর তিনটি ডিভিশনকে সতর্কও করা হলো, শেষে সরকার গড়িমসি করল এবং সুযোগ পেরিয়ে গেলো। ফলে হলো কি বাংলাদেশকে আমাদের শিবিরে রাখার সুযোগ আমরা হাত ছাড়া করলাম।"[৪২৫] কিন্তু

---

৪২৪ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০ এর ফলাফল প্রতিবেদন।

৪২৫ 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় সমর বিশারদ রবি রিখি, ১১.১১.১৯৮৮; সংগ্রহ বাংলাদেশে 'র' আবু রুশদ; পৃঃ ৩৫ http://www.google.com/#hl=en&sa=X&ei=PRP6TeX- NIvRrQeD9m2Dw&ved= 0CFUQBSgA&q=In+1975, Sheikh + Mujibur + Rahman + was + assassinated. + Though +

www.pathagar.com

ভারতীয় সরকারের নির্দেশে এর গোয়েন্দা সংস্থা RAW এ দেশে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে পড়ে।[৪২৬] তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৫ সনের ৩ নভেম্বর খন্দকার মোশতাক সরকারকে হটিয়ে পুনরায় ভারতপন্থী বাকশালী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। খন্দকার মোশতাক ও তৎকালীন সেনা প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াকে বন্দী করা হয়। ঢাকার রাস্তায় বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও রাশেদ মোশাররফের মায়ের নেতৃত্বে এ সামরিক অভ্যুত্থানকে সর্মথন করে আওয়ামী লীগের এক মিছিল বের করা হয়। প্রথমবারের মত রাজনীতিতে বা সরকার প্রধান পদে বিচারপতিকে আনা হয়; তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সা'দাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতির আসনে বসানো হয়।

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ ঃ সিপাহী জনতার বিপ্লব

আওয়ামী অপশাসনের বিরুদ্ধে সে সময়ের একমাত্র বিপ্লবী রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতন্ত্রিক দল (জাসদ) ও তার অঙ্গ সংগঠন বিপ্লবী সৈনিক পরিষদ ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্তকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের এমন সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চাননি। কর্ণেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে সেনা ছাউনিগুলোতে বিদ্রোহ সৃষ্টি হলে সৈনিকেরা সামরিক কর্মকর্তাদেরকে হত্যা শুরু করে; এতে কতজন সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন সে সংখ্যা আজো অজানা রয়েছে। সামরিক কর্মকর্তারা নিজেদের পিপ্[৪২৭] খুলে জীবন বাঁচানোর জন্য সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মিশে যান। পরিস্থিতি কর্ণেল তাহেরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তিনি জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সিপাহীদের দিয়ে নতুন শ্লোগান চালু করেন "সিপাই-জনতা ভাই ভাই-জেনারেল জিয়ার মুক্তি চাই" "সিপাই-জনতা ভাই ভাই-খন্দকার মোশতাকের মুক্তি চাই" "সিপাই জনতা ভাই ভাই-খালেদ মোশারফের রক্ষা নাই।"

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সিপাহীরা জেনারেল জিয়াকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে আনেন এবং সামরিক বাহিনীতে chain of command ফিরিয়ে আনার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। খন্দকার মোশতাককে মুক্ত করা হয়; রাষ্ট্রপতি কে হবেন বা থাকবেন, মোশতাক না সায়েম এ জল্পনা কল্পনা চলে কয়েক ঘন্টা। তিন মাসের মধ্যে

Mrs + Indira + Gandhi + first + considered + intervention + and + Army + alerted + 3 + divisions, + in + the + end + the + government + h esitated + and + the + moment + passed. &spell=1&ba v = o n.2,or.r_gc.r_pw.&fp = 9dd7129c70b71d22&biw = 1358&bih = 97 accessed on 15.06.2011 এ উল্লেখ করা হয়-- In 1975, Shiekh Mujibur Rahman was assassinated. Though Mrs Indira Gandhi first considered intervention and Army alerted 3 divisions, in the end the government hesitated and the moment passed.

৪২৬ বাংলাদেশে 'র', আবু রুশদ; পৃঃ ৫৪

৪২৭ সেনা কর্মকর্তাদের পদবী বুঝার জন্য ইউনিফরম পড়া অবস্থায় কাধে বা কলারে বিভিন্ন ধরণের চিহ্ন থাকে তাকে পিপ্ বলে।

www.pathagar.com

সাধারণ নির্বাচন দিয়ে সায়েম বিদায় নিবেন শর্তে মোশতাক রাষ্ট্রপতি পদের দাবী ত্যাগ করেন। অভাবিতভাবে বিচারপতি সায়েম সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য না হয়েও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন এবং একাধারে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকেন; তিন বাহিনী প্রধানগণ উপ-সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে বাকশালের প্রত্যাবর্তন ও জাসদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের অভিযান সমাপ্ত হয়।

জিয়াউর রহমান : আধুনিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পথিকৃৎ

পরিস্থিতি (situation) শুধু সে সময় দিয়েই বিচার বিশ্লেষণ করা যায় আর পরে তা উপলব্ধি করা কঠিন হয়। এরূপ ঘটনাই তা ইতিহাসের অংশ হিসাবে গণ্য হয়। তাৎক্ষণিক ইতিহাস কোন নিরপেক্ষ বা বস্তুনিষ্ঠ বিষয় নয়; দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রচনার বিষয়। ১৫ আগষ্ট, ৩ নভেম্বর বা ৭ নভেম্বরকে তখনকার পরিস্থিতি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে Situational Leader এর উদ্ভব হয়; জেনারেল জিয়া ছিলেন তেমনি একজন Situational Leader। ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব যেখানে ব্যর্থ জেনারেল জিয়া সেখানে Situational Leader হিসাবে সফল। ১৯৭৫ সনে বাকশাল গঠন করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে পরিস্থিতিতে জেনারেল জিয়ার নেতৃত্ব বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ সানন্দে বরণ করেন।

জিয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বাংলাদেশ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে এক নতুন দিগন্তে পা দেয়। তিনি বাকশালী সংবিধান (৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান, রাজনীতি, রাষ্ট্রকাঠামো বদলানো হয়) পরিবর্তন করে সে সময়ের আট কোটি মানুষের প্রাণের দাবী অনুযায়ী বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ভারত কর্তৃক নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় চারটি মৌলিকনীতিতে পরিবর্তন এনে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নীতিমালা সংযোজন করেন।

তিনি বিচার বিভাগের উপর প্রশাসনযন্ত্রের হস্তক্ষেপ রোধ করেন এবং সরকারী ৪টি পত্রিকার পরিবর্তে সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেন। 'একমাত্র ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতি'র পরিবর্তে তার উন্মুক্ত পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশকে বন্ধুহীন রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করে। এভাবে রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনসহ বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তলাবিহীন ঝুড়ি রাষ্ট্রের দুর্নাম ঘোচানোর প্রক্রিয়ায় জেনারেল জিয়া Situational Leader থেকে Strategic Leader হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আজ যারা জিয়ার তৎকালীন নীতিসমূহের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন তারা হয়

(১) পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে তৎকালীন ৮ কোটি বাংলাদেশীকে অসম্মান করছেন, নতুবা

(২) বাংলাদেশকে পুনরায় কেবল ভারতমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাচ্ছেন, অথবা

www.pathagar.com

(৩) এরা নতুন প্রজন্মের মানুষ, যারা ঐ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন বা পরিস্থিতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে জেনারেল জিয়া Statesmanship গুণাবলী অর্জন করার মাধ্যমে বেশ কিছু মৌলিক কাজ করেন। যেমন--সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংহতকরণ, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য খাল কাটা কর্মসূচি গ্রহণ, রাষ্ট্র গঠনের জন্য মানুষে মানুষে রেষারেষী দূর করে একসূত্রে কাজ করার জন্য শেখ মুজিব যে কলাবরেটর আদেশে আটককৃতদের সাধারণ ক্ষমা করে দেন, সেই ধারাবাহিকতায় কলাবরেটর আদেশ বাতিলকরণ, উচ্চ আদালতের অভিজ্ঞ বিচারকদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে জাতির কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য তাদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি। কিন্তু তার এ ধরণের কর্মকান্ড ভারত সরকার বিশেষ করে RAW সুনজরে দেখেনি, তাই এ দেশের ভারতীয় এজেন্টদের হাতে তাকে জীবন দিতে হয়।

হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ঃ বাংলাদেশের আইউব খান

RAW এর ছক অনুসারে জিয়া ও মঞ্জুরকে হত্যা করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল না করে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পক্ষে মত দেন। উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বিএনপির জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণকে নিজের জন্য ঝুকিপূর্ণ মনে করে কুটকৌশল শুরু করেন। তিনি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর বিভিন্ন হীন পন্থা অবলম্বন করেন। শেষ পর্যন্ত ছক অনুসারে খুনের আসামী ইমদুকে যুব প্রতিমন্ত্রী আবুল কাশেমের বাড়িতে পাঠিয়ে তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরশাদ ২৪ জানুয়ারী ১৯৮২ তারিখে সামরিক শাসন জারী করেন এবং নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা দিলেও অসাংবিধানিকভাবে বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। এরশাদ আমলে যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটি কখনই আলোচনায় আসেনি। এ বিষয়ে তিনি শেখ মুজিব ও জেনারেল জিয়ার পথ অনুসরণ করেন। তার উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি নূরুল ইসলাম, যিনি শান্তি কমিটির নেতা ছিলেন, মাওলানা আব্দুল মান্নানসহ আরো অনেক স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে তার মন্ত্রীসভাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন।

www.pathagar.com

খণ্ড : দুই

স্বাধীনতার যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন

একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

'Politics is national,
Economic is international.'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

১৯৭১ সনে এ দেশের মানুষ দু'টি পক্ষ-যারা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ করতে চেয়েছেন অথবা যারা পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে ছিলেন দু'টি পক্ষই 'দেশ আগে' এবং 'চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ পরে' মন্ত্রে বলিয়ান হয়ে অগ্রসর হন। যারা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ করতে চেয়েছেন তাদের বিশ্বাস ছিল দেশ স্বাধীন হলে তারা অর্থনৈতিক বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এখানে স্বাধীনতার চেতনার নামে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মহীনতার কোন স্থান ছিল না। বিপরীতে যারা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন তাদের বিশ্বাস ছিল দেশ ভেঙে গেলে এটা হবে পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দেওয়া।[৪২৮] এতে দেশও যাবে ধর্মও যাবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেশ আগে এবং দেশের অখন্ডতা রক্ষা অথবা দেশ স্বাধীন করার দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্য সে সময়ে মানুষকে দু'টি বিপরীত ও সাংঘর্ষিক মেরুতে নিয়ে যায়।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী তাদের দৃষ্টিতে দেশদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে ২৫ মার্চ যে আক্রমণ শুরু করে তার মাত্র পাঁচ দিন পরেই ৩১ মার্চ ১৯৭১ ভারতের পার্লামেন্ট 'পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে সাহায্য করার' জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। দ্রুত এ প্রস্তাব কার্যকর রূপ লাভ করবে বলে তাজউদ্দিন আশাবাদী ছিলেন। এও প্রণিধানযোগ্য যে ভারত ৩০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে যারা তার ভূখন্ডে গিয়েছে তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিফৌজ তৈরীর ঘোষণা দেয়। পক্ষান্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পৃথিবীর সকল দেশ অক্টোবর ১৯৭১ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে ঘোষণা দেয়।

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর আচরণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীরা হতাশ ও ক্ষুদ্ধ, এ বিষয়টি ভারত সরকার ভালভাবেই উপলব্ধি করে। ১৯৬২ সন থেকেই ভারত পাকিস্তানকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গকে তার সঙ্গে যুক্ত করা নিদেনপক্ষে আলাদা রাষ্ট্র করার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা IB এর নাম পরিবর্তন ও কলেবর বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠা করা হয় শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা RAW। RAW এর রাজনৈতিক শাখা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো বিষয়টি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে।

---

[৪২৮] ২০.১০.২০১০ তারিখে আমাদের সময় পত্রিকায়-বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের বিজ্ঞাপনে গোলাম আযমের ১৯৭১ বক্তব্য। তার বক্তব্য হচ্ছে, "মুক্তিযুদ্ধের নামে যা হচ্ছে তা পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দেওয়া।"

www.pathagar.com

বিপরীতে ২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বড় ধরণের আক্রমণের পর ০৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসীরা কেন জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করলেন তাও বিশ্লেষণ করার বিষয়। সামরিক বাহিনী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওয়া দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অনাগ্রহী ছিল, একাধারে তারা সকল বিবেচনায় পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিল। ইসলামপন্থী-মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পূর্ব থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এক ভয়াবহ সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে ছিলেন একই সাথে পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রশ্নে ছিলেন দ্বিধাহীন। ভারতের পার্লামেন্ট 'পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে সাহায্য করার' প্রস্তাব গ্রহণ করার পর তৎকালীন সামরিক শাসক ও এ সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যমত্য হয় যে, পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করাই এখন মুখ্য। আর তা রক্ষা পেলে operation searchlight এর মত নির্মম operation এর দায়-দায়িত্ব পরে নির্ধারণ করা যাবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ

ড. ইমতিয়াজ আহমেদ[৪২৯] তার The Superpower strategy in the Third World : the 1971 South Asia নিবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে বিশ্বের তৎকালীন বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্বের (confrontation) চারণক্ষেত্র (ground) দরিদ্র দেশগুলোতে স্থানান্তর করার কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন "It is recognized by the powers that a direct confrontation would play havoc for both the parties, their strategic preference shifted from the traditional battle grounds of Europe to the 'undernourished' Third World...The 1971 South Asian Crisis is a case to that effect." (এটি স্বীকৃত যে, দুই পরাশক্তির মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষে উভয় শক্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে জন্য তারা তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ইউরোপ থেকে সরিয়ে তৃতীয় বিশ্বের কোন অঞ্চলে সরিয়ে দেওয়া কে অগ্রাধিকার প্রদান করে।...১৯৭১ সনে দক্ষিণ এশিয়ার বিপর্যয় তাদের ঐ কৌশলগত পরিকল্পনার একটি অংশ।)

তিনি তার Fish eye projection এর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও সেভিয়েত ইউনিয়ন তাদের Ideological conflict কিভাবে পাকিস্তান ও ভারতের দ্বন্দ্বের সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। আর এই দুই বৃহৎ শক্তির Ideological conflict এর bi-product হচ্ছে বাংলাদেশ।

---

[৪২৯] ড. ইমতিয়াজ আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক। তিনি পূর্বে যা বিশ্বাস করতেন বর্তমানে তা করেন বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

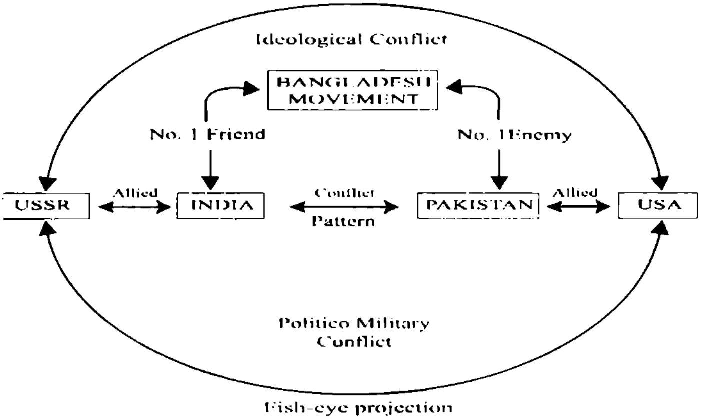

Fish–eye projection

ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, The 1971 South Asian crisis revealed a clear demarcation of the interests of the Superpowers --- USSR and USA --- projecting a conflictive pattern in their relation, each one siding with the enemy of the other. (১৯৭১ সনে দক্ষিণ এশিয়ার বিপর্যয় সোভিয়েত-রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বশক্তিদ্বয়ের নিজস্ব লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে সংঘটিত হয়েছে। এ বিপর্যয়ের মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক নমুনার বিকাশ ঘটে, একজনের শত্রু আরেক জনের বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত হয়।)

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ নিয়ে যে বিশ্লেষণ করে তা হচ্ছে --

"EPCPML had comeout with the thesis that the conflict between Yahia and Bhutto on the one hand and Sheik Mujib and his lieutenants on the other, was a struggle between the "two boot-licking dogs of the American imperialists."[৪৩০] (পূর্ব পাকিস্তান কমুনিষ্ট পার্টি (এম-এল) গবেষণাপত্রে উল্লেখ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা ছিল এক পক্ষে ইয়াহিয়া ও ভূট্টো, অন্য পক্ষে, শেখ মুজিব ও তার দোসরদের দ্বন্দ্ব যারা সকলেই ছিল আমেরিকান সম্প্রসারণবাদীদের পা চাটা কুকুর।)

এ ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চীনপন্থী রাজনীতিবিদদের বক্তব্য ছিল যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ হচ্ছে "fight between the two dogs."[৪৩১] (দুই কুকুরের যুদ্ধ।)

---

৪৩০ The Bangladesh Revolution And Its Aftermath, Talukder Maniruzzaman; p-137

৪৩১ The Bangladesh Revolution And Its Aftermath, Talukder Maniruzzaman; p-140

www.pathagar.com

ভারতের রাজনৈতিক স্বপ্ন ও পাকিস্তান বিভক্তি

নেহরুর রাজনৈতিক স্বপ্ন ছিল, "ভারত মহাসাগরের চারদিকে এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ এলাকাতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ভারতবর্ষের রয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ এই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ব্যাপারে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং ভবিষ্যতে এসব অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। ভারতের দুইদিকে ভারত মহাসাগরকে ঘিরে যে সমস্ত দেশ অবস্থিত যেমন- ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), বার্মা, মালয় (মালয়েশিয়া), শ্যাম (থাইল্যান্ড), জাভা (ইন্দোনেশিয়া) এরা সকলেই যদি আঞ্চলিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহলে বর্তমানে যে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসান ঘটবে; অথবা তা না হলেও এই সমস্যার বিচার ও পর্যালোচনার পটভূমিকাই সম্পূর্ণ বদলে যাবে।"[৪৩২]

নেহরু ভারতকে মুসলমান ও হিন্দু ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ না করতে চাওয়ার বিশ্লেষণে বলেছেন, "বাঙলা ও পাঞ্জাবে শতকরা ৫৪ জন হল মুসলমান এবং বাকীরা অমুসলমান। গণভোটের উপরোক্ত বিকৃত প্রয়োগ অনুযায়ী ওই শতকরা ৫৪ জনই ভোটের একমাত্র অধিকারী তারাই ৪৬ জনেরও ভাগ্য নির্ধাতা এবং এই ৪৬ জনের কোন মতামত বা বক্তব্যই গ্রাহ্য নয়। এইভাবে চললে হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা মাত্র ২৮ জনই বাকি ৭২ জনের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।"[৪৩৩] এ অবস্থায় তিনি 'বাঙলা' ও 'পাঞ্জাব'কে ছুরি চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিষয়টিতে Jaswant Singh যেভাবে দেখেছেন, "How do you divide a geographic unity? Simply by drawing lines on maps? Through a 'surgical operation', Mountbatten had said, and tragically Nehru and Patel and the Congress party had assented" (ভৌগলিক একতাকে তোমরা কিভাবে ভাগ করবে? মানচিত্রের উপর লাইন টেনে? মাউনব্যাটন বলেন, শৈল্য ব্যবচ্ছেদ; নেহরু প্যাটেল ও কংগ্রেস তার সাথে একমত প্রকাশ করেন)।

এই 'surgical operation' চিন্তাটি ছিল সাময়িক; শেষ পর্যন্ত দুটি দেশ একত্রিত হয়ে একটি দেশে পরিণত হবেই এই ছিল নেহরুর লক্ষ্য। ইন্দিরা গান্ধী তার এবং কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাবেন এটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তান ভাঙার ব্যাপরটি ছিল সে ইচ্ছা বাস্তবায়নে একটি বড় পদক্ষেপ।

নেহরুর রাজনৈতিক স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ অখন্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন। আর এ অখন্ড ভারতের রূপরেখা হচ্ছে-

---

৪৩২ দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া, জওহরলাল নেহরু; ভারতের সিগনেট প্রেস থেকে বঙ্গানুবাদ; বাংলাদেশে প্রকাশক; চারদিক; পৃঃ ৬৮৩-৮৪

৪৩৩ দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া, জওহরলাল নেহরু; ভারতের সিগনেট প্রেস থেকে বঙ্গানুবাদ; বাংলাদেশে প্রকাশক: চারদিক: পৃঃ ৬৭৫

www.pathagar.com

Akhand Bharat for the western reader is basically the policy for reunification of the subcontinent according to the pre-1947 borders that include the entire geographical area of Pakistan and Bangladesh. For some, Akhand Bharat refers to an earlier period in Indian history that would encompass an area that also includes Afganistan and parts of present day Myanmar. All these territories would come under the suzerainty of New Delhi. Akhand Bharat also has political connotations that bears similarities to western imperialism and envisions India's control over all the countries mentioned above and also Sri Lanka, Nepal, Bhutan and the Maldives.[৪৩৪]

এ দিকে হিন্দু মহাসভা ১৯৫০ সনে ঘোষণা দেয় যে, এ অঞ্চল ততদিন শান্ত হবে না যত দিন না ভারত স্বাধীন এলাকাগুলো তার দখলে নিতে পারবে।[৪৩৫] ১৯৫৯ সনে Keith Callard[৪৩৬] বলেন 'Many Indians feel that the creation of Pakistan was a tragic mistake which might still be corrected at least as far as East Bengal (East Pakistan presently Bangladesh) is concerned.'[৪৩৭] ("অধিকাংশ ভারতীয় মনে করেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টি ছিল একটি মারাত্মক ভুল এবং এই ভুলের কিছুটা সংশোধন হতে পারে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে।)

২৫ মার্চ রাতের হামলার পর দলে দলে হিন্দু-মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-যুবা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। আর ৩০ মার্চ RAW-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র Institute for Defence and Analysis এর পরিচালক কে সুব্রামানিয়াম Indian Council of World Affairs আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে বলেন."যে বিষয়টি ভারতের উপলব্ধিতে আনতে হবে, সেটা হলো পাকিস্তানের ভাঙন আমাদের স্বার্থেই আসবে। এ জাতীয় সুযোগ কখনো আসবে না।"[৪৩৮] কে সুব্রামানিয়াম ও মোহাম্মদ আইউব The Liberation War গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন," ভারতের জন্য এটা এমন একটি ঘটনা, যা শতাব্দীতে আর ঘটেনি।" ভারত পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন করার সাহায্য সহযোগিতা করার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করে ---

---

৪৩৪ The India Doctrine by M.B.I. Munshi pp 23

৪৩৫ The resolution of Hindu Mahasabha, a political organization in India, put the same thought in more militant words: 'India is one and indivisible and there will never be peace unless and until the separate areas are brought back into the Indian Union and made integral parts thereof / Mainsprings of Indian and Pakistani foreign policies By S. M. Burke p: 57

৪৩৬ Keith Callard (1924-1961) Associate Professor of Political Science, McGill University

৪৩৭ Pakistan's Foreign Policy: An Interpretation/ Keith Callard/ Institute of Pecific Relations, 1959/ New York; p14

৪৩৮ নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক; অনুবাদ - মাসুদুল হক; পৃঃ ১০০

www.pathagar.com

১. সজওহরলাল নেহরুর পাকিস্তান ভাঙার স্বপ্ন, যা তার মেয়ে বাস্তবায়নের সুযোগখুঁজছিলেন।
২. ১৯৬৫ সনে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ।
৩. ভূ-রাজনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার।
৪. সামরিক দিক থেকে প্রতিবেশীদেরকে দুর্বল অবস্থানে রাখা। এক পাকিস্তানের দু'টি অংশ তার জন্য সামরিক কৌশলগত দিক দিয়ে বিপদজনক ছিল।
৫. ভারত পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে একটি বড় বাজার দখল করতে পারবে।
৬. ভারতের ধারণা ছিল ISI ভারতের মিজো ও নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পাকিস্তান ভেঙে গেলে সেই প্রশিক্ষণ বন্ধ হবে এবং ভারত থেকে মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড বিচ্ছিন্ন হবে না (এ অঞ্চলের সাত কন্যার বিষয়েইও ভারত একই মত পোষণ করে)।

বাংলাদেশ সৃষ্টিতে RAW এর ভূমিকা

নভেম্বর ২৮, ১৯৪৭ নেহরু বলেন,"ultimately both the dominions will unite into one country."[৪৩৯] ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, It is natural that his daughter, Indira Gandhi,would aspire to fulfil his wishes and of the Congress leaders. Breakup of Pakistan would naturally be a major step."[৪৪০]

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW (Research and Analysis Wing) বাংলাদেশে পরিচিত পাঁচটি[৪৪১] গোয়েন্দা সংস্থার একটি। ১৯৬৮ সনে IB (Intelligence Bureau) থেকে শুধু নামই পরিবর্তন করেনি, কাজের পরিধি ও গুণগত মানের পরিবর্তনের কারণে RAW আজ বিশ্বমানের গোয়েন্দা সংস্থা KGBর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। একদল নিবেদিত প্রাণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ভূ-রাজনীতি বিশারদ, সমাজ বিজ্ঞানী, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, ধর্মীয় পন্ডিত, ভাষা বিশেষজ্ঞ ও সামরিক কর্মকর্তা নিয়ে এ সংস্থা ভারতের জন্য এক গৌরব বয়ে এনেছে। The Illustrated Weekly of India, October 14, 1990 পত্রিকা একজন RAW কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে, 'RAW has within its ranks every form of specialist from a cobbler to a nuclear scientist.'(মুচি থেকে পারমাণবিক বিজ্ঞানী পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ RAW-র অন্তর্ভূক্ত)।

India Doctrine অনুযায়ী অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠাকল্পে সিকিম দখল, পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলা, শ্রীলংকায় তামিল বিদ্রোহ, নেপালের রাজপরিবার ধ্বংস ও মাওবাদীদের

---

৪৩৯ The Superpower strategy in the Third World : the 1971 South Asia; Imtiaz Ahmed

৪৪০ The Superpower strategy in the Third World : the 1971 South Asia; Imtiaz Ahmed

৪৪১ অপর চারটি হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্রের CIA, ইসরাইলের MOSSAD, পাকিস্তানের ISI এবং বাংলাদেশের DGFI.

www.pathagar.com

উত্থান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ইসলামী সন্ত্রাসী গ্রুপ তৈরী, বাংলাদেশের পাবর্ত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় দাঙ্গা, দক্ষিণাঞ্চলে চরমপন্থী আন্দোলন ইত্যাদিতে RAW এর ভূমিকার জন্য ভারত গর্ববোধ করতে পারে।

B Raman তার বিখ্যাত বই The Kaoboys of R&AW এর 'Role of R&AW in Liberation of Bangladesh' অধ্যায়ে উল্লেখ করেন "The late Rameshwar Nath Kao, who headed the external intelligence division of the IB, was appointed by Indira Gandhi as the head of the R&AW when it was formed on September 21,1968. In the first few months after its formation, he gave it two priority tasks--- to strengthen its capability for the collection of intelligence about Pakistan and China and for covert action in East Pakistan."(প্রয়াত রমেশ্বর নাথ কাউ, যিনি ইন্টিলিজেন্ট ব্যুরোর বহির্বিশ্ব গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন তাকে প্রধান করে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৮ সনের ২১ সেপ্টেম্বর RAW প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে তাকে দুটি কাজের অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। যার প্রথমটি হচ্ছে, পাকিস্তান ও চীনের বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সামর্থ বৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে গোপন তৎপরতা পরিচালনা করা)।

The Council on Foreign Relations (CFR)[৪৪২] এর Senior Staff Writer Jayshree Bajoria তার লেখা RAW: India's External Intelligence Agency (published on November 7, 2008) এ উল্লেখ করেন "Successes that RAW claims it contributed to include:

- Creation of Bangladesh in 1971;
- India's growing influence in Afghanistan;
- Sikkim's accession to India in the northeast in 1974;
- Security of India's nuclear program;
- Success of African liberation movements during the Cold War."[৪৪৩]

(RAW-তার যে সমস্ত বিষয়ে সফলতার দাবী করে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ সৃষ্টি

(২) আফগানিস্তানে ভারতের প্রভাব-বলয় বৃদ্ধি

(৩) ১৯৭৪ সনে ভারতের সংগে সিকিমকে একীভূতকরণ

(৪) ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচীর নিরাপত্তা বিধান

(৫) শীতল যুদ্ধের সময় আফ্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর সফলতায় সহযোগিতা প্রদান।)

---

৪৪২ The Council on Foreign Relations (CFR) is an independent, nonpartisan membership organization, think tank, and publisher.

৪৪৩ http://www.cfr.org/india/raw-indias-external-intelligence-agency/p17707 accessed on 23.10.2011

www.pathagar.com

RAW এর কৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, গুজব, পঞ্চম বাহিনীভুক্ত রাজনীতিক দলের সভা সমিতি, আন্দোলনের মাধ্যমে ভুল তথ্য উপস্থাপন করা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করা, জনমতকে হতবুদ্ধি, বিশৃঙ্খল বা প্রজ্জলিত করা। সোজা কথায় এর অর্থ হচ্ছে প্রবঞ্চনা বা চাতুরীর আশ্রয়ে কার্যসিদ্ধি করা। এক্ষেত্রে শত্রুদেশে ভুল তথ্যের অনুপ্রবেশ করানো হয় যার ফলশ্রুতিতে সে দেশের স্বার্থহানি ঘটে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রু দেশের জনগণকে নিজ দেশের ইচ্ছানুযায়ী কোন বিশেষ কিছুতে বিশ্বাস করানো। এ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভুল গোয়েন্দা রিপোর্ট, সংবাদ মাধ্যম, কূটনৈতিক চ্যানেল, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশাজীবিদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করানো হয়। যাদের মতামত সাধারণভাবে প্রভাব বিস্তারকারী, তারা কৌশলে ভুল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরীতে ভূমিকা রাখেন।[888] বাংলাদেশের অনেকগুলো মিডিয়াতে সরাসরি RAW অর্থায়ন/নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের নিয়ন্ত্রণে এ দেশের অনেক সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবি থাকায় নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত ও ভারতমুখী করে ১৯০৫ সনের মুসলিম উদ্দীপনার বিপরীতে পরিচালনা করতে সমর্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশে "র" নামক বই-এ আবু রুশ্‌দ বলেন "এদিকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার সময় এ উপমহাদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে ভারতের কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল ---

প্রথমতঃ চির বৈরী পাকিস্তানকে দূর্বল করে দিয়ে সামরিক অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে পেশাগত দুর্নামের ভাগীদার হয় তা দূর করে হীনমন্যতার বীজ নষ্ট করে দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ দ্বি-জাতি তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত করার অজুহাত সৃষ্টির আড়ালে বাঙালীদের মনে অখন্ড ভারত-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ১৯৪৭ সাল ও পূর্ববর্তী ঘটনাবলী অস্বীকার করার ভিত্তি তৈরী করা।

তৃতীয়তঃ চীনের বিপরীতে ও রাশিয়ার পক্ষে অত্র অঞ্চলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা বজায় রাখা। এ ব্যাপারে মূলত রাশিয়ার কাছ থেকে চুক্তি মোতাবেক নিজ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও সমরাস্ত্র পাওয়ার প্রশ্নটিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশে একটি বন্ধুভাবাপন্ন দলকে রাজনৈতিক পর্যায়ে সর্বতো উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে টিকিয়ে রাখা। যাতে এ অঞ্চলে ভারতের অনুকূলে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে ও পার্শ্ববর্তী ৭ টি বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত রাজ্যের বিদ্রোহ দমানোর জন্য বাংলাদেশকে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য RAW এর মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া জোরদার ও বাংলাদেশের নব্য প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

---

888 Asoka Raina, Inside RAW, The story of India's Secret Service; Chapter-4

www.pathagar.com

পঞ্চমতঃ ভারতীয় চেতনার অনুকূলে বাংলাদেশে যদি কার্যকরভাবে কিছু সময়ের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তার অজুহাতে খবরদারী করা যায় তবে বাংলাদেশের মতো তিনদিকে ভারতবেষ্টিত একটি দেশের বন্ধুত্ব ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তায় বড় রকমের প্লাস পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে- এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া।

ষষ্ঠতঃ 'ভেতো বাঙালীকে' পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মতো শুধুমাত্র সংস্কৃতি চর্চার আঁতেলেকচুয়াল কায় কারবারে মত্ত রেখে একটি নির্জীব জাতিতে পরিণত করা। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় হতে সশস্ত্র বাহিনী বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে আধিপত্য কায়েম করা। যদি বাংলাদেশীরা এ প্রক্রিয়াতেও 'পথে না আসে' তবে যেন তেন প্রকারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে দিয়ে আজন্ম ভারতের উপর নির্ভরশীল করে রাখা।"[৪৪৫]

Asoka Raina-তার Inside RAW, The story of India's Secret Service RAW এর কার্যক্রম বৃদ্ধির উপাধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে "পূর্ব পাকিস্তানে একটি গোপন গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে শত গুপ্তচরের বছর শুরু হয়। ... কর্ণেল মেননের[৪৪৬] (শঙ্কর নায়ারের ছদ্ম নাম যিনি ছিলেন র এর একজন পরিচালক) অবিরাম ভ্রমণ ও যোগাযোগ এর জন্য সীমান্তব্যাপী RAW এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং কর্ণেল মেননের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের নিবিড় যোগাযোগ ঐ সমস্ত তরুণ, অবিশ্রান্ত, ও উৎসর্গীকৃত যোদ্ধাদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি করে। এ সমস্ত ভ্রমণ স্থানীয় কেন্দ্র প্রধান নির্বাচনে বিশেষ কাজে লাগে। এ সমস্ত কেন্দ্র প্রধানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কর্ণেল এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বাধীন মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শফিউল্লাহ, ও আব্দুল কাদের সিদ্দিকী, যিনি বাঘা সিদ্দিকী ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনী ও RAW এজেন্টদের মধ্যে যোগাযোগকারী রূপে আবির্ভূত হন।"[৪৪৭]

RAW পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ তৈরীতে কিভাবে কাজ করেছে তার একটি সুন্দর বর্ণনা Exile : The Spymaster এবং RAW: The top secrat failures বই দুটিতে উল্লেখ রয়েছে। RAW এর ইতিহাস এবং কাউ (এম রামেশ্বর নাথ কাউ) এর কর্মজীবনের একটি গৌরবময় অধ্যায় হচ্ছে বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে তাদের কর্মযজ্ঞ। বাংলাদেশের সৃষ্টিই হতো না যদি না ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী RAW এর অনেক বছরের চেষ্টা ও সাধনা না থাকতো। শেখ মুজিবের সাথে আই বি (IB, RAW এর পূর্বতন নাম)-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে এবং RAW এর প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৮ সালে। প্রকৃতপক্ষে RAW তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত প্রতিটি রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রম পূর্বেই আঁচ করতে পারত।"[৪৪৮]

---

৪৪৫ বাংলাদেশে "র", আবু রূশদ: পৃঃ ২৮-২৯

৪৪৬ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান এবং মোহাম্মদ আলী রেজা ১২ থেকে ১৫ জুলাই ১৯৬৭ তারিখের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সম্ভাব্য ভারতীয় সাহায্যের বিষয়ে ভারতীয় কর্মকর্তা লেঃ কর্ণেল মিশ্র, মেজর মেননের সঙ্গে আলোচনার জন্য আগরতলা যান।

৪৪৭ বাংলাদেশে 'র', আবু রূশদ: পৃঃ ৪৮

৪৪৮ Exile : The Spymaster, Alex Leamus, The Illustrated weekly of India, December 23, 1984 and একশ বছরের রাজনীতি, আবুল আসাদ পৃঃ ৩০১।

www.pathagar.com

ভারত ও তার গোয়েন্দা সংস্থা পাকিস্তানের রাজনীতি, অর্থনীতি পর্যবেক্ষণ করে পূর্ব পাকিস্তানীদের অসন্তুষ্টিকে পুঁজি করে তাদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে। "পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রায় ২০ বছরের অসন্তুষ্টির ফল হচ্ছে বাংলাদেশ সৃষ্টি। পূর্ব পাকিস্তানীদের অসন্তুষ্টির বীজ রোপিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক, এলিট পাঞ্জাবীদের ক্ষমতালোভী ও অভদ্রজনোচিত আচরণের ফলে। পূর্ব পাকিস্তানীদের এই দুই দশকের অসন্তুষ্টি পুঁজি করেই ভারত সামনে অগ্রসর হয়েছিল। RAW এর সফলতার কয়েকটি দিকের মধ্যে ছিল শেখ মুজিবকে একান্তভাবে নিজের করে পাওয়া, তার নির্বাচনে অর্থ সাহায্য করা এবং মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দেয়া।"[৪৪৯]

'১৯৬২ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Director of Intellegence Bureau-DIB) জানতে পারে যে, কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় একটি বাড়িতে, যা ছিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনাল সদর দফতর, সেখানে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি গোপন সংস্থান সক্রিয় রয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এও জানতে পারে যে চিত্তরঞ্জন সুতার ও কালিদাস বৈদ্য নামক দুই পাকিস্তানি নাগরিকের সঙ্গে এই গোপন সংস্থানের যোগাযোগ রয়েছে। তাদেরকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট বলে মনে করতো। গোয়েন্দা সংস্থা আরো জানতে পারে, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ সংস্থানটি সংখ্যালঘু এলাকায় বিশেষ করে ফরিদপুরের সংখ্যালঘু অঞ্চলে তৎপর রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ওই সংস্থানটি কিভাবে এবং কি পরিমাণে জড়িত ছিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সেটা আবিষ্কার করতে পারেনি।[৪৫০]

RAW স্বাধীনতা যুদ্ধকালে 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করে। মুজিব বাহিনীকে দেরাদূনের নিকটবর্তী ছাকার্তার RAW এর বিশেষ ঘাটি "Aviation Research Centre" এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ বাহিনীর প্রধানরা ছিলেন সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক এবং মরহুম ফজলুল হক মনি। স্বাধীনতা লাভের পর তাদের অধিকাংশ জাতীয় রক্ষী বাহিনী (JRB) এবং জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে (JSB) যোগদান করে।[৪৫১]

তাজউদ্দিন সে সময়ে RAW এর ছকে এগিয়ে যান। তিনি স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে দেশ ভাগের সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত করেন। এইচ টি ইমাম বলেন "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশের সরকারের সঙ্গে অলিখিত সমঝোতা আগেই হয়ে গিয়েছিল বলে সশস্ত্র অবস্থায় এসব বাঙালি সামরিক-বেসামরিক

---

৪৪৯ RAW: Top secret Failures, Gentleman, November 1985 (Indian), এবং একশ বছরের রাজনীতি, আবুল আসাদ: পৃঃ ৩০১।

৪৫০ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক, পৃঃ ১৯

৪৫১ Maj.Gen S.S. Uban, Phantoms of Chittagong the Fifth Army in Bangladesh

www.pathagar.com

লোকজনের পক্ষে এভাবে সীমান্ত পাড়ি দেয়া সম্ভব হয়।"[৪৫২] ১৯৭১ সনের ৫ ও ৬ মার্চ ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার কে সি সেনগুপ্তের (যিনি একজন নেতৃস্থানীয় RAW এর এজেন্ট) সঙ্গে তাজউদ্দীন বৈঠক করেন। শেখ মুজিব বিষয়টি জানতে পেরে এবং এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তাকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখেন। মঈদুল হাসান বলেন "২৪ শে মার্চ এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে না পারায় এবং নির্ধারিত সময়ে তাজউদ্দিনকে অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সংশোধনের মুসাবিদায় ব্যস্ত রাখায়, সেনগুপ্তের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি"।[৪৫৩]

"তাজউদ্দিন আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নেতা RAW এর এজেন্ট এর সাথে সারারাত ভ্রমণ করে মুজিবনগরে এসে পৌছেন....তাজউদ্দিনের সাথে অন্য যারা ছিলেন তারা হলেন জনাব নজরুল ইসলাম, মোশতাক আহমদ, সামাদ আজাদ এবং চারজন ছাত্রনেতা ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক, ও সিরাজুল আলম খান"।[৪৫৪]

"মুক্তিযুদ্ধে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় সাধনের জন্য RAW, IB ও তিন বাহিনীর মিলিত ডিরেক্টরেট অব ইন্টিলিজেন্স এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে সংযুক্ত গোয়েন্দা কমিটি গঠিত হয়। বেসামরিক পর্যায়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তার প্রয়োগে নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সেক্রেটারিয়েট কমিটি গঠিত হয়। প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও পররাষ্ট্র সচিব সমন্বয়ে এ সচিব পর্যায়ের কমিটি কাজ আরম্ভ করে এবং RAW প্রধান কাও সদস্য-সচিব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। এছাড়া রাজনৈতিক প্রতিনিধি জনাব ডি পি ধর যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি ছিলেন, তাকে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়"।[৪৫৫]

RAW কিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কাজ করেছে তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন অশোক রায়না। তিনি বলেন "In order to present a clear synopsis of the events that finally brought RAW (Indian spy agency) into the Bangladesh operation, one must review the intelligence activities that started soon after its formation in 1968. But by then Indian operatives had already been in contact with the "pro-Mujib" faction. A meeting convened in Agartala during 1962-63 between the IB (Intelligence Bureau) foreign desk operatives and the Mujib faction, gave some clear indications of what was to follow. The meeting in Agartala had indicated to colonel Menon (which in fact was Sankaran Nair), the main liaison man between the Mujib faction and the Indian intelligence, that the "group" was eager to escalate their movement...

---

৪৫২ সরকার ৭১, এইচ টি ইমাম ; পৃঃ : ১৪৩

৪৫৩ মূলধারা '৭১, মঈদুল হাসান; পৃঃ ১০

৪৫৪ বাংলাদেশে 'র', আবু রুশদ ; পৃঃ ৪৮

৪৫৫ Asoka Raina. Inside Raw. The story of India's Secret Service, Operation Bangladesh. Chapter-6

www.pathagar.com

They raided the armoury of East Bengal Rifles in Dhaka but this initial movement failed. In fact it was a total disaster....A few months later, on January 6, 1968, the Pakistan government announced that 28 person would be prosecuted for conspiring to bring about the secession of East Pakistan, with the Indian help (which is known as Agartala conspiracy case in judicial history of Pakistan)[৪৫৬].

("কি ধরনের ঘটনাবলী ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা RAW (Research & Analytic Wing) তার অপারেশনকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টেনে নেয় সেটির উপর একটি সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে অবশ্যই ১৯৬৮ সালে RAW প্রতিষ্ঠা পাবার পর থেকে তার কাজকর্মকে পর্যালোচনা করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই (অর্থাৎ RAW প্রতিষ্ঠা পাবার শুরু থেকেই) ভারতীয় গুপ্তচরেরা মুজিবগ্রুপের সাথে সংযোগ গড়ে তুলেছে। আগরতলাতে ১৯৬২-৬৩ সালে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর বিদেশ বিভাগের গুপ্তচর এবং মুজিবগ্রুপের সাথে যে বৈঠক হয়েছিল সেটিই একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয় যে সামনে কি হতে যাচ্ছে। আগরতলার সে মিটিং কর্ণেল মেননকে (আসলে তিনি ছিলেন সংকরান নায়ার) যিনি ছিলেন মুজিবের লোক এবং ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার এজেন্টদের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী; এ ধারণা দেয়া হয়, তারা তাদের কাজকে আরো প্রবলতর করতে আগ্রহী। ...তারা ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস ঢাকাস্থ অস্ত্রাগারে হামলা করে, কিন্তু প্রাথমিক এ হামলা ব্যর্থ হয়ে যায়। ...আসলে এটি ছিল বিপর্যয়। ...কয়েক মাস পরেই ১৯৬৮ সালের জানুয়ারীতে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দেয়, ভারতের সাথে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে ২৮ জনের বিরুদ্ধে বিচার করা হবে। এবং এটাই পাকিস্তানের ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রূপে পরিচিত।")

RAW কিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কাজ করেছে তার চিত্রও তুলে ধরেছেন অশোক রায়না। তিনি বলেন RAW-এর ভূমিকাগুলোকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করা

(২) বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গোপন প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ প্রদান

(৩) বাঙালি সরকারী কর্মকর্তা যারা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে যারা বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত ছিলেন তাদেরকে গোয়েন্দা তথ্য প্রদানসহ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে নাগা এবং মিজো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান ও প্রশিক্ষণ শিবিরে আক্রমণ পরিচালনা করা

(৫) পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের উপর নির্যাতনের কাল্পনিক প্রতিবেদন তৈরী ও বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে পাকিস্তান শাসকদের উপর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

---

[৪৫৬] Asoka Raina. Inside RAW: The Story of Indian Secret Service, page 49-50

www.pathagar.com

মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে ১৯৭১ সনে ৭ দফা চুক্তি[৪৫৭]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কালে ভারত বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে; ভারতের সহায়তা ব্যতীত যুদ্ধ পরিচালনা বা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ক্ষমতা ও সামর্থ কোনটাই মুজিবনগর সরকারের ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারত সরকার ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অক্টোবর ১৯৭১ সনে স্বাক্ষরিত সাত দফা চুক্তির সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

১. মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যারা যুদ্ধ করেছে তাদেরকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যোগ্যতা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হবে এবং তারাই প্রশাসন পরিচালনা করবে। বাকীদের চাকরিচ্যুত করা হবে এবং এই শূণ্য পদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
২. বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী মিলে একটি যৌথ কমান্ডের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হবে। ভারতের সেনাপ্রধান উক্ত যৌথ কমান্ডের প্রধান হবেন এবং তার কমান্ড অনুসারে যুদ্ধে শামিল হওয়া বা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
৩. স্বাধীন বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী থাকবে না।
৪. অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙখলা পরিস্থিতি রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে প্যারামিলিটারী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হবে।
৫. দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে কিন্তু সময়ে সময়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ করা হবে।
৬. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সেনাবাহিনী অনির্ধারিত সময়ের জন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। এবং প্রতি বছর নভেম্বর মাসে এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
৭. বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ আলোচনা করে একই ধরনের পররাষ্ট্র নীতি ঠিক করবে।

তাজউদ্দীন আহমদ এ চুক্তি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে স্বাক্ষর করার জন্য চাপ দেন। তা স্বাক্ষর করে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।[৪৫৮]

৭ দফা চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা

১ দফা বাস্তবায়ন

এ দেশে বেসামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অক্টোবর মাসে চুক্তির আগেই ভারত এ পরিকল্পনা স্থির করেন। "কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে[৪৫৯] পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান

---

৪৫৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক: পৃষ্ঠা ৮১

৪৫৮ বাংলাদেশে 'র', আবু রুশদ, পৃঃ ৪৯ এবং দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ, পৃঃ ৪৬২

www.pathagar.com

১৯টি জেলায় প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ১৯ জন আইএএস অফিসারকে মনোনীত করে বাংলাদেশের সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। ওই সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ব্রিফ করেন।"[৪৬০]

এটিএম শামসুল হুদা বলেন, "যা আমাদের হতবাক করল, তা হল পি কে ব্যানারজি নামের এক ভারতীয় আইএএস অফিসারের উপস্থিতি। তিনি ময়মনসিংহ সার্কিট হাউসে পৌঁছেই আমাদের ডিসিকে দেখা করার জন্য সার্কিট হাউসে ডেকে পাঠালেন। প্রতিষ্ঠিত প্রটোকল অনুযায়ী, সফরকারী কর্মকর্তা সমান মর্যাদার কিংবা নিচ পর্যায়ের হলে ডিসির অফিসে কিংবা তাঁর বাসভবনে, অথবা যেখানে ডিসি তাঁকে সময় দেবেন, সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার কথা। শুধু ডিসির চেয়ে উচ্চ পদের কর্মকর্তারা ডিসিকে ডেকে পাঠাতে পারেন। এই আইএএস অফিসার ভিনদেশি। তাঁর ক্ষেত্রে পদমর্যাদা নির্বিশেষে তাঁকে এসেই ডিসির সঙ্গে দেখা করতে হবে। তা ছাড়া ময়মনসিংহে আসা এই অফিসার কোনক্রমেই আমাদের ডিসির চেয়ে সিনিয়র হবেন না, হলে তিনি ঢাকা সচিবালয়ে যেতেন।" [৪৬১]

ভারত সরকার বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। যে সব পর্যায়ের কর্মকর্তা দিয়ে তা নেয়া হয় --

১। ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আইএএস) হতে বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা

২। ডিআইজি পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা

৩। ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের পরিচালক

৪। সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার

৫। মেডিকেল সার্ভিসের পরিচালক[৪৬২]

২ দফা বাস্তবায়ন

স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী, মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনীসহ স্থানীয় সকল বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডের অধীন আনা হয়। সে অনুসারেই পাকিস্তান বাহিনী যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে।

৩ দফা বাস্তবায়ন

হুমায়ূন আহমেদের ভাষায়,"বঙ্গবন্ধু পচিশ বছরের জন্যে ভারতের সঙ্গে দেশরক্ষা চুক্তি করেছেন। এখন আর মিলিটারির প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে মিলিটারিদের ক্ষমতা খর্ব করতে হবে। এমনভাবে করতে হবে যেন এরা বুঝতেও না পারে।"[৪৬৩]

---

৪৫৯ পশ্চিম বঙ্গ মূখ্য মন্ত্রীর কার্যালয়।

৪৬০ ফিরে দেখা জীবন,এটিএম শামসুল হুদা:প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৪ পৃঃ ১২৮

৪৬১ ফিরে দেখা জীবন,এটিএম শামসুল হুদা:প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৪ পৃঃ ১২৭

৪৬২ Victory in Bangladesh, Maj Gen (Retd) Lachman Shing PVSM, p: 264

www.pathagar.com

৪ দফা বাস্তবায়ন

জেনারেল এস এস ওবানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশে রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়। তাঁর পরামর্শে রক্ষী বাহিনীর অফিসারদের (লিডার) ট্রেনিং দেওয়া হতো ভারতে। ভারতীয় ইউনিফরম পরহিত এ বাহিনী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অফিসারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। দেশের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে এ বাহিনীকে দেওয়া হতে থাকে।

৫ দফা বাস্তবায়ন

১৯৭১ সনে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সব শিল্প কারখানা চালু ছিল বিভিন্ন কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। বর্ডার বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয় এ দেশ। তৃতীয় দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তির কোন অবকাশ না থাকায় তা একচ্ছত্র বাজারে রূপ নেয়।

৬ দফা বাস্তবায়ন

শেখ মুজিবের একক চিন্তা ও হস্তক্ষেপে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় বাহিনী দেশের সকল স্থান থেকে সড়িয়ে নিলেও পার্বত্য অঞ্চলে রেখে যান। যার পরিণতি এখনও আমরা বুঝতে পারছি।

৭ দফা বাস্তবায়ন

১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত দেশ ভারত ও সোভিয়েত ব্লকের বাইরে কোন দেশের সাথ সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি। শেখ মুজিবের একক সিদ্ধান্তে তিনি ১৯৭৪ সনে লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার স্বাধীন সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে; শেখ মুজিব পিন্ডির পরিবর্তে দিল্লীর গোলামী আশা করেননি বলেই তিনি way of reconciliation and normalisation among the countries of the sub-continent এর পথ খুঁজছিলেন।

ভারতের দাবী ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাদের আনুকূল্যের ফসল

বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসংগে বাংলাদেশীদের প্রতি ভারতীয়দের যেমন তাচ্ছিল্য মনোভাব রয়েছে, বাংলাদেশে কোন কোন ব্যক্তির রয়েছে ভারতের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অনুগত মনোভাব; ভাবটা এমন যে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দান করেছে। ভারতের দূরবর্তী পরিকল্পনা (visonary planning) হচ্ছে India doctrine বাস্তবায়ন। যুদ্ধ কৌশলের মত কখনো offensive and advance আবার কখনো defensive and backward খেলতে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা যে পারদর্শী তা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। ১৯০৫ সনে বাংলাকে ভাগ করতে না দিয়ে, ১৯৪৭ সনে বাংলাকে ভাগ করে, ১৯৪৮ সনের ভিতর ২৮৩ টি করদ রাজ্যের মধ্যে ২৮২ টি করদ রাজ্য দখল করে, ১৯৭১ সনে

---

[৪৬৩] দেয়াল, হুমায়ূন আহমেদ; পৃঃ ৮৫

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে ভাঙতে সহায়তা, ১৯৭৪ এ সিকিম দখল, শ্রীলংকায় তামিল বিদ্রোহ, নেপালের মাওবাদী বিদ্রোহ, বাংলাদেশের পাবর্ত্য অঞ্চলে উপজাতি বিদ্রোহ, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন সব খেলার একটিই লক্ষ্য "অখন্ড ভারত" প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান ও বাংলা আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের প্রস্তাব ছিল। জিন্নাহ, সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, নূরুল আমীনসহ সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সুভাষ বসু বাংলাকে (সুবে বাংলা) আলাদা রাষ্ট্রের পক্ষে মত দেন। ১৯৪৬ সনের ২৪ মার্চে বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে বৃটিশ কেবিনেটের ৩ জন সদস্য ভারতে এসে পৌঁছেন যা কেবিনেট মিশন নামে পরিচিত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জননেতাদের সহযোগিতায় যথা শীঘ্র ভারতীয়দের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা এবং দ্রুত ভারত ত্যাগ করা। এই প্লান অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথায় প্রতি দশ লক্ষ ভোটার থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান সভা রচিত হবে। এই কেন্দ্রীয় সংবিধান সভা ভারত ইউনিয়নের জন্য সংবিধান রচনা করবে। বৃটিশ ভারতে যাতে মুসলিম স্বার্থ রক্ষিত হয় তার জন্য গ্রুপিং সিস্টেম নামে প্রদেশগুলোকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাধীন করার পরিকল্পনা নেয়া হল।

গ্রুপ-এঃ মাদ্রাজ, বোম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ এবং উড়িষ্যা অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ।

গ্রুপ-বিঃ পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ।

গ্রুপ-সিঃ বাংলা এবং আসাম অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ।

প্রত্যেক গ্রুপের তার নিজের সংবিধান রচনা করার অধিকার থাকবে এবং প্রত্যেক গ্রুপ দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া বাকি বিষয়গুলোর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারত ইউনিয়ন নামে একটি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

জওহরলাল দৃঢ়তার সাথেই বলেন যে, কংগ্রেস সাংবিধানিক পরিষদে শুধুমাত্র এই শর্তে অংশগ্রহণ করেছিল যে, কংগ্রেস যখন প্রয়োজন মনে করবে তখন 'কেবিনেট মিশন প্লান' পরিবর্তন করতে পারবে।

দিল্লীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিল 'কেবিনেট মিশন প্লান' গ্রহণ করেছিল এবং মুসলিম লীগকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে, কংগ্রেসও স্কীমটি গ্রহণ করেছে এবং প্লানটি ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে। এখন ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ঘোষণা দেন, সাংবিধানিক পরিষদে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্কীমটি পরিবর্তনী হতেও পারে। তার মানে সাংবিধানিক পরিষদে সংখ্যালঘুরা, সংখ্যাগুরুদের করুণার পাত্র হয়ে থাকবে।

জওহরলাল আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান অনেক। তৎসত্ত্বেও আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি ভারতের জন্য ক্ষতিকর এটিই তার

www.pathagar.com

প্রথম কার্যক্রম নয়। একই ধরণের সাংঘাতিক ভুল তিনি ১৯৩৭ সনেও করেছিলেন, যখন গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৫-এর আওতায় প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৪৬৪]

যে সোহরাওয়ার্দী বাংলাকে আলাদা রাষ্ট্রের পক্ষে মত দেন সেই সোহরাওয়ার্দী ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে মত দেন যখন "তারা আবিষ্কার করেন যে, হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্তির অদম্য ইচ্ছা এবং কংগ্রেসের 'অখন্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের কাছে তাদের মুক্তির দাবী হুমকীর সম্মুখীন। এ অবস্থায়, তারা বাংলার জনগণ ফজলুল হকের দে'য়া দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের দাবীর কথা ভুলে যায়।[৪৬৫]

সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সনে মুসলিম লীগের সভায় resolution গ্রহণের সময় ঘোষণা দেন যে, in this sub-continent there was no path for Muslims other than the Muslim League and no ambition before them other than Pakistan.[৪৬৬] (এই উপ-মহাদেশে মুসলিম লীগ ছাড়া মুসলমানদের আর কোন রাস্তা খোলা নেই এবং পাকিস্তান ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই।)

সোহরাওয়ার্দী উপলব্ধিতে করেন "বৃটেন, ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় এবং কেবিনেট মিশন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি সন্ধান করছে। কংগ্রেস ব্রিটিশদের বললো "আমাদের ক্ষমতা দাও, আমরা সকল বিরোধিতায় অবসান ঘটাবো, আমরা মুসলিমদের দমন করবো, সিডিউল কাষ্ট ও আদিবাসীদের নিঃশেষ করবো। আমাদেরকে পুলিশ দাও, তোমাদের সেনাবাহিনী ও অস্ত্র আমাদেরকে দাও, আমরা 'অখন্ড ভারতের' নামে সত্যাশ্রয়ী বাহিনী গঠন করবো। এ ধরণের মনোভাবকে আমি বলবো ক্ষমতার লোভে সম্পাদিত অস্বাভাবিক আচরণ। আমরা একটি গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চাই না, কিন্তু আমরা এমন একটি ভুখন্ড চাই, যেখানে আমরা শান্তি পূর্ণভাবে বসবাস করতে পারি। আমরা একটি জাতি এবং আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীর সভ্যতা বিনির্মাণে আমাদের ভূমিকা রাখা উচিত। কিন্তু ব্রিটিশ ও কংগ্রেস কি আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে ও মর্যাদার সাথে পাকিস্তান দিতে চায়? যদি দিতে না চায়, মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আমি এই প্রশ্নগুলি নিয়ে অনেক ভেবেছি, এখন আমি সততার সাথে ঘোষণা করছি যে, বাংলার প্রতিটি মুসলিম পাকিস্তানের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত রয়েছে। মি. জিন্নাহ আপনাকে বলছি, আমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।"[৪৬৭]

---

৪৬৪ India Wins Freedom, Mawlana Abul Kalam Azad; p-170

৪৬৫ Memoirs of Huseyn Shaheed Shurawardy:Edited by Muhammad H.R. Talukdar; University Press Limited. The demand for the two sovereign Muslim states was as quickly forgotten as the people of Bengal forgot Fazlul Huq, when they discovered that their greater demand for freedom from Hindu domination became threatened by the Congress demand for Akhanda Bharat (undivided India)

৪৬৬ The Resolution of the All India Muslim League (1945-46); Liaquat Ali Khan; pp 35-47

৪৬৭ Memoirs of Huseyn Shaheed Shurawardy:Edited by Muhammad H.R. Talukdar; University Press Limited, 1987
Britain wants to hand over power to the Indians and the Cabinet Mission is here to find out suitable machinery for the transfer of power. Congress tells the British 'Give us power, we shall sweep away all opposition, we shall suppress the Muslims we shall bring the

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীর উপলব্ধি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি তত্ত্ব (Two Nations Theory)[৪৬৮] বেগবান হয়। কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে 'গ্রুপ বি' ও 'গ্রুপ সি' দু'টি পৃথক ও বড় মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে গান্ধী, নেহরু, প্যাটেলসহ অন্যান্য হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দের এ দাবীকে ব্রিটিশ সরকার অগ্রাহ্য করলে নেহরুরা কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়ে দেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন,"Sixteen August 1946 was a black day not only for Calcutta but for the whole of India...This was one of the greatest tragedies of Indian history and I have to say with the deepest of regret that a large part of the responsibility for this development rests with Jawaharlal."[৪৬৯] (১৯৪৬ সনের ১৬ আগষ্ট শুধু কলকাতা নয় পুরো ভারতবর্ষের জন্যই একটি কালো দিবস। এটি ভারতের ইতিহাসের জন্য ছিল অন্যতম বড় ট্রাজেডী। আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, এই ঘটনার জন্য প্রধানত দায়ী জওহরলাল।) এবং সারা ভারতবর্ষে এ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে বলে নেহরু হুমকি দেন।

সোহরাওয়ার্দী অক্টারলোনি ময়দানে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে; যেমনটি বর্ণনা দিয়েছেন ডঃ ফারুক, "আগষ্টের ১৬ তারিখ সোহরোওয়ার্দী অক্টারলোনি মনুমেন্ট ময়দানে কলকাতা ও এর শহরতলীর জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার সময় জানতে পারেন যে, জনসভার উদ্দেশ্যে আগত মিছিলসমূহে বাধাসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানরা আক্রান্ত হচ্ছে।[৪৭০]

---

scheduled caste to heel and we shall annihilate the adivasis. Give us the police, your army and arms and we shall reproduce an Armageddon in the name of a united India. This I call insanity induced by the lust for power we do not intend to start a civil war but we want a land where we can live in peace. We are a nation and, we believe, we have something to contribute to the civilization of the world. But are the British and the Congress prepared to give us Pakistan peacefully and with grace? If not, then, are the Muslims prepared to fight? I have long pondered over these questions Let me now honestly declare that every Muslim of Bengal is ready and prepared to lay down his life for Pakistan Now I call upon you, Mr. Jinnah to test us.

৪৬৮ ভারতবর্ষে ১৯২০ সন থেকে বহুজাতি তত্ত্বের (Multi Nations Theory) ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও মনোনয়নের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, গুরু দুয়ারা শিখ, আকালি শিখ, নিম্ন বর্ণের মানুষদেরকে এক তফশিলভুক্ত করে তফশিলি সম্প্রদায় (Scheduled Castes) প্রভৃতি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে হতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। হিন্দু জনসংখ্যাকে অধিকতর সংখ্যাগুরু হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য পৌত্তলিক সকল জনগোষ্ঠীকে হিন্দ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারপরও ১৯৪৫-৪৬ সনের নির্বাচনে আকালি শিখগণ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখায় তাদেরকেও জাতীয় পরিষদের ৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। বাংলায় হিন্দু, মুসলমান ও তফশিলি সম্প্রদায় (Scheduled Castes) প্রভৃতি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে হতে বহুজাতি তত্ত্বের (Multi Nations Theory) ভিত্তিতে প্রাদেশিক পরিষদেও প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।

৪৬৯ India Wins Freedom, Mawlana Abul Kalam Azad; p-170

৪৭০ Memoirs of Huseyn Shaheed Shurawardy, Dr. Farook; Edited by Muhammad H.R. Talukdar; University Press Limited, 1987
On 16 August at the Ochterlony Monument Maidan, whilst he was addressing a crowd, gathered from all parts of Calcutta and the suburbs, he received news that processions were

www.pathagar.com

রাজমোহন গান্ধী লিখেছেন, "বল্লভভাই প্যাটেল রাজাগোপাল আচারীর কাছে একটি পত্রে লিখেছিলেন- এই কোলকাতা হত্যাকান্ড মুসলিম লীগের জন্য একটি উত্তম শিক্ষার ব্যাপার হবে, কারণ আমি শুনেছি এই দাঙ্গায় হিন্দুদের চাইতে মুসলমানরা নিহত হয়েছে অনেক বেশী।"[৪৭১]

১৯৪৬ সনে কোলকাতায় Direct Action Day তে হিন্দুদের দ্বারা সৃষ্ট রায়টে নিহত মানুষের দৃশ্য।
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb/8/87/Calcutta_1946 _riot.jpg/300px- Calcutta_1946_riot.jpg accessed on 17.06.2012

১৯৪৬ সনে কোলকাতায় Direct Action Day তে হিন্দুদের দ্বারা সৃষ্ট রায়টে নিহত মানুষের দৃশ্য।
http://radhikaranjanmarxist.blogspot.com/2010/04/direct-action-day1946.html accessed on 21.06.2012

---

being obstructed and attacked by the Hindus and anti-Muslim riots were taking place in many areas.

৪৭১ Understanding the Muslim Mind, Rajmohan Gandhi; p-170
Vallabhbhat Patel wrote in a letter to Rajagopalachari: This Calcutta killing will be a good lesson for the league, because I hear that the proportion of Muslims who have suffered death in much larger

www.pathagar.com

এম এ মুহাইমেন বলেন, "অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিরাট বিরাট হিন্দু জনতা পূর্বাহ্নে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অকস্মাৎ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এসব মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে তাদের প্রতিবেশীদের সংগে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সংগে বাস করে এসেছেন। এ নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার নারী-পুরুষ শিশু নির্বিশেষে প্রায় সাত থেকে আট হাজার হয়েছিল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্ত প্রদেশে হত্যাকান্ড আরও নৃশংস রূপ গ্রহণ করেছিল। গর্ভবতী মহিলাদের উদর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে অজাত শিশুকে বের করে ফেলা হয়েছিল এবং শিশুদের মস্তক দেওয়ালে বা মেঝেতে পিটিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে মগজ বের করে দেয়া হয়েছিল। মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়েছিল।"[৪৭২]

নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী মাউন্টব্যাটেনকে তাদের পক্ষে আনার জন্য অনৈতিক পথ বেছে নেন। বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দু নেতাদের অবস্থা বুঝতে পেরে তারা পাকিস্তান তৈরীতে ঝাপিয়ে পড়েন এবং পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে গণ্য করেন। ১৯৪৭ সনের ১৪ আগষ্ট পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করে। সেদিন যদি এ অংশ পাকিস্তানের অংশ না হতো হা হলে এটি ভারতের একটি প্রদেশ হতো; আর আজ তা বাংলাদেশ হওয়ার সুযোগ পেতো না।[৪৭৩]

---

৪৭২ ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ্, এম এ মুহাইমেন; পৃ : ১৮৩

৪৭৩ দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি, মাহবুব উল্লাহ্ ও আকতার আহমাদ ; পৃষ্ঠা : ১৮৩

www.pathagar.com

অধ্যায়: দুই

বুদ্ধিজীবী হত্যার রাজনৈতিক দায়

বুদ্ধিজীবী হত্যা : দায় কার

বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড নিয়ে গত প্রায় ৪০ বছরে প্রচার মাধ্যমগুলো একমুখী বক্তব্য প্রচার করে আসছে। ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাদিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে, যা সকলকে ধারণা দিচ্ছে যে, সকল বুদ্ধিজীবী ঐ দিনেই নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন; মূলতঃ তা নয়, তারা ভিন্ন ভিন্ন দিনে বিভিন্ন ভাবে নিহত হয়েছেন। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত–"একাত্তরের ঘাতক ও দালাররা কে কোথায়" যে তিন ধরণের মতামত পাওয়া যায় -

১. "এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ দেশের নানা স্থানের যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে তারা নিহত হয়েছেন পাকবাহিনীর সাধারণ নির্বিচার গণহত্যা বিশেষতঃ স্বাধীনতাপন্থী ছাত্র শিক্ষক হত্যার শিকার হয়ে; পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড তখনো শুরু হয়নি।

২. একাত্তরে জামাত ও ছাত্রসংঘের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিবৃতি, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি, ছাত্র সংঘের টিক্কা খানের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উগ্র সাম্প্রদায়িক সুপারিশ পেশ এবং এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাংলাদেশমনা বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি আলামত থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। জামাত ও ছাত্র সংঘের নেতারা তাদের এই অপপ্রয়াসের দোসর করে নেয় এক শ্রেণীর লোভী, নীতিজ্ঞানবর্জিত ও উগ্র সাম্প্রদায়িক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং শান্তি কমিটির কিছু অতি গোড়া সদস্যকে। এ ধরণের বুদ্ধিজীবী হত্যা জামাতে ইসলামী করেছে এপ্রিল থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। জামাতে ইসলামী তাদের দলীয় নীতির অংশ হিসেবেই গোড়া ধর্মোন্মাদ ছাড়া অন্য সমস্ত বুদ্ধিজীবীকেই হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

৩. নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন, তারা সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে হানাদার পাকিস্তানী জেনারেলদের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। শেষোক্ত শ্রেণীর শহীদদের কেউ ছিলেন শুধুমাত্র জামাতের টার্গেট, কেউ কেউ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের টার্গেট, কেউ কেউ ছিলেন উভয়পক্ষের টার্গেট। একারণেই দেখা যায় সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনের

www.pathagar.com

> মত পাকিস্তানপন্থী লোকও নিহত হয়েছেন অথবা যে কবীর চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের সিরাত সম্মেলনে, আজাদী দিবস পালনে ইত্যাদি সভায় অভ্যাগত করে বক্তৃতা করতে দিয়েছেন তিনিও রাও ফরমান আলীর হত্যা তালিকার অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছেন।"[৪৭৪]

সংক্ষেপে বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িতদের পরিচয় হচ্ছে

১. পাকিস্তান সামরিক বাহিনী

২. আল বদর

৩. আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী দল

পাকিস্তান সামরিক শাসক

২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে প্রথম কয়েক সপ্তাহ পাকিস্তান বাহিনীর সাধারণ নির্বিচার গণহত্যায় বুদ্ধিজীবী নিহত হন। পরবর্তীতে পাকিস্তান বাহিনীর পরিকল্পিত আক্রমণ ঘটে যার মধ্যে সত্য, ধারণা ও বিশ্বাস করার মত উপাদান রয়েছে। ব্রিটিশ সাবেক মন্ত্রী জন স্টোন হাউজ জানান যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার দশজন সামরিক অফিসারকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিক অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে একটি আন্ত র্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবী জানান। এই দশজন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যা সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনই আমাদের হস্তগত হয়নি।[৪৭৫] THE HINDUSTAN TIMES, উল্লেখ করে যে, Ten senior Pakistani army officers were responsible for organising the recent murders of a large number of people, especially intellectuals, in Dacca, Mr. John Stonehouse, British Labour M.P., told PTI in an interview here this morning. (New Delhi, 20 December).[৪৭৬] (সম্প্রতি ঢাকায় ব্যাপক গণহত্যা বিশেষত বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর উর্দ্ধতন দশজন অফিসার দায়ী ছিলেন। বিট্রিশ শ্রমিক দলের এমপি মি. জন ষ্টোনহাউস আজ সকালে পিটিআইকে দেয়া সাক্ষাতকারে এ কথা বলেন।)

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবী হত্যা সংক্রান্ত আলোচনায় বলেন "১০ ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সময় ঢাকার কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ আমাকে তার ধানমন্ডির পিলখানাস্থ অফিসে আসতে বলেন। তাঁর কমান্ড পোস্টের কাছাকাছি গিয়ে আমি কিছু গাড়ি দেখতে পাই। তিনি তার বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছিলেন এবং আমাকে তার গাড়িতে উঠতে বললেন। কয়েক মিনিট পর এই গাড়িগুলোর এখানে আসার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন 'এ ব্যাপারেই নিয়াজীর সঙ্গে কথা বলার

---

৪৭৪ একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ১১১

৪৭৫ একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ১০৮

৪৭৬ THE HINDUSTAN TIMES, New Delhi, 21 December 1971

www.pathagar.com

কথা বলার জন্য আমরা যাচ্ছি।' কোর সদরদপ্তরে (Corps Headquarters) যাওয়ার পথে তিনি আমাকে বললেন, বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য একটি আদেশ তিনি পেয়েছেন। আমি বললাম 'কেন, কি জন্য? এটা এধরণের কাজ করার সময় নয়।' জামশেদ বললেন 'কথাটা নিয়াজীকে বলবেন।' নিয়াজীর অফিসে যাওয়ার পর জামশেদ প্রশ্নটি ওঠালেন। নিয়াজী আমার মত জানতে চাইলেন। আমি বললাম 'এখন এ সময় নয়। আপনি আগে যাদেরকে গ্রেফতার করেছেন তাদের ব্যাপারে আপনাকে জবাব দিতে হবে। দয়া করে আর কাউকে গ্রেফতার করাবেন না।' তিনি সম্মত হলেন। আমার আশংকা, পূর্ববর্তী আদেশকে বাতিল করে সম্ভবত নতুন আদেশ আর জারী করা হয়নি। এবং কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমি আজ পর্যন্ত জানি না যে, তাদেরকে কোথায় রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তাদেরকে এমন কোথাও বন্দী করে রাখা হয়েছিল, যার প্রহরায় ছিল মুজাহিদরা। আত্মসমর্পণের পর কোর বা ঢাকা গ্যারিসনের কমান্ডাররা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তারা মুক্তিবাহিনীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ মুক্তিবাহিনী নির্দয়ভাবে মুজাহিদদের হত্যা করছিল। পাকিস্তান আর্মিকে দুর্নাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী কিংবা ইন্ডিয়ান আর্মিও বন্দী ব্যক্তিদের হত্যা করতে পারে। ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই ঢাকা দখল করে নিয়েছিল।"[৪৭৭]

Nicholas Tomanil বলেন বৃহস্পতিবার ঢাকায় আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তান বাহিনী ৫০ জন বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী এবং ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করে। এটি ছিল পাকিস্তান বাহিনীর অকস্মাৎ আক্রমণ যা ছিল উচু স্তরের বাঙালী নাগরিকদের নির্মূল করার পরিকল্পনার অংশ। জেনারেল নিয়াজিসহ সকল হাই কমান্ড বিষয়টি জানতেন। ধারণা করা হয়, মঙ্গলবার খুব সকালে পাঞ্জাবী সৈনিকরা নির্দিষ্ট ঠিকানায় যায় এবং মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসে। সম্ভবতঃ তাদেরকে রায়ের বাজারে ইটের ভাটাতে নিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে।[৪৭৮]

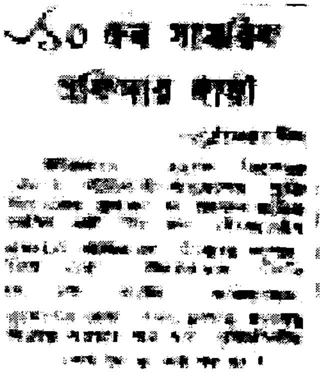

Internet থেকে প্রাপ্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

---

[৪৭৭] বাংলাদেশের জন্ম, রাও ফরমান আলী, অনুবাদঃ মুনতাসির মামুন; পৃঃ ১৯৭

[৪৭৮] পরিশিষ্ট ঃ ১১। BENGAL'S ELITE DEAD IN A DITCH, Nicholas Tomalin ; News report in the daily Newyork Times; 17.12.1971

www.pathagar.com

আল বদর

আল বদর ইসলামী ছাত্র সংঘ ও জামায়তে ইসলামী সৃষ্ট সশস্ত্র গ্রুপ হিসেবে পরিচিত। বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে এতদিন প্রচার করা হলেও এখন এটিকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সহায়ক বাহিনী হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা একেবারেই নতুন। ডা. এম এ হাসান বলেন "রাজাকার, আলবদর, আল শামস এরা সবাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়ক বাহিনী (Auxiliary force)।"[৪৭৯]

জামায়াতের পক্ষ থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড বিষয়ের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণকারী হিসেবে সাজাপ্রাপ্ত[৪৮০] আসামী এ বি এম এ খালেক মজুমদার বলেন "শহীদুল্লাহ কায়সারের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে ১৯৭৩ সনে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ছবিতে প্রথম বারের মত জীবনে তাকে দেখলাম। অথচ তখন তার অপহরণ মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে আমার কারাজীবন চলছে তিন বছর।"[৪৮১]

মাওলানা আব্দুল মান্নান[৪৮২] তার প্রতিবেশী ডাঃ আব্দুল আলীম চৌধুরীর অপহরণ ও হতার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন[৪৮৩] বলেন "মাওলানা মান্নানকে চাঁদপুরে আমরা মুক্তিযোদ্ধারাই সেদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম।"[৪৮৪] নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আল বদর বাহিনীর পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশী মুখোশ, ছদ্ম পোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে।[৪৮৫] ম্যানিক শ'র জীবনীমূলক বই-এ লেখা হয়েছে যে, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আশি হাজার হিন্দু যুবককে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন; তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজাকার আলবদর হিসাবেও কাজ করেছে।"[৪৮৬]

আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী দল

আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী দলের মধ্যে পাকিস্তান, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া সকলেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী দলের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারেন।

---

৪৭৯ সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক; তারিখ : ২৩.০২.২০১২

৪৮০ হাইকোর্টের বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর দেওয়া রায়ে বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত।

৪৮১ শিকল পরা দিনগুলো, এ বি এম এ খালেক মজুমদার, পৃ: ১১

৪৮২ মাওলানা আব্দুল মান্নান পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ করতেন। শুধু "মাওলানা" হওয়ার কারণে তাকে জামায়াত নেতা ও আল বদর বাহিনীর সদস্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

৪৮৩ কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন মুক্তিযোদ্ধে একজন সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।

৪৮৪ জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী, জানুয়ারী ১৯৯২

৪৮৫ একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃ: ১০৬

৪৮৬ http://www.defence.pk/forums/military-history-strategy/50095-truth-1971-sheikh-haseena-wajid-2.html এবং সম্ভবতঃ Manekshaw Soldering with dignity; Dipender Singh বই থেকে উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে। বইটি আমাদের হাতে না থাকাতে তথ্যটি নিশ্চিত করা যায়নি।

www.pathagar.com

ডাঃ এম এ হাসান বলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে Haight ও Dwespic নামের দু'জন সিআইএ কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। তিনি আরো বলেন যে, "বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নক্সা তৈরী করতে ভারত বিরোধী ও কম্যুনিস্ট বিরোধী চক্রের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে হাত মিলিয়েছিল চীনপন্থী সে অংশ যারা মুক্তিযুদ্ধের শেষদিন ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্যন্ত চীনের সঙ্গে গাটছাড়া বেধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছে। এ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর অনেক নিকটকর্মীসহ পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত কিছু আমলা ও শিক্ষককে চিহ্নিত করা গেছে, যারা নিজেদের রং বদল করে মুক্তিযুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক বনে গেছেন।"[৪৮৭]

"আওয়ামী লীগ সরকারকে নিহত বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ, বিশ্বে প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দসহ অন্যান্য মহল বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবী হত্যা রহস্য উন্মোচনের কোন উদ্যোগ নেয়নি। সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হবার পর বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। জহির রায়হানের সভাপতিত্বে এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন

১.এহতেশাম হায়দার চৌধুরী | ২. ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম
৩. ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ | ৪. এনায়েতুল্লাহ খান[৪৮৮]
৫. সৈয়দ হাসান ইমাম | ৬. ডঃ সিরাজুল ইসলাম

৩০ জানুয়ারী জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এর পর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়া হয়। কমিটি ইতিমধ্যে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছিল, কলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক তা ভারতে নিয়ে চলে যান।[৪৮৯]

[illegible]

সূত্রঃ http://chandrakantha.com/articles/indian_music/filmi_sangeet/film_song_1970_s_asia.html date 06.07.2011

---

৪৮৭ একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ১০৭ এবং পরিশিষ্টঃ ১২, একটি পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট; পত্রিকার নাম ও তারিখ মনে না থাকায় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টটি সংযুক্ত করা হলো।

৪৮৮ পিকিংপন্থী সাংবাদিক ও Weekly Holiday সম্পাদক ছিলেন।

৪৮৯ একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ১০৭

www.pathagar.com

টেবিল ২.১

নিহত বুদ্ধিজীবীদের তালিকা[৪৯০] ও মৃত্যুর বিবরণ

ক্রম	নাম	মৃত্যুর তারিখ	মন্তব্য
১.	অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব	২৫.০৩.১৯৭১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাকিস্তান বাহিনীর Operation Searchlight এ নিহত হন।
২.	অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা	২৫.০৩.১৯৭১-আহত ৩০.০৩.১৯৭১- মৃত্যু	
৩.	ড. এ এন এম মনিরুজ্জামান	২৫.০৩.১৯৭১	
৪.	আতাউর রহমান খান খাদেম	২৫.০৩.১৯৭১	
৫.	ড.ফজলুর রহমান খান	২৫.০৩.১৯৭১	
৬.	শরাফত আলী	২৫.০৩.১৯৭১	
৭.	এম এ মুকতাদির	২৫.০৩.১৯৭১	
৮.	অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য	২৫.০৩.১৯৭১	
৯.	ড. সিরাজুল হক খান	তারিখ অজ্ঞাত	
১০.	অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী	১৪.১২.১৯৭১	পাকিস্তানপন্থী হিসাবে বিবৃতি স্বাক্ষরকারী। ১৯৬৯ সনে প্রকাশিত তার "সংগ্রাম ও সংহতি" বইটি দ্রষ্টব্য।
১১.	অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	১৪.১২.১৯৭১	
১২.	অধ্যাপক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা	১৪.১২.১৯৭১	
১৩.	অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ	১৪.১২.১৯৭১	
১৪.	অধ্যাপক রাশিদুল হাসান	১৪. ১২.১৯৭১	
১৫.	সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচায	১৪.১২.১৯৭১	
১৬.	ড. আবদুল খায়ের	১৪.১২.১৯৭১	
১৭.	ড. সিরাজুল হক খান	১৪.১২.১৯৭১	
১৮.	ড. ন আ ম ফয়জুল মাহী	১৪.১২.১৯৭১	
১৯.	মোঃ সাদেক	২৫.০৩.১৯৭১	
২০.	ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা	১৪.১২.১৯৭১	
২১.	ডা. ফজলে রাব্বি	১৪.১২.১৯৭১	
২২.	ডা. মোহাম্মদ শফি	১৪.১২.১৯৭১	

৪৯০ ১-১৮ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ক্রমিক ১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক এবং ক্রমিক ২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ছিলেন।

www.pathagar.com

ক্রম	নাম	মৃত্যুর তারিখ	মন্তব্য
২৩.	সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন	১০.১২.১৯৭১	পাকিস্তানপন্থী হিসেবে চিহ্নিত
২৪.	শহীদুল্লাহ কায়সার	১৪.১২.১৯৭১	
২৫.	নিজামউদ্দিন আহমেদ	১২.১২.১৯৭১	
২৬.	খন্দকার আবু তালেব	২৯.০৩.১৯৭১	
২৭.	আনম গোলাম মোস্তফা	১১.১২.১৯৭১	
২৮.	শহীদ সাবের	৩১.০৩.১৯৭১	
২৯.	সৈয়দ নাজমুল হক	১১.১২.১৯৭১	
৩০.	চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান	৩০.০১.১৯৭২	রহস্য জনকভাবে নিখোজ
৩১.	আলতাফ মাহমুদ	৩০.০৮.১৯৭১	বাড়ি থেকে পাক সেনারা নিয়ে হত্যা করে।
৩২.	ডা.আবদুল আলীম চৌধুরী	১৫.১২.১৯৭১	
৩৩.	সেলিনা পারভিন	১৪.১২.১৯৭১	
৩৪.	হাবিবুর রহমান	১৬.০৪.১৯৭১	
৩৫.	মেহেরুন্নেসা	২৫.০৩.১৯৭১	বিহারিরা মেরেছে
৩৬.	গিয়াসউদ্দিন আহমদ	১৪.১২.১৯৭১	

০১ জুন ১৯৭১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ১৯ এপ্রিলের প্রবাসী সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনামার[৪৯১] ১ম দফার নির্দেশই অমান্য করে তাদের পেশায় ড. এম. এন. হুদা, ড. এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ, ড. এম ইন্নাস আলী, ড. এ. কে. নজমুল করিম, ড. মফিজুল্লাহ কবির, অধ্যাপক আতিকুজ্জমান খান, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, ড. এস.এম.আজিজুল হক, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. এ.কে. রফিকুল্লাহসহ প্রায় সকল শিক্ষক কাজে যোগদান করেন।[৪৯২]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যাতে 'পিকিংপন্থী কম্যুনিজম' এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সে পরিকল্পনা আগেই প্রণয়ন করে। RAW এক ঢিলে দু'টি পাখি মেরেছে অর্থাৎ পিকিংপন্থী বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করে মাওবাদী কম্যুনিজমের উত্থানকে রোধ করেছে, দ্বিতীয়তঃ এর দায়দায়িত্ব রাজাকার আল-বদরদের উপর চাপিয়ে ইতিহাসে পরিষ্কার থেকেছে।

---

৪৯১ পরিশিষ্ট: ৮

৪৯২ www.liberationwarmuseum.org /this day/ June 1, 1971 accessed on 14.11.2011

www.pathagar.com

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বলেন "১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত যারা ঢাকায় থেকে পাকিস্তানিদের সেবাযত্ন করে ১৪ ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হানাদারদের হাতে জীবন দিয়ে সবাই শহীদ বুদ্ধিজীবী হয়ে গেছেন, এটাও তো তেমন ব্যাপার। শহীদ বুদ্ধিজীবী তাদের এত বুদ্ধিই যদি থাকত তাহলে ঢাকায় থাকলেন কেন? পাকিস্তানিদের বেতন নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেন কেন? শহীদ বুদ্ধিজীবীরা ডিসেম্বর মাসেও পাকিস্তান সরকারের বেতন নিলেন কেন? তাই ১৪ ডিসেম্বর হানাদারদের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবী আর হানাদারদের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদারদের হাতে জীবন দেয়া শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আমি অন্তত একই রকম সম্মান করতে পারি না।

২৫ মার্চ হানাদারদের আক্রমণে যারা শহীদ হয়েছেন অথবা পরে দেশের নানা স্থানে প্রতিরোধ করতে গিয়ে হানাদারদের হাতে যারা নিহত হয়েছেন তারা আমার হৃদয়ে দেশপ্রেমিক শহীদ বুদ্ধিজীবী। তারা নিহত হওয়ায় তাদের প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি আছে, তাদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিদের প্রতিও গভীর মমতা আছে। কিন্তু যারা পাকিস্তানের বিরোধিতা করে হানাদারদের হাতে নিহত হয়েছিলেন তারা আর যারা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করেছে, পরাজিত হওয়ার মুহূর্তে হানাদাররা হত্যা করে ফেলে গেছে উভয়কেই এক মর্যাদায় বিচার করতে পারি না। ১৪ ডিসেম্বর নিহত জ্ঞানী-গুণীরা বেঁচে থাকলে আমরা এবং আমাদের সন্তানরা তাদের কাছ থেকে অবশ্যই আরও অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারত। সেটা নিশ্চয়ই দেশের জন্য কল্যাণকর হতো। একজন সাহিত্যিক, একজন শিক্ষক তাদের কাজ সাহিত্য রচনা, শিক্ষা দেয়া। পাকিস্তান ছিল, তারা পাকিস্তানে ছিলেন। চাকরি-বাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তারা পাকিস্তানের হয়ে নিশ্চয়ই কোনো খুন-খারাবি করেননি? তাই তাদের গালাগাল করব কেন? তারা পাকিস্তানে থেকে পাকিস্তান রক্ষা করতে চেয়েছেন। এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু তাদেরই মতো কেউ কেউ যখন আরাম আয়েশের সরকারি চাকরি ছেড়ে গ্রামে-গঞ্জে অথবা নির্বাসনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে হানাদারদের পরাজিত করে বাংলাদেশ বানিয়েছেন, উভয়কে এক করে বিচার করি কী করে? সত্য কথা হলো, চোখে যা দেখেছি তা এড়িয়ে যেতে পারি না। এড়িয়ে গেলে পেটের ভেতর কুরকুর করে, ভাত হজম হয় না। [৪৯৩]

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম ১১.১০.২০১১ তারিখে এক নিবন্ধে লেখেন "তালিম হোসেনের কাছে যাওয়ার আগে আমারও তাদের ওপর ক্ষোভ ছিল। এত বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী মানুষ তারা, যুদ্ধের পুরো সময় পাকিস্তানের সেবাদাস হিসেবে কাজ করলেন কেন? কিন্তু কবি তালিম হোসেনের কথা শুনে ও অন্যদের সঙ্গে কথা বলে আমার বেশ খটকা লেগেছিল। তাইতো, বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ১৩

---

[৪৯৩] প্রধানমন্ত্রী হত্যার ষড়যন্ত্র, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, আমার দেশ; তারিখ: ২৭.০৯.২০১১

www.pathagar.com

তারিখ পর্যন্ত যারা অবলীলায় ঢাকায় থেকে পাকিস্তানীদের সব হুকুম হাকাম পালন করেছে, ১৪ তারিখ সুবহে সাদেকে সেই পাকিস্তানিদের হাতে নিহত হয়ে সবাই পূতঃপবিত্র হয়ে গেল? আর যারা বেঁচে ছিল তাদের কেউ কেউ দালাল হলো?[৪৯৪]

বাংলাপিডিয়ায়[৪৯৫] প্রকাশিত পরিসংখ্যানে তথাকথিত হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী নিহত হওয়ার তথ্য যথার্থ নয় বলে প্রমাণিত হয়। এ পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ২১ জন, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ৫৯ জন, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ২৭০ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৬৩৯ জন, সাংবাদিক ১৩ জন, চিকিৎসক ৪৯ জন, উকিল ৪১ জন এবং অন্যান্য (সাহিত্যি-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব-প্রকৌশলী) ১৬ জন নিহত হন। নিম্নে দেশের তৎকালীন জেলা অনুসারে হিসেব দেয়া হল-

টেবিল ২.২

বাংলাপিডিয়ায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে বুদ্ধিজীবী নিহত হওয়ার তথ্য

জেলা ও বিভাগ	শিক্ষাবিদ			উকিল
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কলেজ	
ঢাকা	৩৭	৮	১০	৬
ফরিদপুর	২৭	১২	৪	৩
টাঙ্গাইল	২০	৭	২	
ময়মনসিংহ	৪৬	২৮	১	২
ঢাকা বিভাগ	**১৩০**	**৫৫**	**১৭**	**১০**
চট্টগ্রাম	৩৯	১৬	৭	১
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৯	৪	১	১
সিলেট	১৯	৭		২
কুমিল্লা	৪৫	৩৩	১	৪
নোয়াখালী	২৬	১৩	৪	২

৪৯৪ প্রধানমন্ত্রী হত্যা ষড়যন্ত্র-৪, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম , আমার দেশ; তারিখ: ১১.১০.২০১১

৪৯৫ বাংলাপিডিয়া,collected fro http://en.wikipedia.org/wiki/1971_killing_of_Bengali_intellectuals accessed on 16.08.2012

www.pathagar.com

জেলা ও বিভাগ	শিক্ষাবিদ			উকিল
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কলেজ	
চট্টগ্রাম বিভাগ	**১৩৮**	**৭৩**	**১৩**	**১০**
খুলনা	৪৮	১৫	২	২
যশোর	৫৫	৩১	৫	৪
বরিশাল	৫০	২১	৪	
পটুয়াখালী	৩	১		
কুষ্টিয়া	২৮	১৩	৪	
খুলনা বিভাগ	**১৮৪**	**৮১**	**১৫**	**৬**
রাজশাহী	৩৯	৮	৩	৫
রংপুর	৪১	২২	৯	৪
দিনাজপুর	৫০	১০	১	২
বগুড়া	১৪	১২		২
পাবনা	৪৩	৯	১	২
রাজশাহী বিভাগ	**১৮৭**	**৬১**	**১৪**	**১৫**
সমগ্র বাংলাদেশ	**৬৩৯**	**২৭০**	**৫৯**	**৪১**

ডিসেম্বরের যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে বুদ্ধিজীবী হত্যা সংক্রান্ত বিষয়ে Daily Telegraph সংবাদ প্রকাশ করে যে "With public opinion inflamed by the discovery of the massacre by Pakistani irregulars of more than 200 Bengali intellectuals in the last days of the war, it was feared that armed bands roaming the streets would step up their campaign of vengeance against collaborators with the Pakistanis."[৪৯৬]

125 Slain in Dacca Area, Believed Elite of Bengal শিরোনামে New York Times সংবাদ প্রকাশ করে "At least 125 persons, believed to be physicians, professors, writers and teachers were found

[৪৯৬] Daily Telegraph , December 20, '71

www.pathagar.com

murdered today in a field outside Dacca. All the victims' hands were tied behind their backs and they had been bayoneted, garroted or shot. They were among an estimated 300 Bengali intellectuals who had been seized by West Pakistani soldiers and locally recruited supporters."[৪৯৭] (বিশ্বাস করা হচ্ছে যে, ঢাকার অদূরে ১২৫ জন চিকিৎসক, অধ্যাপক, লেখক ও শিক্ষককে আজ হত্যা করা হয়েছে। সকল মৃত ব্যক্তির হাত পিছন থেকে বাধা ছিল ও তাদেরকে বেয়েনেট দিয়ে খুচিয়ে, শ্বাসরোধ করে বা গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিক ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের দ্বারা প্রায় ৩০০ জন বাঙালী বুদ্ধিজীবির একটি অংশ তারা।)

এ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে, রায়ের বাজার বদ্ধভূমিতে ২০০ বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে। ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া বলেন, " ঢাকার মোহাম্মদপুর পশ্চিম প্রান্তের ইটখোলা ও মীরপুরের উত্তরের কবরস্থানের পাশে ৫০-৬০ জনের লাশ পাওয়া যায়। এঁদের অনেককে এক সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে ডোবার পাশে রেখে গুলি করা হয়েছিলো, আবার কাউকে কাউকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সে সব বুদ্ধিজীবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাংবাদিক, কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী-ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী কর্মচারীসহ সব ধরনের পেশার ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, মোহাম্মদপুর ও মীরপুর আবাসিক এলাকা দুটো ছিলো মূলত অবাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চল।"[৪৯৮]

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয়-

১. ২৫ মার্চ -- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ অর্থাৎ পুরো যুদ্ধকালে ঢাকায়[৪৯৯] বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছে মোট ৭১ জন, যার হিসেব নিম্নরূপ--

• প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	---	৩৭ জন
• মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	---	৮ জন
• মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক	---	১০ জন
• বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক	---	১০ জন
• এ্যাডভোকেট	---	৬ জন
মোট=	---	**৭১জন**

৪৯৭ "125 Slain in Dacca Area, Belicved Elite of Bengal". New York Times (New York, NY, USA): p. 1 December 19 , 1971

৪৯৮ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ , ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃ: ১১৬-১১৭

৪৯৯ ঢাকা মহানগর ও বৃহত্তর ঢাকা জেলা অর্থাৎ বর্তমান ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাসমূহ।

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে --

(অ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে বুদ্ধিজীবীর কাতারে ধরা হয় কিনা ? যদি ধরা না হয় তা হলে প্রথমেই এ হিসেব থেকে ৪৫ জনকে বাদ দিতে হবে। এর পর বাদ যাবেন অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ড.মনিরুজ্জামান, আতাউর রহমান খান খাদেম, ড. ফজলুর রহমান খান, শরাফত আলী, এম এ মুকতাদির, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, মোঃ সাদেক, খন্দকার আবু তালেব, শহীদ সাবের, চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান, আলতাফ মাহমুদ, হাবিবুর রহমান, মেহেরুন্নেসা, শহীদুল্লাহ কায়সার, যারা ডিসেম্বরের পূর্বেই মারা গেছেন অথবা যাদের লাশ কখনো পাওয়া যায়নি; আর এর সংখ্যা হচ্ছে ১৬ জন।

(আ) ১৮ তারিখে রায়ের বাজার বদ্ধ ভূমিতে কতটি লাশ পাওয়া গিয়েছিল এবং এগুলো কাদের ?

(ই) ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখের Daily Telegraph এর রিপোর্ট কতটুকু বাস্তব ভিত্তিক আর কতটুকু অতিরঞ্জিত ছিল ?

(ঈ) ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়ার হিসাবকে সঠিক ধরলে Daily Telegraph এর রিপোর্ট কতটা বাস্তবসম্মত ছিল ?

২. ৩০ জানুয়ারী জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। তার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে এ বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

৩. "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ৮০০০০ হিন্দু যুবককে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন; তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজাকার আল বদর হিসাবেও কাজ করেছে।" "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল ম্যানিক শ'র জীবনীমূলক বই এর এ উক্তি থেকে পরিষ্কার যে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী হিন্দু যুবকদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করেছে।

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা

মাওলানা মোহাম্মদ অলিউল্লাহর ছেলেদের নাম ছিল মোহাম্মদ শহীদল্লাহ, মোহাম্মদ জহির উল্লাহ, মোহাম্মদ জাকারিয়া, মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ। বামপন্থী আন্দোলন করার কারণে তারা নামে বৈচিত্র এনে রাখেন শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান। শহীদুল্লাহ কায়সার তার স্ত্রীর নাম সাইফুন্নাহার থেকে রাখেন পান্না কায়সার। ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতাকারী কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্র শাখা ছাত্র ফেডারেশন[৫০০] নেতা শহীদুল্লাহ কায়সার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে

[৫০০] মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সঙ্গে মিলিয়ে তাদের ছাত্র সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে রাখে ছাত্র ইউনিয়ন এরপর মুসলিমলীগ তাদের ছাত্র সংগঠনের নাম রাখেন ন্যাশনাল স্ট্যুডেন্ট ফেডারেশন বা এন এস এফ

www.pathagar.com

অংশগ্রহণের জন্য ভারতে পাড়ি জমান। তিনি সেখানে বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষে ভারতের এককালের মন্ত্রীসভার সদস্য রফি আহমেদ কিদ্‌ওয়ারীর মেয়েকে নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে এসে পাকিস্তান সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন; তিনি আর ভারতে যাননি। ভারতীয় সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সরকার কিদ্‌ওয়ারীর মেয়েকে ভারতের নিকট হস্তান্তর করে। তিনি ভাবতেন দেশ স্বাধীন হলে মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থের বিনিময়ে কিনে নিবেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ RAW এর বিশেষ স্কোয়াড যখন তার বাড়ি হানা দেয় তখন তাদেরকে মুক্তিবাহিনী ভেবে এবং তাদের হাত থেকে বাচার জন্য গেট খোলার পূর্বেই আলমিরা থেকে টাকা বের করা শুরু করেন।[৫০১] ভবানীপুরের RAW এর অপারেশনাল সদর দপ্তরে যাতায়াতকারী শহীদুল্লাহ কায়সারকে তারা নিরাপদ মনে করেননি; সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

RAW-এর সৃষ্ট মুজিববাহিনীর সদস্যদের হাতে ধরা পড়া এ, বি, এম, এ, খালেক মজুমদারকেই শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ হত্যা মামলার আর্জিটি হচ্ছে- "অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ এ যে, অভিযুক্ত এ, বি, এম, এ, খালেক ওরফে আব্দুল খালেক নটরিয়াস আলবদর বাহিনীর একজন মেম্বার ছিলেন। এছাড়াও তিনি অধুনালুপ্ত জামায়াতে ইসলামীর মেম্বর ও সেক্রেটারী ছিলেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে বে-আইনীভাবে ও জোর করে দখলে রাখার জন্য তিনি পাক-সেনাকে সাহায্য সহযোগিতা যুগিয়েছেন। তাই তিনি উপরের বর্ণিত ধারা মতে একজন কলাবোরেটর।

অভিযোগ এই যে ১৪.১২.১৯৭১ সন্ধ্যায় ৬-৩০ টায় তার বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে ষ্টেনগান, রিভলবার ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আলবদরের ইউনিফরমে দৈনিক সংবাদের সম্পাদক মিষ্টার শহীদুল্লাহ কায়সারের বাসায় দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে।

অভিযোগ এই যে তাঁর স্ত্রী, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী এবং বোনের বাধাকে উপেক্ষা করে তাদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে শহীদুল্লাহ কায়সারকে তার বেড রুম থেকে ধরে জোর করে নিচের তলায় নামায় এবং হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। এবং তাকে হত্যা করা হয় কিন্তু তার মরদেহ পাওয়া যায়নি।"[৫০২]

ঘাদানিকের প্রতিবেদনে একই কথা বলা হয় "At that time someone knocked loudly the outside door. Zakaria rushed to first floor. Shahidullah Kaiser was taking tea at the drawing room at that time, Neela was accompanying him. Informing that someone

---

[৫০১] বাংলাদেশ প্রতিদিন, রকমারি, তারিখঃ ১৪.১২.২০১০

[৫০২] শিকল পরা দিনগুলো, এ বি এম খালেকমজুমদার, পৃঃ ৯৪

www.pathagar.com

came at the door, Zakaria came down. Gripped by fear, Kaiser's sisters and other switched on all the lights on the ground and first floor. Kaiser was trying to make a phone call, but the intruders entered breaking the door inside. They first knocked Obaidullah (younger brother of Shahidullah) down by the rifle butt. The masked-men went up to Shahidullah's bedroom. Identifying himself, Shahidullah wanted to know the reason for their coming."[৫০৩]

(সে সময় কেউ যেন দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়ছে। জাকারিয়া দোতলায় দৌড়ে গেলেন তখন শহীদুল্লাহ কায়সার ড্রইং রুমে চা পান করছিলেন, নীলা তার (শহীদুল্লাহ কায়সার) সঙ্গে ছিলেন। শহীদুল্লাহ কায়সারকে খবরটি দিয়েই জাকারিয়া নিচে নেমে আসে। ভীত-সন্ত্রস্ত তার বোন ও অন্যান্যরা নীচ তলা ও দোতলার সকল বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। কাযসার কাউকে ফোন করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে আগন্তুকরা দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন। তারা রাইফেলের বাট দিয়ে প্রথমেই ওবায়দুল্লাহকে ফেলে দেয়। মুখোশ পড়া লোকেরা শহীদুল্লাহর বেড রুমে প্রবেশ করলে শহীদুল্লাহ নিজ পরিচয় দিয়ে তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করে।)

১৪.১২.২০১০ তারিখে শহীদুল্লাহ কায়সারের মেয়ে শমী কায়সার বলেন "বাবাকে নিয়ে আমার নিজের পোক্ত কোনো স্মৃতি নেই। মা এবং অন্যদের কাছ থেকে শুনেছি বাবার কথা। বাবার বই পড়েছি। ১৪ ডিসেম্বরের কথা বলতে গেলেই মায়ের চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠত। বাবার কথা মনে পড়লে আমারও ভীষণ কান্না পায়। শুনেছি ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যার সেই ভয়াল গল্প। তখন আমাদের বাসা ছিল পুরনা ঢাকার কায়েতটুলিতে। বাবা বাসাতেই ছিলেন। তিনি মোমবাতি জ্বালিয়ে বিবিসি শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। মা আমাকে কোলে নিয়ে মেঝেতে বসেছিলেন। আর আমি নাকি ফিডারে করে দুধ খাচ্ছিলাম। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। বাবা বারবারই মাকে বলছিলেন, আমরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। পাকিস্তানিরা এখন পালানোর পথ খুঁজছে। সবই মায়ের মুখে শোনা। পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে। এমন সময় দরজায় ঠক ঠক করে কড়া নাড়ার শব্দ হলো। ছোট চাচা (ওবায়দুল্লা) এসে বাবাকে বললেন, 'বড়দা, দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে, খুলে দেব?' বাবা নাকি তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। চিৎকার করে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা এসেছে, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাও' এ কথা বলে তিনি আলমারি খুলে টাকা বের করলেন মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়ার জন্য। কিন্তু এর পরের

[৫০৩] 2nd Report on the findings of the People's Inquiry Commission on the activities of the War Criminals and the Collaborators

www.pathagar.com

ঘটনা পুরোটাই অপ্রত্যাশিত। মুক্তিযোদ্ধা নয়, চার-পাঁচজন লোক কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে ঘরে প্রবেশ করল। তারা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, 'শহীদুল্লাহ কায়সার কে' বাবা এগিয়ে এসে বললেন, 'আমিই শহীদুল্লাহ কায়সার।' সেই কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা লোকগুলো তার হাত ধরে নিয়ে যেতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে রেখে বাবার হাত চেপে ধরলেন। অন্য ঘর থেকে ছোট ফুফুও দৌড়ে এলেন। তিনিও বাবার হাত চেপে ধরেছিলেন। কিন্তু তারা শত শক্তি প্রয়োগ করেও ধরে রাখতে পারলেন না। আল-বদররা স্ত্রী ও বোনের হাতের বাঁধন ছিন্ন করে ধরে নিয়ে গেল তাকে। যাওয়ার সময় তিনি স্ত্রী ও বোনের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলেছিলেন, 'ভালো থেকো'। শুনেছি এক মুহূর্তের জন্য করুণ চোখে আমার দিকেও নাকি তাকিয়েছিলেন। কারফিউর অন্ধকারে তিনি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন। তারা আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমনকি তার মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। খুব কষ্ট হয় যখন বাবার কথা ভাবি। এভাবে আমাকে একা রেখে তিনি অন্ধকারের অতলে হারিয়ে গেছেন ভাবতেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে। তবু দেশের কথা ভেবে, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বলে গর্ববোধও হয়। একজন শহীদ বুদ্ধিজীবীর সন্তান হিসেবে আমি গর্ববোধ করি।"[৫০৪]

জহির রায়হানের অন্তর্ধান[৫০৫]

জহির রায়হান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি আলাদা অধ্যায়, একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস। ১৯৩৫ সালের ৫ আগস্ট[৫০৬] ফেনী জেলার[৫০৭] মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার প্রকৃত নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ডাক নাম জাফর। তার পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। ১৯৫৩ বা ৫৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলে মনি সিংহের দেয়া রাজনৈতিক নাম 'রায়হান' গ্রহণ করেন।

১৯৬৬ সালে চীন ও রাশিয়া কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে শহীদুল্লাহ কায়সার মস্কোপন্থী লাইন ধরলেও জহির ছিলেন দোদুল্যচিত্ত ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় জহিরের মধ্যে পিকিংপন্থী প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মস্কোপন্থীদের সাথে পারিবারিক ও বান্ধব সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও তিনি পিকিংপন্থীদের প্রতি সহানুভূশীল ছিলেন এবং এদের মধ্যে ঐক্য কামনা করতেন।

---

৫০৪ বাংলাদেশ প্রতিদিন, রকমারি, তারিখঃ ১৪.১২.২০১০

৫০৫ প্রথম সংস্করণ থেকে কিছুটা আলাদা।

৫০৬ কোন কোন বইয়ে তার জন্ম তারিখ ১৯ আগস্ট উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার বোন দাবি করেছেন তার জন্ম তারিখ ৫ আগস্ট।

৫০৭ তৎকালীন নোয়াখালি জেলার ফেনী মহকুমা।

www.pathagar.com

দেশের চলচ্চিত্র জগতে এবং জীবনস্পর্শী প্রতিবাদী সাহিত্য ধারায় জহির রায়হান এক বিশিষ্ট শিল্পী। তার আবির্ভাব ঘটেছিল কথাসাহিত্যে। সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক, রাজনৈতিক কর্মী, চিত্রপরিচালক- নানা পরিচয়ে তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি স্পষ্ট।

১৯৭০ সনে ১০ এপ্রিল মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' আর ১৯৭১ সনে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রামাণ্যচিত্র (documentary film) STOP GENOCIDE তাকে স্মরণীয় করে। অমুক্তিপ্রাপ্ত প্রামাণ্যচিত্রের (documentary film)[508] Premium show র আয়োজন তাকে অন্তর্ধান করে। তিনি হারিয়ে গিয়েছেন, নিহত হয়েছেন না এখনো জীবিত আছেন এ প্রশ্নের উত্তর জাতি জানে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর জহির রায়হান ঢাকায় ফিরে এসেই শুনলেন তার অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার ১৪ ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ। আদর্শস্থানীয় বড় ভাইকে হারিয়ে তিনি পাগলের মত তাকে খুঁজতে থাকেন। তাকে খুঁজতে গিয়েই তিনি হারিয়ে যান।

জহির রায়হানের অন্তর্ধান নিয়ে পান্না কায়সার[৫০৯] বলেন, "৩০ জানুয়ারি, ১৯৭২। সেদিন সকালে একটা ফোন এলো। ফোনটা আমিই ধরেছিলাম। ওপাশ থেকে বললো: জহির সাহেব আছেন? ধরুন বলে মেজদাকে ডেকে দিলাম। ফোনে কথা বলে মেজদা সবাইকে ডেকে বললেন, বড়দার খোঁজ পাওয়া গেছে... টেলিফোনে কি কথা হলো, কার সঙ্গে কথা হলো, মেজদা এসব কিছুই বললেন না। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি... পর দিন হাইকোর্টের কাছে মেজদার গাড়িটা পাওয়া গেল। গাড়িটা এখানে কিভাবে এলো, কিছুই জানা গেল না... ছুটে গেলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা ভেবেছিলাম, বঙ্গবন্ধু নিজেই এ ব্যাপারে একটা উদ্যোগী ভূমিকা নেবেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তার সাক্ষাৎ যখন পেলাম-দেখলাম তিনি বেশ নির্লিপ্ত। তাজউদ্দীন আহমদকে ডেকে বললেন, দেখতো কি করা যায়। স্বাধীন দেশে এমন একটি লোক হারিয়ে যাবে, তা কি করে হয়। আমরা মন খারাপ করে ফিরে এলাম।"[৫১০]

সাংবাদিক হারুনুর রশীদ খান বলেন, "সেই যে নিখোঁজ হলেন, আজও আমাদের কাছে নিখোঁজ। রহস্যজনক ঘটনা আরো ঘটলো। জহির রায়হানের মরিস মাইনর গাড়িটি দরজা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেল।" তিনি আরো বলেন, "মজার ঘটনাটি হলো, বঙ্গবন্ধুর সরকার থেকে আজতক কোন সরকারই জহির রায়হানকে নিহত ঘোষণা করেনি।"[৫১১]

---

৫০৮ প্রামাণ্যচিত্রটি (documentary film) জহির রায়হান তার খালাত বোন মনিরার বাসায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। মনিরা তখন আজিমপুরের চারনা বিল্ডিং-এ থাকতেন। তাকে ১৯৭২ সনে হত্যা করে আটা রাখার ড্রাম থেকে document নিয়ে যাওয়া হয়।

৫০৯ শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী।

৫১০ 'জহির রায়হানের অন্তর্ধান যা ঘটেছিল সেদিন' শিরোনামে পান্না কায়সারের লেখা ছাপা হয়েছে দৈনিক ভোরের কাগজে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সংখ্যায়।

৫১১ সাংবাদিক হারুনুর রশীদ খান ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে দৈনিক লাল সবুজ

www.pathagar.com

জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তার স্ত্রী সুমিতা দেবী বলেন, "আমার বিশ্বাস জহির মিরপুরে মারা যায়নি। ঘাতকরা তাকে অন্য কোথাও হত্যা করেছে। সেদিন সকাল আটটার দিকে জহিরের কাছে একটা ফোন আসে। ফোনটা ধরেছিল সুরাইয়া নিজে। সেদিন রফিক নামে কেউ একজন ফোন করেছিল। আমরা যে রফিককে চিনতাম, তিনি ইউসিসে চাকরি করতেন। তার সাথে আমারই প্রথম পরিচয় ছিল। পরে আমিই তাকে জহিরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। আজ মাঝে মাঝে মনে হয় তার সাথে জহিরের পরিচয়টা না করিয়ে দিলেও পারতাম। টেলিফোনে জহিরকে বলা হয়েছিল, আপনার বড়দা মিরপুর বারো নম্বরে বন্দী আছেন। যদি বড়দাকে বাঁচাতে চান তাহলে এক্ষুণি মিরপুর চলে যান। একমাত্র আপনি গেলেই তাকে বাঁচাতে পারবেন। অন্য কেউ যদি সেখানে যায় তাহলে আপনার বড়দার ডেডবডি আসবে বাড়িতে।" তিনি আরো বলেন, "জহির রায়হান নিখোঁজ এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখালেখিও হলো। একদিন বড়দি অর্থাৎ জহিরের বড় বোন নাসিমা কবিরকে ডেকে নিয়ে শেখ মুজিব বললেন, জহিরের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে এ রকম চিৎকার করলে তুমিও নিখোঁজ হয়ে যাবে। পরে নাসিমা আর কিছু বলেনি। টেলিফোন করেছিল যে রফিক, তাকে নিয়ে যখন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলো। তখন তাকে নাগরিকত্ব দিয়ে পুরো পরিবারসহ আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া।"[৫১২]

শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুজতে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছেন জহির রায়হান--এটিই হচ্ছে সত্য। তার অন্তর্ধানকে হত্যাকান্ড হিসেবে বর্ণনা করে সেই হত্যাকান্ডের দায়দায়িত্ব রাজাকারদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন বিশ্বাস যে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী আওয়ামী লীগের নেতাদের অপকর্ম সেলুলয়েড করার কারণেই তাজউদ্দিনের নির্দেশে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। তৃতীয় বিশ্বাস হচ্ছে এ অন্তর্ধানের সাথে ভারতীয় বাহিনী সরাসরি জড়িত। চতুর্থ মত হচ্ছে মুজিব বাহিনীর সদস্যরা এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছে।

তার স্ত্রী সুচন্দা বলেন "বিষয়টি আড়ালে রয়ে গেছে, আমি জহিরকে মনের আড়ালেই রাখতে চাই। সব কথা সবসময় বলা যায় না। যে বিপদটা তার জীবনে এসেছিল। তিনি প্রেসক্লাবে দাড়িয়ে এক বক্তব্যে বলেছিলেন 'যারা এখন বড় বড় কথা বলেন, নিজেদের বড় কথা বলেন, নিজেদের বড় নেতা মনে করেন তাদের কীর্তি-কাহিনী, কলকাতায় কে কি করেছিলেন, তার ডকুমেন্ট আমার কাছে রয়েছে। তাদের মুখোশ আমি খুলে দেব।' --- একথা বলার পরই তার ওপর বিপদ নেমে আসে।[৫১৩] "তাকে কারা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এ সম্পর্কে ববিতা বলেন- জহির ভাই যেদিন বাসা থেকে বের হয়ে যান সেদিন একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার তার সঙ্গে ছিলেন এবং ওই রাতেই আমাদের বাসায় ডিনার ছিল।

---

[৫১২] দৈনিক আজকের কাগজ ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩

[৫১৩] বাংলাদেশ প্রতিদিন, রকমারি, তারিখঃ ১৪.১২.২০১০

www.pathagar.com

তিনিই আমাদের ফোন করে জানান, সরি তোমাদের ডিনারে যাওয়া হচ্ছে না। আমি জহিরের সঙ্গে যাচ্ছি ।"[৫১৪] তার সেলুলয়েড পিকিংপন্থীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবার আশংকা ছিল ভারতের। দুয়ে দুয়ে চার মিলাতে জঅড এর ব্রিলিয়েন্ট অফিসারদের কোন অসুবিধাই হয়নি।

সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল বলেন "ভারতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনেক কিছুই জানতে পেরেছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান। তিনি জেনেছিলেন অনেক কিছু, চিত্রায়িতও করেছিলেন অনেক দুর্লভ দৃশ্যের। কিন্তু অতসব জানতে বুঝতে গিয়ে তিনি বেজায় অপরাধ করে ফেলেছিলেন। স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই সেই অনেক কিছু জানার অপরাধেই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে বলে ধারণা। ভারতের মাটিতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চুরি, দুর্ণীতি, অবৈধ ব্যবসায়, যৌন কেলেংকারী, বিভিন্নরূপ ভোগবিলাস সহ তাদের শত অপকর্মের প্রচুর প্রামাণ্য দলিল ছিল– ছিল সচিত্র দৃশ্য। আওয়ামী লীগের অতি সাধের মুক্তিযুদ্ধের বির"দ্ধে জহির রায়হানের এত বড় অপরাধকে স্বার্থান্বেষী মহল কোন যুক্তিতে ক্ষমা করতে পারে?[৫১৫]

"৩০ জানুয়ারী জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এর পর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়া হয়। কমিটি যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছিল, কলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক তা ভারতে নিয়ে চলে যান।"[৫১৬]

দেশের সচেতন মানুষের কাছে আজো প্রশ্ন--

১. কে এই ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার যার সঙ্গে গিয়ে তিনি আর ফেরৎ আসেননি?

২. কে এই কলকাতার সাংবাদিক যিনি তদন্ত কমিটির সদস্য না হওয়ার পরও সকল তথ্য তার হস্তগত হয় এবং তিনি সমস্ত তথ্য প্রমাণ কলকাতা নিয়ে যান? আরো বড় প্রশ্ন হ"ছ কোন প্রকার কপি না রেখেই মূল দলিল তার কাছে কে এবং কার হুকুমে হস্তান্তরিত হয়?

সাপ্তাহিক বিচিত্রার[৫১৭] ১৯৯২ সালের ১ মে সংখ্যায় শাহরিয়ার কবিরের নেয়া চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে সত্যজিৎ রায় শাহরিয়ার কবিরকে হঠাৎ করে যা জিজ্ঞেস করেন সে অংশটুকুঃ

সত্যজিৎ রায়ঃ জহিরের ব্যাপারটা কিছু জেনেছো?

---

[৫১৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, রকমারি, তারিখঃ ১৪.১২.২০১০

[৫১৫] অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা-মেজর (অবঃ) এম,এ, জলিল, পৃঃ ২৬

[৫১৬] একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, পঞ্চম মুদ্রণ; পৃঃ ১০৭

[৫১৭] সেই সময়কার সরকার নিয়ন্ত্রিত সাপ্তাহিক, বর্তমানে বিলুপ্ত।

www.pathagar.com

শাহরিয়ার কবিরঃ তাকে সরিয়ে ফেলার পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে যা বুঝতে পেরেছি তাতে বলা যায়, ৩০ জানুয়ারি দুর্ঘটনায় তিনি হয়তো মারা যাননি। তারপরও দীর্ঘদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।[৫১৮]

সত্যজিৎ রায়ঃ স্ট্রেঞ্জ! জহিরকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে কারণ কি?

শাহরিয়ার কবিরঃ সেটাই ষড়যন্ত্রের মূল সূত্র বলে ধরছি। মিরপুরে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলে গভীর ষড়যন্ত্র মনে করার কোনো কারণ ছিল না। আমি যতদূর জানি, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে তিনি এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যা অনেক রথী-মহারথীদের জন্যই বিপজ্জনক ছিল, সে জন্য তাকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন ছিল।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি ও জহির রায়হানের চাচাত ভাই শাহরিয়ার কবির ৩০ জানুয়ারি দুর্ঘটনার দিন তার সাথে মীরপুরে গিয়েছিলেন। "১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি ৩ দৈনিক বাংলায় একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, কোন এক সূত্র থেকে অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার মিরপুরের এক বিশেষ বাড়িতে আটক আছেন। এমন একটি সংবাদ পেয়ে জহির রায়হান ২৯ জানুয়ারি সকালে মিরপুরে যান। সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ সেনাহাহিনীর একজন লেফটেনেন্ট এবং দুই চাচাত ভাই বাবুল ও শাহরিয়ার, শ্যালক আব্দুল হক ও শহীদুল্লাহ কায়সারের দুই শ্যালক নিজাম ও পারভেজ। জনাব জহির রায়হান তার নিজের টয়োটা গাড়িটা নিজেই চালিয়ে যান।"[৫১৯]

৩০ জানুয়ারি ৭২ রোববার সকালে এক অজ্ঞাত টেলিফোন আসে জহির রায়হানের কায়েতটুলির বাসায়। টেলিফোন পেয়ে জহির রায়হান দুটো গাড়ী নিয়ে মিরপুরে রওনা দেন। তাঁর সাথে ছিলেন ছোট ভাই মরহুম জাকারিয়া হাবিব, চাচাত ভাই শাহরিয়ার কবির, বাবুল (সুচন্দার ভাই), আব্দুল হক (পান্না কায়সারের ভাই), নিজাম ও পারভেজ।[৫২০]

জহির রায়হানের অন্তর্ধান নিয়ে যে প্রশ্ন তার উত্তর জাতিকে অবশ্যই বেড় করতে হবে। এ বেড় করাটা এখনো সহজ। কারণ তার সহযোদ্ধারা এখনো জীবিত। বেসরকারিভাবে গঠিত "বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির" যারা যারা সদস্য ছিলেন[৫২১] তাদের মধ্য ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদূদ আহমেদ, সৈয়দ হাসান ইমাম,

---

৫১৮ ১৯৭৮ সনের কোন এক সময় 'সাপ্তাহিক মতামত বা জনমত' এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে বলা হয় জহির রায়হানকে ভারতের একটি কারাগারে দেখা গেছে।

৫১৯ মুক্তিযুদ্ধঃ মিরপুর, মোজাম্মেল হোসেন রতন; পৃঃ ৯৮

৫২০ মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণাঙ্গনে জহির রায়হান ট্রাজেডি, ফারুক ওয়াসিফ, দৈনিক সমকাল ৩০ জানুয়ারি ২০০৭

৫২১ কমিটি পৃষ্ঠা [illegible] আছে।

www.pathagar.com

ডঃ সিরাজুল ইসলাম জীবিত। এর বাইরে শাহরিয়ার কবির যিনি জহির রায়হানের অন্তর্ধানের সাক্ষী তিনি জীবিত। প্রয়োজন শুধু সত্য কথা বলার সাহস সঞ্চয় করা।

স্টুয়ার্ড মুজিব হত্যা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবেরও ঘটেছিল একই পরিণতি। এই দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান, তেজোদীপ্ত যুবক স্টুয়ার্ড মুজিব আমার ৯ নং সেক্টরের অধীনে এবং পরে ৮ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছে। তার মত নির্ভেজাল ত্বরিতকর্মা একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা সত্যিই বিরল। প্রচন্ড সাহস ও বীরত্বের অধিকারী স্টুয়ার্ড মুজিব ছিল শেখ মুজিবের অত্যন্ত প্রিয় ও অন্ধ ভক্ত।....স্টুয়ার্ড মুজিব ভারতে অবস্থিত আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেক কুকীর্তি সম্পর্কে ছিল ওয়াকিফহাল। এতবড় স্পর্ধা কি করে সইবে স্বার্থান্বেষী মহল? তাই স্বাধীনতার মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ঢাকা নগরীর গুলিস্তান চত্বর থেকে হাইজ্যাক হয়ে যায় স্টুয়ার্ড মুজিব। এভাবে হারিয়ে যায় বাংলার আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।"[৫২২] আবদুর রহিম[৫২৩] বলেন "পাকিস্তান নেভীর অতি সামান্য পদে চাকরিরত অসমসাহসী স্টুয়ার্ড মুজিব নিহত হন মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর সহকর্মীদের হাতে দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে। স্টুয়ার্ড মুজিবের অপরাধ, তিনি নাকি মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কতিপয় ব্যাক্তির নিরীহ লোকদের ওপর জোরজুলুম ও অপকর্মের প্রতিবাদ করেছিলেন।[৫২৪]

---

৫২২ অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর (অবঃ) এম এ জলিল; পৃ: ২৬, ২৭

৫২৩ সাংবাদিক।

৫২৪ যুদ্ধাপরাধীর জবানবন্দি, আবদুর রহিম, পৃ: ৩৩-৩৪

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ তিন

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার - প্রথম পর্যায় (১৯৭২-১৯৭৫)

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের শ্রেণী বিভাগ

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা মূলতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল---

১. পাকিস্তান সামরিকবাহিনী যারা মূলতঃ এক পক্ষের player। এদের সকলকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করার দাবী থাকলেও কেবল ১৯৫ জনকে চিহ্নিত করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

২. পাকিস্তান সরকার বা সামরিকবাহিনীকে সহায়তাকারী শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস্, মুজাহিদ, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য সহায়তাকারী, এক কথায় কলাবরেটর বা দালাল; এরা মূলতঃ এ পক্ষের collaborator stakeholders।

এ দু'ভাগের অপরাধীদের বিচারের জন্য দু'টি আইন প্রণয়ন করা হয়। বিষয়টি আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হলো

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বা যুদ্ধাপরাধী

ডাঃ এম এ হাসান বলেন "৯৫% মানুষ হত্যা করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী।"[৫২৫] নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর ফলে নৈতিক বল হারিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে তিন বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অস্ত্র নিয়ে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর বিনা শর্তে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫৫,৬৯২ জন, নৌ ও বিমানবাহিনীর ১৮০০ জন, প্যারা-মিলিটারীর ১৬৩৫৪ জন, পুলিশ বাহিনীর ৫২৯৬ জন এবং প্রায় ১০৫০০ জন বিহারিকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যুদ্ধবন্দীদেরকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে তাদের বিচার করা জনগণের একটি বড় দাবী ছিল। ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিব ঢাকা ফিরে রমনা রেসকোর্স ময়দানে বলেন, "বিশ্বকে মানবেতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকান্ডের তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক দল এই বর্বরতার তদন্ত করুক এই আমার কামনা।"[৫২৬] কিন্তু সকল ধরণের যুদ্ধবন্দীকে ভারত সে দেশে নিয়ে গেলে বিষয়টি অংকুরেই দিগ্‌ভ্রষ্টতায় পড়ে।

---

[৫২৫] সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক; তারিখ: ২৩.০২.২০১২

[৫২৬] দৈনিক বাংলা; তারিখ: ১১.০১.১৯৭২

www.pathagar.com

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য ও তাদের সহায়ক বাহিনীর যুদ্ধবন্দীদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার করার জন্য তৎকালীন সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ প্রণয়ন করে। এটি সামরিক বাহিনীর সদস্য যারা যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক আইন।

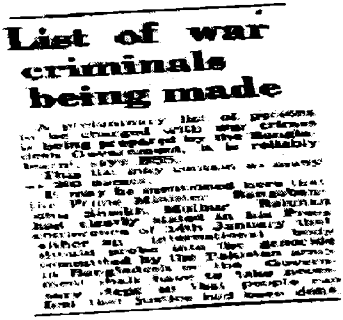
List of war criminals being made

Banglasedh Observer/ 15.01.1972

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য ও তাদের সহায়ক বাহিনীর[৫২৭] যুদ্ধবন্দীদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার করার জন্য তৎকালীন সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ প্রণয়ন করে।[৫২৮] এটি সামরিক বাহিনীর সদস্য যারা যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক আইন।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যে সকল অফিসার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর আক্রমণ, মানুষ হত্যা, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন অপরাধ করে এ আইন অনুসারে তাদের মধ্যে প্রাথমিক ভাবে ১০১৫ মতান্তরে ১৫০০ জনের একটি তালিকা যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে সে সংখ্যা কমিয়ে ১৯৫ জনের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।[৫২৯]

যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা

১৯৭৩ সনের International Crimes (Tribunals) Act অনুযায়ী কেবল সামরিক বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী বা সহায়তা বাহিনীর সদস্যগণকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেখানে কোন বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কাউকে যুদ্ধাপরাধী গণ্য করা হয়নি। সংগায় বলা হয়-

"A tribunal shall have the power to try and punish any person irrespective of his nationality, who being a member of any armed forces, defence or auxiliary forces commits or has committed, in

---

৫২৭ EPR/ EPCAF, Coastal Guards, Paramilitary forces of West Pakistan

৫২৮ পরিশিষ্ট: ১৫

৫২৯ পরিশিষ্ট ঃ ১৬

www.pathagar.com

the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this act, any of the following crimes

- Crimes against Humanity
- Crimes against Peace
- Genocide
- War Crimes

(কোনো ব্যক্তি তিনি যে দেশেরই নাগরিক হন না কেন যিনি কোনো সশস্ত্র, প্রতিরক্ষা কিংবা সহায়ক দল বা বাহিনীর সদস্য হয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অত্র আইন কার্যকর হবার পূর্বে কিংবা পরে যাই হউক না কেন নিম্নবর্ণিত যে কোনো অপরাধ করলে কিংবা করে থাকলে তার বিচার করবার ও শাস্তি দে'য়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের আছে।

- মানবতা বিরোধী অপরাধ
- শান্তির বিরুদ্ধ অপরাধ
- গণহত্যা
- যুদ্ধাপরাধ)

সরকার ১৯৭৩ সনে ১৭ এপ্রিল এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংজ্ঞানুযায়ী সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা ও করণীয় নির্ধারণ করে।

Press release of the Government of Bangladesh on war crimes trial (17April 1973)[৫৩০]

Investigations into the crimes committed by Pakistani occupation forces and their auxiliaries are almost complete. Upon the evidence, it has been decided to try 195 of serious crimes, which include genocide, war crimes, crimes against humanity and breaches of article 3 of the Geneva conventions, murder, rape and arson.

Trial shall be held in Dacca before a special tribunal, consisting of judges having status of the Supreme Court.

The trial will be held in accordance with universally recognized judicial norms, eminent international jurists shall be

---

[৫৩০] The weaknesses in the international protection of minority rights, Javaid Rehman, Kluwer Law International Appendix-F; p-261

www.pathagar.com

invited to observe the trials. The accused will be afforded facilities to arrange for their defence and to engage counsel of their choice including foreign counsel.

A comprehensive law providing for the constitution of the tribunal, the procedure to be adopted and other necessary materials is expected to be passed this month. The accused are expected to produce before the tribunal by the end of May 1973

(পাকিস্তানী দখরদার বাহিনী এবং তাদের সাহায্যকারীদের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত অপরাধের তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে। সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টে এবং মারাত্মক অপরাধ যেমন-জেনোসাইড, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩-এর লংঘন, খুন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগমূলক অপরাধের জন্য ১৯৫ জনের বিচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ঢাকার বিশেষ ট্রাইবুন্যালে এর বিচার হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের মর্যাদা সম্পন্ন বিচারকের অধীনে এই বিচার অনুষ্ঠিত হবে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিচারিক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এই বিচারকাজ সম্পন্ন হবে এবং বিচারটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত বিচারকদের এই বিচারে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অভিযুক্তদেরকে তাদের পছন্দানুযায়ী তাদের পক্ষের বিদেশী উকিলসহ কুশলী নিয়ুক্তিতে সহায়তা করা হবে।

এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠাকালে প্রয়োজনীয় আইন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতির ব্যবস্থা চলতি মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। অভিযুক্তকে ১৯৭৩ সনের মে মাসের শেষ নাগাদ ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করানো হবে।)

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি কেন

তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে অক্টোবর ১৯৭১ ভারতের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত ০৭ (সাত) দফা চুক্তির ২য় দফায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ন্যস্ত রাখার শর্ত ছিল। সে কারণেই পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর পরিবর্তে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ড প্রধানের নিকট আত্মসমর্পণের সুযোগ পায়। বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ইতিহাসের গৌরবোজ্জল মূহুর্তে নেতৃত্বের যথাযথ স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়। মুক্তিবাহিনী কমান্ডের অন্যতম উপ-প্রধান তদানীন্তন এয়ার কমোডর (পরবর্তীতে এয়ার ভাইস মার্শাল) এ কে খন্দকার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে দর্শক কাতারে উপস্থিত ছিলেন মাত্র।[৫৩১]

---

[৫৩১] তিনি বেসামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। ছবি পৃষ্ঠা নং ৭৯ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

কলাবরেটর বেসামরিক ব্যক্তিগণ ছাড়া আত্মসমর্পণকৃত পাকিস্তানের নিয়মিত বাহিনী ও সকল সহযোগী বাহিনীর সদস্যগণ যুদ্ধবন্দী হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং তাদেরকে বন্দী অবস্থায় ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারত পুরো বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণহীন মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট (যাদের হাতে ছিল অস্ত্র, ছিল পাকবাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভ) ছেড়ে দিতে চায়নি।[৫৩২] এ ক্ষোভ যাতে নিয়ন্ত্রণহীন পর্যায়ে না যায়, সে সতর্কতা থেকেই ভারত আত্মসমর্পণকৃত সকলকে ভারতের মাটিতে স্থানান্তর করে ।

যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ভারত বিষয়টি আরো দুরদর্শিতার সঙ্গে পরিচালনা করে। বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সে যুক্তরাষ্ট্রকে চির বৈরী করে রাখার পক্ষপাতি ছিল না। তাই ভারত পাকিস্তানে সঙ্গে ১৯৭৪ সনে সিমলা চুক্তি[৫৩৩] করে দু'দেশের বৈরীতাকে প্রশমিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তাছাড়া "ভারতের প্রফেশনাল সামরিক বাহিনী ছিল পাকিস্তানী প্রফেশনাল সামরিক বাহিনীর স্বদেশ প্রত্যার্পণের পক্ষে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাংলাদেশের দাবী তাদের কাছে একটি গৌণ বিষয় ছিল। ১৯৭৩ সনের পররাষ্ট্র সচিব এনায়েত করিম দিল্লীতে সফরে গেলে সি এন হাসকার জানান - কোন পেশাদার আর্মি অপর পেশাদার আর্মির বিচার আশা করে না -- ভারতের সেনাবাহিনী এই যুক্তিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়না।"[৫৩৪]

ভারতের চাপে যুদ্ধাপরাধী তালিকা ছোট হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫ জনকে চিহ্নিত করে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর সংখ্যা ১৪১ জনে নির্ধারণ করে পুনরায় গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ডাঃ এম এ হাসান উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধাপরাধী তালিকা ছোট হতে হতে ১১৮ জনে দাড়ায়।[৫৩৫] যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে সে সময় বাংলাদেশের কোন মানুষের দ্বিমত বা আপত্তি ছিল না। কিন্তু যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে ভারতীয় সামরিক কমান্ডারদের নেতিবাচক মনোভাব, পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধবন্দী বিনিময়, পাকিস্তানে আটকে পড়া ৩ (তিন) লক্ষ বাংলাদেশীর প্রত্যাগমন ইস্যু, মুসলিমবিশ্বসহ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের চাপে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দেয়া

---

৫৩২ "Mukti Bahini Guerrillas have threatened to attack the Red Cross-protected Inter-continental Hotel, unless the former Governor of East Pakistan. Dr. A. M. Malik who is sheltering there, is handed over to them as a war criminal. For the moment, the Indian Army has talked the guerrillas out of attacking, but the situation is highly charged. The Red Cross and the Mukti Bahini were in desperate conference this afternoon. The young Mukti Bahini leaders say they have no control over their followers now." The Guardian, December 18, 1971.

৫৩৩ পরিশিষ্ট: ১৭

৫৩৪ দৈনিক ইত্তেফাক; তারিখ: ০৬.১১.২০০৭

৫৩৫ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ, ডাঃ এম এ হাসান; পৃ: ৭০৯

www.pathagar.com

হয়। ১৯৭৪ সনে ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ২য় দফা অনুসারে "in the larger interests of recociliation, peace and stability in the sub-continent" সিদ্ধান্ত হয় "the 195 persons of the war may be repatriated to Pakistan along with other persons of the war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement", অর্থাৎ শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তাঁরই অনুমোদনক্রমে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৭১ সনের যুদ্ধাপরাধ ইস্যু ও আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর কার্যকারিতার অবসান ঘটে। ভবিষ্যতে যদি genocide, war crimes, crimes against humanity ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হয়, তা হলে যাতে বিচার করা যায়, সে জন্য এ আইনটি কখনই বাতিল করা হয়নি।

১৯৭৪ সনের ত্রিদেশীয় চুক্তি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক এ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, নৃশংস হত্যাকান্ড, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী ইত্যাদি অপরাধ করার কারণে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে অল্প সময়ে বিচার করে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ জারী করা হয়। ১৯৭২ সনের ০২ জুলাই তারিখে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শিমলা চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সকল ধরণের সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ য়ো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সনে ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ১৩, ১৫ ও ১৬ ধারা অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীসহ সকল যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানের সকল যুদ্ধবন্দীকে ভারত ছেড়ে দিলে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর কার্যকারিতার অবসান ঘটে ।

স্বাধীনতা বিরোধী ঃ কলাবরেটর

কলাবরেটর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ শীর্ষক আইন অনুযায়ী কলাবরেটর হিসেবে ঐ সকল ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যারা–

১. বাংলাদেশে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর দখলদারিত্বকে শক্তিশালী করা, টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজে সমর্থন দিয়েছে বা সহায়তা করেছে।

২. দখলকারী পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীকে মৌখিক বা অন্য কোন ভাবে বাস্ত ব সহায়তা প্রদান করেছে।

৩. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বা যুদ্ধে লিপ্ত হতে সহায়তা করেছে।

www.pathagar.com

৪. পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জনগণ ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন সহায়তা করেছে বা ক্ষতিকর কাজ করেছে।

৫. দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর দখলদারিত্বকে আরো দীর্ঘায়িত করা বা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনসমক্ষে কোন বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া বা কোন অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে বা পরিকল্পিত উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে।

কলাবরেটরদের শ্রেণী বিন্যাস

২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখ হতে আমাদের দেশ স্বাধীন; আর এ কারণেই পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ছিল দখলদার বাহিনী, পাকিস্তান সরকার ছিল অবৈধ সরকার। এ অবৈধ সরকারকে বাংলাদেশের (২৬ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর) অভ্যন্তরে বা বাইরে যারা সহযোগিতা প্রদান করে তাদের দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছেন তারা পরবর্তীতে কলাবরেটর বা দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ কলাবরেটরবা মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী বিভিন্ন stakeholder এর মধ্যে একটি stakeholder। এরা বিভিন্ন পেশা বা শ্রেণীর মানুষ ছিলেন যাদের বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

কলাবরেটরদের বিচার ও সাধারণ ক্ষমা

পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক এ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, নৃশংস হত্যাকান্ড, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ইত্যাদি কাজে সহায়তাকারী বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বিচার করার জন্য ২৪ জানুয়ারী ১৯৭২ Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Orber 1972 জারী করা হয়। এ আইনের আওতায় প্রায় ৪২,০০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[৫৩৬] ১৯৭২ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীদের জন্য শেখ মুজিব দু'দফায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। প্রথম দফায় ১৬ মে, ১৯৭৩ এবং দ্বিতীয় দফায় ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩। প্রথম দফার সাধারণ ক্ষমা সকলের নিকট আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি, কারণ আইনের অধিকাংশ ধারাগুলোকে বলবৎ রাখা হয়। দণ্ডবিধির ১২১, ১২৪, ৩০২, ৩০৪, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭৬, ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪৩৫, ৪৩৬ ও ৪৩৮ ধারাসমূহ বলবৎ থাকায় এ দফার সাধারণ ক্ষমার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে এর আওতায় খুব কম মানুষই ক্ষমা লাভ করেন। দ্বিতীয় দফার সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন জাতীয় জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, কারণ এ দফায় সাধারণ ক্ষমার পরিধি বাড়ানো হয়। এবং এ সুযোগে বিপুল সংখ্যক মানুষ জেল থেকে বেরিয়ে আসে।

---

[৫৩৬] After The Dark Night, Problems of Skeikh Mujibur Rahman; S M Ali ; p:32 (UPL,1994)

www.pathagar.com

প্রথম দফায় "১৬ মে, ১৯৭৩ দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর লোকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।"[৫৩৭] শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি খাজা খায়ের উদ্দিন এবং খান এ সবুর এ সময় মুক্ত হন[৫৩৮] যদিও অন্য মামলায় তাদেরকে পুনরায় বন্দী করা হয়। তা ছাড়া প্রায় ৪,৫০০ জন যোগসাজশকারীকে এ সময় মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সনে ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর কার্যকারিতার অবসান ঘটায় । মূল অপরাধীদের বিচার করা সম্ভব না হওয়াতে সহযোগী রাজাকার-আল্ বদর-আল্ শামস, শান্তি কমিটির সদস্যদের বিচারের জন্য গঠিত কলাবরেটর আদেশ বাতিল করার জন্য জনমত গড়ে উঠে। আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'ইত্তেফাক' এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, কবি শামসুর রাহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দৈনিক বাংলা'ও এ ব্যাপারে জনমত তৈরীতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয় দফায় ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা[৫৩৯] ঘোষণা করলে তা সকল মহল কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। এ বারের সাধারণ ক্ষমার আওতায় ৩৭৪৭১ জন বন্দীর মধ্যে ২৬৪০০ জন মুক্তি লাভ করেন। সে সময় ৭৩ (তেহাত্তর) টি স্পেশাল ট্রাইবুনালে ১১০০০ জন আসামীর বিচার হয়, যার মধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদন্ডসহ ৭৫২ জনের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি হয়; বাকীরা বেকসুর খালাস পান। যারা হাজতে বন্দী ছিল না তাদেরকে নিকটস্থ মহকুমা হাকীমের নিকট আত্মসমর্পণ করে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিতে বলা হয়েছে। যাদেরকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় নেওয়া বা মুক্তি দেয়া হয়নি তাদের বিরুদ্ধে চার ধরনের অপরাধের অভিযোগ ছিল–

ক্রমিক	অভিযোগের ধরণ	দণ্ডবিধির ধারা
১	খুন , হত্যা	দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩০৪ ধারা
২	ধর্ষণ	দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা
৩	ঘর ও নৌযান জ্বালানো	দণ্ডবিধির ৪৩৬ ও ৪৪৮ ধারা
৪	গুলি ও বিস্ফোরক ব্যবহার করে ক্ষতি সাধন	দণ্ডবিধির ৪৩৫ ধারা

সাধারণ ক্ষমার প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবার ছিল যৌথ পরিবার কাঠামোতে বিন্যস্ত। স্বাধীনতার পর পরই মুক্তিযোদ্ধারা উপলব্ধি করতে পারেন যে তাদের পরিবারের কোন না কোন সদস্য স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে সক্রিয় ছিলেন। যখন

---

৫৩৭ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ, ডাঃ এম এ হাসান; পৃ: ৭১১

৫৩৮ প্রচারিত আছে যে, খান এ সবুরকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে শেখ মুজিব নিজ বাসায় একত্রে খিচুড়ি খেয়েছিলেন। সূত্র: www.omipial.amarblog.com accessed on 29.09.2010

৫৩৯ সাধারণ ক্ষমার পরিপত্র, ড. সাইদুর রহমানের ১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল; পৃ: ১৮০-১৮১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমলাদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করেন। দেশের বাইরের শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বিদেশী আইনজীবী জেরার্ড নিরেনবার্গের[৫৪২] সঙ্গে আলোচনা কলাবরেটর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ এর আওতায় আটককৃতদের সাধারণ ক্ষমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রেরণা যোগায়।

৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ সাধারণ ক্ষমা (দ্বিতীয় দফা) ঘোষণার প্রেস নোট ইস্যু হয়। দন্ডবিধির ৩০২, ৩০৪, ৩৭৬, ৪৩৫, ৪৩৬ ও ৪৪৮ ধারা যথাক্রমে হত্যা, অপরাধজনক প্রাণনাশ, ধর্ষণ, গুলি অথবা বিস্ফোরক ব্যবহার করে ক্ষতিসাধন, ঘর জ্বালানো এবং নৌযানে আগুন বা বিস্ফোরণ ইত্যাদির অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ছাড়া সকলকেই ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করা হয়।

জেলে যারা আছেন তারা তো মুক্তি পাবেনই তা ছাড়া কলাবরেটর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ বলে আরও যে সব গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া, সমন, তদন্ত-তল্লাশী, ও সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ জারী করা আছে সব বাতিল হবে। এক কথায় হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ এর পেন্ডিং কেসগুলির প্রয়োজন ছাড়া কলাবরেটর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ এর কোন প্রয়োজন নেই। ঐ কেসগুলির নিস্পত্তি হলে এই আইনেরও সমাপ্তি ও আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটবে এটা ধরে নেয়া যেতে পারে।[৫৪৩]

[redacted] চৌধুরী দাবী করেন সাধারণ ক্ষমার বিষয়ে শেখ মুজিব তার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং প্রেসনোটের খসড়াসহ ১৯৭৩ সনের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের বক্তৃতার খসড়া তৈরী করে দেয়ার জন্য শেখ মুজিব তাকে ডেকে পাঠান। তিনি বলেন–

"১৯৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসে বিজয় দিবসের আগে বঙ্গবন্ধু আমাকে কলকাতা থেকে ডেকে পাঠান। তিনি তখনও পুরনো গণভবনে (পাকিস্তানী আমলের প্রেসিডেন্ট হাউস) অফিস করছেন। ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে গেলাম গণভবনে। তার প্রেস সেক্রেটারি তোয়াব খান (তখন ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর গণসংযোগ অফিসার) আমাকে নিয়ে গেলেন তার অফিস কক্ষে। কয়েকজন মন্ত্রী তখন সেখানে উপস্থিত। তিনি আমাকে একান্তে ডেকে নিলেন। বললেন, এখনি একটা সরকারি ঘোষণার খসড়া তোমাকে লিখতে হবে। পাকিস্তানীদের মধ্যে কোলাবরেটর হিসেবে যারা দন্ডিত ও অভিযুক্ত হয়েছেন, সকলের জন্যেও ঢালাও ক্ষমা (জেনারেল এ্যামনেস্টি) ঘোষণা করতে যাচ্ছি।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, পালের গোদাদেরও ছেড়ে দেবেন?

---

৫৪২ আমাদের সময়; তারিখ: ২৫.১২.২০১০

৫৪৩ দৈনিক ইত্তেফাকের ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩ এর সম্পাদকীয়

www.pathagar.com

তিনি বললেন, হ্যাঁ। সকলকে। কেবল যাদের বিরুদ্ধে খুন, রাহাজানি, ঘরে আগুন দেয়া, নারী-হরণ বা ধর্ষণ প্রভৃতির অভিযোগ রয়েছে, তারা ছাড়া পাবেন না। কেন, ঢালাও ক্ষমায় তোমার মত নেই?

বললাম, না, নেই। পাকিস্তানীদের অত্যাচারে সাহায্য যোগানের অভিযোগে যে হাজার হাজার লোক বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে, তাদের প্রতি আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আপত্তি নেই। তাদের অনেকেই নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাহায্য জোগাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পালের গোদাদের আপনি ক্ষমা করবেন না। এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু। এদের বিচার হওয়া দরকার।

মুজিব হেসে বললেন, না তা হয় না। সকলকেই ছেড়ে দিতে হবে। আমার এ আসনে বসলে তোমাকেও তাই করতে হত। আমিতো চেয়েছিলাম নব্বই হাজার পাকিস্তানী সৈন্যদের ছেড়ে দিয়ে অন্তত ১৯২ জন যুদ্ধাপরাধী অফিসারের[৫৪৪] বিচার করতে। তাও পেরেছি কি?[৫৪৫] আমি ছোট্ট অনুন্নত দেশের নেতা। চারিদিকে উন্নত ও বড় শক্তির চাপ। ইচ্ছা থাকলেই কি আর সব কাজ করা যায়?

চাপ কথাটার উপর তিনি জোর দিলেন। কিন্তু আর ব্যাখ্যা করতে চাইলেন না। প্রসংগ পাল্টিয়ে বললেন, আসলে তোমাকে ডেকেছি আমার বিজয় দিবসের ভাষণ লিখে দিতে। যাও তোয়াবের ঘরে গিয়ে ঢালাও ক্ষমা ঘোষণার খসড়াটিও লিখে ফেল।

বললাম, বঙ্গবন্ধু, আমাকে মাফ করুন, ক্ষমা ঘোষণার খসড়া আমি লিখতে পারবো না। শেখ মুজিব ম্লান হাসলেন। কোন কথা বললেন না।

তোয়াব আগেই খসড়া তৈরী করেছিলেন। সেটাকেই কেটে ছেটে দাঁড় করিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিয়েছি।"[৫৪৬]

প্রেস নোট

১ ডিসেম্বর ১৯৭৩ বড় বড় হরফে তৎকালীন সকল পত্রিকায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সংবাদ এবং প্রেসনোটটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ কলাবরেটর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ এর আওতায় যারা আটক হয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা অথবা হুলিয়া রয়েছে এবং যারা এই আইনে সাজা ভোগ করছেন তাদের সকলের প্রতি এই সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে এবং তারা অবিলম্বে মুক্তি লাভ করবেন। তবে নরহত্যা, নারী ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ অথবা

---

৫৪৪ তালিকায় ২০৯ জন যুদ্ধাপরাধী অফিসারের নাম রয়েছে।

৫৪৫ আব্দুল গাফফার চৌধুরীর যদি কোন ভূমিকা থাকে তা হলেও স্মৃতিভ্রমজনিত কারণে তিনি অন্ততঃ দু'টি ভুল করেছেন; আর যদি তার কোন ভূমিকা না থাকে তা হলে নিজের সংশ্লিষ্টতা জাহির করার জন্য লিখেছেন। তার ভুল দু'টি হচ্ছে (১) ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ সনে সাধারণ ক্ষমার প্রেসনোট ইস্যু করা হয় সেখানে তাকে ডিসেম্বরে ডাকার কথা লিখেছেন; এবং (২) ১৯৭৪ সনের ৯ এপ্রিল পাকিস্তানী সৈন্যদের ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে সেক্ষেত্রে ডিসেম্বর '৭৩ এ শেখ মুজিবের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৫৪৬ ইতিহাসের রক্তপলাশ ১৫ই আগস্ট, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী; পৃঃ ১৩

www.pathagar.com

বিস্ফোরকের সাহায্যে ঘরবাড়ি ধ্বংসের অভিযোগে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না।

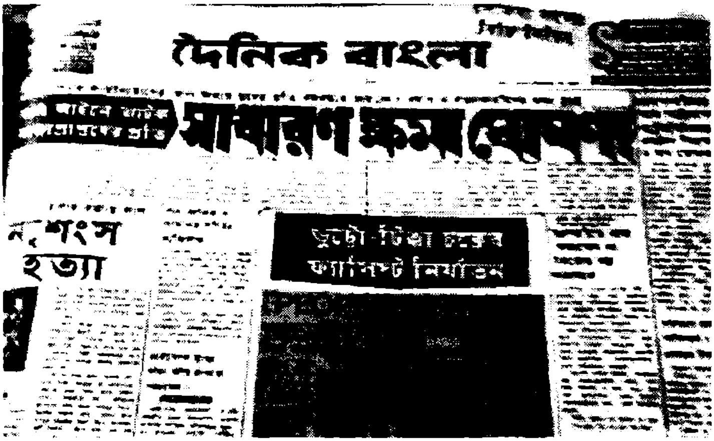

দৈনিক বাংলা

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

নৃশংস হত্যা

ভুট্টো-টিক্কা চক্রের ফ্যাসিস্ট নির্যাতন

দ্বিতীয় দফায় সাধারণ ক্ষমাঃ যারা মুক্ত হন

সাধারণ ক্ষমার আওতায় ৩৭৪৭১ জন বন্দীর মধ্যে ২৬৪০০ জন মুক্তি লাভ করেন। সে সময় ৭৩ (তেহাত্তর) টি স্পেশাল ট্রাইবুনালে ১১০০০ জন আসামীর বিচার হয়, যার মধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদন্ডসহ ৭৫২ জনের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি হয়; বাকীরা বেকসুর খালাস পান। যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর ডাঃ এম এ মালেক ও তার মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সে সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি পেয়েছেন তাদের কয়েকজনের নাম ---

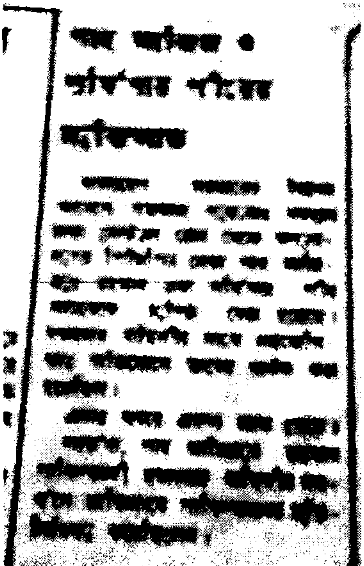

www.pathagar.com

ক্রমিক	নাম	পরিচয়
১	ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক	পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর
২	আবুল কাশেম	ডাঃ মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য
৩	ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	ঐ
৪	শামসুল হক	ঐ
৫	এ এস এম সোলায়মান	ঐ
৬	নওয়াজেশ আহমেদ	ঐ
৭	আখতার উদ্দিন আহমেদ	ঐ
৮	মাওলানা মোঃ ইসহাক	ঐ
৯	মজিবুর রহমান	ঐ
১০	জসিমুদ্দীন আহমেদ	ঐ
১১	এ কে মোশাররফ হোসেন	ঐ
১২	এ কে এম ইউসুফ	ঐ
১৩	আব্বাস আলী খান	ঐ
১৪	আউং শু-প্রু চৌধুরী	ঐ
১৫	শাহ্ আজিজুর রহমান	রাজনীতিবিদ
১৬	খান এ সবুর	রাজনীতিবিদ
১৭	ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ	শিক্ষাবিদ
১৮	ডঃ হাসান জামান	শিক্ষাবিদ
১৯	ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন	শিক্ষাবিদ
২০	ডঃ মোহর আলী	শিক্ষাবিদ
২১	মাওলানা আব্দুল মান্নান	আলেম
২২	মাওলানা মহিউদ্দিন খান	আলেম
২৩	শর্ষিনার পীর	আলেম

সাধারণ ক্ষমা অভিনন্দিত

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সে সময়ে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়। আওয়ামী লীগের সকল নেতা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এমনকি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ পর্যন্ত শেখ মুজিবের এ পদক্ষেপকে

www.pathagar.com

অভিনন্দন জানায়। যারা তখন মুক্ত হন তারাও অভিনন্দন জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় ও উপ সম্পাদকীয় লিখে এ স্টেট্‌স্‌ম্যানশিপ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করে।

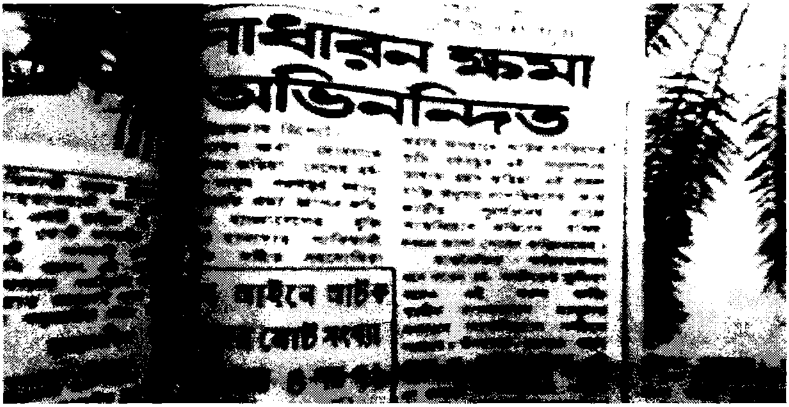
াধারন ক্ষমা
অভিনন্দিত
আইনে আটক

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা প্রতিবেদন : দৈনিক বাংলা; ১ ডিসেম্বর ১৯৭৩

শিরোনাম : দালাল আইনে আটক সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

উপ-শিরোনাম : দেশের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বান : ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের ক্ষমা নেই

সরকার বাংলাদেশ দালাল আইনে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২ বলে যারা আটক হয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা অথবা হুলিয়া রয়েছে এবং যারা এই আইনে সাজা ভোগ করছেন তাদের সকলের প্রতি এই সাধারণ ক্ষমা প্রযুক্ত হবে এবং তারা অবিলম্বে মুক্তি লাভ করবেন। তবে নরহত্যা, নারী ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরকের সাহায্যে ঘরবাড়ি ধ্বংসের অভিযোগে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সাধারণ ক্ষমা প্রযুক্ত হবে না। গতকাল শুক্রবার রাতে প্রকাশিত এক সরকারী প্রেসনোটে এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কথা প্রকাশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতরাতে বলেন, দলমত নির্বিশেষে সকলেই যাতে আমাদের মহান জাতীয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশ গড়ার শপথ নিতে পারে সরকার সেজন্য দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ দালাল

www.pathagar.com

অধ্যাদেশে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যাতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর অনতিবিলম্বে জেল থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে এবং আসন্ন ১৬ ডিসেম্বর বিজয় উৎসবে যোগ দিতে পারেন বঙ্গবন্ধু সেজন্য তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করার জন্যে স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ ক্ষমায় যারা মুক্তি পাবেন তাদের বিজয় দিবসের উৎসবে একাত্ম হতে এবং দেশ গঠনের পবিত্র দায়িত্ব ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার শপথ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তার সরকারের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, মুক্ত হয়ে দেশগঠনের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ তারা গ্রহণ করবেন এবং তাদের অতীতের সকল তৎপরতা ও কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন তিনি এটাই কামনা করেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বহু রক্ত, ত্যাগ, তিতিক্ষা আর চোখের পানির বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। যে কোন মূল্যে এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। তিনি আশা করেন যে এবারের বিজয় দিবস বাঙালীর ঘরে ঘরে সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিছু লোক দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন। পরে বাংলাদেশ দালাল আদেশ বলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই পরিচিত ব্যক্তি। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় দখলদার বাহিনীর সঙ্গে তাদের সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশের মানুষ এর জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা নেমে এসেছিল।

বঙ্গবন্ধু বলেন এসব লোক দীর্ঘদিন আটক রয়েছেন। তিনি মনে করেন এতদিনে তারা নিশ্চয়ই গভীরভাবে অনুতপ্ত। তারা নিশ্চয়ই তাদের অতীতের কার্যকলাপের অনুশোচনায় রয়েছেন। তিনি আশা করেন তারা মুক্তিলাভের পর তাদের সকল অতীত কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে দেশ গঠনের নতুন শপথ নিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। গতকাল স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে নিম্নোক্ত প্রেসনোটটি ইস্যু করা হয়।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্ত ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩ দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়

তওবার দরোজা খোলা

বহু প্রত্যাশিত সাধারণ অনুকম্পা ঘোষিত হয়েছে। নরহত্যা, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া আর সবাই এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হিসাব অনুযায়ী ছত্রিশ-সাইত্রিশ হাজার লোক এই অনুকম্পার ফলে কারাগার হতে মুক্তি লাভ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর

www.pathagar.com

এই নির্দেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কারাগার হতে বন্দী মুক্তি দ্রুততার সাথে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে মুক্তিলাভ করেছেন। আগামী ১৬ ডিসেম্বর এর বিজয় দিবসে যাতে তারা সবাই গোটা জাতির সাথে একাত্ম হয়ে দেশ গঠন এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার স্বংকল্প গ্রহণ করতে পারে সেজন্য ১৫ ডিসেম্বর এর মধ্যে মুক্তি দান শেষ করতে হবে। জেলে যারা আছেন তারা তো মুক্তি পাবেনই তাছাড়া কোলাবোরেশন অর্ডার বলে আরও যে সব গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া, সমন, তদন্ত-তল্লাশী, ও সম্পত্তি ক্রোক এর আদেশ জারী করা আছে সব বাতিল করা হবে। এক কথায় হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ এর পেন্ডিং কেসগুলির প্রয়োজন ছাড়া কেলাবোরেশন আইনের কোন প্রয়োজন নেই। ঐ কেসগুলির নিষ্পত্তি হলে এই আইনেরও সমাপ্তি ও আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটবে এটা ধরে নেয়া যেতে পারে। সরকার এর আগেও দুবার ক্ষমা ঘোষণা করেছিল। একবার গত মে মাসে আরেকবার অক্টোবর এর শেষ ভাগে ঈদের প্রাক্কালে। কিন্তু সেই দুবারের এ্যামনেষ্টি ক্ষমাশীল হৃদয়ের ও ঔদার্যের পরিচায়ক হলেও তার স্কোপ বা পরিধি ছিল সীমিত। এবারের এ্যামনেষ্টির পিছনে যে উদার মন ও মানসিকতা বিদ্যমান পূর্বের দুবারের ক্ষমার পিছনেও নিঃসন্দেহে সেই একই মন ও মানসিকতা কাজ করেছে। কিন্তু তবু কেন যেন কিসের একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব পিছন হতে বারবার রশি টানছে, তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে দেয়নি। প্রকৃত অর্থে এবারেরটাই সাধারণ ক্ষমা এবং তাই এই ব্যাপক অনুকম্পা কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রদর্শিত হলেও এটা সারা দেশে সাধারণভাবে ও সামগ্রিকভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এটা শুধু বঙ্গবন্ধুর ঔদার্যই নয় তার স্টেটসম্যানশিপ এরও পরিচয় বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, "Grass don't grow under gallows, but grows then on a battle field"– ফাঁসির মঞ্চে কখনো দুর্বাদল জন্মায় না, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর রণক্ষেত্র আবার সবুজ হয়ে উঠে। কথাটার অর্থ এই যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এখন আর হিংসা দ্বেষ আক্রোশ ও প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না বরং অহিংস ও আক্রোশহীন মনোভাব গ্রহণ করে সকলে দেশ গঠনের কাজ করতে হবে। এটি একজন মহান স্টেটসম্যান এর কথা বটে। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা সংক্রান্ত বাণীর প্রতিটি ছত্রে দূরদর্শীতা ফুটে উঠেছে। যাদের মুক্তি দেয়া হলো তাদের পূর্বেকার ভূমিকা সম্পর্কে বলা হলে অনেক কথাই বলা যেত। ভোগালে আরও অনেক ভোগানো যেত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা না করে তাদের স্বাধীনতার সুফল ভোগ করবার জন্য সুযোগ করে দিলেন। অতীত ভুলে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি তাদের আহ্বান জানান। সকল বাঙালীর ঘরে ঘরে শান্তি সমৃদ্ধি ও পরিতৃপ্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হোক এই প্রার্থনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর এই বাণী ও ঘোষণার প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান সাবেক গর্ভর্নর ডা.মালেক ও তার তৎকালীন মন্ত্রীসভার সদস্যগণ এবং কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজনীতিক,

www.pathagar.com

শিক্ষাবিদসহ ৩৬,৪০০ জন বন্দী মুক্তি লাভ করবেন। মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাদের সকল সম্পত্তি ফেরত পাবেন। এবং দেশের নাগরিকরা যা কিছু সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে থাকেন তার সব কিছু ভোগ করবেন। বস্তুত: এর নাম জেনারেল এ্যামনেষ্টি বা সাধারণ ক্ষমা এবং এরই নাম মহানুভবতা। এই ক্ষমার পিছনে রিজার্ভেশন নাই। যা দেয়া হয়েছে সর্বাংশে দেয়া হয়েছে । বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বহু নেতা ও চিন্তাবিদ এই ধরনের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপই আশা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেই আশা পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি তাই সকল মহলের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন। এটা তার প্রাপ্য। মুক্তিযুদ্ধ যে কোন যুদ্ধের ন্যায়ই একটা যুদ্ধ। বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামীদের জয় ও বাংলার বিমুক্তির মধ্যে দিয়ে সেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধবন্দীরা খালাস পেয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানীরা ও পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন চলছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে মি. ভুট্টো অহেতুক গড়িমসি না করলে সবকিছু আরও সহজ হয়ে আসত। এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির কবল হতে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সে সব দেশের উপর বর্বর নিপীড়ন চালিয়েছে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি স্বাধীন ও বিমুক্ত দেশগুলির সাথে সাবেক ইম্পেরিয়াল পাওয়ারসমূহের যুদ্ধোত্তর সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠতে দেরী হয়। এবং হল্যান্ডের সাথে ইন্দোনেশিয়ার নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ হতে পারে। এই নজির বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে না খাটলেও অনেক পরিমাণেই খাটে। মি.ভুট্টো স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিলে এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ইতিমধ্যে অনেকটা সহজ হয়ে উঠত এবং উপমহাদেশে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন হতো। কিন্তু সহজ স্বাভাবিক বাস্তবতার পথে চলা যেন মি.ভুট্টোর ধাতে নেই। তার তথাকথিত মুসলিম বাংলা জিগির একশ্রেণীর সাবোটিয়ার এর প্রতি তার ও তার ভিন্নদেশীয় বন্ধুদের বর্ণিত সমর্থন এবং বাংলাদেশ বিরোধী ইসলামবাদী প্রচার প্রোপাগান্ডা ও কুটিল কূটনৈতিক কার্যকলাপ যদি উল্লেখিত বন্দীদের মুক্তিদানের প্রশ্নে সরকারকে ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত ও তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বিত করে আটককালীন দুর্ভোগকেই দীর্ঘায়িত করে থাকে তবে তাকে একেবারে অস্বাভাবিক বলা যায় কি? ভুট্টো সাহেবের কথা ইসলামাবাদের কথা থাক। বন্দী মুক্তির কথায় ফিরে আসি। মুক্তিযুদ্ধকালে কার ভূমিকা কি ছিল সে বিচার পরিহার করে আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ মার্জনা ঘোষণা করেছেন। যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীগণকে সহ প্রায় সাইত্রিশ হাজার বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়েছে। তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও পূর্ব নাগরিক অধিকার ফেরৎ দিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন নজীর নেই একথা বলি না। কিন্তু থাকলেও খুব বেশী নয়। এখন যারা কারাগার থেকে মুক্ত আলো বাতাস এ ফিরে আসেন তাদের সৎ নাগরিকসুলভ দায়িত্ব পালনের পালা। বঙ্গবন্ধু আশা প্রকাশ করেছেন, তারা তাদের অতীত ভুলে গিয়ে দেশ পুনর্গঠনের নতুন

www.pathagar.com

সুযোগ গ্রহণ করে দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল ঐতিহ্য স্থাপন করবেন। আমরাও আশা করি অচিরেই তারা প্রমাণ করবেন যে এই আস্থা বিশ্বাস অপাত্রে দান হয়নি। সেই মূল্যবান কথাটা আবার মনে পড়ে একদা কে কি বিশ্বাস করতেন তার জন্যই বরাবর ক্রিমিনাল বলে চিহ্নিত হতে পারেনা। বরঞ্চ সেই ব্যক্তি অতীতের বিশ্বাস মন থেকে মুছে ফেলে বাস্তবতাকে ঐকান্তিকভাবে মেনে নিলে দেশ ও জাতির জন্য অকৃত্রিম সেবা দ্বারা অনেক দেশপ্রেমিক এর চেয়েও বড় দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব। যারা মুক্তিলাভ করেছেন তাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ রয়েছেন এমনকি মরহুম শহীদ সাহেবেরও এককালের কতিপয় ঘনিষ্ঠ অনুগামী আছেন। তাদের মধ্যে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ আছেন, বিত্তশালী, ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোগী আছেন। আরও আছেন এমন অনেক প্রবীণ লোক যাদের নিজ নিজ এলাকায় প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং সম্ভবত এখনও আছে। আজ দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রেই নয়, মনীষা, প্রজ্ঞা, প্রশাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, স্থানীয় নেতৃত্ব সকল ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর শূণ্যতা দেখা দিয়েছে। সমাজ বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির আজকের কর্ম ও ধ্যান ধারণার যা মেনস্ট্রিম বা মূলস্রোত তার সাথে মনেপ্রাণে সম্পৃক্ত হয়ে এই কারামুক্ত ব্যক্তিগণ যদি তাদের প্রতিভা, প্রভাব, প্রতিপত্তি, অভিজ্ঞতা ও কর্মশক্তি কাজে লাগান তবে উপরোক্ত শূন্যতা অনেকখানি পূর্ণ হতে পারে। নব্য স্বাধীন সমস্যা সঙ্কটের ফাকে এক ধরনের উগ্র মতবাদ নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় লিপ্ত। যারা কারাগারে ছিলেন তারাও নিশ্চয়ই এই সর্বনাশা প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হয়েছেন। ইত্তেফাক দৃশ্যতঃ এদের লক্ষ্য করেই সম্পাদকীয় স্তম্ভে একাধিকবার লিখেছে যে কাটাটা পায়ে বিধে অবিরাম রক্ত ঝরাচ্ছে তাকে সমূলে উপড়ে ফেলাই আজকের কর্তব্য। তথাকথিত আলবদর কোলাবোরেটরদের পিছনে সময়ে ও উদ্যম নষ্ট করার সময় নেই। আজ নৈরাজ্যবাদের মোকাবিলায় আমাদের একত্রিত হতে হবে। যারা কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছে তাদের কাছেও ইত্তেফাক এর এই বক্তব্য এবং তাৎপর্য সুস্পষ্ট। অতএব আমরা আশা করি দূরদৃষ্টিসহকারে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে তারা বাঙালী জাতির ঐক্য ও বাংলার স্বাধীনতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য আপন আপন দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। কে কবে কি চিন্তা করতেন সেটা আজ বড় কথা নয়। আজকের বাঙালী জাতির চিন্তাস্রোত এ নিজেকে মিলাতে হবে। প্রগতিপন্থী দেশদরদী শক্তির সাথে একাত্মভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে। উল্টামুখী স্রোতে চলার আর দিন নেই। রাজনীতির কথাও গৌণ। নৈরাজ্যের কবল হতে রক্ষা পেলে তো রাজনীতি। রাজ্যই যদি রক্ষা না হয় তবে রাজনীতি হবে কোথায়। আজকাল হারাধনের ছেলে খোকনেরা নাকি মুসলিম বাংলার ধ্বনি উঠিয়ে দুস্কর্ম করতে চলছে তা সরকারের ভাবতে হবে। অতীত বিস্মৃত হয়ে একযোগে দেশকে রক্ষা করতে হবে। এই মুসিবৎকে হাল্কা করে দেখার জো নেই। প্রসঙ্গতঃ আরেকটা

www.pathagar.com

কথা বলি। সরকারের সাধারণ অনুকম্পায় বেশ কিছু লোক ছাড়া পেল। এদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছেন যাদের সমকক্ষ লোক পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষাবিদদের মধ্যে এরূপ কারও নাম ইতোমধ্যে সংবাদপত্রে আলোচিত হয়েছে। এরা যদি সত্য সত্যই অনুতপ্ত হয়ে বাংলাদেশের সেবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন তবে এদের সেবা গ্রহণ করা যায় কিনা বিষয়টি কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখতে দোষ কি ? এই যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদের বেকার ও সমাজের গলগ্রহ করে রাখার মানে কী? মুক্তিযুদ্ধকালে যারা বিদেশে অবস্থান করায় ধরা পড়েনি কিন্তু নিন্দনীয় অবস্থার দরুণ নাগরিকত্ব বা পদ ও বিষয় সম্পত্তি হারিয়েছেন তারাও যদি অনুতপ্ত হয়ে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন তবে তাদের কেসসমূহ বাছাই করে অন্ততঃ কতিপয় ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করা যায় কিনা সরকার তা ভেবে দেখতে পারেন। অবশ্য এদের মধ্যে অনেকে আছেন যাদের বিষয় বিবেচনার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু কিছু কিছু কেস হয়ত পুনর্বিবেচনার যোগ্য হতে পারে। যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত সাবেক গভর্নর মন্ত্রীরাও যদি বঙ্গবন্ধুর অনুকম্পা পাইতে পারেন তবে কেন এদের সামনে তওবার দরোজা বন্ধ থাকবে? উপরোক্ত কেসগুলি সাধারণ অনুকম্পার অন্তর্ভূক্ত না করলে হয়ত কিঞ্চিৎ নীতিগত অসঙ্গতি থেকে যায়, ৮ নম্বর অর্ডার কার্যতঃ শেষ হয়ে যাবার পর ৯ নম্বর অর্ডার বহাল রাখা হয়। আরেকটা কথা। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে আমি যেটুকু বুঝেছি, বঙ্গবন্ধুর আলোচ্য মহানুভব কার্যের পিছনে মূল লক্ষ্য হলো জাতীয় ঐক্য সুসংহত করা। তিনি এক্ষেত্রে পার্টি লিডার হিসেবে নয়, গভর্নমেন্টের কর্ণধার হিসাবে নয়, রাষ্ট্রস্রষ্টা ও স্টেটসম্যান হিসেবে তার মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সেজন্যই আমি এ ক্ষেত্রে আমার পূর্বেকার একটি ক্ষুদ্র সাজেশনের পুনরাবৃত্তি করতে চাই। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তিনি সর্বদলীয় ও অ-দলীয় নেতৃবর্গের একটি সম্মেলন ডাকুন এবং কারামুক্ত বন্দীদের যেভাবে দেশ পুনর্গঠন ও স্বাধীনতা সংরক্ষণকার্যে সম্পৃক্ত হবার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন সেভাবে দেশের আইন শৃংখলা রক্ষীবাহিনী, ও অন্যবিধ প্রাণান্তকর সমস্যা সমাধানে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করার সর্বদলীয় অদলীয় নেতৃবর্গকে ডাক দিন। আমার বিশ্বাস সত্যিকার দেশদরদীরা এই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেন না। সাড়া না দেয়ার অর্থ হবে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। তাছাড়া আপামর জনসাধারণ এর মধ্যেও যে এইরূপ একটা উদাত্ত আহ্বানের একটা কল্যাণকর ভূমিকা পড়বে তাতে সন্দেহ নাই। এরূপ মরাল বুষ্ট আপের আজ প্রয়োজন আছে।

সাধারণ ক্ষমার বিষয়ে পত্রিকায় ফলোআপ

৩ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে সাধারণ ক্ষমার ফলোআপ এসেছিল যে সিদ্ধান্তটাকে সকল মহল স্বাগত জানিয়েছে। সেখানেই রয়েছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল সেখানে দালাল আইনে

www.pathagar.com

আটকদের এবং মুক্তি পাওয়াদের বিষয়ে সাংবাদিকদের ক্ল্যারিফাই করেছেন। দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা ৩৭ হাজার ৪শত ৭১ শিরোনামে ওই খবরে লেখা রয়েছে: সরকার কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই আদেশের আওতাভুক্ত সকল ব্যক্তির মুক্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল (শনিবার) সচিবালয়ের সাংবাদিকদের সাথে আলাপ আলোচনাকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মালেক উকিল এ কথা জানান। তিনি বলেন যে, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের আদেশের সহিত দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের তালিকা পরীক্ষা করার পর ইহার আওতাভুক্ত সকল ব্যক্তিকে মুক্তিদানের জন্য তিনি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, দালাল আইন অনুযায়ী মোট অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা হচ্ছে ৩৭ হাজার ৪শত ৭১ জন। ইহার মধ্যে চলতি বছর অক্টোবর মাস পর্যন্ত ২হাজার ৮শত ৪৮ জনের বিরুদ্ধে মামলার নিস্পত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭শত ৫২ জনের সাজা হইয়াছে এবং বাকী ২ হাজার ৯৬ জন খালাস পাইয়াছেন। তিনি বলেন একটি সংবাদপত্রে দালাল আইনে আটক ব্যক্তির সংখ্য ৮৬ হাজার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু উহা সত্য নয় বরং অতিরঞ্জিত।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, আটককৃত বা সাজাপ্রাপ্ত অনেক প্রাক্তন নেতা এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় মুক্তিলাভ করিবেন। তিনি বলেন যে যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্ণর ডাঃ এম এ মালেক ও তাহার মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবেন। অন্যদের মধ্যে যাহারা মুক্তি লাভ করিবেন তাহাদের মধ্যে ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, ডঃ হাসান জামান, ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, ডঃ মোহর আলী (প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিক্ষক) ও খান আব্দুস সবুরও রয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাহাদের সম্পত্তি ফেরৎ পাইবেন এবং দেশের নাগরিকদিগকে প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করিবেন। পাকিস্তান থেকে ফিরেই বঙ্গবন্ধু খান এ সবুরকে নিজের গাড়ি চালিয়ে জেল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন বলে যে গল্পটা শুনছিলাম সেটার নিস্পত্তি হলো এই খবরে।

সবশেষে তুলে ধরছি সে বছরে ১৫ ডিসেম্বর রেডিও টিভিতে সম্প্রচার হওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণে এ প্রসঙ্গে বলা অংশটুকু বিপ্লবের পর স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে যারা অভিযুক্ত হয়েছিলো তাদেরও আমরা হত্যা করিনি, ক্ষমা করেছি.....আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা দালাল আইনে আটক হয়েছিলো বা দন্ডিত হয়েছিলো তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসাবে স্বাভাবিক জীবনযাপনে আবার সুযোগ দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি অন্যের প্রচারণায় যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন তারা অনুতপ্ত হলে তাদেরও দেশ গড়ার সংগ্রামে অংশ নেবার সুযোগ দেয়া হবে।...

সূত্র: দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলার বাণী ও বাংলাদেশ অবজারভার

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেসনোটে ভিন্নতা

সাধারণ ক্ষমার প্রেসনোটটির সরকারী ভার্সন পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনটি প্রেসনোট পাওয়া গিয়েছে।[৫৪৭] প্রথমটি ওমি রহমান পিয়ালের www.omipial.amarblog.com থেকে, দ্বিতীয়টি ড. সাঈদ-উর-রহমানের বই '১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল' থেকে এবং তৃতীয়টি শাহরিয়ার কবিরের 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্ষ বিপক্ষ' বই থেকে।

ওমি রহমান পিয়াল ও ড. সাঈদ-উর-রহমান যে প্রেসনোট বর্ণনা দিয়েছেন তা দ্বিতীয় দফার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেসনোট এবং শাহরিয়ার কবির তার বইতে প্রথম দফার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেসনোট উল্লেখ করেছেন। শাহরিয়ার কবির দ্বিতীয় দফার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেসনোটটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উল্লেখ না করে প্রথম দফার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেসনোটটি তার বইতে উল্লেখ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তিনটি প্রেসনোট নিম্নে দেয়া হলো ---

ওমি রহমান পিয়ালের www.omipial.amarblog.com ও ডঃ সাঈদ উর রহমানের বই থেকে

১ ডিসেম্বর ১৯৭৩ পত্রিকায় প্রকাশিত 'দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্তদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা' উভয় সূত্রের বর্ণনা হুবহু এক ---

যারা ১৯৭২ সালে দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (পি. ও নং-৮, ১৯৭২ সালের) বলে আটক রয়েছেন অথবা সাজাভোগ করছেন তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নটি সরকার আগেও বিবেচনা করে দেখেছেন। সরকার এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা করছেন ঃ

১. দু'নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তিদের ও অপরাধ সমূহের ক্ষেত্র ছাড়া ঃ

(ক) ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী দন্ডবিধি ৪০১ ধারা অনুযায়ী উল্লিখিত আদেশবলে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রেহাই দেয়া হচ্ছে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অন্য কোনো আইনবলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকলে তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার অনতিবিলম্বে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

---

[৫৪৭] প্রেস নোটের গেজেট সংগ্রহ করার জন্য কয়েকদিন প্রচেষ্টা চালানোর পর www.eBangladesh.com এবং www.omipial.amarblog.com এ ওমি রহমান পিয়ালের লেখাটি পড়ার পর সে চেষ্টা বাদ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

(খ) কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে অথবা কোনো বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উক্ত আদেশবলে বিচারাধীন সকল মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল ও ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে প্রত্যাহার করা হবে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অন্য কোনো আইনে তাদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন কোনো মামলা বা অভিযোগ না থাকলে তাদের হাজত থেকে মুক্তি দেয়াহবে।

(গ) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উল্লিখিত আদেশবলে আনীত সকল মামলা ও তদন্ত তুলে নেয়া হবে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অন্য কোনো আইনে বিচার বা দন্ডযোগ্য আইনে সে অভিযুক্ত না হলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। উল্লিখিত আদেশবলে ইস্যু করা সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা, হাজির হওয়ার নির্দেশ অথবা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুলিয়া কিংবা সম্পত্তি ক্রোকের নোটিশ দেয়া থাকলে তা প্রত্যাহার বলে বিবেচিত হবে এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা অথবা হুলিয়া বলে কোনো ব্যক্তি ইতিপূর্বে গ্রেফতার হয়ে হাজতে আটক থাকলে তাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেয়া হবে। অবশ্য সে ব্যক্তি উল্লিখিত দালাল আদেশ ছাড়া কোনো বিচার বা দন্ডযোগ্য অপর কোনো আইনে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকে তবেই।

যাদের অনুপস্থিতিতেই সাজা দেয়া হয়েছে অথবা যাদের নামে হুলিয়া বা গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছে তারা যখন উপযুক্ত আদালতে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবে কেবল তখনই তাদের বেলা ক্ষমা প্রযোজ্য হবে।

২. দন্ডবিধি ৩০২ নং ধারা (হত্যা), ৩০৪ নং ধারা (ধর্ষণ), ৪৩৫ ধারা (গুলি অথবা বিস্ফোরক ব্যবহার করে ক্ষতিসাধন), ৪৩৬ (ঘর জ্বালানো) ও ৪৪৮ ধারায় (নৌযানে আগুন বা বিস্ফোরণ) অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত এক নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষমার আওতায় পড়বে না।

শাহরিয়ার কবিরের বই থেকে উদ্ধৃত
দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি বঙ্গবন্ধু সরকারের অনুকম্পা[৫৪৮]

১৭ মে, ১৯৭৩[৫৪৯]

গতকাল ১৬ মে বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ কয়েক শ্রেণীর অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রর্দশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৫৫০] শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, কয়েক শ্রেণীর

---

৫৪৮ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্ষ ও বিপক্ষ, শাহরিয়ার কবির; পৃ: ১৪২-১৪৪ ।

৫৪৯ ১৭ মে, ১৯৭৩ প্রথমবার সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। এতে প্রায় ৪৫০০ জন মুক্ত হন।

৫৫০ ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেস নোটটি শাহরিয়ার কবির কেন উদ্ধৃত করেননি তা বিস্ময় জাগায় এবং তার গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

www.pathagar.com

অপরাধের ক্ষেত্রে এই ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ১৮ ধরনের এক বা একাধিক বা সকল অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শিত হবে না। উপ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দখলদার সেনাবাহিনীর পক্ষে দেশের ভিতরে বা বাহিরে প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করা, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকার বা সরকারের মন্ত্রীর উপদেষ্টা পদ গ্রহণের জন্য দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত এবং আলবদর বা আল শামস এর সদস্য ও রাজাকার কমান্ডার হওয়ার কারণে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও অনুকম্পা প্রদর্শনের আওতায় পড়িবে না। সরকারী বিবৃতিতে বলা হয় সরকার ঘোষিত অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তিকে জেল হাজতে থাকিলে এই ঘোষণা প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের লিস্ট হাজির করিতে হইবে। অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তিকেই সংশ্লিষ্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মুচলেকা দিতে হইবে এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকারের ঘোষণা দিতে হইবে। বঙ্গবন্ধু সরকার গতকালই প্রথম দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুকম্পা প্রদর্শনের বিষয় কিছুদিন যাবৎ সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনার পর সরকার নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রকাশ করেন।

১. চতুর্থ প্যারায় উল্লেখিত ব্যক্তি এবং অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে পূর্বে উল্লেখিত আদেশ বলে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাজা মওকুফ করা হইবে। এবং জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ ছাড়া অন্য কোন আইন অনুযায়ী অভিযোগ না থাকে এবং তাহাদের যদি সদাচরণের ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করেন এবং লিখিতভাবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন ও বাধ্যতা স্বীকার করেন।

২. চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি ও অপরাধসমূহ ব্যাতিরেকে উল্লেখিত আদেশ অনুযায়ী বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ আদালত এর বিচারাধীন সকল ব্যক্তির মামলা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বা আদালতের অনুমোদনক্রমে প্রত্যাহার করা হইবে। অবশ্য যদি তাহারা দালাল আদেশ ছাড়া অন্য কোন বিচারযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য আইনে বিচারাধীন না থাকেন এবং যদি তাহারা সদাচরণের ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করেন এবং লিখিতভাবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন ও বাধ্যতা স্বীকার করেন।

৩. চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি ও অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে উক্ত আদেশ বলে দায়েরকৃত সকল মামলার তদন্ত এবং অনুসন্ধানমূলক কাজ প্রত্যাহার করা হইবে এবং সকল গ্রেফতারী পরওয়ানা, হাজির হওয়ার নির্দেশ ও সম্পত্তি দখলের আদেশ বাতিল করা হইবে। এবং এই কারণে ইতিমধ্যে কেহ হাজতে থাকিলে তাকে মুক্তি

www.pathagar.com

দেওয়া হইবে। অবশ্য অন্য কোন শাস্তিযোগ্য বা বিচারযোগ্য আইনে যদি কোন অভিযোগ না থাকে এবং যদি তাহারা সদাচরণের মুচলেকা প্রদান করেন ও লিখিতভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে।

৪. ১, ২ ও ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুকম্পা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি এবং নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।

ক) যাহারা উল্লেখিত আদেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের একাধিক সব কয়টি অপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত কিংবা এই সব অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া কথিত।

১. ১২১- বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধ প্রচেষ্টা
২. ১২১- বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র
৩. ১২৪- রাষ্ট্রদ্রোহিতা
৪. ৩০২- হত্যা
৫. ৩০৪- অপরাধযোগ্য নরহত্যা
৬. ৩৬৩- অপহরণ
৭. ৩৬৪- হত্যার জন্য অপহরণ
৮. ৩৬৫- আটক রাখার জন্য অপহরণ
৯. ৩৬৮- অপহৃত ব্যক্তিদের গোপন করা বা আটক রাখা
১০. ৩৭৬- ধর্ষণ
১১. ৩৯২- চুরি
১২. ৩৯৪- জখম করিয়া চুরি
১৩. ৩৯৬- ডাকাতি
১৪. ৩৯৬- খুন করিয়া ডাকাতি
১৫. ৩৯৭- খুন বা গুরুতররূপে আহত করার চেষ্টা করিয়া চুরি বা ডাকাতি
১৬. ৪৩৫- আগুন বা বিস্ফোরক উপাদানের সাহায্যে দুস্কৃতি
১৭. ৪৩৬- ঘর নষ্ট করার মতলবে আগুন বা বিস্ফোরক উপাদানের সাহায্যে দুস্কৃতি
১৮. ৪৩৮- আগুন বা বিস্ফোরক এর সাহায্যে নৌযানে দুষ্কৃতি

খ) দখলী আমলে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করেছে বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত অথবা অভিযুক্ত অথবা নন্দিত।

www.pathagar.com

গ) দখলদার বাহিনীর অনুকূলে স্বদেশী বা বিদেশে প্রচারণা চালাইয়া বা এই ধরনের প্রচার চালাইবার জন্য কোন পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল বা কমিটির সদস্যরূপে বিদেশে গমন করিয়া যারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

ঘ) দখলী আমলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তান সরকারের গভর্ণর মন্ত্রী বা উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

ঙ) আল বদর বা আল শামস সংগঠনের সদস্য হইয়া দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

চ) রাজাকার কমান্ডার হইয়া দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

ছ) দখলী আমলে জেলা, মহকুমা বা থানা শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, আহ্বায়ক বা সেক্রেটারী হইয়া দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

জ) দখলী আমলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কর্মকর্তা হইয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

ঝ) মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা ও সংগঠনের দমন বা পার্থিব সুবিধা আদায়ের মানসে দখলদার বাহিনীকে তথ্যাদি সরবরাহ এবং সাহায্যদানের মাধ্যমে দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

৫. এই ঘোষণার আওতায় অনুকম্পা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ যাহারা জেলে হাজতে আছে অথবা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যাহাদের হাজির করা হইবে বা হাজির হওয়ার জন্য যাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি বা হুলিয়া জারি হইয়াছে এবং যাহারা পালাইয়া বেড়াইতেছে, ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার জন্য এই ঘোষণা প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইয়াছে।

৬. প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার ঘোষণার পর অনুরূপ মুচলেকা প্রদানকারী ও ঘোষণাকারী

www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গকে যাহারা যদি দন্ডপ্রাপ্ত হয় তবে ৪০১ নং ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনিত দন্ডাদেশ মওকুফের যথাযথ নির্দেশ অনুযায়ী জেল হইতে খালাস করা হইবে। অথবা তাহারা যদি বিচারাধীন থাকে তবে ৪৯৪ ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অথবা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া মামলা প্রত্যাহারের পর হাজত হতে মুক্তি দেয়া হইবে। অবশ্য মুক্তির শর্ত হইতেছে যে, তাহারা যদি উপরোক্ত আদেশের বাহিরে বিচারযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য অন্য কোন অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হন তাহলে গ্রেফতারের জন্য জারিকৃত সকল পরোয়ানা ও হাজির হওয়ার জন্য সকল ঘোষণা এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ বাতিল করা হইবে এবং ফিরাইয়া নেওয়া হইবে।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সামাজিক ও রাজনৈতিক ফল

ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের দূরদর্শিতা ও নিপুণতা হিসেবে উল্লেখ করেন।[৫৫১] তিনি বলেন---

"মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর যেসব কাজে আওয়ামী লীগ দূরদর্শিতা ও নিপুণতা দেখিয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. সুশীল প্রশাসন পুনস্থাপন, বড় শিল্পের, ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স ব্যবস্থার জাতীয়করণ, সেক্টর কর্পোরেশন ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ আইনগতভাবে স্থাপন।

২. যৌথ বাহিনীর অঙ্গ ভারতীয় সেনাদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার, মুক্তিবাহিনী থেকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি রাষ্ট্রীয় হেফাজতে সমর্পণ এবং ক্রমান্বয়ে দেশের সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ, আনসার বাহিনীর পুনর্গঠন ও সুসংহতকরণ।

৩. শরণার্থী ও যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনস্থাপন এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৪. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা মূলক মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অপরাধীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং

৫. ভারতের সাথে সীমানা চুক্তি সম্পাদন।"

---

[৫৫১] আওয়ামী লীগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস (সংকলন), ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, পৃঃ ১২৪

www.pathagar.com

১৯৭২-৭৪ সনের ঘটনাবলী ও সামাজিক চিত্রসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে–

১. দু'দল মানুষের হাতে অস্ত্র ছিল--(ক) ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং (খ) স্বাধীনতার পক্ষে যোদ্ধা (মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী, কাদেরীয়া বাহিনী, আওরঙ্গ বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী প্রভৃতি)।

২. মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বলা হলেও তাদের কাউকে কাউকে সকল অস্ত্র জমা না দেওয়ার জন্য গোপনে নির্দেশ দেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান বাহিনী ও সহায়ক বাহিনী সমূহের ফেলে দেয়া অনেক অস্ত্র তাদের করায়ত্ত্ব হয়। এ অস্ত্র তারা জমা দেননি।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট অংশই

- ক্ষমতার দাপট প্রদর্শন করে ঘরবাড়ি, জমি জিরাত দখল করে।
- হাইজ্যাক করে (তৎকালীন পত্রিকায় প্রতিদিনই হাইজেকিং এর সংবাদ প্রকাশিত হতো)।
- সুন্দর কোন মেয়েকে দেখলে জোরপূর্বক বিয়ে করে।

৪. ৯৩০০০ যুদ্ধবন্দীকে ভারত তার মাটিতে নিয়ে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদা প্রদান করলে যে সকল মুক্তিযোদ্ধার আত্মীয়রা দালাল আইনে বন্দী হয়ে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয় ঐ সকল মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা নিজ আত্মীয়কে হাজত থেকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

১৯৭৩ সানের ডিসেম্বরে দলে দলে যোগাসাজসকারী বন্দীরা যখন মুক্ত হয়ে ঘরে ফেরেন, তখন হাজার হাজার পরিবারে আনন্দ আসে।। সামাজিক বিভেদের পরিবর্তে সামাজিক বন্ধন জোরালো হয়। স্বাধীন দেশের দ্বিতীয় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অনেকেই উপস্থিত থেকে স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ চার

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার- দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৭৫-১৯৯৫)

জিয়া-এরশাদ আমলে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার

শেখ মুজিব দেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সকল মত ও আদর্শের মানুষকে এক কাতারে আনার জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সকল সদস্যসহ এদেশীয় সকল সহায়তাকারীদের ক্ষমা করে দেন। বিষয়টি ১৯৭৪ সনের ০৯ ফেব্রুয়ারী তারিখেই নিষ্পন্ন হয়। ১৯৭৫ সনে বিচারপতি আবু সাদাৎ মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি থাকা কালে কলাবরেটর আইন ১৯৭২ বাতিল করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ কখনোই বাতিল হয়নি। এ আইন বাতিল না করা প্রসঙ্গে কয়েকজন মন্ত্রী ও বুদ্ধিজীবী বলেন, যোগসাজশকারীদের বিচার করার জন্যই এ আইন প্রণয়ন করা হয় এবং সংরক্ষণ করা হয়। যদিও বিষয়টি তা মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যদি genocide, war crimes, crimes against humanity ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হয়, তা হলে যাতে বিচার করা যায়, সে জন্য এ আইনটি কখনই বাতিল করা হয়নি।

জেনারেল জিয়াউর রহমান এ বিষয়ের জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শেখ মুজিবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দ্বিতীয়বার জাতীয় সংহতির ঘোষণা দেন এবং তা বাস্তবায়ন করে জাতির সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করেন। জাগদল ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) গঠনের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়া সামরিক পোষাক ছেড়ে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করেন। ধর্মীয় ও অধর্মীয়[৫৫২] সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানকে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়।

---

৫৫২ যারা রাজনীতিতে কোন ধর্ম নেই বলে ঘোষণা দেন।

www.pathagar.com

দেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন যে, জেনারেল এরশাদের কুটচালে জেনারেল জিয়া ও জেনারেল মঞ্জু নিহত হন। ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ তিনি সামরিক শাসন জারী করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘ নয় বছর দেশ পরিচালনা করেন। তিনিও শেখ মুজিব ও জেনারেল জিয়ার পথ ধরেই পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে যুদ্ধাপরাধীর ইস্যু নিয়ে কোন কথা বলেননি।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক)

১৯৯০ সনে এরশাদ বিরোধী গণ আন্দোলন। পাঁচ দল, সাত দল, একুশ দল আর জামায়াতে ইসলামী যুগপৎ কর্মসূচী দিয়ে এ আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সনে জেনারেল এরশাদ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[৫৫৩] বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে এ সরকার Caretaker সরকার হিসেবে কাজ করে।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১। জাতির ইতিহাসে এক অনন্য দিন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের পূর্বে সকল হিসাব ও ধারণায় আওয়ামী লীগ অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় যাচ্ছে। অতিমাত্রিক আত্মবিশ্বাসের কারণে শেখ হাসিনা কলকাতায় ঘোষণা দেন যে বিএনপি ১০ (দশ) টি আসন পাবে। কিন্তু তখনো মানুষ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সনের আওয়ামী লীগের অপশাসনের কথা ভুলেননি।

বিএনপি সরকার গঠন করার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে তা আওয়ামী লীগ যেমন কল্পনা করেনি, তেমনি এ দলের কোন নেতাও তা ভাবতে পারেননি; মনে মনে তারা বিরোধী দলের আসনে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে সময়ে সকল পত্রিকার জরিপ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ১৪০-১৬০টি আসন, বিএনপি ৬০-৮০টি আসন, জামায়াতে ইসলামী ৩২-৪০টি আসন, জাতীয় পার্টি ১৫-২০টি আসন লাভ করবে বলে পূর্বাভাস দেয়।

সকল ধারণা জরিপ আর পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার কারণ ছিল একটাই,"১৯৭২-৭৫ সময়ের অপশাসনের কথা তখনও ভোটাররা ভুলেননি; শাসন ক্ষমতায় তারা আওয়ামী লীগকে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি।"

হিসেবের এ গরমিল আর জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বিএনপির ক্ষমতায় যাওয়াতে RAW প্রমাদ গুণে। জামায়াত অতি উৎসাহী হয়ে তার অঘোষিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য নির্বাচিত করে আমীর ঘোষণা করে।

---

৫৫৩ উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করলে বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। এরপর এরশাদ তার নিকট রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়।

www.pathagar.com

RAW এর কাউবয়েরা[৫৫৪] এ সুযোগ হাতছাড়া করেননি। এ দেশীয় এজেন্টেদের দ্বারা সংগঠন দাঁড় করানো এবং মিডিয়া ব্যবহার করার মাধ্যমে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ৩০ অক্টোবর ১৯৯১ তারিখে সাইদুর রহমানকে সভাপতি করে 'প্রজন্ম ১৯৭১' নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ ঘটায়। ১৯ জানুয়ারী ১৯৯২ তারিখে জাহানারা ইমামকে আহবায়ক ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে গঠন করা হয় ৪২ সদস্য বিশিষ্ট "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি"। এ সমন্বয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণ হলেন --

১. আব্দুর রাজ্জাক- আওয়ামী লীগ

২. নূরুল ইসলাম নাহিদ- সিপিবি

৩. কাজী আরেফ আহমদ- জাসদ (ইনু)

৪. মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী- ন্যাপ (মুজাফ্ফর)

৫. মির্জা সুলতান রাজা- আওয়ামী লীগ (এক সময়ের জাসদের সভাপতি)

৬. ডাঃ এস এ মালেক- বঙ্গবন্ধু পরিষদ

৭. আব্দুল আহাদ চৌধুরী- মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

৮. সৈয়দ হাসান ইমাম- নাট্যকার

৯. শাহরিয়ার কবির- সাংবাদিক

১০. কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী- মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ

১১. গোলাম কুদ্দুস- সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট

গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিচার ও তার নাগরিকত্ব

৮ জানুয়ারী ১৯৯২ তারিখে অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত করার বিষয়ে আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ শামসুল হক, আজিজুর রহমান, আব্দুল আউয়াল মিয়া এবং ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন জাতীয় সংসদে ৪ (চার)টি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করে। রাশেদ খান মেনন সংসদে বলেন, "বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী একজন নাগরিক অধিকার রহিত ব্যক্তিকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচিত করে একটি মুক্তিযুদ্ধের ফসল আমাদের সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

---

[৫৫৪] তখন 'র' প্রধান ছিলেন এন. নরসিমহান।

www.pathagar.com

জামায়াত সংসদ সদস্য এনামুল হক মঞ্জু বলেন “অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। যে আদেশ বলে তার নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছে, তা অবৈধ। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবেই তাকে আমরা দলের আমীর নির্বাচিত করেছি।”

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী এ মুলতবী প্রস্তাবের উপর বলেন, “সরকার গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়নি। একজন বিদেশী হয়েও তাঁর আমীর নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত হয়েছে। এর আইনগত বিষয়াদি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।”

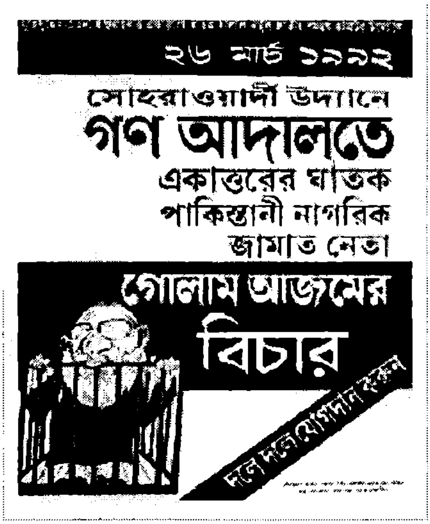

অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার
অনুষ্ঠানের পোস্টার

তিনি আরো বলেন, “স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গোলাম আযম (পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের) আমীর ছিলেন। ২২ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৭২ সনে তাকে বিদেশী নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৬ সনে লন্ডন থেকে তিনি (বাংলাদেশের) নাগরিকত্বের আবেদন করেন। ১৯৭৮ সনেও তিনি আবেদন করেন। কিন্তু দু'বারই আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়। ১১ জুলাই ১৯৭৮ তারিখে সরকারের কাছ থেকে তিন মাসের ভিসা নিয়ে তিনি বাংলাদেশে আসেন। আসার সময় তিনি তার মায়ের অসুস্থতার কারণ দেখিয়েছিলেন। ৩০ এপ্রিল ১৯৮১ তারিখে গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আনুগত্য প্রকাশ করে 'হলফনামা' দাখিল করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক নন।”

www.pathagar.com

২৪ মার্চ ১৯৯২ তারিখ রাতে বিদেশী নাগরিক (প্রবেশ) আইনে অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে এক মাসের ডিটেনশন দেওয়া হয়। ২৬ মার্চ ১৯৯২ তারিখে জাহানারা ইমামকে চেয়ারপারসন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তার বিরুদ্ধে "গণ-আদালত" বিচার অনুষ্ঠিত হয়। গণ-আদালত সম্পর্কে শাহরিয়ার কবির বলেন, "প্রতীকী বিচার ছিল ১৯৯২ সালে গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিচার করা। প্রতীকী বিচার করা হয় জনসচেতনতা তৈরী করার জন্য। গণ-আদালতের বিচারে তো গোলাম আযমকে সত্যিকার অর্থে কোন সাজা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। কারণ সেটা কোন বৈধ আদালত ছিল না। [৫৫৫] এ গণ-আদালতের অন্যান্য বিচারকগণ হলেন–

১. এডভোকেট গাজীউল হক

২. ডঃ আহমদ শরীফ

৩. মাযহারুল ইসলাম

৪. ব্যারিষ্টার শফিক আহমদ

৫. ফয়েজ আহমদ

৬. অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

৭. কলিম শরাফী

৮. মাওলানা আব্দুল আওয়াল[৫৫৬]

৯. লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান

১০. লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী

১১. ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান

এ গণ-আদালত অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১০টি অভিযোগের ভিত্তিতে ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে "মৃত্যুদন্ড" প্রদান করে এবং দন্ডাদেশ কার্যকর করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানায়।

অধ্যাপক গোলাম আযম বিদেশী নাগরিক (প্রবেশ) আইনে গ্রেফতার করা হলে তিনি তার নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করার দাবীতে

---

৫৫৫ সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখ: ১৯.০১.২০১২। "গণ-আদালত" সাংবিধানিকভাবে কোন বৈধ-আদালত নয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং এ ঘরানার বুদ্ধিজীবীগণ এ আদালতের রায় বাস্তবায়নের জন্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সংবিধান লংঘন করেছেন এবং নৈরাজ্যকে উৎসাহিত করেছেন।

৫৫৬ কাদিয়ানী ধর্মমতে বিশ্বাসী

www.pathagar.com

হাইকোর্টে মামলা করেন। বিএনপি সরকারের এ্যাটর্ণী জেনারেল ছিলেন আওয়ামী লীগ ঘরাণার আমিনুল ইসলাম; তাকে সহায়তা করেন এড. সিরাজুল হক (এড. আনিসুল হকের পিতা)। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রায়ে গোলাম আযম নাগরিকত্ব ফিরে পেয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলায় বিভক্তি রায় হয়, যে বিচারক (বিচারপতি ইসরাইল) তার নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন তিনিও তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, গোলাম আযম দ্বারা মানবতাবিরোধী কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি।[৫৫৭]

---

[৫৫৭] 'that there is nothing to directly implicate the petitioner in any of the atrocities alleged to have been perpetrated by the Pakistani Army or their associates – the Rajakars, Al Badrs or the Al Shams...we do not find anything that the petitioner was in any way directly involved in perpetuating the alleged atrocities during the war of independence.' Professor Golam Azam Vs. Bangladesh Government (45 Dhaka Law Report, High Court Division, page 433

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ পাঁচ

স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার - তৃতীয় পর্যায়

(২০০৭ হতে চলমান)

মঈনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকার ও আওয়ামী লীগ

১৯৭২-৭৫ আওয়ামী লীগের অপশাসনের জন্য শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সনের নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঐ শাসনামলে যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, ১৯৯৬ সনে তারা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারী হয়েছেন তাদের একটি বিরাট অংশ এবং যারা শেখ হাসিনার ক্ষমা প্রার্থনায় অতীত অপকর্মকে ক্ষমা করে দিয়ে তারা আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট প্রদান করে এ দলকে একুশ বছর পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করান। এ নির্বাচনের পূর্বে ও পরে শেখ হাসিনা বেশ কয়েক বার জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন।[৫৫৮] বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের এ সময়কার দূরত্ব আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করতে সাহায্য করে; বিপরীতে জামায়াত মাত্র ৩ (তিন) টি আসন পেয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে।

১৯৯৬-২০০০ শাসনামলে আওয়ামী লীগ সরকার বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতার মত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালু করে জনসমর্থন বাড়াতে সক্ষম হয়।

আওয়ামী লীগ কোন ধর্মভিত্তিক দল না হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনে 'জায়নামাজে মুনাজাতরত হাসিনা' 'তসবীহ হাতে হাসিনা' ইত্যাদি পোস্টার ছাপিয়ে ধর্মের অপব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয়। তবে সরকারে এসে আওয়ামী লীগ প্রথম দিকে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করলেও চরম ধর্ম বিদ্বেষী বামপন্থীদের চাপে ইসলামী দলগুলোর উপর আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ২০০১ সনের নির্বাচনে পরাজয়ের এটি ছিল অন্যতম একটি কারণ।

২০০১ সনের নির্বাচনে বিএনপি - জামায়াত জোট আসন প্রাপ্তির দিক থেকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী মানুষের সকল চাহিদা যথাযথভাবে পূরণের ব্যর্থতা, RAW এর অর্থায়নে প্রচার মাধ্যমগুলোর

---

[৫৫৮] ১ম বৈঠক হয় ১৯৯২ সনের ২৬ মার্চ শেখ হেলালের ইন্দিরা রোডের বাসায়। ২য় বৈঠক হয় ১৯৯৪ সনের ২৫ জানুয়ারী শেখ হাফিজুর রহমানের ধানমন্ডি ৮/এ রোডের বাসায় এবং ৩য় বৈঠক হয় ১৯৯৬ সনে নির্বাচনের পূর্বে শেখ হাসিনার বিয়াই মোশারফ হোসেনের উত্তরার বাসায়। সূত্রঃ আমার ফাসি চাই, মতিয়ুর রহমান রিন্টু; পৃঃ ১১৫, ১২৩ ও ১৮৪

www.pathagar.com

ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী ভূমিকা, বিদেশী দূতাবাসগুলোকে অধিক গুরুত্ব প্রদানের কারণে এদের লাগামহীন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, তেল-গ্যাস-বন্দরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রাপ্তির বিদেশী ষড়যন্ত্রের প্রভাব, Third Force কে ক্ষমতায় বসানোর আমেরিকান পূর্ব পরিকল্পনা[৫৫৯], সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা, সব মিলিয়ে ২০০৬ সনের নির্বাচনকে বানচাল করা হয় এবং সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় অসাংবিধানিক তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার[৫৬০] ক্ষমতায় আরোহণ করে।

সেনা প্রধান মঈন উদ্দিন আহমদের রাজনৈতিক বক্তব্য, ফেরদৌস আহমদ কোরেশীকে দিয়ে King's Party গঠনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, সেনা সদস্যদের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, বেসামরিক ব্যক্তিদের চরিত্র হননের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)কে ব্যবহার, বিচারকদের দিয়ে অনৈতিকভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে সাজা প্রদানসহ বহুবিধ বেআইনী পদক্ষেপ দেশের সার্বিক অবস্থা অস্থিতিশীল করে তুললে সেনা প্রধান প্রস্থানের উপায় খুঁজতে থাকেন। এ অবস্থায় শেখ হাসিনা ১১ জুন ২০০৮ তারিখে আমেরিকা যাওয়ার পথে ঢাকা বিমান বন্দরে বলেন "আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে এ সরকারের সকল কর্মকান্ডকে বৈধতা প্রদান করবে।"[৫৬১]

সামরিক-রাজনৈতিক নতুন মেরুকরণে সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন 'ফৌজী লীগ' হিসাবে কাজ করে। ২০০৮ সনের নির্বাচনে সেনাবাহিনীর বিতর্কিত ভূমিকা , মিডিয়ার প্রত্যক্ষ সহায়তা, নির্বাচন কমিশনের অনিয়ম সব ছিল CIA-RAW-MOSSAD এর পরিকল্পিত ছক। নিশ্চিত বিজয়ের এ ছক অনুযায়ী বাংলাদেশকে ইসলাম শূন্য করার জন্য আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে এবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যু সংযুক্ত করে।

অপরাধীদের বিচারের দাবী

In the larger interests of reconciliation, peace and stability in the sub-continent" এবং "In the largest interests of reconciliation, peace, stability and development of our sovereign country"-র লক্ষ্যে ৯ এপ্রিল ১৯৭৪ বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে শেখ মুজিব ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেন। তিনি কলাবরেটর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ অনুসারে আটককৃতদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। বিচারপতি সায়েমের আমলে কলাবরেটর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ বাতিল করা হয়।

---

৫৫৯ Cristina Roca এবং Harry K Thomas বলেছেন যে তৃতীয় শক্তি ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

৫৬০ তত্ত্বাবধায়ক সরকার; সংবিধানের ৫৮ ধারা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা, সময়কাল, কার্যপরিধি ইত্যাদির বিবরণ দেয়া আছে। এ সরকারের মেয়াদ মাত্র ৯০ (নব্বই) দিন এবং এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত করা।

৫৬১ ১২ জুন ২০০৮ তারিখের সকল জাতীয় সংবাদপত্র।

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যু স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর প্রাক্তন সেনা প্রধান জেনারেল মঈন উদ্দিন আহমদ তাজা করেন।[৫৬২] ১৯৭১ সনে যে সেনা প্রধান ১৪/১৫ বছরের বালক ছিলেন, যিনি মুক্তিযোদ্ধা বা রাজাকার কোনটাই ছিলেন না, তিনি নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের একজন মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন দুটি কারণে–

১. প্রথমতঃ তিনি বিএনপি সরকারের আমলে সাতজন সিনিয়রকে ডিঙ্গিয়ে সেনা প্রধান হয়েছিলেন,[৫৬৩] তিনি যখন বিএনপি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তখন নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করাটা একান্তভাবেই প্রয়োজন মনে করেন, প্রয়োজন হয় আওয়ামী লীগের আস্থাভাজন হওয়া।

২. দ্বিতীয়তঃ তার সঙ্গে RAW এর সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যে, he had no point of return; RAW এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তিনি যুদ্ধাপরাধী ইস্যুটি সামনে আনেন।

জেনারেল মঈন RAW এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার দাবী জোরদার করার জন্য সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম গঠন করা হয়। মৃতপ্রায় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আবার চাঙ্গা হয়। বামপন্থী দলগুলো সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য ১৩টি দলের মহাজোট যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী নির্বাচনী ইশতেহারে সংযুক্ত করে।

যুদ্ধপরাধের বিচারের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সোচ্চারকারীদের অধিকাংশই হচ্ছেন কলাবরেটর। তাদের মধ্যে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবীর চৌধুরী (অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মৃত্যু তার ভাই অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে দালাল আইনে অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। সূত্রঃ র-এর ভয়াল থাবা, সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী; পৃঃ ৯৫), বিচারপতি কে এম সোবহান (যিনি নিজেই টিক্কা খানের অধীনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়ে একজন দালালরূপে গণ্য)। ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর (যিনি এডিসি হিসেবে রাজাকার সংগঠক ছিলেন), ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (যিনি ১৯৭১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে পাকিস্তান সরকারের অনুগতদের একজন ছিলেন), এডভোকেট কামরুল ইসলাম (যিনি ১৯৭১ সনে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রকাশিত পত্রিকায় কাজ করেছিলেন) প্রমুখ। এ

---

[৫৬২] যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্ষ ও বিপক্ষ, শাহরিয়ার কবির; পৃ: ৫০

[৫৬৩] জেনারেল মঈন বলেন, "নভেম্বর ২০০১ তারিখে দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনে চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করলো। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সেনাসদরে স্থানাপন্ন এমজিও (Officiating Master-General of the Ordnance) হিসেবে আমার বদলি হলো। আমার সামরিক জীবনে হঠাৎ করেই আবার সম্ভাবনার আলো দেখা গেলো। শান্তির স্বপ্নে; পৃ: ২৭৫

www.pathagar.com

ছাড়া যারা রয়েছেন শাহরিয়ার কবির, ডাঃ এম এ হাসান, আক্কু চৌধুরী, লেঃজেঃ (অবঃ) হারুনুর রশীদ (প্রাক্তন সেনা প্রধান এবং ডেসটিনি গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে বিদেশে ৬০০০ কোটি টাকা পাচারকারীদের একজন) প্রমুখ।

আওয়ামী লীগের ২০০৮ সনের নির্বাচনী ইশতেহার

নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করলে তারা কি কি কাজ করবে তার ফিরিস্তিই হচ্ছে নির্বাচনী ইশতেহার। নির্বাচনের পূর্বে প্রতিটি দল নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। নির্বাচনের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দল অধিষ্ঠিত হলে তার দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনী ইশতেহার এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে মানুষের নিকট যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করা।

১৯৯৬ সনের নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছিল। এ নির্বাচনের পূর্বে তারা ৭২-৭৫ সনের অপশাসনের জন্য ক্ষমা চেয়েছে (ঐ সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন শেখ মুজিব)। ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী মূল্যবোধে আঘাত হানায় পরবর্তী ২০০১ সনের নির্বাচনে তাদেরকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়।

২০০৮ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে দিন বদলের পালার ইশতেহার প্রকাশ করে। এবারের নির্বাচনের পূর্বে ঘোষিত ইশতেহারে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতি (Political and Administrative culture) বদল করে মানুষের জন্য Digital Bangladesh গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ইশতেহারের ৫(১) ধারায় বলা হয় "Trial of the war crimes" করা হবে,[৫৬৪] কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ের পর তার ইশতেহার সংশোধন করে ৫(১) ও ৫(২) ধারায় পরিবর্তন আনে। ২৯ জুলাই ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত ইশতেহারে International Crimes (Tribunals) Act 2009 অনুযায়ী বিচারের কথা উল্লেখ করা হয়।

১৯৭৩ সনের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের সংজ্ঞানুযায়ী যুদ্ধাপরাধী হচ্ছে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, আধা-সামরিক ও সহায়তাবাহিনীর সদস্য যারা (১৯৭১ সনে) যুদ্ধাপরাধ করেছে। বাংলাদেশী অথচ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কলাবরেটর হিসাবে চিহ্নিত তাদের বিচার করার জন্য কলাবরেটর আদেশ ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়। এই কলাবরেটরদেরকে নতুন করে যুদ্ধাপরাধী সংজ্ঞায়িত করে নতুনভাবে সংশোধিত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ২০০৯ প্রণয়ন করার পর আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহার ২৯ জুলাই ২০০৯ সংশোধন করে এবং ঐ ইশতেহারে বলা হয়েছে "২০০৯ সনে সংশোধিত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে।"[৫৬৫]

---

[৫৬৪] নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

[৫৬৫] www.albl.org/menifesto accessed on 12.12.2011

www.pathagar.com

সংশোধিত আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ অনুযায়ী কেবল সামরিক বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী বা সহযোগী বাহিনীর সদস্যগণকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কোন বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কাউকে যুদ্ধাপরাধী গণ্য করা হয়নি। আইনের ৩(১) অনুচ্ছেদে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারে বলা হয় যে, A Tribunal shall have the power to try and punish any person irrespective of his nationality who, being a member of any armed, defence or auxiliary forces commit or has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the following crimes.(Crimes against Humanity, Crimes against Peace, Genocide, War Crimes) কোনো ব্যক্তি তিনি যে দেশেরই নাগরিক হন না কেন যিনি কোনো সশস্ত্র, প্রতিরক্ষা কিংবা সহায়ক দল বা বাহিনীর সদস্য হয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অত্র আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে কিংবা পরে অপরাধ করলে তার বিচার করবার ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের থাকবে। আইনের এ অংশের সঙ্গে ২(এ) ও ২(ডি) অনুচ্ছেদে সংজ্ঞা দু'টি তথা

(a) "auxiliary forces includes forces placed under the control of the Armed Forces for operational, administrative, static and other purposes;

(d) "Service law" means the Army Act, 1952 (XXXIX of 1952), the Air Force Act, 1953 (VI of 1953), or the Navy Ordinance, 1961 (XXXV of 1961), and includes the rules and regulations made under any of them;

একত্রে পড়লে আইনের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নেয়া যায়। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর যেসব আইনের উল্লেখ করা হয়েছে তা কেবল পাকিস্তানের বাহিনীসমূহের জন্য প্রযোজ্য। 'তিনি যে দেশেরই নাগরিক হন না কেন' উল্লেখপূর্বক যে এখতিয়ারের কথা বলা হয়েছে তা সাংঘর্ষিক।

২০০৯ সনে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ এর সংশোধন আনা হয়। এ আইনের মূল যে পরিবর্তন আনয়ন করা হয় তা হলো আইনের ৩(১) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বৃদ্ধি এবং আইনের ২(এএ) অনুচ্ছেদ সংযোজন। এর ফলে যুদ্ধাপরাধীদের পরিধি বিস্তৃত হয়। আইনের ৩(১) অনুচ্ছেদে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার সংশোধন করা হয়--

"A tribunal shall have the power to try and punish **any individual or group of individuals**, or any member of any armed

www.pathagar.com

forces, defence or auxiliary forces person irrespective of his nationality, who being a commit or has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the crimes mentioned in sub-section (2)"

কোনো ব্যক্তি তিনি যে দেশেরই নাগরিক হন না কেন যিনি কোনো সশস্ত্র, প্রতিরক্ষা কিংবা সহায়ক দল বা বাহিনীর সদস্য হয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অত্র আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে কিংবা পরে হউক না কেন নিম্নবর্ণিত যে কোনো অপরাধ করলে কিংবা করে থাকলে তার বিচার করবার ও শাস্তি দেওয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের আছে। এবং আইনের ২(এএ) অনুচ্ছেদ সংযোজন করে "armed forces means the forces raised and maintained under the Army Act, 1952(XXXIX of 52), the Air Force Act, 1953 (VI of 1953), or the Navy Ordinance, 1961(XXXV of 1961" মূলতঃ পাকিস্তানের বাহিনীসমূহের জন্য আইনকে প্রযোজ্য রাখা হয়েছে। তবে, ট্রাইব্যুনালের সংশোধিত এখতিয়ার অনুযায়ী যে কোন বেসামরিক ব্যক্তি যিনি (পাকিস্তান) সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করেছেন তাকেও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গণ্য করা যাবে। আইন সংশোধন করার মাধ্যমে ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বাইরে এ দেশের হাজার হাজার মানুষকে বিচারের সম্মুখীন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল তা বাতিল করতে হবে। বাংলাদেশী লাখ লাখ মানুষ যারা শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন, ডাঃ মালেক মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন, রাজাকার, আল-বদর, আল শামস, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, উকিল, বিচারক, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপজাতিসমূহ, চীনপন্থী রাজনৈতিক, বৌদ্ধ সম্প্রদায় সকলকে বিচারের সম্মুখীন করা বাঞ্ছনীয়।

২০০৯ সনের সংশোধনীর মাধ্যমে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এ দেশীয় কলাবরেটরদের বিরুদ্ধে যেমন বিচারের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে, তেমনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল ব্যক্তির বিচার করার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথমেই যাদের নাম আসে তারা হলেন-

১. জেনারেল আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান- পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট
২. জেনারেল আব্দুল হামিদ খান - পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান
৩. লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা - প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার।
৪. জুলফিকার আলী ভূট্টো - পিপিপি চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

এর বাইরে প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যাদের বিচার করা যায় তারা হলেন–

১. লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান

২. লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান গুল

৩. মেজর জেনারেল ওমর

৪. মেজর জেনারেল আকবর

৫. মেজর জেনারেল জমশেদ

৬. মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী

৭. মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা

৮. মেজর জেনারেল আনসারী

৯. কর্ণেল ইয়াকুব মালিক

১০. লে.ক. শামসুজ্জামান

১১. মেজর মোঃ আব্দুল্লাহ খান

১২. মেজর খুরশীদ ওমর

১৩. ক্যাপ্টেন আব্দুল ওয়াহিদ

১৪. এম এম আহমদ -- বেসামরিক আমলা

১৫. বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান রিজভী

উভয় পক্ষ যুদ্ধাপরাধ করেছে

১৯৭৩ সনের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের সংগা ও পরিধি এবং The Bangladesh National Liberation Struggle (Indemnity) Order, 1973 অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন সদস্য যুদ্ধাপরাধ করেছে এমনটি বলা যাবে না কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ২০০৯ এর সংগা ও পরিধি অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেকেই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুদ্ধের উভয় পক্ষ যুদ্ধাপরাধী হতে পারেন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ গত ১৩.১১.২০০৭ তারিখে প্রথম আলোতে 'বর্তমান বাস্তবতা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী' প্রবন্ধে লেখেন --"কাদের সিদ্দিকী প্রকাশ্যে পল্টন ময়দানে স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালী, বিহারি প্রভৃতিকে গুলি করে হত্যার যে জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাতে বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে চূর্ণ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ অপরাধ হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা করেছেন; শুধু বিহারি নয় পূর্ব শত্রুতার কারণেও হাজার হাজার নিরীহ বাংলাদেশীকে প্রাণ দিতে হয়েছে; যদিও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিকভাবে সহায়তা করেছিলেন।"

আন্তর্জাতিক সকল আইন অনুসারে যে কোন যুদ্ধে বিজিত বা বিজয়ী উভয় পক্ষ দ্বারাই যুদ্ধাপরাধ ঘটতে পারে। উপরের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান যে কোন মানুষ একজন মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবী করার সুযোগ রয়ে গেছে।

পরিচিত স্বাধীনতাবিরোধীদের কোন দলে কত জন

War Crime Facts Finding Committee-র সভাপতি ডাঃ এম এ হাসানের বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমান জাতীয় পার্টিতে (এরশাদ) যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী।[৫৬৬] অন্যদের বক্তব্য হচ্ছে সংখ্যার দিক থেকে আওয়ামী লীগে যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা দ্বিতীয়, জামায়াতে যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা হচ্ছে তৃতীয়। Fact Finding Committee-র সভাপতির বক্তব্য হচ্ছে আওয়ামী লীগে থাকা যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে তাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[৫৬৭] পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছেন; তারা কোন কোন দলের মন্ত্রীসভায় ছিল বা আছে তার একটি তালিকা দেয়া হলো–

জাতীয় পার্টির মন্ত্রীসভায় স্বাধীনতাবিরোধী : বিচারপতি এ কে এম নুরুল ইসলাম, কাজী জাফর আহমদ, মাওলানা এম এ মান্নান, রিয়াজুল হক ভোলা মিয়া, অউং শু প্রু চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, ড. শাফিয়া খাতুন, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, আনোয়ার জাহিদ, বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী, সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী, বিনয় কুমার দেওয়ান, মঈদুল ইসলাম, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী , উপেন্দ্র লাল চাকমা, সৈয়দ মুহিবুল হাসান, সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সার, সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ, এস এ বারী এ টি, এ বি এম গোলাম মোস্তফা (বর্তমানে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য)।

আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভায় স্বাধীনতাবিরোধী : এ কে ফয়জুল হক, অউং শু প্রু চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, কল্পরঞ্জন চাকমা, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, মাওলানা নূরুল ইসলাম, এড. কামরুল ইসলাম, এ এইচ এফ কে সাদেক, কর্ণেল ফারুক খান, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন।

বিএনপি (এবং চার দলীয়) মন্ত্রীসভায় স্বাধীনতাবিরোধী : আব্দুর রহমান বিশ্বাস, আব্দুল আলীম, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, কাজী জাফর আহমদ, শাহ

---

[৫৬৬] ডাঃ এম এ হাসান, আহ্বায়ক, ওয়ার ক্রাইম্স ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির ০৪.০৫.২০১০ তারিখে টেলিভিশনে দেয়া বক্তব্য এবং আমাদের সময়; তারিখ: ০৫.০৫.২০১০

[৫৬৭] ঐ

www.pathagar.com

আজিজুর রহমান, অউং শু প্রু চৌধুরী, মাওলানা এম এ মান্নান, এ কে ফয়জুল হক, সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী, সৈয়দ মুহিবুল হাসান, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (জামায়াত), আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ (জামায়াত)।

যুদ্ধাপরাধী অপবাদে দাড়ি টুপির অবমাননা

বাংলাদেশের প্রতিটি মিডিয়া যুদ্ধাপরাধীদের যে ব্যঙ্গ চিত্র অংকন করছে তাতে মানুষের মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে দাড়ি আর টুপীধারীরাই যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতা বিরোধী, দেশের সকল অমঙ্গলের হোতা।

আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর কারোই দাড়ি-টুপি ছিল না। তারা পাকিস্তানের নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলো। এর বাইরে ৪২ হাজার বাংলাভাষী মানুষকে পাকিস্তানীদের সহায়তাকারী রাজাকার, আলবদর, শান্তি-কমিটির সদস্য হিসেবে গ্রেফতার ও বিচারের সম্মুখীন করা হয়। রাজাকার অধ্যাদেশ দ্বারা গঠিত এ বাহিনী তৎকালীন পুলিশবাহিনীর মত একটি বাহিনী ছিলো, যদিও সংখ্যা ছিলো প্রায় ৩৭ হাজার। তাদের অধিকাংশেরই দাড়ি-টুপি ছিলো না। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মেম্বারদের অধিকাংশই তৎকালে নিজে বাঁচার জন্য এবং এলাকাকে পাকিস্তান বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যোগদান করেছিল। উল্লেখ্য যে, শান্তি কমিটিতে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, পিডিপি, জাতীয় দল,জামায়াতসহ সকল দলের নেতা-কর্মীরা ছিলেন।

টেবিল ৫.১

'চরম পত্র' বই এর তালিকা অনুযায়ী দাড়িওয়ালা ও দাড়িবিহীন যোগসাজশকারীদের পরিসংখ্যান

	সংখ্যা	দাড়িওয়ালার সংখ্যা	দাড়িওয়ালার হার (%)	দাড়িবিহীনদের সংখ্যা	দাড়িবিহীনদের হার (%)
ডাঃ মালেক মন্ত্রীসভা	১৪	৩	২১.৪৩	১১	৭৮.৫৭
কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি	১২৭	২০	১৫.৭৫	১০৭	৮৪.২৫
কলাবরেটর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব	১৩৭	২৯	২১.১৭	১০৮	৭৮.৮৩
রাজাকার কমান্ড	৭২	০	০	৭২	১০০.০০
সিএসপি/ইপিসিএস	২৬৬	০	০	২৬৬	১০০.০০
পুলিশ বিভাগ	১০২	০	০	১০২	১০০.০০
পররাষ্ট্র	২৯	০	০	২৯	১০০.০০

www.pathagar.com

	সংখ্যা	দাড়িওয়ালার সংখ্যা	দাড়িওয়ালার হার (%)	দাড়িবিহীনদের সংখ্যা	দাড়িবিহীনদের হার (%)
সামরিক বাহিনী[৫৬৮]	১০৪	০	০	১০৪	১০০.০০
মোট	**৮৫১**	**৫২**	**৬.১১**	**৭৯৯**	**৯৩.৮৯**

এ অবস্থায় দাড়ি-টুপিকে স্বাধীনতা বিরোধী বা যুদ্ধাপরাধীর সিম্বল করাটা সুদূরপ্রসারী ধর্ম বিরোধী চক্রান্ত । স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে পরিচিত পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী চীনপন্থী কম্যুনিস্টরা ছিল দাড়ি-টুপির বিরোধী। স্বাধীনতা বিরোধী উপজাতি ও বৌদ্ধরাও দাড়ি-টুপিধারী ছিল না। তাদেরকে symbolized না করে ইসলামের নবীর সুন্নতের বিরুদ্ধে অপমানজনক প্রকাশ ইসলামপন্থীদের ধর্মের প্রতি যেমন কটাক্ষ তেমনি আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।

সূত্রঃ http://gurumia.com/tag/constitutional-amendment/
date: 17.09.2011

যুদ্ধাপরাধীদের নয়, মানবতাবিরোধীদের বিচারঃ একটি রাজনৈতিক চাতুরতা

৪০ বৎসর ধরে বাম ও আওয়ামীপন্থীদের ভাষায় গোলাম আযম, নিজামী, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আর আব্দুল আলীমরা হলেন যুদ্ধাপরাধী। আওয়ামী পন্থী আর বামপন্থী পত্রিকায় অথবা বুদ্ধিজীবীগণ টিভি টকশো, সেমিনার আর আলোচনা সভায় কত লক্ষবার এদেরকে যুদ্ধাপরাধী উল্লেখ করেছে তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না।

---

৫৬৮ সামরিক বাহিনীর তথ্য নেয়া হয়েছে এ এস এম সামছুল আরেফিনের 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান' বই থেকে।

www.pathagar.com

এ প্রজন্মের কাছে এরা যুদ্ধাপরাধী হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু আইনমন্ত্রী শফিক আহমদ যখন বুঝলেন যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত ও বিচার করার কথা বলা হচেছ, আইনের ভাষায় তারা যুদ্ধাপরাধী নন, তখন, তিনি বললেন - যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না, বিচার হবে মানবতাবিরেধীদের।[৫৬৯] পূর্বেই বলা হয়েছে শেখ মুজিব সরকার প্রথমতঃ পাকস্তান সামরিক বাহিনীর ১০১৫ জন কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে। তদন্ত ক্রমে এ সংখ্যা ১৯৫ জনে নেমে আসে এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে এদের নাম প্রকাশিত হয়। এর পর এ সংখ্যা আরো কমে এসে ১৪১ এবং সর্বশেষে ১১৮ জনে দাড়ায়। বহুল প্রচারিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ভারত সরকার ক্ষমা করে দেয় । ১৯৭৩ সনের পররাষ্ট্র সচিব এনায়েত করিম দিল্লীতে সফরে গেলে সি এন হাসকার জানান - কোন পেশাদার আর্মি অপর পেশাদার আর্মির বিচার আশা করে না– ভারতের সেনাবাহিনী এই যুক্তিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়না ।[৫৭০]

সরকার ও সরকারী দলের বক্তব্য বিশ্লেষণ

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে মহাজোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিপরিষদের প্রায় সকল সদস্য, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম, Facts Finding Committee এবং বাম-আওয়ামী ঘরাণার বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বক্তব্য দিয়ে এসেছেন তা বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

প্রথমতঃ আইন মন্ত্রী বলেছেন- যুদ্ধাপরাধীদের কোন বিচার হবে না, বিচার হবে মানবতাবিরোধীদের। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন - No trial of 195 Pakistani war criminals.[৫৭১] বিচারপতি (অবঃ) গোলাম রাব্বানী এক সাক্ষাৎকারে বলেন - “পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আগে বা পরে হবে এটা বিষয় না। আইনে পাকিস্তানীদের বিচারের কথাও বলা হয়েছে। যাকে আগে পাওয়া যাবে তার বিচারই

---

৫৬৯ আমাদের সময়, তারিখ: ১৯.০৩.২০১০

৫৭০ দৈনিক ইত্তেফাক; তারিখ: ০৬.১১.২০০৭

৫৭১ The Nation, 31 May, 2009

www.pathagar.com

আগে করা হবে। পাকিস্তানীদের বিচারের জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব।"[৫৭২] স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেছেন- যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে প্রতিকী।

সৈয়দ বোরহান কবীর ৩০.০৫.২০১০ তারিখের আমাদের সময়ে 'জেগে থাকো যুবলীগ' শিরোনামে লিখেছেন "যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যতটা আইনি তার চেয়েও বেশি হলো রাজনৈতিক।" আর এটাই আসল কথা। ঢাকা মহানগর জামায়াত আমীর রফিকুল ইসলাম খান ১৯৭১ সনে ছিলেন ৪ (চার) বছরের শিশু আর ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াত আমীরের বয়স ছিল ১০(দশ)। আওয়ামী লীগ প্রণীত ৩৬ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় তাদের নাম থাকাতে স্পটতই সৈয়দ বোরহান কবীরের কথাই সত্য। সাপ্তাহিকের প্রতিবেদনে বলা হয়, "আওয়ামী লীগ এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে ট্রামকার্ড হিসেবে বিবেচনা করছে। তাদের ধারণা এ কার্ড দিয়ে তাদের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে ঘায়েল করতে পারবে।"[৫৭৩]

পূর্ত প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট আব্দুল মান্নান খান বলেন "স্বাধীনতার পর ৩২ বছর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা দেশ শাসন করেছে।"[৫৭৪] তার এ কথাকে যদি সত্য ধরে নেয়া হয় তা হলে বুঝতে হবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ভারত বিরোধী ছিল, আছে এবং ভবিষতেও থাকার সম্ভাবনা বেশী। ২০০৮ সনের নির্বাচনেও ৩৮% মানুষ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী[৫৭৫] ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন "যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে বিরোধীদল দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে।"[৫৭৬] অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, পানি চাই-বিদ্যুৎ চাই-গ্যাস চাই বলে শ্লোগান দিলেও সে শ্লোগান যুদ্ধাপরাধীদের বাচানোর জন্য হয়ে যায়। তাইতো বিরোধীদল পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাবীতে সমাবেশ আহ্বান করলে যুবলীগ-ছাত্রলীগ-কৃষকলীগের নামে পাল্টা সমাবেশ দিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর (?) ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে রক্ষা করছেন।

আইনমন্ত্রী বলেন "যুদ্ধাপরাধ আর মানবতাবিরোধী অপরাধ একই।"[৫৭৭] আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এবং সংশোধিত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ২০০৯ এর সংগা অনুযায়ী 'যুদ্ধাপরাধ' (War Crimes) এবং 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' (Crimes against Humanity) সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা অপরাধ; আইনমন্ত্রী যদি আইনের ভাষায় কথা না বলে রাজনীতির ভাষায় কথা বলেন তাহলে সৈয়দ বোরহান কবীরের "যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যতটা আইনি তার চেয়েও বেশি হলো রাজনৈতিক" বক্তব্যই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

---

[৫৭২] সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখ: ০১.০৪.২০১০

[৫৭৩] দলীয় না নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, শুভ কিবরিয়া, সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক তারিখ: ২৩.০২.২০১২

[৫৭৪] দৈনিক যুগান্তর; তারিখ: ০৪.০৪.২০১০

[৫৭৫] আওয়ামী বিরোধী; যেহেতু প্রতিমন্ত্রীর ভাষায় আওয়ামী বিরোধী অর্থই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী।

[৫৭৬] দৈনিক যুগান্তর তারিখ: ০৬.০৪.২০১০

[৫৭৭] বাংলাদেশ প্রতিদিন, তারিখ: ০৪.০৪.২০১০

www.pathagar.com

অধ্যায়: ছয়

৪১ বছরের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ (১৯৭১ থেকে ২০১২)

১৯৭০ সন থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বেশ কিছু মানবতাবিরোধী অপরাধ[৫৭৮] সংঘটিত হয়েছে যা প্রতিটি মানুষকে নাড়া দিয়েছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও সহায়তাকারীদের মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের বাইরে উল্লেখযোগ্য মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহের একটি বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

১৯৭০-৭১ এ বিহারি হত্যাকান্ড

১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনের পর আওয়ামী নেতা কর্মীরা বিহারিদেরকে তাদের শত্রুপক্ষ বিবেচনা করে আক্রমণ করা শুরু করে। রংপুর, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বিহারিদের উপর আক্রমণ করে হত্যাসহ তাদের সম্পত্তি বিনষ্ট করে।

৩ ও ৪ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামে বিহারিদের উপর হত্যাযজ্ঞ নেমে আসে। "At Chittagong, violent mobs led by Awami League storm troopers attacked the Wireless Colony and several other localities, committing wanton acts of loot, arson, killing and rape. In one locality (Ferozeshah Colony), 700 houses were set on fire and their inmates including men, women and children were burnt to death. Those who tried to flee, were either killed or seriously wounded. Apart from those burnt alive, whose bodies were found later, over 300 persons were killed or wounded on 3 and 4 March."[579]

(চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের জঙ্গীরা ওয়ারল্যাস কলোণীসহ বেশ কিছু স্থানে লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও ধর্ষণ চালায়। ফিরোজশাহ কলোণীতে ৭০০ ঘরবাড়িতে আগুন লাগায় যেখানে বসবাসকারী নারী, পুরুষ ও শিশুরা মারা যায়। যারা পালাতে চেষ্টা করে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বা মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। সেখানে ৩০০ মত লাশ পাওয়া গিয়েছে।)

৫৭৮ মানবতাবিরোধী অপরাধের সংগা পৃষ্ঠা নম্বর ১৮১ এ দেয়া আছে।

579 The Crisis in East Pakistan, Government of Pakistan, 5 August, 1971, p. 31.

www.pathagar.com

দি টাইমস অব লন্ডন তাদের এপ্রিল ৬, ১৯৭১ সংখ্যায় রিপোর্ট করেছে -

"Thousands of helpless Muslim refugees who had settled in Bengal at the time of partition arc reported to have been massacred by angry Bengalis during the past week........The facts about the massacres were confirmed by Bihari Muslim refugees who crossed the border into India this week and by a young British technician who crossed the Indo-Pakistan frontier at Hilli today....He said that hundreds of non-Bengali Muslims have died in the northwestern town of Dinajpur alone".

(হাজার হাজার সহায় সম্বলহীন মুসলিম উদ্বাস্তু যারা (১৯৪৭ সনের) দেশ ভাগের সময় পূর্ববঙ্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা গত সপ্তাহে বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের দ্বারা ধংসাত্মক আক্রমণের শিকার হয়। .... বিহারি মুসলিম উদ্বাস্তু যারা সীমানা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতে প্রবেশকারী একজন ব্রিটিশ টেকনিসিয়ান এ ধংসাত্মক আক্রমণের ঘটনা নিশ্চিত করেছেন.... তিনি (ব্রিটিশ টেকনিসিয়ান) বলেন উত্তর-পূর্ব শহর দিনাজপুরে শত শত অবাঙালি মুসলিম মারা গিয়েছে।)

এর চেয়েও ভীতিকর সংবাদ বেরিয়েছে ওয়াশিংটনস্থ সানডে ষ্টারের মে ৯, ১৯৭১ সংখ্যায়-

"In Khulna, newsmen on an army-conducted tour yesterday saw what a non-Bengali resident described as a human slaughter-house. Sheds were said to have been used by East Pakistan's dominant Bengalis in mass killings of Bihari immigrants from India, West Pakistanis and other non-Bengalis during March and early April at the height of the secessionist uprising....

(খুলনায় সেনাবাহিনীর সহায়তায় সফরকারী এক সংবাদকর্মী গতকাল জানান যে, তিনি একটি বিহারিদের বাড়ি দেখেছেন যাকে মানুষের কসাইখানা হিসেবে বর্ণনা দেন। পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী ভারত থেকে আগত বিহারী, পশ্চিম পাকিস্তানী এবং অন্যান্য অবাঙালীদেরকে মার্চ এবং এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বিচ্চিন্নতাবাদী বাঙালীদের দ্বারা নৃশংসভাবে মরতে হয়।)

৭০ এর নির্বাচনের পর থেকেই বিহারিদের উপর নির্যাতন নেমে আসে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত বিহারিরা নিজ নিজ আবাস ছেড়ে নিরাপত্তার স্বার্থে মোহাম্মদপুর ও মীরপুর এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। তারা চলাচল সীমিত করে। ১ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণার পর তাদের জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। তাদের অনেককেই কর্মস্থল থেকে, কর্মস্থলে যাওয়া আসার

www.pathagar.com

পথে অপহরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে বিশেষ করে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হল) বন্দী করে নির্যাতনসহ হত্যা করা হয়। ২৫ মার্চ তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য সেনাবাহিনী হলসমূহে অভিযান পরিচালনা করে।

বেসামরিক বিহারিদের হত্যা, নির্যাতন, সম্পত্তি লুন্ঠন ও ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত

স্বাধীনতার পরপরই ঢাকা, খুলনা, সৈয়দপুর, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, চট্টগ্রামসহ দেশের সকল স্থানে বিহারিদের উপর বিভিন্নমুখী নির্যাতন চালানো হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী তাদের অস্থাবর সম্পত্তি হরণের জন্য স্থাবর সম্পত্তি দখল, পূর্ব শত্রুতা উদ্ধার, কতিপয় বিহারির অপকর্মে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের প্রতিশোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য বিহারিদের উপর আক্রমণ নির্যাতন সহ হত্যাকান্ড ঘটানো হয়।

ময়মনসিংহের একজন মুক্তিযোদ্ধা বললেন, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর পর পর আমরা প্রতিপক্ষকে হত্যার মাধ্যমে আমাদের প্রতিশোধ নিয়েছি। অবাঙালি এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বাঙালিদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার ছাড়াই এবং কখনো কখনো এমনকি ক্যামেরার সামনেও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকায় বিদেশী সাংবাদিকসহ হাজার হাজার জনগণের সামনে এবং যা ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে, মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী তার সঙ্গীদের নিয়ে চারজন বন্দীকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্তান সমর্থক ভাইস-চ্যান্সেলরকে ১৯ ডিসেম্বর ধরে নিয়ে পিটিয়ে, ছুরিকাঘাত করে পরের দিন সকালে মৃতবৎ অবস্থায় ঢাকার রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। শেখ মুজিব ফেরত আসার পর ১৯৭২ সালের মার্চের শেষে সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে খুলনায় বিহারিদের আরেক দফা গণহত্যা করা হয়।[৫৮০]

ভারতের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলনের সময় থেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিহারিরা একত্রে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঢাকায় মিরপুর-মোহাম্মদপুর, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনাসহ প্রতিটি এলাকাতেই তারা সামাজিক শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একত্রে থাকা শুরু করে। ৭০ সনের নির্বাচনের পূর্বেই তারা বাংলা ভাষাভাষীদের শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে পড়ে। ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে আহুত অধিবেশন স্থগিত করলে এরা রোষের শিকার হয়। অনেক স্থানে বিহারিদের উপর বাঙালিরা আক্রমণ চালায়। কিছু কিছু স্থানে বিহারিদের দ্বারা বাঙালি আক্রান্ত হলেও সংখ্যাগত কারণেই তারা হেরে যায়। তাদেরকে হত্যা, নির্যাতন,

---

৫৮০ Anatomy of Violence, Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971, Sarmila Bose, Economic and Political Weekly, October 08, 2005; p 4468 এর অংশ বিশেষ বঙ্গানুবাদ।

www.pathagar.com

তাদের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, লুট-পাট চালানো হয়। তবে ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের পূর্বে এমন কতগুলো সংঘাত হয়েছে, তাতে কতজন বাঙালি অথবা কতজন বিহারি মারা গিয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান কোথাও নেই।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখের পর[৫৮১] থেকে বিহারিদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করা শুরু হয়, যার কোন পরিসংখ্যান কোথাও নেই। এ ঘটনাগুলোও লিপিবদ্ধ নেই। এরকম হত্যাকান্ডের কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দেয়া হলো--

১. "নবলব্ধ স্বাধীন দেশে এক দিনের ইতিহাস সৃষ্টি করে ১৭ই ডিসেম্বরে যে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সূচনা হল তাতে আমার আশংকা শুধু বৃদ্ধিই পেল না বরং সত্য বলতে কিছুটা ভীতিতে পরিণত হল। রাস্তায় মানুষের হৈ চৈ শুনে জানালার পরদা সরিয়ে যা দেখলাম তা ছিল সত্যই মর্মবিদারক। আদমজী কোর্ট ও বাওয়ানী বিল্ডিং-এর উর্দূভাষী দারওয়ানগুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে এবং মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য গুলি করে ইতি করা হচ্ছে। দারওয়ানগুলো সংখ্যায় পনের/ষোল জন। অধিকাংশই ছিল বৃদ্ধ কিন্তু ওদের মৃত্যুর কারণ ছিল ওরা বাঙালী নয়।"[৫৮২]

২. এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে একটি নৃশংস গৃহযুদ্ধের পর পর এবং যখন ঢাকায় কোন প্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল না, যে সরকার কিনা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। নুতন সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিশেষতঃ জানুয়ারীর প্রথম দিকে শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকা প্রত্যাবর্তন ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর এ ধরণের প্রতিশোধপরায়ণ হত্যা বন্ধ হয়। যোগসাজশকারীদের বিচারের প্রক্রিয়া আদালতের হাতে সোপর্দ করা হয়। সাধারণভাবে সরকারের এই নীতি সফল ছিল, যদিও বিহারীদের প্রতি সংঘবদ্ধ সহিংসতা মাঝে মাঝেই সংঘটিত হতো। এ ধরণের একটি সংগঠিত সহিংস ঘটনা ১৯৭২ সনের মার্চে খুলনায় সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় বাঙালিদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতায় ২০০ জন বিহারী নিহত হয়।[৫৮৩]

---

৫৮১ কোন কোন জেলায় তার পূর্ব হতেই।

৫৮২ মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন, সাদ আহমদ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯০ ; পৃঃ ১১

৫৮৩ THE EVENTS IN EAST PAKISTAN, 1971: A Legal Study, The Secretariat of International Commission of Jurists, Geneva, 1972 এ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে- It must be remembered that these incidents occurred in the immediate aftermath of a most brutal civil war, and took place at a time when no government had yet been established in Dacca, let alone been able to take action to restore law and order. As soon as the new government was established and in particular after Sheikh Mujibur Rahman returned to Dacca early in January to assume the office of Prime Minister, all the authority of the new Government was brought to bear to stop

www.pathagar.com

যশোর হত্যাকাণ্ড

৩. পাশের ছবি দু'টি যশোর হত্যাকান্ডের বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। ২ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে এখানে যে হত্যাকান্ড হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সর্মিলা বোস বলেন, "It turns out that the massacre in Jessore may have been genocide, but it wasn't committed by the Pakistan army. The dead men were non-Bengali residents of Jessore, butchered in broad daylight by Bengali nationalists."[৫৭৫] ২ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে বিহারীদেরকে হত্যার চিত্রকে পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংস হত্যাকান্ড হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ছবি দু'টিকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল বিপরীত। বাঙালিদের দ্বারা নিহত বিহারীদের ছবিকে অপব্যবহার করা হয়। এম আর আখতার মুকুল বলেন,"তারিখটা মনে না থাকলেও মাসটি ছিল একাত্তরের মে মাস।..হালকা রং-এর গগল্‌স্‌ পরিহিত লম্বা-চওড়া এক অবাঙালি ভদ্রলোক এসে প্রবেশ করলো।...

these revenge killings and to leave the fate of collaborators to be determined by the courts after due process of law. In general this policy has been successful, though feelings against the Biharis are such that explosions of mob violence against them may recur. One such outburst occurred in Khulna in March 1972, when some 200 Biharis are believed to have been killed by a Bengali mob. P-29

৫৭৫ The Telegraph, India; March 19, 2006

www.pathagar.com

নিহত দাড়িওয়ালা রিক্সাচালক একজন উর্দূভাষী।[৫৭৬]

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ফটোটা হাতে নিয়ে রিক্সার লাশগুলোর একটা পৌঢ় শ্মশ্রুমন্ডিত লাশের উপর আঙুল রেখে বললেন,'ইনিই হচ্ছেন আমার জন্মদাতা'।"

স্বাধীনতার পর ভারতীয় বাহিনীর লুটতরাজ

পাকিস্তান বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করার পর পরই সকল সেনানিবাস, সেনাক্যাম্প, ইপিকাফ (ইপিআর-এর সর্বশেষ নাম। স্বাধীনতার পরে বিডিআর নামকরণ করা হয়, বর্তমানে বিজিবি), আনসার ক্যাম্প, পুলিশ ক্যাম্প, অর্থাৎ সমরাস্ত্র সংরক্ষিত স্থানগুলো হতে বিজয়ী বাহিনী তথা আমাদের মহাবন্ধু (ভারতীয় বাহিনীর সদস্য এ দেশের মানুষকে 'বন্ধু' সম্বোধন করতো আর আমরা তাদেরকে 'বন্ধু' সম্বোধন করতাম।) ভারতীয় বাহিনী পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক ফেলে যাওয়া সকল সমরাস্ত্র ভারতে নিয়ে যায়। ১৯৭২ সনের হিসাব অনুযায়ী ৫০০০ কোটি টাকার সমরাস্ত্র তারা ভারতে পাচার করে (বর্তমানে এর মূল্য ১৩১২৫০০ কোটি টাকা)। তা ছাড়া বিহারিদের বাড়িঘর থেকে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। বিত্তবান বাংলাদেশীদের ঘরে প্রবেশ করে তারা লুঠতরাজ চালায়।

মেজর জলিল "অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা" বই এ লেখেন, "দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধরা ১৬ই ডিসেম্বরের পরে মিত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ মালামাল লুণ্ঠন করতে

[৫৭৬] আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল; পৃ: ৮৭।

www.pathagar.com

দেখেছে। সে লুণ্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুণ্ঠন, সৈন্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ নয়। সে লুণ্ঠনের চেহারা ছিল বীভৎস-বেপরোয়া। সে লুণ্ঠন ছিল একটি সচেতন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা।

পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত কয়েক হাজার সামরিক বেসামরিক গাড়ী, অস্ত্র, গোলাবারুদসহ আরো অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 'প্রাইভেট কার' পর্যন্ত যখন রক্ষা পায়নি তখনই কেবল আমি খুলনা শহরের প্রাইভেট কারগুলো রিকুইজিশন করে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে হেফাজতে রাখার চেষ্টা করি। এর পূর্বে সেখানে যে গাড়ী পেয়েছে সেটাই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সীমান্তের ওপারে। যশোর সেনানিবাসে প্রত্যেকটি অফিস এবং কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে লুট করেছে। বাথরুমের মিরর এবং ফিটিংসগুলো পর্যন্ত সেই লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি নিরীহ পথ যাত্রীরা। কথিত মিত্র বাহিনীর এই ধরণের আচরণ জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে।"[৫৭৭]

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাঙালি হত্যাকান্ড

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১। ঢাকার প্রথম গণজমায়েতে মুক্তিযোদ্ধাদের কতিপয় নেতা শান্তি ও শৃংখলার আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করার পর হঠাৎ কি আবেগবশত বিদেশী সাংবাদিক ও টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে অজ্ঞাত অভিযোগে ধৃত চারজন বন্দীকে আধঘন্টা কাল ধরে পিটিয়ে অবশেষে বেয়নেট বিদ্ধ করে হত্যা করে।[৫৭৮] এ ব্যাপারে ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১ The Times লিখে " The problems the Indian army has over caring for its prisoners of war pales beside that of controlling Mr. Siddiqui, a Castro-like former student, who is already known as the 'Tiger of Tangail' with 16,000 Mukti Bahini under his command... Saturdays bayoneting, when the four bound prisoners were cold-bloodedly hacked to death by Mukti soldiers and Mr. Siddiqui, has received world-wide publicity and clearly put the Indian army in a dilemma. The army is concerned not to assume the responsibilities of an occupying army imposing law and order. On the other hand, it is law and order that Bangladesh needs and the Indian army is the only body strong enough to provide it.... But Mr. Siddiqui is a powerful figure. By moving against him, the Army is risking incurring the hostility of a large sector of the Bangladesh people."

---

৫৭৭ অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর এম এ জলিল; পৃ: ৩৭-৩৮

৫৭৮ মূলধারা ৭১, মঈদুল হাসান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ; পৃ: ১৯৮

www.pathagar.com

হচ্ছে একজন ক্যাস্ট্রোর মত প্রাক্তন ছাত্র, যিনি ইতোমধ্যে বাঘা সিদ্দিকী নামে পরিচিত এবং তাদের অধীনে রয়েছে ১৬০০০ মুক্তিযোদ্ধা ....শনিবারের বেয়নেট আক্রমণে, যার ফরে চারজন যুদ্ধাপরাধীকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়, কাদের সিদ্দিকী পরিচালিত মুক্তিবাহিনী কর্তৃক এই হত্যাকান্ড সারা বিশ্বে প্রচারণা পায় এবং স্পটতই এর ফলে ভারতীয় বাহিনী একটি উভয় সংকটে পড়ে যায়। ভারতীয় বাহিনী দখলকারী বাহিনী হিসাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিজেকে জড়িত করতে চাচ্ছিল না। অন্যদিকে বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং একমাত্র ভারতীয় বাহিনীই এটি রক্ষা করতে সমর্থ ছিল ....কিন্তু জনাব সিদ্দিকী ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব। কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে বংলাদেশের জনগণের একটি বিরাট অংশের সাথে ভারতীয় বাহিনীর বিপক্ষে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল।)

ওরিয়ানা ফ্যালাসি[৫৭৯] বলেন," আমার স্মরণ হলো, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন লোকজন বলছিল, মুজিব থাকলে সেই নির্মম, ভয়ঙ্কর ঘটনা কখনই ঘটতো না। মুজিব প্রত্যাবর্তন করলে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। কিন্তু গতকাল (সম্ভবত ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২) মুক্তিবাহিনী কেন আরও ৫০ জন নিরীহ বিহারিকে হত্যা করেছে? টাইম ম্যাগাজিন কেন তাকে নিয়ে বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে হেডলাইন করেছে? আমি বিস্মিত হয়েছি যে, ঐ ব্যক্তিটি ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে সাংবাদিক অ্যালডো শালতিনিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমার দেশে আমি সব চেয়ে সাহসী এবং নির্ভিক মানুষ, আমি বাংলার বাঘ, দিকপাল... এখানে যুক্তির কোন স্থান নেই...। আমি বুঝে উঠতে পারিনি আমার কি করা উচিৎ।"[৫৮০] তারপরও তিনি শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যার অংশবিশেষ-

"এরপর ১৮ ডিসেম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। নিচের অংশটুকু আমার টেপ থেকে নেয়া–

'ম্যাসাকার? হোয়াট ম্যাসাকার?'

'ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি।'

---

৫৭৯ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইটালির মহিলা সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্যালাসি দ্বিতীয়বারের মত ঢাকা আসেন। এবারের আগমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ যা তিনি ২৪.০২.১৯৭২ তারিখে গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় তিনি ঢাকায় ছিলেন।

৫৮০ ওরিয়ানা ফেলাচির জন্মদিন ও বাংলাদেশী নেতাদের নিয়ে তার মূল্যায়ণ, আবু জুবায়ের। http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=956 accessed on 19.05.2012

www.pathagar.com

'ঢাকা স্টেডিয়ামে কোন ম্যাসাকার হয়নি। তুমি মিথ্যে বলছো।'

'মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি মিথ্যেবাদী নই। সেখানে আরো সাংবাদিক ও পনেরো হাজার লোকের সঙ্গে আমি হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি চাইলে আমি আপনাকে তার ছবিও দেখাবো। আমার পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।'

'মিথ্যেবাদী, ওরা মুক্তিবাহিনী নয়।'

"মি. প্রাইম মিনিস্টার, দয়া করে 'মিথ্যেবাদী' শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তিবাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনিফর্ম পরা ছিল।"

'তাহলে হয়তো ওরা রাজাকার ছিল যারা প্রতিরোধের বিরোধিতা করেছিল এবং কাদের সিদ্দিকী তাদের নির্মূল করতে বাধ্য হয়েছে।'

'মি. প্রাইম মিনিস্টার, কেউ প্রমাণ করেনি যে, লোকগুলো রাজাকার ছিল এবং কেউই প্রতিরোধের বিরোধিতা করেনি। তারা ভীতসন্ত্রস্ত্র ছিল। হাত-পা বাধা থাকায় তারা নড়াচড়াও করতে পারছিল না।'

'মিথ্যেবাদী।'

"শেষবারের মতো বলছি, আমাকে 'মিথ্যেবাদী' বলার অনুমতি আপনাকে দেবো না।"

'আচ্ছা সে অবস্থায় তুমি কি করতে?'

'আমি নিশ্চিত হতাম যে, ওরা রাজাকার ও অপরাধী। ফায়ারিং স্কোয়াডে দিতাম এবং এভাবেই এই ঘৃণ্য হত্যাকান্ড এড়াতাম।'

'ওরা ওভাবে করেনি। হয়তো আমার লোকদের কাছে বুলেট ছিল না।'

'হ্যা তাদের কাছে বুলেট ছিল। প্রচুর বুলেট ছিল। এখনো তাদের কাছে প্রচুর বুলেট রয়েছে। তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গুলি ছোড়ে। ওরা গাছে, মেঘে, আকাশে, মানুষের প্রতি গুলি ছোড়ে শুধু আনন্দ করার জন্য।"[৫৮১]

সাদ আহমেদ বলেন "খেলাফত ভাইকে হত্যা করে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। কুমারখালির আজিজুল হক ভাইকে নদীর চরে নিয়ে মুখের মধ্যে বালি ভর্তি করে হত্যা করা হয়। ভেড়ামারার প্রসিদ্ধ আলেম আলহাজ্ব মাওলানা আহমদ হোসেন সাহেবকে তিন খন্ড করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। কুষ্টিয়া শহরের শওকত ভাইকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ গড়াই নদীর মধ্যে গুলী করে হত্যা করা হয়।

---

৫৮১ ঐ

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের ১৮ ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক বেসামরিক মানুষ হত্যা

দৌলতপুর থানার গাছিরদিয়াড় গ্রামের মুজিবর রহমান ভাইসহ তার পরিবারের প্রায় এগারোজনকে হত্যা করা হয়। কত ভাই-এর শরীরে কেটে লবণ দেয়া হয়েছে। কাউকে বা শীতের রাত্রিতে পানির মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। এরূপ হাজারো টুকরো খবর জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া গেছে। বহু রাজাকারদের গোটা পরিবারই খতম করে দেয়া হয়েছে।"[৫৮২]

রক্ষীবাহিনী ও লালবাহিনী কর্তৃক নির্যাতন

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নিয়মিত সামরিক বাহিনী শক্তিশালী করার পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয় রক্ষীবাহিনী। রক্ষী বাহিনী ও রাজনৈতিক লালবাহিনীর মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অন্যত্র দেয়া হয়েছে (পৃষ্ঠাঃ ১৮৫-১৮৯)।

পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড সিরাজ শিকদার হত্যাকাণ্ড

কমরেড সিরাজ শিকদারের হত্যাকান্ড সম্পর্কে তার বোন ঢাকা চারুকলা ইনষ্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপিকা শামীম শিকদার বলেন "সিরাজ শিকদারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন আওয়ামী লীগের যে প্রবীণ নেতা ও তৎকালীন মন্ত্রী কামরুজ্জামান আমাকে বলেছেন, ১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত

---

৫৮২ মুজিবের কারাগারে পৌণে সাতশ দিন, সাদ আহমদ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯০; পৃ: ২১

www.pathagar.com

১২টা ১মিনিটের সময় সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়। এদিন রাতে শেখ মুজিব ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসহ আরো অনেকে তৎকালীন গণভবনে উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব যে রুমে একা ছিলেন রাত ১১টার পর ঢাকার এসপি মাহবুব, সিরাজ শিকদারকে নিয়ে সে রুমে উপস্থিত হয়। সিরাজ শিকদারকে দেখেই শেখ মুজিব বলে উঠে তোমার পরিণতি কি জান? শান্ত ও ধীর কণ্ঠে সিরাজ শিকদার জবাব দেন একজন দেশপ্রেমিকের যা হওয়া উচিৎ তাই। এভাবে উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়। সিরাজ শিকদার ছিলেন এ সময় খুবই দুর্বল। তাছাড়া অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই সিরাজ শিকদার শেখ মুজিবকে বলল, আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট অথচ একজন দেশপ্রেমিকের সাথে কি আচরণ করা উচিৎ তাও জানেন না। তার এ কথা শুনে এসপি মাহবুব পিস্তলের বাট দিয়ে সিরাজ শিকদারের মাথায় আঘাত করে এবং শেখ মুজিব নিজেকে সামলাতে না পেরে জোরে চিৎকার করে উঠেন এবং সিরাজ শিকদারকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং রাত ১২ টা ১ মিনিটের সময় সিরাজ শিকদারকে হত্যার মধ্যে দিয়ে নববর্ষের সূচনা হয়।[৫৮৩]

৩২ হাজার জাসদ কর্মী হত্যাকাণ্ড

জাসদ হঠকারী রাজনীতি দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করলেও আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠ হওয়াতে অতি তাড়াতাড়ি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। আওয়ামী লীগ এ দলটিকে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে এর উপর ফ্যাসিবাদী কায়দায় আক্রমণ চালায়। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অন্যত্র দেয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা : ১৮৪)।

২৮ অক্টোবর ২০০৬ ঃ আওয়ামী লগি বৈঠার পৈশাচিকতা

বাংলাদেশের ইতিহাসে আরো একটি turning day হচ্ছে ২৮ অক্টোবর। ৩০ অক্টোবর ২০০৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার পূর্ব মুহূর্তে বিএনপি আর জামায়াত আলাদা আলাদা স্থানে তাদের বিগত পাঁচ বছরের সাফল্যের বর্ণনা দেওয়ার জন্য সমাবেশ ডাকে। আর আওয়ামী লীগ পরবর্তী সরকার গঠন করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শক্তিমত্তা দেখানোর জন্য লগি-বৈঠার সমাবেশ ডাকে। এ ধরণের মানবতাবিরোধী হত্যাকান্ড ঘটানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেত্রী গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে পল্টন ময়দান থেকে লগি বৈঠা লাঠি নিয়ে সমাবেশে আসার আহ্বান জানালে ইতিহাসের এই বর্বরতম দিনটির সূচনা হয়।

---

[৫৮৩] ৭১ এর গণহত্যার আসল নায়ক গোলাম আজম না শেখ মুজিব, খন্দকার আবুল খায়ের; পৃঃ ৩৩

www.pathagar.com

২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর হত্যাকান্ডের দৃশ্য

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া সাংবাদিকদের জানান যে, ঐ দিন সমাবেশে ২০০,০০০ লগি-বৈঠা নিয়ে নেতা-কর্মীরা সমাবেশে আসবে।[৫৮৪] সরকার থেকেও নেই এমন একটি অবস্থায় পুলিশ তার কার্যকর ভূমিকা রাখেনি বলেই সকলে মনে করেন। তৎকালীন পুলিশ মহা-পরিদর্শককে টেলিফোন করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলে তার কিছু করণীয় নেই বলে জবাব দিয়েছেন বলে প্রচারিত আছে। ৭ জন শিবির কর্মীকে পিটিয়ে মারা হয়। এ হামলায় প্রায় ৬০০ জন জামায়াত শিবির কর্মী আহত হয় । জামায়াত শিবিরের কর্মীদের প্রতিরোধে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজনও আহত হয়।

২০০৯-২০১২ ঃ গুম চর্চার আওয়ামী স্টাইল

ঢাকার ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলমসহ অনেক সামরিক[৫৮৫] বেসামরিক ব্যক্তিকে ইতোমধ্যে গুম করা হয়েছে। বিডিআরের ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রীকে সেনাকুঞ্জে যে সকল সেনা কর্মকর্তা বেশী বেশী প্রশ্ন করে জর্জরিত করেছিলেন একে একে তাদেরকে গুম করা হয়েছে বলেও শোনা যায়। আওয়ামী ঘরাণার সুশীল সেবক ও সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামালও আওয়ামী শাসনামলে গুমের ঘটনায় উদ্বিগ্ন।

গুপ্তহত্যার ঘটনা যে এখনই শুধু হচ্ছে তা নয়, ১৯৭১ সনের শেষ দিকে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা স্বপন চৌধুরীকে গুম করার মাধ্যমে এ চর্চা শুরু হয়। এ

---

৫৮৪ http://www.bangladeshnews.com.bd/2006/10/21/200000-sticks-oars-ready-for-awami-league/ accessed on 23.08.2012

৫৮৫ এ পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। তবে জানুয়ারি ২০১২ সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করার সংবাদ প্রকাশকালে কয়েকজন সামরিকবাহিনীর সদস্যের আত্মীয় স্বজনদের বিবৃতিতে এ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

www.pathagar.com

গুমের সাথে শেখ ফজলুল হক মনি জড়িত উল্লেখ করে হাসানুল হক ইনু বলেন, "আমার বিশ্বাস শেখ ফজলুল হক মনির গ্রুপের লোকেরা তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। ধরা পড়ার সময় তিনি প্রতিরোধ করেন এবং আহত হন। পাক বাহিনী স্বপন চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং গোপন খবরাখবর পাবার আশায় তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য রাঙ্গামাটি হাসপাতালে নিয়ে রাখে। ১৬ ডিসেম্বরের আগে আগেই রাঙ্গামাটির পতন ঘটে। স্বপন চৌধুরী তখনও হাসপাতালেই ছিলেন। পরদিন তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাকে গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়। যে নার্স তার চিকিৎসায় ছিলেন, তিনিও ১৯৭২ সনে গায়েব হয়ে যান। আমাদের ধারণা এ কাজও শেখ ফজলুল হক মনির গ্রুপের। স্বপন চৌধুরীর নিখোঁজ হবার সাক্ষী ছিলেন ওই নার্স।"[৫৮৬] ১৯৭২ থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত হাজার হাজার গুপ্তহত্যা হয়েছে। ১৯৭৩ সনের ৬ জুলাই তারিখের অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সংসদকে জানান যে, গত দেড়বছরে গুপ্তহত্যার সংখ্যা ২০৩৫ টি এবং দুস্কৃতিকারীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে ৪৯২৫ জন।[৫৮৭]

২০09 সনে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিচার বর্হিভূত হত্যার পাশাপাশি গুম করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি গুমের সাথে সরকার জড়িত বলে মানুষ বিশ্বাস করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসেব অনুযায়ী ২০১০ সনের জানুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত (১৯.০৪.২০১২) ২৭ মাস ১৯ দিনে সারা দেশে ১০০ ব্যক্তি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে অপহরণের শিকার হয়েছে এ সবই হচ্ছে Enforced Disappearence।[৫৮৮] দৈনিক আমার দেশে প্রকাশিত প্রতিবেদনে Enforced Disappearence এর সংখ্যা বলা হয় ১২২ জন।[৫৮৯]

আমার দেশ পত্রিকার ০১.০১.২০১২তারিখের প্রতিবেদনে বলা হয় "বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের হিসাব ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী গত বছরে (২০১১) শুধু ঢাকা থেকে ৩০ জনের বেশি গুম হয়েছে। লাশ পাওয়া গেছে মাত্র ১০ জনের। বাকিরা সবাই নিখোঁজ রয়েছেন মাসের পর মাস ধরে।

- ২৮ ডিসেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, রাজধানীতে ৪ ব্যক্তি ২১ দিন ধরে নিখোঁজ।
- ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিখোঁজ হওয়ার পর লাশ উদ্ধার।

---

৫৮৬ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মাসুদুল হক; পৃ: ১৭৩
৫৮৭ দৈনিক ইত্তেফাক ; জুলাই ৭, ১৯৭৩
৫৮৮ দৈনিক প্রথম আলো, তারিখ: ২০.০৪.২০১২
৫৮৯ দৈনিক আমার দেশ, তারিখ: ২১.০৪.২০১২

www.pathagar.com

- ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত সংবাদ বলা হয়, এবার পুলিশ সদস্য নিখোঁজ।
- ১৮ ডিসেম্বর আরেকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, অপহরণের পর ১৬ পরিবারের হাহাকার। তাদের অনুসন্ধানী সংবাদটিতে আরও বলা হয়, এক বছরে রাজধানী ও আশপাশ এলাকা থেকে ২৭ জনকে অপহরণ করা হয়েছে আইশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে। এর মধ্যে ১১ জনের লাশ পাওয়া গেলেও বাকি ১৬ জন নিখোঁজ।
- ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় দৈনিকগুলোতে আরও একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় অপরহরণ নিয়ে। সংবাদটিতে বলা হয়, ফরিদপুরে পাঁচজন নিখোঁজ। তাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাদা পোশাকধারীরা ধরে নেয়ার পর খোঁজ মিলছে না। ১৬ ডিসেম্বর অপহরণের পর লাশ উদ্ধারের আরও একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় জাতীয় দৈনিকগুলোতে।
- যশোর বিএনপির জনপ্রিয় নেতা নাজমুল ইসলাম ঢাকায় অপহরণের পর হাজিপুরে তার লাশ পাওয়া গেছে।
- ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, সাভারে অপহৃত হওয়ার পর এক মাস ধরে ব্যবসায়ীর হদিস নেই। একই সংবাদে বলা হয়, কিশোরগঞ্জে দুই বন্ধু নিখোঁজ।
- ১৫ ডিসেম্বর অপর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ভোলার বোরহানউদ্দিন থেকে বিদেশগামী যাত্রীকে বিদায় জানাতে ১১ নভেম্বর ঢাকায় এসেছিলেন ৭ জন। ওইদিন দুপুরে মালিবাগ এলাকা থেকে তাদের অপরহণ করা হয়। কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেয়া হয় তাদের ২ জনকে। ঘটনার ১০ দিন পর আশুলিয়া এলাকা থেকে তাদের একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। বাকি ৪ জনের খবর মিলছে না।
- একইদিন আরও একটি সংবাদ ছিল, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মাসুদ ২৯ নভেম্বর থেকে নিখোঁজ।
- ১৪ নভেম্বর জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, ধলেশ্বরীতে আরও ৩টি লাশ উদ্ধার।
- একইদিন অপর একটি পৃথক সংবাদে বলা হয়, বরগুনার দক্ষিণে সাগরে লাশ ভাসছে।
- ১০ ডিসেম্বর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ঢাকার হাতিরপুরল এলাকা থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ৩

www.pathagar.com

জনকে অপহরণ করা হয়। পরেরদিন পুলিশ মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে দু'জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ দু'টি ছিল তাহিরপুল থেকে অপহৃত দুই ছাত্রদল নেতার।

- ২৩ সেপ্টেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে জানানো হয় পুলিশের সদস্য পরিচয়ে ঢাকার দয়াগঞ্জ থেকে ৩ তরুণকে ধরে নিয়ে হত্যা।"[৫৯০]
- ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আল মুকাদ্দাস ও ওয়ালীউল্লাহ র‍্যাব পরিচয় দিয়ে ঢাকার নবী নগর থেকে গুম করা হয়। (০৮.০২.২০১২ তারিখের সকল জাতীয় পত্রিকা)

পিলখানা হত্যাকান্ড ঃ দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী নিধন

বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানায় ২০০৯ সনের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী বিডিআর সৈনিকেরা কথিত বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সেনাকর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭০ জন ব্যক্তিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে লাশ পুড়ানো, গুম করা, মাটি চাপা ও ড্রেনে ফেলে দেয়া, লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ নানা মানবতাবিরোধী অপরাধ ঘটায়। এ অপরাধের পেছনে আওয়ামী সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা কমবেশী সকলেরই জানা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন সংসদ সদস্য, তৎকালীন সেনা প্রধান মঈন এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত বলে দেশবাসী বিশ্বাস করে। এ বিদ্রোহ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম ধাপ তথা সীমান্ত প্রহরা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে দে'য়া হচ্ছে।

আনন্দমোহন কলেজ ঃ নারী নির্যাতন

৩০ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে রাতে ছাত্রলীগ আয়োজন করে ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানে পাচঁশ (৫০০) নারীকে যৌন নির্যাতন করা হয়।[৫৯১] মানবতাবাদী সরকার, তথাকথিত সুশীল সমাজ, নারীবাদী সংগঠন এর কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

১ বৈশাখ ১৪১৭ (১৪.০৪.২০১০) এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ছাত্রী নির্যাতন

বৈশাখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সাতান্ন (৫৭) জন ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা যে পৈশাচিকতা ও উল্লাস প্রকাশ করেছে, সেটার

---

৫৯০ গুপ্তহত্যা, বছরের ট্রাজেডি, অলিউল্লাহ নোমান, আমার দেশ; তারিখ: ০১.০১.২০১২

৫৯১ প্রথম আলো; তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০

www.pathagar.com

ভিডিও ফুটেজ প্রধান মন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার পর পত্রিকা তথা মিডিয়ার ঐ সংবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এটা কি পহেলা বৈশাখের রসিকতা (খ্রীষ্টানরা ১লা এপ্রিল যেভাবে উদ্‌যাপন করে) নাকি আদিম বর্বরতা। ৫৭ জন ছাত্রীর মধ্যে ইতিমধ্যে ৪৪ জন ছাত্রীর নগ্নছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা কোন মানবতা দেখিয়েছেন?[৫৯২]

এগুলো মানবতা বিরোধী অপরাধ হওয়ার যৌক্তিকতা

যুদ্ধাপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচারের জন্য ২০০৯ সনে সংশোধিত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে ট্রাইব্যুনালের বিচারিক এখতিয়ার বাড়ানো হয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী বা সহায়তা বাহিনীর সদস্যগণকে বিচারের সুযোগ রেখে (মূলতঃ বাদ দিয়ে) দেশের বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয় যা ১৯৭৩ সনের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে ছিল না। সুযোগ এসেছে ১৯৭০ সন থেকে ২০১১[৫৯৩] পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী সকল অপরাধের আলোচনা, বিশ্লেষণ ও বিচারের ব্যবস্থা করা। আলোচনার সুবিধার জন্য যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞাগুলো আরও একবার দেখা প্রয়োজন।

মানবতাবিরোধী অপরাধ : মানবতাবিরোধী অপরাধ হচ্ছে হত্যা, ধংসযজ্ঞ, দাসত্ব বরণে বাধ্য করা, উচ্ছেদ করা, জবরদস্তভাবে বন্দী, নির্যাতন, ধর্ষণ ও অন্যান্য অসামাজিক কর্মকান্ড যদি কোন বেসামরিক নাগরিকের উপর রাজনৈতিক, বর্ণ, গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কারণে করা হয়; যা ঐ রাষ্ট্রের দেশী আইন দ্বারা তা অপরাধ সংজ্ঞায়িত হোক বা না হোক।

গণহত্যা : গণহত্যা হচ্ছে জাতীয়তা, ধর্মীয়, গোষ্ঠী ও বর্ণগত অথবা রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে কাউকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কাজ করা হয়–

১. ঐ গোষ্ঠী বা দলের সদস্যদেরকে হত্যা করা হয়

২. ঐ গোষ্ঠী বা দলের সদস্যদেরকে শারীরিক বা মানসিকভাবে গুরুতর নির্যাতন করা হয়

---

৫৯২ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য।

৫৯৩ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোষ্ঠী বা দলের সদস্যদের সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জীবনহানি ঘটানো হয়

৪. যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ গোষ্ঠীতে জন্মধারণ বন্ধ করা হয়

৫. জোরপূর্বক যদি শিশুদেরকে এক গ্রুপ থেকে অন্য গ্রুপে হস্তান্তর করা হয়।

যুদ্ধাপরাধ : বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যুদ্ধের আইন ও প্রথাকে অমান্য করা, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে অধিকৃত এলাকার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা নির্যাতন করা বা দাস হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্বাসন দেয়া; অথবা বেসামরিক কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন কাজ দেয়া; যুদ্ধবন্দী বা দ্বীপে বা সাগরে বসবাসকারী বা জিম্মিদের হত্যা করা বা নির্যাতিন করা বা আটককৃত ব্যক্তিদের হত্যা করা। সামরিক প্রয়োজনে যুক্তিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো। সরকারী বা বেসরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করা বা নির্বিচারে নগর, শহর, গ্রাম ধ্বংস করা। যুদ্ধের আইন ও প্রথাকে ভঙ্গ করা। এর মধ্যে সীমিত নয় এমন কার্যাবলী হইতেছে: যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা; বা নির্যাতন করা; দাস হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্বাসন দেয়া; কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন কাজ দেয়া; যুদ্ধবন্দী বা দ্বীপে বা সাগরে বসবাসকারী বা জিম্মিদের হত্যা করা বা নির্যাতিন করা বা আটককৃত ব্যক্তিদের হত্যা করা; সরকারী বা বেসরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করা। সামরিক প্রয়োজনে যুক্তিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো।

গত চল্লিশ বছর ধরে যে সকল মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হলো। এ অপরাধসমূহ যে মানবতাবিরোধী অপরাধ তার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো–

১. ১৯৭০ সনে গোষ্ঠীগত বৈষম্যের শিকার উর্দুভাষী নাগরিকদের উপর জুলুম নির্যাতনসহ হত্যাকান্ড পরিচালিত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে হাজার হাজার উর্দূভাষী মানুষকেও হত্যা করা হয়। যা ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের গণহত্যার সংগা অনুযায়ী উর্দূভাষী নাগরিকরা ছিল এক গোষ্ঠীর মানুষ। তাদেরকে রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে হত্যা, শারীরিক বা মানসিকভাবে গুরুতর নির্যাতন করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জীবনহানি ঘটানো হয়

২.১ রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী বাঙালিদেরকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ থেকে হত্যা করা শুরু হয়।[৫৯৪]

---

৫৯৪ দেশের কোন কোন অঞ্চলে এ হত্যাকান্ড আরো পূর্বেই শুরু হয়।

www.pathagar.com

২.২ ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনায় উজ্জীবিত মুজিববাহিনীর সদস্যরা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী হাজার হাজার আলেমকে হত্যা করে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের গণহত্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী শান্তি কমিটির সদস্য, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ধর্মীয় ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ, আলেম ওলামাগণ ছিলেন রাজনৈতিকভাবে এ গোষ্ঠীর মানুষ। তাদেরকে রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে হত্যা, শারীরিক বা মানসিকভাবে গুরুতর নির্যাতন করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জীবনহানি ঘটানো হয়।

৩.১ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর সকল সামরিক প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক সমরাস্ত্র সে দেশে পাচার করে এ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধংস করা।

৩.২ ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক বিহারিসহ বিত্তবান বাঙালিদের বাড়িঘর থেকে মূল্যবান সামগ্রী লুট করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া।

৩.৩ আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের যুদ্ধাপরাধের সংগা অনুযায়ী ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সনের ১৭ মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনী সরকারী ও বে-সরকারী সম্পত্তি লুণ্ঠন করে যুদ্ধাপরাধ করেছে।

৪.১ ১৯৭২ থেকে ১৪ আগষ্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত ৩২ হাজার জাসদের নেতা-কর্মীকে রক্ষীবাহিনী-লালবাহিনী দ্বারা হত্যা করা হয়।

৪.২ পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড সিরাজ শিকদারকে ১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর হত্যা করা হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের গণহত্যার সংগা অনুযায়ী জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল- জাসদের ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনের কারণে ৩২ হাজার নেতা-কর্মীকে বর্বরোচিত নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। এ পরিকল্পিত হত্যাকান্ড নিঃসন্দেহে ছিল মানবতা বিরোধী অপরাধ।

৫.১ বাংলাদেশের ইতিহাসে আরো একটি জঘন্য দিন হচ্ছে ২৮ অক্টোবর ২০০৬। আওয়ামী লীগ নেত্রীর আহ্বানে লগি-বৈঠা নিয়ে জামায়াতের সমাবেশে আক্রমণ করা হয়। এতে ৭ জন শিবির কর্মী নিহতসহ প্রায় ৬০০ জন জামায়াত শিবির কর্মী আহত হয়।

৫.২ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সনে ক্ষমতারোহণের পর রাজনৈতিক কারণে জামায়াতের প্রায় ৩০ হাজার নেতা-কর্মীকেকেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে জেলে পাঠিয়ে তাদের রাজনৈতিক অধিকারসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৫.৩ আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের মানবতাবিরোধী অপরাধের সংগা অনুযায়ী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের কারণে জবরদস্তভাবে বন্দী ও নির্যাতন করা হচ্ছে যা মানবতাবিরোধী অপরাধের সামিল। তাছাড়া একই আইনের গণহত্যার সংগা অনুযায়ী এ অপরাধে অপরাধী।

৬.১ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সনে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিচার বর্হিভূত হত্যার পাশাপাশি ২০১০ সনের জানুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত (১৯.০৪.২০১২) ২৭ মাস ১৯ দিনে সারা দেশে বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী, ঢাকার ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলমসহ ১০০ ব্যক্তি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে "গুম" হয়।[৫৯৫]

৬.২ পিলখানায় ২০০৯ সনের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রিপরিষদ ও কয়েকজন সংসদ সদস্য, তৎকালীন সেনা প্রধান মঈন ইউ আহমেদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সৈনিকদের দিয়ে[৫৯৬] ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭০ জন ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ নানা মানবতাবিরোধী অপরাধ ঘটানো হয়।

৬.৩ ৩০ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে রাতে ছাত্রলীগ আয়োজিত ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে পাচঁশ (৫০০) নারীকে যৌন নির্যাতন করা হয়।

৬.৪ ১৪.০৪.২০১০ পহেলা বৈশাখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সাতান্ন (৫৭) জন ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা পৈশাচিকতা ও উল্লাস প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের মানবতাবিরোধী অপরাধধের সংগা অনুযায়ী গুম, হত্যা, ধংসাযজ্ঞ, নির্যাতন, ধর্ষণ ও অসামাজিক কর্মকান্ড করার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধ করা হয়েছে; যার বিচার অবশ্যই করা দরকার।

---

[৫৯৫] দৈনিক প্রথম আলো, তারিখ: ২০.০৪.২০১২।

[৫৯৬] হত্যাকান্ডে বিডিআরের সৈনিকরা কতটুকু জড়িত ছিল সন্দেহ আছে। হত্যাকান্ডের সময় বাইর থেকে একটি গাড়িতে করে কিছু অস্ত্রধারী আসার ফুটেজ দেখা যায়।

www.pathagar.com

অধ্যায়ঃ সাত

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিসমূহের ভূমিকা এবং এদের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিসমূহকে আমরা মূলতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ সরাসরি অংশগ্রহণকারী (player) এবং দ্বিতীয়তঃ সহায়তাকারী (collaborators)। সরাসরি অংশগ্রহণকারী (player) হচ্ছে পাকিস্তান। এর সামরিক বাহিনীর লক্ষাধিক সদস্য দীর্ঘ ন'মাস বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। তাদের হাতে অগণিত সাধারণ মানুষসহ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা, সামরিক বাহিনীর সদস্য নিহত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়-আত্মসমর্পণ এ অঞ্চলে নতুন ভৌগলিক ও ইতিহাস রচনার অবস্থা সৃষ্টি করে। ভারত জেনেভা কনভেনশন পালন করতে গিয়ে পরাজিত পাকিস্তান বাহিনীর ৯৩০০০ সদস্যকে তার দেশে স্থানান্তর করে।

সহায়তাকারীরা (collaborators) আবার দু'টি মূল ধারায় বিভক্ত। প্রথমতঃ অভ্যন্তরীণ সহায়তাকারী (internal collaborators) এবং দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক সহায়তাকারী (International collaborators)। অভ্যন্তরীণ সহায়তাকারীরা আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত; যেমন–

১. ধর্মীয় ও সম্প্রদায়
- ইসলাম
- বৌদ্ধ
- চাক্মা, বুমাংসহ অন্যান্য উপজাতি

২. রাজনৈতিক
- ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী
- চৈনিক সমাজতান্ত্রিক

৩. পেশাগত
- বেসামরিক প্রশাসন তথা সিএসপি, ইপিসিএস
- বিচার বিভাগ (সম্পূর্ণ)
- পুলিশ বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী
- সামরিক বাহিনী (ক্ষুদ্রাংশ)
- রাজাকার (সম্পূর্ণ)

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ সহায়তাকারীদের (internal collaborators) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী গত ৪০ বছর তাদেরকেই শুধু স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাকী সকল ধর্মীয়-সম্প্রদায়, রাজনৈতিক এবং পেশাগত সহায়তাকারীদের পর্দার আড়ালে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশের পার্বত্য অঞ্চলের reconciliation and normalisation জন্য আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী চাকমাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছে; স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী কমরেড তোয়াহা-হকের সঙ্গে সখ্যতা করেছে । পেশাগতভাবে অভ্যন্তরীণ সহায়তাকারীদের মধ্যে শুধু রাজাকারদের বিরুদ্ধে আইন আদালত করা হয় বাকীরা থাকেন ধরা ছোয়ার বাইরে। সম্পূর্ণ বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যেখানে সহায়তাকারী হিসেবে বিচারের কাঠগোড়ায় দাড়ানোর কথা সেখানে তারা বিচারক হয়ে বিচার করেন, পুলিশ হয়ে তাদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারের সহায়তা করেন।

আন্তর্জাতিক সহায়তাকারী (International collaborators)

স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের আদর্শিক ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য, পারস্পরিক হানাহানি ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে বিশ্ব মূলতঃ দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়; WARSAW PACT ভুক্ত দেশসমূহ একদিকে আর NATO PACT ভুক্ত দেশসমূহ ও মুসলিমবিশ্ব অন্যদিকে অবস্থান নেয়। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজ নিজ বলয় বৃদ্ধি করার জন্য শক্তিসমূহ মরিয়া হয়ে উঠে। ভারত তার সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ১৯৭১ সনের ৯ আগস্ট বাণিজ্যিক চুক্তির নামে নতুন সামরিক চুক্তি করে। এরপর থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তান-ভারত নীতিতে পরিবর্তন এনে ভারতকে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য নিজে ও WARSAW PACT ভুক্ত দেশসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী জোট বা দেশসমূহের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানকে রক্ষা করা। পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করার জন্য এ সকল দেশ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং সপ্তম নৌবহরের মত সামরিক বহর প্রেরণ করতেও কোন দ্বিধা হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুশ' বছরের বেশী সময় ধরে এ বিশ্বে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অথবা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী "সন্ত্রাসীযুদ্ধ তথা মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ" (War against Humanity) সবকিছুর পেছনেই এ দেশটির ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। ১৯৭১ সনে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সামরিক জান্তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। US-Pakistan Mutual Defense

www.pathagar.com

Assistance Act 1949 and US-Pakistan Mutual Act 1951 ছাড়াও পাকিস্তান NATO বহির্ভূত SEATO ও CENTO'র সদস্য ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে চীনকে সঙ্গী হিসাবে পায়। "ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষের অনুসৃত পীড়নের নীতিকে প্রকৃতপক্ষে উৎসাহ জুগিয়ে মার্কিন সরকার পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক মীমাংসা এবং শরণার্থী সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে। নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময়ে গৃহীত মার্কিন অবস্থানটি ছিল পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) জনগণের বিরুদ্ধে।[৫৯৭] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সমরাস্ত্র সরবরাহসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে বার বার পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞে সরাসরি সহায়তা করেছে।

২৮ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ (জর্জ বুশ সিনিয়র পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট হন) তৎকালীন মহাসচিব উ'থান্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান, পূর্ব পাকিস্তানের মার্কিন সাহায্য সমন্বয়ের জন্য 'মার্কিন টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়েছে।[৫৯৮]

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে অষ্টম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান পাঠ্য বইতে বলা হয়, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। প্রথমদিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে মার্কিন সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদেরও আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। একাত্তরের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রচণ্ড ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। স্বভাবতই তাদের এ ভূমিকা বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থনে ভারত মহাসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠায়। তবে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে শেষ পর্যন্ত তারা সে নৌবহরকে কাজে লাগায়নি। পাকিস্তানের পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভণ্ডুল করতেও জাতিসংঘে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।"

চীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চীন পাকিস্তানের বড় বন্ধু হয়ে দাড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্লক ভারতের হয়ে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের পক্ষে দাড়িয়েছে। মাওবাদী সমাজতন্ত্রী চীন মূলত: মার্ক্সবাদকে আদর্শ ধরে চললেও নিজ ভূমির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন সমাজতন্ত্র (মাওবাদ) ভূ-রাজনৈতিকভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী ছিল। মার্কিনীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী ভূমিকার অংশীদার হিসাবে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক

---

৫৯৭ বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী; পৃ: ৫১০

৫৯৮ www.liberation warmuseum.org August 28, 1971 accessed on 14.11.2011

www.pathagar.com

গড়ে তোলে এবং পাকিস্তান এতে দূতিয়ালীর ভূমিকা পালন করে। এতে চীন–মার্কিন সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেলে উভয় দেশই পাকিস্তানের অখন্ডতার জন্য একত্রে কাজ করে।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত এক পত্রে বলেন, চীন সরকার মনে করে বর্তমানে পাকিস্তানে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার। চীনা নেতা পাকিস্তানকে আশ্বাস দেন, ভারত পাকিস্তানের ওপর হামলা চালালে চীনা সরকার ও জনগণ সবসময় পাকিস্তান সরকার ও জনগণকে তাদের রাষ্ট্রীয় সর্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ন্যায্য সংগ্রামে দৃঢ় সমর্থন দেবে।[৫৯৯]

ব্রিটেন

আমাদের দেশে যে দ্বিমুখী চরিত্রের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে তাকে 'ব্রিটিশ' বলে ডাকা হয়; কারণ ব্রিটিশ ভারতে ওদের শাসনামলে এদেশের মানুষ একই জিনিসের দু'টি ফল (result) দেখেছেন। "Divide and Rule" নীতি ব্রিটিশ ভারতে বিশেষ করে সুবে বাংলায় মুসলমানদেরকে নিঃস্ব করে ছেড়েছে। সেই ব্রিটিশরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করে। সরকারের একাংশ পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিল আর একাংশ ছিল পাকিস্তান খন্ড করায় বিশ্বাসী। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক ফোর্ড জানান, পাকিস্তানের সংহতির জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। তিনি আরো বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের শত্রুরা আওয়ামী লীগে প্রবেশ করে সরলপ্রাণ লোকদের বিপথে পরিচালিত করে এবং তারা বিদেশী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়।"[৬০০]

বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম কমন্স সভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা পাকিস্তান সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। আমরা পাকিস্তানের জনগণের বর্তমান সমস্যাসমূহের একটি রাজনৈতিক সমাধান চাই এবং বাইরে থেকে কেউ তা চাপিয়ে দিতে পারে না।[৬০১]

সৌদী আরবসহ মুসলিমবিশ্ব

বর্তমান মুসলিমবিশ্ব আর ১৯৭০-৭১ সনের মুসলিমবিশ্ব এক নয়, এ সত্যটি বিবেচনা করে ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হবে। সে সময় পাকিস্তান সামরিক শক্তিতে মুসলিমবিশ্বে প্রথম স্থানে অবস্থান করছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তার অবস্থান সুদৃঢ় ছিল। একাধারে তার নেতৃত্বে ইরান ও তুরস্ককে নিয়ে Regional Co-operation Development (RCD) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

---

৫৯৯ www.liberation warmuseum.org /Today/April 11, 1971 accessed on 14.11.2011

৬০০ www.liberationwarmuseum org/Today/August 5, 1971 accessed on 14.11.2011

৬০১ www.liberationwarmuseum org/Today/May 15, 1971 accessed on 14.11.2011

www.pathagar.com

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পাকিস্তান ছিল সর্ব-বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র এবং বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। মহাকবি ইকবাল, আবুল হাশিম, আক্রাম খাঁ, মাওলানা মওদূদী প্রমুখের মত বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব মুসলিমবিশ্বকে আলোকিত করে। এমন একটি দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে তা তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের কোন মুসলিম জাতীয়তাবাদী বা ইসলামী নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। তাই মুসলিমবিশ্বের সকল নেতৃত্বই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভারতের আগ্রাসী ষড়যন্ত্র হিসেবে গণ্য করেছেন, সাথে সাথে মুসলিমবিশ্বকে নেতৃত্ব শূন্য করার চক্রান্ত হিসাবে দেখেছেন। জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ২২ জাতি ইসলামী সম্মেলনে পাকিস্তানের ঐক্য ও ভৌগলিক অখন্ডতা রক্ষার প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

পাকিস্তান ভেংগে যাওয়াতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একটা হতাশায় নিমজ্জিত হয়; তারা প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদান থেকে বিরত থাকে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মুসলিমবিশ্বের নেতৃবৃন্দ এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসংখ্যাকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়; তারা ধর্মনিরপেক্ষ-সমাজতন্ত্রী বাংলাদেশকে মুসলিম বাংলাদেশ হিসাবে দেখার জন্য OIC ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সনে শেখ মুজিব লাহোরের OIC সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে সক্ষম হয়। এর অংশ হিসাবে মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের নেতৃত্বে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়েরি বুমেদিনের সহযোগিতায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক আদালতে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী হস্তান্তর বিষয়ে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের মামলার সব কাগজপত্র জমা দেয়ার তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ থেকে ১৭ মে ১৯৭৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলেও যুদ্ধাপরাধী সমস্যা নিরসনে আরব নেতারা সম্পৃক্ত হন। তাদের নেয়া উদ্যোগের ফলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক আদালতের রেজিস্ট্রার বরাবর চিঠিতে পাকিস্তান মামলাটি আর না চালানোর সিদ্ধান্ত জানায় এবং মামলাটি আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারাধীন মামলার তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ এক আদেশের মাধ্যমে আদেশ নম্বর ৩৯৩ এ মামলা বাতিল ঘোষণা করে এবং তালিকা থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ অবস্থায় আরব লীগ নেতাদের সাথে শেষ মুহূর্তের আলোচনায় অনেকটা নাটকীয়ভাবে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একই দিনে ইরান ও তুরস্ক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ পাকিস্তানের স্বীকৃতি লাভের পর একই দিনে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ও আই সি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানে আর কোন বাধা থাকেনা।[৬০২]

---

৬০২ মাসিক 'অন্য দিগন্ত'; এপ্রিল ২০১০

www.pathagar.com

অধ্যায়: আট

বাংলাদেশের জাতি সত্ত্বার সংকট ও যুদ্ধাপরাধ বিচার

"যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যতটা আইনি তার চেয়েও বেশী হলে রাজনৈতিক"।[৬৩৩] রাজনীতি হচ্ছে একটা আদর্শ অপর একটি আদর্শের উপর বিজয় লাভের কৌশল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যদি রাজনৈতিক হয় তা হলে এর পেছনে কমপক্ষে দু'টি আদর্শ থাকবেই। আদর্শিক দ্বন্দ্বের চিত্রগুলো (options) কি কি হতে পারে ---

১. ইসলামপন্থী এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী বনাম সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও হিন্দুবাদী।

২. পাকিস্তানপন্থী বনাম ভারতপন্থী বনাম বাংলাদেশপন্থী।

৩. রাজাকার, আলবদর, বনাম মুক্তিযোদ্ধা।

৪. দ্বন্দ্ব নিরসনবাদ (Conflict resolutionism) বনাম দ্বন্দ্ব প্ররোচণাবাদ (Conflict aggravationism)

৫. 'আসুন আমরা সবাই করি' বনাম 'আসুন আমরা কয়েকজন করি'

৬. দূরদর্শিতা বনাম পশ্চাৎমুখিতা

৭. 'আমাদের ইতিহাস ১৯৭১ থেকে' বনাম 'আমাদের ইতিহাস হাজার বছরের পুরানো'

রাজনীতির সঙ্গে ইতিহাসের একটা উৎস ভিত্তিক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। Winston Churchill এর "The longer you can look back, the farther you can look ahead." (যে জাতির ইতিহাস যত বেশী দীর্ঘ সে জাতির ভবিষ্যৎ তত সমৃদ্ধ) উক্তিটি আবারো উল্লেখ করা হলো। নতুন প্রজন্মের ইতিহাসবিদরা বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭১ সাল থেকে শুরু করেন। এ ধারাটি এতই প্রবল যে সকল ধরণের মিডিয়াই ৭১ থেকে শুরু করে ইতিহাস রচনায় ব্রত। ধারণাটি (assumption) এমন যে বাংলার ইতিহাস হচ্ছে ৪০(চল্লিশ) বছরের। বিপরীতে আর একদল ঐতিহাসিক আছেন যারা মৃত্যুর দিন গুণছেন, তারা বাংলার ইতিহাস হাজার বছর পূর্ব থেকে শুরু করেন। এভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস এবং বাংলার তিহাসের ধারণা (Assumption of Bengal History) রাজনৈতিক আদর্শিক দ্বন্দ্বে (Politico philosophical[৬৩৪] conflict) পতিত হয়েছে।

---

[৬৩৩] জেগে থাকো যুবলীগ, সৈয়দ বোরহান কবীর, দৈনিক আমাদের সময়; ৩০.০৫.২০১০

[৬৩৪] মূলতঃ রাজনীতি হচ্ছে দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংগ্রাম। আদর্শ থেকে রাজনীতিকে এবং রাজনীতি থেকে আদর্শকে বিভাজন করতে যাওয়াটা বোকামী। এ দেশে ধর্মীয় আদর্শকে নিরপেক্ষ (অর্থাৎ zero) করার চেষ্টা চলছে।

www.pathagar.com

ইসলামপন্থী এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী বনাম সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও হিন্দুবাদী

ইসলামের সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দ্বন্দ্ব হচ্ছে আদর্শিক (Philosophical)। ইসলামের বিশ্বাস হচ্ছে এক আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর অবিচল আস্থা সেখানে সমাজতন্ত্র কোন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী নয়, বরং বলা হচ্ছে "relegion is the opium –ধর্ম হচ্ছে আফিম "। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এ ধর্মেও নেই ও ধর্মেও নেই; যেমন জোট নিরপেক্ষতা হলো NATO জোটেও নেই WARSAW জোটেও নেই। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্মহীনতা যা সমাজতন্ত্রের সমর্থক।

পাকিস্তানপন্থী বনাম ভারতপন্থী বনাম বাংলাদেশপন্থী

মীর জাফর তথা বিশ্বাসঘাতক যুগে যুগে দেশে দেশে তৈরী হয়। অর্থের লোভে, নারীর প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে কত মীরজাফর তার জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে তার হিসেব নেই। ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক যুগে মানুষকে ব্ল্যাক-মেইলিং করা আরো সহজ হয়েছে। আর এ হাতিয়ারকে ব্যবহার করে কত বীর মদন লাল মীর জাফরের খাতায় আর কত মীর জাফর বীর মদন লালের খাতায় নাম লেখাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এর ফাঁদে পা দিয়ে এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারতপন্থী আবার অনেকে পাকিস্তানের প্রতি অহেতুক দুর্বলতার কারণে পাকিস্তানপন্থী হয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগ ও এর সমমনা দলগুলো ইসলামপন্থী মুসলিম জাতিয়তাবাদী দল বা মানুষগুলোকে সোজা সাপ্টায় রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করে পাকিস্তানপন্থী ভাবে; বিপরীতে ভারতের প্রতি তাদের অতিমাত্রিক নতজানু মনোভাবের কারণে তারা নিজেদেরকে ভারতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদের সাম্প্রতিক ভারতায়ন (Indianisation) কর্মসূচি তাদেরকে 'যতটা বাংলাদেশী তারচেয়েও বেশী ভারতীয়' হিসেবে দেশের মানুষ মনে করে। কিন্তু নিরেট কথা হচ্ছে দেশের মানুষ পাকিস্তানপন্থী বা ভারতপন্থী না হয়ে তারা বাংলাদেশপন্থী হতে চায়।

রাজাকার-আল বদর বনাম মুক্তিযোদ্ধা

বাংলাদেশে রাজাকার আলবদর বা আলশামস আজো ঘৃণিত শব্দ। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধীতাকারী হিসেবে পরিচিত পরাজিত শক্তির সহায়তাকারী রাজাকার আলবদর শুধু ইসলামপন্থী মুসলিম জাতিয়তাবাদীদের অন্তর্ভূক্তি না হলেও একমুখী প্রচারণার ফলে তা-ই আজ গোয়েবলসীয় সত্যতে রূপ নিয়েছে। দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশে ইসলাম বিরোধী, মুসলিম বিদ্বেষীরা মুক্তিযুদ্ধের ধারক বাহক হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। নিজে রাজাকার হিসেবে কাজ করেও ইসলাম বিরোধী মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে গণ্য হয়ে মুক্তিযোদ্ধা সাজার সংখ্যা কম নয়। বাবা, চাচা, ভাই বা নিকটাত্মীয় শান্তিকমিটির নেতা বা রাজাকার, আলবদর সত্ত্বেও নিজে ইসলাম বিরোধী-মুসলিম বিদ্বেষী হওয়ার কারণে কোন প্রকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করেও

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন। জেনারেল ওসমানীর তথ্য অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। আজ মন্ত্রী, সাংসদ, সচিব বা সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী, ব্যবসায়ীসহ সকলেই মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের অফুরন্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট সংগ্রহে উঠে পড়ে লেগেছেন। মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট বিক্রি ও সংগ্রহের কেলেংকারী জাতিকে আবারো পঙ্গুত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মিথ্যা ও ভূয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহে যারা পিছিয়ে পড়েছে অথবা নৈতিকতা বোধের কারণে যারা এ ধরনের সার্টিফিকেট সংগ্রহ থেকে বিরত থেকেছে তারাই রাজাকার আলবদর হিসেবে সমাজে গণ্য হয়েছে।

দ্বন্দ্ব নিরসনবাদ বনাম দ্বন্দ্ব প্ররোচণাবাদ

সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, স্বাধীনতার যুদ্ধ অথবা ভোটযুদ্ধের পর সকল দেশ তার নাগরিকদের মধ্যে সংহতি ফিরিয়ে আনার জন্য দ্বন্দ্ব নিরসনবাদ তত্ত্ব প্রয়োগ করে থাকে। বিপরীতে অন্যরাষ্ট্রে দুর্বল রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক–সামাজিক কাঠামো স্থায়ী করার জন্য দ্বন্দ্ব তৈরীবাদ ও দ্বন্দ্ব উৎসাহবাদ তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এক বছরের মাথায় তৎকালীন শেখ মুজিব সরকার এ সত্য উপলব্ধি করেন এবং নাগরিক দ্বন্দ্ব নিরসনে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ এ ধারাবাহিকতা বহাল রাখেন।

ভোটে জয় লাভ করার পর বিজয়ী দলের নেতা 'আমার দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক'কে সম্বোধন না করে 'আমার জনগণ'কে সম্বোধন করে সকল দ্বন্দ্ব অসহিষ্ণুতা পরিহার করার আহ্বান জানানোর পরিবর্তে ২০০৮ সনের নির্বাচনে জয় লাভের পর দেশের প্রতিটি সেক্টরে দ্বন্দ্বকে উৎসাহিত করা হয়। বেসামরিক প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, বিচার বিভাগ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে শ্রমিক কর্মচারি সকল স্ত রে জনগণকে বাদ দিয়ে দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের নিয়োগ পদায়ন করে জনগণের সঙ্গে দলের দ্বন্দকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। কিছু বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক অন্যরাষ্ট্রের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য তৎপর। তারা জাতিরাষ্ট্রের Inner conflict resolution system অকার্যকর করে Inner conflict aggravation system চালু রাখতে ব্যস্ত।

'আসুন আমরা সবাই করি' বনাম 'আসুন আমরা কয়েকজন করি'

দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। দেশের শতকরা ৮০ জনকে মূলধারা থেকে বাইরে রেখে বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামো তৈরী করার জন্য কিছু বুদ্ধিজীবী–সাংবাদিক ও অন্যান্য পেশাজীবী প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শতকরা ৮০ জন মূলধারার মানুষ হচ্ছেন–

১.	আওয়ামী লীগ বিরোধী জনশক্তি	৬০%
২.	আওয়ামী লীগ সমর্থক অথচ দাড়ি টুপিধারী	০৫%
৩.	ভাসমান ভোটারদের একাংশ	১৫%

www.pathagar.com

২০ শতাংশ মানুষ দেশের ৮০ শতাংশ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শক্তি এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ভোগ করতে চাচ্ছেন। লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এর মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ হচ্ছেন অমুসলিম।

দূরদর্শিতা বনাম পশ্চাৎমুখিতা

রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে রাষ্ট্রনায়কদের দূরদর্শিতার উপর। পশ্চাৎমুখী বা অল্পদর্শী নেতা দ্বারা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, আমলা, বিচারক সব সময়েই অল্পদর্শিতা নিয়ে তৃপ্ত আর পশ্চাৎমুখিতা নিয়ে উৎফুল্ল। তারা মাহাথির মুহাম্মদের প্রশংসা করেন কিন্তু তার মত পঞ্চাশ বছরের দূরদর্শিতা তাদের নেই। সকল সময় পশ্চাৎমুখী চিন্তায় তারা ব্যস্ত। এতে রাষ্ট্রকে পশ্চাৎমুখী করা হচ্ছে। কখনো কখনো অন্যের প্ররোচণায় এ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে দেশের পরিবর্তে স্বীয় উন্নতিতে মত্ত। যারা দেশকে সামনের দিকে অগ্রসর করার জন্য পশ্চাতের বিভেদ ভুলে যাওয়ার কথা বলেন তাদেরকে হতে হয় পাকিস্তানপন্থী, স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার আলবদর।

'আমাদের ইতিহাস ১৯৭১ থেকে' বনাম 'আমাদের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো'

বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার ইতিহাস ১৯৭১ বা ১৯৫২ সালের থেকে উৎসরিত নাকি এর পুরোনো ইতিহাস আছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাংলার আদি জনগোষ্ঠীগুলো তথা বঙ্গ, পুন্ড্র ও গৌড়ের ভাষা ছিল অস্ট্রিক। সম্রাট আকবরের সময় রচিত আইন-ই-আকবরই প্রথম এ দেশের নাম উল্লেখ করা হয় বাংলা। তার আমলেই বাংলা সন প্রচলন হয়। ৭৫০ সনে গোপালের পাল বংশের উদ্ভব ঘটলেও বাংলার মানুষেরা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়,আর্য, মঙ্গলীয়, সেমিটিক, এ্যারাবিক, নিগ্রো, পার্সিয়ান জাতি সমূহের সঙ্কর জাতি হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আমলে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করেন। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে এ জনপদের অস্তিত্ব থাকলেও কতিপয় বুদ্ধিজীবী আর রাজনীতিবদ এ ইতিহাসের দিকে নজর দেন না। এ কারণে আজকের প্রজন্ম বাংলার আদি ইতিহাস না জেনেই বসে আছে। তথাকথিত অবার্চিন বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা থেকে বুঝা যায় ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এই হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস। যারা ১৯৫২ সন থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করেন তারা এক বাঙালির ইতিহাস লিখতে চান। আর যারা হোসেন শাহ বা আরো আগ থেকে ইতিহাস লিখতে চান তারা বাঙালি দুটি বৃহৎ জাতি তথা বাংলা ভাষী মুসলিম এবং বাংলা ভাষী হিন্দুর ইতিহাস লিখতে চান। এ ইতিহাসে স্বাতন্ত্রবোধ আছে, গৌরব আছে, আত্ম-মর্যাদা আছে।

www.pathagar.com

শরৎচন্দ্র স্বাতন্ত্রবোধ থেকেই বলেন "বাঙ্গালী আর মুসলমানদের মধ্যে ফুটবল খেলা হবে।" নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি, পরাধীন মনোভাব ত্যাগ করে বাংলাভাষী মুসলমানদের ইতিহাস হাজার বছরেরও পুরোনো এ সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে।

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর বক্তব্য

আমাদের জাতীয় পরিচয় বুঝা ও আলোচনার বোধগম্যতার স্বার্থে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর উদ্ধৃতিটি প্রনিধানযেগ্য --

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর ভাষায় "রুরাল বেঙ্গল বা পল্লী বাঙলার ঢাকা কেন্দ্রিক জীবন প্রথম দিকে কিছুটা সংশয় ও বিমূঢ়তার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। তাদের ভাষা হবে কোনটা? নবদ্বীপ[৬০৫] কলকাতার পরিশীলিত সংস্কৃতবহুল ভাষা ? না, মধ্যযুগীয় পুথির আরবী ফার্সি (বইতে 'ফরাসি' উল্লেখ আছে) মিশ্রিত 'যাবনী মিশাল'[৬০৬] অপরিশীলিত বাংলা ভাষা? তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার কী? আলাওল[৬০৭] থেকে রবীন্দ্রনাথ[৬০৮]? না গোলেস্তাবুস্তা[৬০৯] থেকে গোলাম মোস্তফা[৬১০]? তাদের জাতীয় বীর কে? বহিরাগত আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজি? না বিজিত লক্ষণ সেন? তাদের জাতীয় পরিচয় কী হবে? বাঙালী মুসলমান নাকি মুসলমান পাকিস্তানী? নাকি শুধুই বাঙালী।"[৬১১]

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর বক্তব্যকে যদি দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের (Dialectic Theorem) ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করি তা হলে 'আমরা কারা' এর উত্তর বের করা বাঞ্ছনীয়।

'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' যার কলমে আসে তিনি ভাষার প্রশ্নে এমন পরাধীনতার চিন্তা কিভাবে করেন তা ভাবতে কষ্ট হয়। নিজের ভূমির ভাষাকে ছোট করে নদীয়া ও কলকাতার ভাষা গ্রহণ করার পরাধীন মানসিকতা তাকে নিজ পরধর্মে পরাধীন হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। আরবী ফারসিকে মধ্যযুগীয়[৬১২] ভাষা দাবী করে কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে সুর মিলিয়ে মুসলমানকে যবন জাতি আখ্যা দেন তিনি। মুসলমানদের শব্দ মিশ্রিত ভাষাকে যাবনী মিশাল (যবনের ভাষাকে যাবনী বলে) আখ্যা দিয়ে (আরবী, ফারসিসহ ইংরেজি, পুর্তগীজ, ফ্র্যান্স, স্পেনিশ, লেটিন, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভাষা বাংলা ভাষা মিশ্রিত হয়ে এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে) ইসলামী শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ ভাষা বর্জন করার আহ্বান সুদূর ষড়যন্ত্রের অংশ বলেই ধরে নেয়া যায়।

---

৬০৫ নবদ্বীপ নদীয়া জেলার একটি শহর।

৬০৬ 'যাবনী মিশাল' হচ্ছে যবন তথা মুসলমানদের ভাষা। ভারতচন্দ্র বলেন 'অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল'।

৬০৭ কবি আলাওল মুসলিম কবি হলেও তার কাব্যে অতিমাত্রিক হিন্দু পৌরনিক প্রভাব ছিল। পদ্মাবতী তার অমর গ্রন্থ।

৬০৮ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমানদেরকে যবন, ম্লেচ্ছ বলে গালি দিতেন।

৬০৯ গোলেস্তাবুস্তা কোন কবি সাহিত্যিকের নাম নয়। শেখ সা'দী (রঃ)এর অমর কাব্যগ্রন্থ গোলেস্তা (Rose Garden) ও বুস্তা (The Orchid)।

৬১০ গোলাম মোস্তফার বিখ্যাত বই 'মোস্তফা (সাঃ) চরিত/ বিশ্বনবী (সাঃ)

৬১১ ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; পৃ: ১৬৯-১৭০

৬১২ বর্বরযুগীয় বুঝাতে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

আমরা কি কবি রবীন্দ্রনাথের ম্লেছ বা যবন জাতি না আমরা গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবীর[৬১৩] উম্মত? আমরা কি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির জন্য গর্ব অনুভব করি না আমরা লক্ষ্মণ সেনের পতনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শিবাজীর মতো বীরের অপেক্ষায় রয়েছি? হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর প্রশংসা করে শেখ সা'দী (রহঃ) 'বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাশাফাত দোজা বি জামালিহি, হাসনাৎ জামিউ খেসালিহি, সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি' যে কবিতা লিখেছেন তা পড়বো না শ্রীলঙ্কার রাণী পদ্মাবতীকে চিতোরের রাজা রত্নাসেন কিভাবে বিয়ে করলো তা নিয়ে আলাউলের ভালগার কাব্যগ্রন্থ পদ্মাবতী আমাদের উপজীব্য হবে, তা চিন্তা করতে হবে।

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী আমাদেরকে দ্বন্দ্বে ফেলেছেন; এসব সিদ্ধান্তমূলক প্রশ্নের উত্তর যাই হোক তা নির্ধারণের পথ একটি; যা সরাসরি বিশ্বাস করতে হবে, মুখে প্রকাশ করতে হবে এবং কর্মে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আমি হয় মুসলিম নতুবা হিন্দু; কিছুটা মুসলিম আর কিছুটা হিন্দু এর কোন সুযোগ নেই। গাফ্ফার চৌধুরীর মতো সংশয়ে থাকার সুযোগ নেই। একজন মুসলিমকে অন্তরে বিশ্বাস করতে হয় যে সে মুসলিম, মুখে বলতে হবে যে সে মুসলিম এবং তার কর্ম দিয়ে বুঝাতে হবে যে সে মুসলিম (সব কিছুই কোরান-সুন্নাহ এর আলোকে) বিপরীতে একজন হিন্দুকে বিশ্বাস করতে হবে যে সে হিন্দু, মুখে প্রকাশ করতে হবে যে সে হিন্দু এবং কর্মে প্রকাশ করতে হবে যে সে হিন্দু (বেদ, গীতা, মনুসংহিতা, মহাভারতের আলোকে)।

আদর্শিক দ্বন্দ্ব (Philosophical Conflict) বা রাজনৈতিক আদর্শিক দ্বন্দ্ব (Politico philosophical Conflict) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্বকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে–

১. ইসলামপন্থী ও মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার শপথ নেন, তারা পাকিস্তানপন্থী হিসাবে তখন চিহ্নিত হন।

২. একদল নেতা পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে ভারতের অঙ্গরাজ্য করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন; এদের সঙ্গে যোগ দেন কিছু উপ-নেতা আর পাতিনেতা যারা ভারতের হাত ধরে এদেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঐ হাত ধরা যে পা' ধরাতে রূপ নেবে তা তারা বুঝতে পারেনি এবং এমন একদল মানুষ এদের সঙ্গে একত্রিত হয়েছিল যারা হিন্দু জীবনধারা ও সংস্কৃতি তার নিজের ইসলামী মূল্যবোধ থেকে উপরে তুলে ধরায় ব্রতী হন। সকলেই হিন্দুবাদী হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন।

---

[৬১৩] গোলাম মোস্তফার অমর বই বিশ্বনবী (সাঃ)।

www.pathagar.com

৩. অপর গ্রুপটিতে ছিলেন যারা পাকিস্তান থেকে ভাগ হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভারত বা রাশিয়ার কৃপায় নয়; তাদের অধিকাংশই নীরব থেকেছেন, পরবর্তী পরিস্থিতি বুঝতে চেয়েছেন এবং শেষে ভারত ও রাশিয়ার সাহায্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে শংকিত ও নীরব থেকেছেন।

৪. একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভাসমান ভোটারদের মত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব শুনে পুলকিত হতেন; আবার পাকিস্তানী বাহিনীর সফলতায় উল্লসিত হতেন।

বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পরপরই পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আধা সামরিক বাহিনী পুলিশ, আনসার বা রাজাকারসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তাকারীদের বিচার করার জন্য কলাবরেটর আদেশ ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ প্রণয়ন করা হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য। কিন্তু আইনের চেয়ে রাজনীতি এখানেও বড় হয়ে দাঁড়ায়। "এই ১৯৪ (১৯৫) জনের বিরুদ্ধে তখন বাংলাদেশ সরকার মামলা করেনি। কারণ এই ১৯৪ (১৯৫) জনকে সামনে রেখে ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের রাজনীতি করেছে।....ভারত বাংলাদেশকে বাধ্য করে চুক্তি করতে।"[৬১৪]

১৯৭২ সনের শেষ পর্যায়ে এসে বুদ্ধিজীবীগণ বুঝতে পারেন যে, দেশ প্রথম আর দেশের জন্য রাজনীতি ও কুটনীতিটাই আসল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১০৪টি দেশ ভোট প্রদান করে; বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের অবস্থা অনুকূলে আনতে ও সকল দেশকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে পেতে হলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের দ্বন্দ্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। বুদ্ধিজীবীগণ সংবাদপত্রে কলাম লেখাসহ রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে বিষয়টি উপলব্ধি করাতে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে পরামর্শ দিতে শুরু করেন । শেখ মুজিব বুঝতে সমর্থ হন যে আমাদেরকে বাংলাদেশপন্থী হতে হবে। তিনি বলেন "তোমরা কারা আমেরিকার টাকা খাও কারা ভারতের টাকা খাও এবং কারা পাকিস্তানের টাকা খাচ্ছ সবই এখন আমার জানা। আমার শুধু একটা কথা, টাকা খাও আপত্তি নেই কিন্তু দেশের স্বার্থ বিক্রি করো না।"[৬১৫]

---

৬১৪ সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখ: ৩০.০৪.২০০৯

৬১৫ ইতিহাসেররক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; পৃ: ২৮

www.pathagar.com

শেখ মুজিব কলাবরেটর আদেশে আটককৃতদের কতিপয় শর্ত দিয়ে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সকল দ্বন্দ্ব নিরসন করে দেশ গঠনের জন্য একত্রে কাজ করার আহ্বানের মধ্যে দিযে অভ্যন্তরীণ reconciliation এর কাজটি সম্পন্ন করেন।

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ

রাজনৈতিক ফায়দা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ২০০৮ সনের নির্বাচনের পূর্বে যে ইশতেহার প্রকাশ করে তাতে ১৯৭০ সনে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশিত ইশতেহারের অনুরূপ "Quran & Sunnah" বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করবে না বলে অঙ্গীকার করে। তাছাড়া নির্বাচন বৈতরণী পার হবার পর ২৯ জুলাই ২০০৯ তারিখে নির্বাচনী ইশতেহার সংশোধন করে সেখানে নতুন সংগানুসারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি সন্নিবেশিত করে।[৬১৬]

রাজনীতির খেলা হয় শক্তিতে শক্তিতে। অনেকের মতে এ দেশের রাজনৈতিক শক্তিতে খেলোয়াড় হচ্ছে ৫(পাচঁটি) টি-- আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, আর সেনাবাহিনী। পাকিস্তান আমল থেকে আওয়ামী লীগ, জামায়াত রাজনৈতিক দল হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। সেনাবাহিনী পেশাজীবি সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান আমল থেকে বারবার ক্ষমতা দখল করে প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনৈতিক চরিত্র দান করেছে।

পাকিস্তান আমলের শক্তিশালী দল ছিল মুসলিম লীগ (বিশেষ করে কাউন্সিল মুসলিম লীগ), নেজামে ইসলাম, জমিয়তে ওলামা ইসলাম, পি ডি পি, ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মুজাফ্ফর), কম্যুনিস্ট পার্টি, জাতীয় দল এবং বাংলাদেশ আমলের প্রথম দিকে জাসদ। এ সব দল বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে পতিত। বিএনপি গঠনের পর মুসলিম লীগ ভাসানী ন্যাপসহ অন্যান্য ছোট বড় সকল দল থেকে নেতা কর্মী ঐ দলে যোগদান করেন। নেজামে ইসলাম, জমিয়তে ইসলাম এবং বাংলাদেশ আমলে গঠিত খেলাফত আন্দোলনসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইসলামী দলগুলো ইসলামী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জোটবদ্ধ ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলে। সকল কিছু নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মেরুকরণে আওয়ামী লীগ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী-সমাজতন্ত্রী-বামপন্থী-সুবিধাবাদী দল; বিএনপি হচ্ছে মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি চরম সুবিধাবাদী মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল, জামায়াতে ইসলাম হচ্ছে ইসলামী মূল্যবোধের দল। ১৯৯১ সন থেকে বিএনপি এবং জামায়াত অলিখিত ও লিখিত মুসলিম-ইসলামী মূল্যবোধের জোট যার

---

৬১৬ www.albd.org/menifesto (English & Bangla)

www.pathagar.com

রাজনৈতিক-আদর্শিক দ্বন্দ্ব হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে। চরম সুবিধাবাদী জাতীয় পার্টি একবার নৌকায় উঠে, অন্যবার নৌকা ফুটো করে।

রাজনৈতিক আদর্শিক দ্বন্দ্বে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলগুলোর হাতে কয়েকটি ট্রামকার্ড ছিল। এক সময় এ দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল একটি ট্রাম্পকার্ড ছাড়ার সময়-জ্ঞানের অভাবে ওটি হারাতে হয়; আব্দুল জলিল নিজেও রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছেন। এখন কার্ড খেলতে এ দল আরো হিসেবী হয়েছে এবং CIA-RAW-MOSSAD (CRM) এর পরামর্শ ছাড়া ট্রামকার্ড ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছে। এদের উপদেশে সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করে রাষ্ট্রের চরিত্র বদল করেছে। সর্বজন বিদিত যে, কয়েকজন নীতি বর্জিত বিচারক ক্ষমতাসীনদের দিকে পাল তুলতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এদের কর্মকান্ড আওয়ামী লীগকে প্রশ্নবিদ্ধ ও সাধারণ মানুষের কাছে আসামী করে ফেলে।

শেখ মুজিব হত্যা মামলার বিচার রাজনৈতিক মামলার নজীরবিহীন রায়। দূরের দেশে না গিয়ে ভারতের করমচাঁদ গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, পাকিস্তানের লিয়াকত আলী, জুলফিকার আলী ভুট্টো, ও বেনজির ভুট্টো এ সব হত্যা মামলা নিয়ে এ দু'টি দেশে বাড়াবাড়ি হয়নি, বরং ইস্যুগুলোকে কবর দেয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার ঘোষক জেনারেল জিয়াকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে মুছে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা ও বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার একটি প্রচ্ছন্ন চিন্তা রয়েছে তাদের। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নাম করে জামায়াতে ইসলামীকে ধ্বংস করার খেলা। এ দুটিই রাজনৈতিক খেলা। সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক যে সকল বিচারকদেরকে "নাজিরদের সাথে অর্থের লেনদেনকারী"[৬১৭] আখ্যা দিয়েছেন, তাদের দিয়েই বিচারিক প্রক্রিয়ায় আইনী সিল মারার যে প্রয়াস চলছে তা দেশে মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

ধর্মভিত্তিক দলগুলোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ

ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে মুসলমানরা সকল বিষয় থেকে কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়ে; বিপরীতে হিন্দুরা প্রভু পরিবর্তনের মাধ্যমে জমি, ব্যবসা, শিক্ষা, চাকরিসহ সকলক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে। মুসলমানরা দীর্ঘ দিন তাদের শাসক থাকায় একটি প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ তাদের মনে কাজ করে; সেই ক্ষোভ ও ধর্মীয় আধিপত্যবাদের চেতনা থেকে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। বাঙালি মুসলমানকে ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি কুরুচিপূর্ণ বিশেষণে নিন্দা করে 'সংগঠন আন্দোলনের' নেতা লালা হরদয়াল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে,

---

৬১৭ জাতীয় সকল সংবাদপত্র, তারিখ: ১৩ নভেম্বর'২০১০

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে হয় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে নতুবা তাদেরকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভারত ত্যাগ করতে হবে।[৬১৮] অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তাঁর A History of Freedom Movement : Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press 1901-30 (p-125) নামক গ্রন্থে হিন্দু নেতা সত্য দেব-এর ১৯২৫ সালের একটি ঘোষণার উদ্ধৃতি দেন "আমরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে শক্তিশালী তখন মুসলমানদের নিকটে নিম্ন শর্তাবলী পেশ করব--কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মানা চলবে না, মুহাম্মদকেও নবী বলে স্বীকার করা হবে না। মুসলমানী উৎসবাদি পরিত্যাগ করে হিন্দু উৎসব পালন করতে হবে। মুসলমান নাম পরিহার করে 'রাম দীন', 'কৃষ্ণ খান' প্রভৃতি নাম রাখতে হবে। আরবী ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষায় উপাসনা করতে হবে।"

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই নির্ধারণ করে "গুরু দক্ষিণা, অমর সিংহ, সরস্বতী বন্দনা, মানভঞ্জন, কলংক ভঞ্জন প্রভৃতি। হিন্দু বই যথা, দান লীলা, দধি লীলা প্রভৃতি ছিল কৃষ্ণের বাল্যকালের প্রেমলীলা সম্পর্কে লিখিত। বিহারে এতদ্ব্যতীত পড়ানো হতো সুদাম চরিত, রাম যমুনা প্রভৃতি।"[৬১৯]

মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা প্রতারিত, নির্যাতিত হতে হতে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এক সময় সচেতন হয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বললে হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়; এ অবস্থায় গান্ধী মন্তব্য করেন "আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ কলহে হিন্দুদের স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। আমার এ মন্তব্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ যে, মুসলমানরা স্বভাবতঃই ষন্ডা প্রকৃতির এবং হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই ভীরু। আর, যেখানেই ভীরু লোক বিরাজ করে সেখানে সর্বদাই থাকবে ষণ্ডাদল।"[৬২০]

তিতুমীর স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সিপাহসালার। তিনি হজ্ব করে "চার বছর পর দেশে ফিরে চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলার মুলসমানদের সঠিক ইসলামী নিয়ম নীতি জানাতে থাকেন। প্রথম বছর কোন ঝামেলা ছাড়াই তিতুমীর কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় আশেপাশের হিন্দু জমিদাররা কাজে বাধা দিতে থাকে। জমিদাররা তিতুমীর এর অনুসারীদের উপর পাঁচ রকম কর ধরে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দাড়ি কর। কেউ দাড়ি রাখলে আড়াই টাকা হারে কর দিতে হতো। তিতুমীর এসব অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৩০ সালের ৭ আগষ্ট বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করলেন। কিন্তু জমিদারদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা কিছুই করলো না।"[৬২১]

---

৬১৮ Times of India, 25.07.1925;
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মুসলমানকে ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি কুরুচিপূর্ণ বিশেষণে অনেক গল্প লিখেছেন।

৬১৯ A. R. Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal; p 156

৬২০ The Indian Quarterly Register; p: 647

৬২১ দৈনিক কালের কণ্ঠ, টুন টুন টুনা টুনি, তিতুমীরের লড়াই; ২৮.১১.২০১০

www.pathagar.com

প্রশাসনিক কাজ সুচারু রূপে পরিচালনা এবং আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাকে ভাগ করার পরিকল্পনা নিয়ে লর্ড কার্জন ইংল্যান্ড গমন করেন এবং ১৯০৫ সালের প্রথম দিকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। তার অনুপস্থিতিতে বৃহত্তর আসাম গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কার্জনের প্রত্যাবর্তনের পর পরিকল্পনাটি ভারত সচিব ব্রডরিক সমীপে পেশ করা হয়। ব্রডরিক পরিকল্পিত নতুন প্রদেশের নাম দেন ইস্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম।

বাংলা ভাগের নানা ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত মুসলিম সমাজের জন্যে অত্যন্ত মঙ্গলময় হলেও এর পিছনে তাদের কোন প্রচেষ্টাই ছিলনা। বাংলা ভাগের পর তাদের যে প্রভূত মংগল সাধিত হতে যাচ্ছিল তা ছিল তাদের কাছে একবারে অপ্রত্যাশিত। শাসনকার্য সহজ, দ্রুততর, সুষ্ঠু ও সুন্দর করার জন্য এবং এর সুফল যাতে অবহেলিত এবং অনুন্নত বাংলার পূর্বাঞ্চলও ভোগ করতে পারে তার জন্যে এ বাংলা ভাগের পরিকল্পনা ছিল শাসকদের; মুসলমানদের নয়।[৬২২]

হিন্দু জমিদারগণ এ অঞ্চলের কৃষক প্রজাদের শোষণ করে সে শোষণলব্ধ অর্থ কোলকাতায় বসে বিলাসিতায় উড়িয়ে দিতেন। প্রজাদের শিক্ষাদীক্ষা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রতি তাদের ছিল চরম অবহেলা ঔদাসিন। কোলকাতা শহর ও পশ্চিম বাংলা উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছিল। প্রশাসন ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাদের ভোগের জন্য পূর্বাঞ্চলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল। নদীবহুল এ অঞ্চলের নৌকা যাত্রীদের ধনসম্পদ জলদস্যুগণ নির্বিবাদে লুট করে নিয়ে যেতো যার প্রতিকার করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পুলিশ বাহিনী ছিল অপর্যাপ্ত ও দুর্বল যার ফলে সমাজের সর্বস্তরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত। প্রদেশের শাসকগণ এ অঞ্চলের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পরিহার করে হিন্দু জমিদারদের হাতে অলিখিতভাবে হস্তান্তর করে বসেছিলেন। তাদের সকল পরিশ্রম ছিল কোলকাতা কেন্দ্রিক। পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ হতো না। কর্মচারীগণ পূর্বাঞ্চলের নামে ভীত শংকিত হয়ে পড়তেন। এবং পূর্বাঞ্চলে বদলী হওয়াকে নির্বাসন দন্ড মনে করতেন।

নতুন প্রদেশ আসাম, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত হলো, এর আয়তন ছিল ১০৬,৫০০ বর্গমাইল; যার দুই তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান। ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই নতুন প্রদেশ গঠনের কাজ শুরু হলো। নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller, যার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে Fuller Road) প্রথম দিন ঢাকায় এসে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। মুসলমানগণ নতুন গভর্ণরকে সাদর অভ্যর্থনা প্রদান করলেও হিন্দুগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। নতুন

---

[৬২২] Muslim Separatism in India , A. Hamid ; p51-52

www.pathagar.com

গভর্ণরকে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে হিন্দুরা অস্বীকৃতি জানায়। ক্রুদ্ধ হিন্দুরা তিনজন ইংরেজ মহিলাকে পথ চলাকালে আক্রমণ করে।[৬২৩]

স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের সম্মানে আহসান মঞ্জিলে গার্ড অব অনার[৬২৪]

সরদার আলী খান বলেন, "হিন্দুরা বাংলা ভাগের ফলে উগ্রমূর্তি ধারণ করে। এটাকে হিন্দুমহল প্রথমতঃ জাতীয় ঐক্যের প্রতি আঘাত বলে অভিহিত করে। অতঃপর নানাভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে থাকে যথা তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার শাস্তি, মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং অবশেষে এটাকে মুসলমানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হিসেবে অভিহিত করে। রাতারাতি বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে হিন্দুরা আন্দোলন শুরু করে দেয়। জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলো, পবিত্র বাংলাকে বিভক্ত করা হলো, ব্রিটিশ সরকার এবং দেশদ্রোহী মুসলমানদের মধ্যে এক অশুভ আতাত প্রভৃতি উত্তেজনাকর উক্তির দ্বারা বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত করা শুরু করলো বাংলার হিন্দু সমাজ। হিন্দু আইনজীবীগণ এর আইনগত বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। বাংলা ভাষার সাহিত্যিকগণ প্রচার শুরু করলেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি চরম আঘাত হানা হলো। সমগ্র হিন্দু বাংলা এক ধরণের প্রলোপক্তি শুরু করলো। এধরনের অসংগতিপূর্ণ ও অবাস্তব প্রচারণার কারণ কি ছিল ? মুসলমানদের উপরে হঠাৎ আক্রমণ ও অশোভন উক্তি শুরু করা হলো কেন ? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে বংগভংগে কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন ও বেসামাল হয়ে পড়েছিল। যে সংখ্যাধিক্যের ফলে বাংগালী হিন্দুগণ উভয় বাংলায় চাকরি বাকরী ও জীবন জীবিকার উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল তা বংগভংগের ফলে বিনষ্ট হয়ে গেল। নতুন বাংলায় মুসলমানরা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলার

৬২৩ Some Personal Experiences, Bampfylde Fuller; p-126

৬২৪ Honour Guards on the ground of Ahsan Manzil, Dhaka awaiting arrival of Lt. Governor Sir Bampfylde Fuller in 16 Oct 1905. (photo: Fritz Kapp)

www.pathagar.com

পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ হিন্দু বশ্যতা থেকে মুক্ত হলেন এবং এবার তাদের মনে আশার সঞ্চার হলো যে এবার তারা তাদের স্থানীয় সমস্যাদির উপর কথা বলার অধিকার ভোগ করবেন। সমসাময়িক লেখক সরদার আলী খান বলেন, যত সব হৈ হল্লা ... এবং হঠাৎ রাতারাতি যে দেশপ্রেমের আন্দোলন শুরু হলো মাতৃভূমি অথবা ভারতের কল্যাণের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যে প্রদেশে হিন্দুগণ সুস্পষ্ট সংখ্যালঘু সেখানে তাদের শ্রেণীপ্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা ব্যাতীত অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য এ আন্দোলনের নেই।"[৬২৫]

বাংলা ভাগ রদের আন্দোলনে অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন, বংগভংগের ঘোষণা আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায়। যে ১৬ ই অক্টোবর নতুন বাংলার সূচনা হয় (পূর্ব বাংলা ও আসাম), সেদিন কলকাতায় হিন্দুগণ জাতীয় শোকদিবস পালন করেন। ঐ দিন তারা কালো ব্যাজ পরিধান করেন, মাথায় ভস্ম মাখেন, পানাহার পরিত্যাগ করে নানারূপ বিক্ষোভ ধ্বনি সহকারে মিছিল করে গঙ্গাস্নান করেন। অপরাহ্নে এক জনসভায় মিলিত হয়ে তারা বংগভংগ রদের শপথ গ্রহণ করেন।[৬২৬]

"১৯০৮ সালে ৩০শে মে কোলকাতার যুগান্তর পত্রিকা হিন্দুদের প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বংগমাতার খন্ডনকারীদের, সমর্থকের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। বলা হয়, "মা জননী পিপাসার্ত হয়ে নিজ সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করছে একমাত্র কোন্ বস্তু তার পিপাসা দূর করতে পারে। মানুষের রক্ত এবং ছিন্নমস্তক ছাড়া কোন কিছুই তাকে শান্ত করতে পারে না। অতএব জননীর সন্তানদের উচিৎ মায়ের পূজা করা এবং তার ইপ্সিত বস্তু দিয়ে সন্তুষ্টি বিধান করা। এ সব হাসিল করতে যদি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয় তবুও পশ্চাৎপদ হওয়া যাবে না। যেদিন গ্রামে গ্রামে এমনি ভাবে মায়ের পূজা করা হবে সেদিনই ভারতবাসী স্বর্গীয় শক্তি ও আশীর্বাদে অভিষিক্ত হবে।"[৬২৭]

"স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বংগভংগের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে বলেন বাংলাদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্ত করা হয়েছে। বংগভংগের প্রতিবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে। বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হয় এবং আগুন লাগানো হয়। স্কুল কলেজ ও বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষাংগন পরিত্যাগ করে। বালগংগাধর তিলক বংগভংগের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তা জাগ্রত করার জন্য মারাঠা নায়ক শিবাজীকে ভারতের সকল হিন্দুদের জাতীয় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন।"[৬২৮]

---

৬২৫ India of Today/ Sarder Ali Khan, Time Press, Bombay 1908; p-62
৬২৬ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান; পৃ: ৩১৫
৬২৭ বংগভংগের ইতিহাস, ইবনে রায়হান; পৃ: ৬-৭
৬২৮ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আবদুর রহিম; পৃ: ২০৫-২০৬

www.pathagar.com

বস্তুত ১৭৫৭ সনে সুবে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের উপর সর্বাত্মক নির্যাতন নেমে আসে। তারপর থেকে এর মাত্রা বাড়তেই থাকে। ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা তাদের সকল সম্পত্তি হিন্দুদের হাতে হস্তান্তর করা হয়; জমিদার মুসলমান হয়ে যায় প্রজা আর প্রজা হিন্দু হয়ে যায় জমিদার। নতুন জমিদারগণ জমির উপর খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে মুসলমান প্রজাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে দেয়। জমিদারগণ নিজেদের বসবাসের জন্য নতুন নতুন প্রাসাদ তৈরী করেন; আর সে প্রাসাদের সামনে দিয়ে মুসলমানদেরকে জুতা পায়ে ও মাথায় ছাতা দিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ করেন। বিভিন্ন রকম প্রতারণার মাধ্যমে তারা মুসলমান প্রজাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। কথা সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ[৬২৯] তার 'আত্মকথা'য় লেখেন 'বক্‌রা ঈদে গরু কোরবানি কেউ করিত না। কারণ জমিদারদের তরফ হইতে উহা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল'।[৬৩০] তাদের (মুসলমান প্রজাদের) সন্তানদের আপত্তিকর ও বিশ্রী নাম রাখা শুরু করে[৬৩১] এবং লেখা-পড়ার পথ বন্ধ করে দেয় অথবা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ছাত্র-অভিভাবকদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।[৬৩২]

১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবরে বাংলা ভাগ হয়ে বতর্মান বাংলাদেশ ও তৎকালীন আসাম-ত্রিপুরা নিয়ে পূর্ববঙ্গ গঠিত হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এর বিরোধিতায় সোচ্চার হলে মুসলমানদের সম্প্রীতির স্বপ্ন ভেঙে যায়। ভারতীয় জাতীয়তার মোহমুক্তি ঘটে। ফলশ্রুতিতে ১৯০৬ সনে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মুসলমানদের সংগঠন মুসলিম লীগ। ব্রিটিশ ভারতে হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত ও প্রতারিত বাংলাভাষী মুসলমানগণ সকল সময়ই ভারত বিরোধী মনোভাব পোষণ করায় তারা আওয়ামী লীগ বা সমমনা দলগুলোকে ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণকারী দল হিসাবে চিহ্নিত করে। তাই রাজনৈতিকভাবে ভারত বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরাও স্বাধীনতার যুদ্ধকে মুসলিম বিরোধী ভারতীয় চক্রান্ত হিসাবে গণ্য করেছেন।

১৯৭১ সনে পরাজিত ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের অবস্থা

এম আর আখতার মুকুল বলেন, "এদিকে নারায়ে তকবির আর ওদিকে জয় বাংলা শ্লোগানের মধ্যে ইটের চোটে হুজুরেরা সব মতিঝিলের দিকে ভাগোয়াট।[৬৩৩]

---

৬২৯ আবুল মনসুর আহমদ একাধারে সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক ও রাজনীতিক ছিলেন। তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার এক পুত্র মাহফুজ আনাম একজন সাংবাদিক ও The Daily Star এর সম্পাদক। জনশ্রুতি রয়েছে যে The Daily Star 'র' এর অর্থায়নে পরিচালিত।

৬৩০ আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা; পৃ: ২৩

৬৩১ স্মৃতির পাতা থেকে, পি এ নাজির; পৃ: ৪৫

৬৩২ আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, পৃ: ১০৯, --মুসলমান ছাত্ররা হিন্দুদের সাথে এক বেঞ্চিতে বসিতে সাহস পাইত না; আর হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে বসিতে ঘৃণা ও অপমান বোধ করিত।

৬৩৩ চরমপত্র, এম আর আখতার মুকুল, পৃ: ৭০

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের রীতিমত নভেলের কথারই যেন প্রতিধ্বনি হয় ১৯৬৯-৭১ সনে এ পূর্ব বাংলায়। "নারায়ে তাকবীর---আল্লাহু আকবর" ধ্বনি নিমগ্ন হয়ে "জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু" উচ্চকিত হলো সমগ্র পূর্ব বাংলায় (কাহার বজ্রমন্ডিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিন লক্ষ ম্লেছকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবার' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? --- রীতিমত নভেলের থেকে)।[৬৩৪] শিবাজী শেখ মুজিবের বেশে সকল ম্লেচ্ছের জবান বন্ধ করে দিয়েছেন কী।

বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় পরাজিত রূপ হচ্ছে–

- হতাশাগ্রস্ত, চলৎশক্তিহীন।
- সিদ্ধান্তহীনতায় পতিত, বারবার ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, কেউ অর্থ দিয়ে সহায়তা করতে চায় না।
- আশ্রয়হীন হয়ে পড়া, দ্বারে দ্বারে আশ্রয় চেয়েও ব্যর্থ হওয়া।
- ন্যায়বিচারের সকল পথ তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, আইন আদালত তার বিরুদ্ধে তৈরী করা হয়।
- বন্ধুহীন হয়ে তাকে একাকী পথ চলতে হয়, যা তাকে বিপথে ঠেলে দেয়।
- স্রোতহীন নদীর মত তার অপমৃত্যু ঘটে।

১৯৭০ সনে ভোটযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামপন্থী আর মুসলিম জাতীয়তাবাদী মানুষগুলোর অবস্থা হয়েছে ঠিক এমনটাই। ২৫ মার্চের কালোরাত তাদের জন্য ভয়ঙ্কর কৃষ্ণমূর্তি হয়ে দেখা দেয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী তাদের বন্ধু নয় বরং বন্দুকের নলের মুখে তাদেরকে পক্ষে নিয়ে আসা হয়। ভারত প্রথম থেকেই ইসলামপন্থী আর মুসলিম জাতীয়তাবাদীসহ চীনপন্থীদের জন্য সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি খন্ড চিত্র উপস্থাপন করা গেলো

খণ্ডচিত্র-১[৬৩৫]

ন্যাপ নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মুক্তিযুদ্ধকালে আসাম সীমান্তে অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের আগে তার সাথে কয়েকজন সাথী সীমান্ত পার হয়েছিলেন অবস্থা যাচাই করার জন্য। অবস্থা যাচাইকারীদেরকে মাওলানা ভাসানীর এক অসমীয় মুসলিম মুরীদ একজন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নিয়ে যায়। তারপরের ঘটনা --

---

৬৩৪ কতিপয় মুসলিম জাতীয়তাবাদী এ শ্লোগানের প্যারোডি শ্লোগান "জয় বাংলা, জয় হিন্দ, লুঙ্গী ছাইড়া ধুতি পিন" দিয়েও তৎসময়ের বাংলাভাষী মুসলমানরা এতে কোন গ্রাহ্য করেননি। আজ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ধুতি পড়া, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, মঙ্গল শোভাযাত্রা, হলি খেলা আর মুনাজাতের পরিবর্তে প্রার্থনা সব কিছু গ্রাস করে নিচ্ছে।

৬৩৫ সাইফুল ইসলাম, স্বাধীনতা ভাসানী ভারত, ঢাকা: বস্ত্র প্রকাশন, ১৯৯৩, পৃ: ৮

www.pathagar.com

বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে পঞ্চায়েত প্রধান বললেন, আপনারা কি আওয়ামী লীগের নেতা?

না।

আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া বর্ডার পার হবার অর্ডার নাই।

যারা রাজনীতি করে না, তাদেরও?

তারা বর্ডার পেরুবেন কেন?

জান বাঁচানোর দায়ে।

পঞ্চায়েত প্রধান কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ভোট দিয়েছেন কোন দলকে?

আমরা ন্যাপের লোক।

আবার কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে তিনি বলেন, আপনারা বরং ফিরে যান। জানাজানি হলে অসুবিধা হতে পারে।

অবস্থা আঁচ করতে মাওলানা সাহেবের কথা পঞ্চায়েত প্রধানের কানে তুললাম না। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই সামাদ সাহেবের (মাওলানার অসমীয় মুরীদ) বাড়িতে বসলাম। মন জুড়ে একটা প্রশ্ন চেপে বসল, পাকিস্তান দলমত নির্বিশেষে সব বাঙালীকে মারছে। অথচ ভারতে কেবল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগপন্থীদের আশ্রয় দেয়া হচ্ছে। তাহলে বাকী বাঙালীরা যাবে কোথায়?

খণ্ডচিত্র- ২ [৬৩৬]

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপিসহ আমি (কাজী জাফর আহমেদ), রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনো কলকাতার অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন না এবং সরকারের মুক্তিবাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভূক্ত করতে অস্বীকার করেন। আমি বলি যে, ... আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কাউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ জানান যে, তাকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের

---

৬৩৬ কাজী জাফর আহমেদের সাক্ষাৎকার, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, খন্ড ২, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫, খন্ড ১৫, পৃ: ২০১-২০২

www.pathagar.com

উপর। ... আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি। দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW আটক করে নিয়ে যায় শিলং এর ডাক বাংলোয়। সেখানে আমাকে সাতদিন রাখা হয়।...সাতদিনব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়।

খণ্ডচিত্র-৩ [৬৩৭]

পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে মস্কোপন্থী নেতারা প্রথম সুযোগেই কলকাতা মুজিবনগরে সমবেত হয়েছিলেন। ১৭ ই এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণার মাধ্যমে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের দলীয় সংকীর্ণতার কারণে মস্কোপন্থীদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের লাভ থেকে তারা বঞ্চিত থাকতে হয়, তারা বিস্তর দেন দরবার চালাতে থাকেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিষ্ফল দেন দরবার অব্যাহত থাকে। সে পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের কারণ ঘটিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বর্ণনা করে আসছিল। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ভারত শেষ পর্যন্ত '৭১ সালে ৯ই আগস্ট ২৫ বছর মেয়াদী ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করার পর ক্রেমলিনের নায়করা প্রথমবারের মত বাংলাদেশের পরিস্থিতির মধ্যে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের উপাদান খুঁজে পান এবং ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ব্রেজনেভ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। সোভিয়েত মনোভাবের এই পরিবর্তন সার্বিকভাবে ভারত সরকারের অভ্যন্তরেও তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলেছিল। ক্ষমতায় ডানপন্থীরা এর ফলে কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন এবং মস্কোপন্থী কূটনীতিক ডি পি ধর বাংলাদেশ সরকারের উপর মস্কোপন্থীদের সুযোগ দানের জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন এবং সে কারণেই মূলতঃ ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্টোবর থেকে অস্ত্র এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল।[৬৩৮]

খণ্ডচিত্র- ৪[৬৩৯]

আগরতলার বাস ধরার জন্য মোস্তফাসহ বেরিয়ে পড়লাম। বাসে উঠে খানিকটা আসতেই হঠাৎ রাস্তার পাশে এক জায়গায় বেশ কিছু লোক এর একটা জটলা চোখে পড়ল, দেখলাম কিছু লোক লম্বা একটি দাড়িওয়ালা লোককে মারধর

---

৬৩৭ ন্যাপের ৩০ বছর, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৮৭।

৬৩৮ এই সময়েই সিপিবি 'পূর্ব পাকিস্তান কমুনিস্ট পার্টি' নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি নাম গ্রহণ করে।

৬৩৯ এম.এ মোহাইমেন, ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর, ঢাকা, পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪, পৃ: ৪২।

www.pathagar.com

করছে এবং লোকটি দু'হাতে মার ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করছে। লোকটিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম এ যে শেখ নুরুল্লাহ, একজন মুসলিম লীগ নেতা। একে আমি বহুদির ধরে চিনতাম। ...ঘটনাটি দেখে আমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম বাস থেকে নেমে গিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু কি করবো না করবো ভাবতে ভাবতে বাস অনেকটা পথ এসে গিয়েছে, বাস থেকে এখন নেমে পিছন দিকে ঘটনার স্থান পর্যন্ত যেতে যেতেই যা হবার তা হয়ে গেছে ভেবে ভারাক্রান্ত মনে গাড়িতে চুপ করে বসে রইলাম।... এই প্রভাবশালী লোকটি ফেনী কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী এডভোকেট অহিদুল্লাহর বড় ভাই অর্থাৎ (বর্তমান) এরশাদ সরকারের মন্ত্রী কর্ণেল জাফর ইমামের জ্যেঠা।

আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি নেতা কর্মীরা সজাগ ছিলেন যাতে ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা ভারতে পা রাখতে না পারেন। তখন তাদের সামনে একটাই পথ "বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা"। সে সিদ্ধান্ত ইসলামপন্থী বা মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণ করতে পারেননি। 'দেশ আগে না ধর্ম আগে' এ প্রশ্নে দেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা ইচ্ছের বিরুদ্ধেই পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে সমর্থন করেন। এদেরকে সহায়তা করার কারণে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা, ভারতীয় বাহিনী আর সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত স্বাধীনতাপন্থী সাধারণ মানুষদের কোপানলে পড়তে হয়। ১৬ ডিসেম্বর ৭১ এর পূর্বেই এ পন্থীদের অনেকেই জীবন দেয়। যারা প্রাণ হারান তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন–মোনায়েম খান, মৌলভী ফরিদ আহমেদ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতার বিষয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য

১৩ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ অধ্যাপক গোলাম আযম টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতার কারণ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ভারত কখনই পাকিস্তানের অস্তিত্বকে মেনে নেয়নি, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ ভারত দ্বারা বেষ্টিত এবং তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ ভারতের বাজার হবে এ সকল চিন্তা থেকেই তারা স্বাধীনতা বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতা বিরোধিতা তার নের্তৃত্বে হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন জনাব নূরুল আমিনের নেতৃত্বে তারা একত্রিত হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতার বিষয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীরা উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলো। যদিও তারা ইয়াহিয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমননীতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতেন, তবু এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার সাহস তাদের ছিল না। বিরোধিতা করতে হলে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকেও অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো - যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।

www.pathagar.com

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হবার পরও ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিবাদে কর্মসূচী প্রণয়নের গোল টেবিল বৈঠকে তৎকালীন জামায়াত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমানস অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ (১৯৭০)

তারা একদিকে দেখতে পেলো যে, মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে ইয়াহিয়া সরকারকে বিব্রত করার জন্য কোন গ্রামে রাতে আশ্রয় নিয়ে কোন পুল বা থানায় বোমা ফেলেছে, আর সকালে পাক বাহিনী যেয়ে ঐ গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা রাতে কোন বাড়িতে উঠলে পরদিন ঐ বাড়িতে সেনাবাহিনীর হামলা হয়ে যায়।

এভাবে জনগণ এক চরম অবস্থায় পড়ে গেল। ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীরা শান্তি কমিটি কায়েম করে সামরিক সরকার ও অসহায় জনগণের মধ্যে যোগসূত্র কায়েম করার চেষ্টা করলো। যাতে জনগণকে রক্ষা করা যায় এবং সামরিক সরকারকে যুলুম করা থেকে যথাসাধ্য ফিরিয়ে রাখা যায়। শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে সামরিক শাসকদের তাদের ভ্রান্তনীতি ও অন্যায় বাড়াবাড়ি থেকে ফিরাবার পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। একথা ঠিক যে, শান্তি কমিটিতে যারা ছিলেন, তাদের সবার চারিত্রিক মান ভালো ছিল না। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলো যারা সুযোগ মতো অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্বার্থ আদায় করেছে।'[৬৪০]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশ গণআন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় এর শ্লোগান তুলতেন,

---

৬৪০ আমার বাংলাদেশ, গোলাম আযম, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ: ৩৯

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা যদি তারা না হতেন এবং ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া যদি আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন, তাহলে ইসলামপন্থীদের পক্ষে ঐ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা খুব সহজ হতো।"[৬৪১]

ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে এদেশের ইসলামপন্থী-মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য আরেকটি বাস্তব কারণ ছিলো-- এসব দলের নেতা-কর্মীদের ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি। আবুল আসাদের[৬৪২] ভাষায়,"ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের প্রতি ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ক্ষমতাসীন হিন্দু কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বৈরিতার কারণে ইসলামপন্থীদের ভারতে গমন করা সম্ভব ছিল না। এ কারণের শিকার হয়ে তাদের অনেককে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে উভয় সংকটের মোকাবিলায় এক বিদঘুটে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।"[৬৪৩]

ভারত গমনে যেখানে আওয়ামী লীগের সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও মুসলিম লীগপন্থী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরই বাধা ও জীবনহানির আশঙ্কা ছিলো, সেখানে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য ভারত গমন অসম্ভব বিষয় হিসেবে গণ্য হয়।

সব দলকে সাথে রাখতে আওয়ামী লীগের অনীহা

১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন এবং এর পূর্ব ও পরবর্তী কোন সময়ই শেখ মুজিব বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে অন্যান্য দলকে আন্দোলনে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেননি। ১৯৭০ সনের নির্বাচনের পর থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো দলের নেতৃবৃন্দ জনসভা বা বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করেন। ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষিত হওয়ার পর হোটেল পূর্বাণীতে আহূত সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে মাওলানা ভাসানী, নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খানসহ প্রদেশের অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করার স্বীয় সিদ্ধান্তের কথা জানান।[৬৪৪] কিন্তু বাস্তবে তিনি ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কোন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেছিলেন বলে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৬৪৫]

---

[৬৪১] আমার বাংলাদেশ, গোলাম আযম, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ: ৩৮

[৬৪২] গবেষক, সাংবাদিক; দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক।

[৬৪৩] কালো পঁচিশের আগে ও পরে, আবুল আসাদ; পৃ: ২৩৫ ফুটনোট

[৬৪৪] দৈনিক সংগ্রাম, ২ মার্চ ১৯৭১

[৬৪৫] কালো পঁচিশের আগে ও পরে, আবুল আসাদ; পৃ: ২১৬ ফুটনোট

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ এবং এর নেতা শেখ মুজিব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে যেমন এ অঞ্চলের অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বৃহত্তর স্বার্থে কাছে ডাকেননি এবং সহযোগী করেননি, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরও দলটি আগ্রহী দলগুলোকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়নি এবং স্বাগত জানায়নি। অন্যান্য সাধারণ দলগুলো ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর মতো এদেশের আলেম সমাজও আওয়ামী লীগের এ অনীহার কারণে বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ নিতে পারেনি অথবা অংশগ্রহণের সুযোগ নেয়নি বলে মেনে নেবার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও ভারত বিরোধিতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা বিষয়ের ছাত্র মাত্রই জানেন যে যার কোন শত্রু নেই তার প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নয়নের জন্য কাল্পনিক শত্রু তৈরী করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রকেই সবচেয়ে বেশী হুমকি হিসেবে গণ্য করার পক্ষে শতকরা ৯০ জন মত দেন। বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য ভারতকেই তারা হুমকি মনে করেন। কারণ--

১. বাংলাদেশের ভূ-সীমানার ৪২৪৬ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪০৫৩ কিঃমিঃ ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। এককভাবে ভারতের বিপরীতে এদেশের সীমানা সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের প্রচুর শ্রম, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করতে হয়।

২. ভারত তার পণ্যের বাজার হিসেবে বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশী বিশাল বাজারকে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, গোয়েন্দা তৎপরতা, নাশকতা, অনৈতিক আর্থিক চাপ, মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. বর্ডার হাট (Border Hut) নামে ভারতীয় পণ্য শুল্কমুক্ত বিক্রয়ের সুবিধা শেখ মুজিব সরকার চালু করে বন্ধ করে দেয়, তা আবার চালু করতে ভারত সমর্থ হয়েছে।

৪. বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ২০১০ সনে ২৯১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, প্রতি বছরই এ ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৬৪৬]

৫. Non-tariff barrier তৈরী করে বাংলাদেশী পণ্য ভারতে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

৬. ভারতের আকাশ আগ্রাসন বাংলাদেশের যুবসমাজকে ধংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সকল TV channel আমাদের দেশে মুক্ত অথচ আমাদের TV channel কোন তাদের দেশে প্রদর্শিত হয় না।

---

[৬৪৬] বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ২০০০ সনে ৭৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং ২০০৫ সনে ১৯৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

www.pathagar.com

৭. Illegal Border Trade (IBT) বাংলাদেশের শিল্প-কারখানা স্থাপনে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। এতে বেকার জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

৮. ভিন দেশে বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল চালাচ্ছে।

এ রকম একটি অবস্থায় নিজের দেশের স্বার্থে যারা ভারতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন, ভারতপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সংবাদকর্মী, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী তাদেরকে রাজাকার,আল বদর, পাকিস্তানের দালাল বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে থাকে। তাদের গলার জোর এত বেশী যে, নিজ দেশের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে দেশপ্রেমিক মানুষগুলো অপমানিত হয়, নাজেহাল হয়।[৬৪৭]

স্বাধীনতাযুদ্ধের রাজাকার আজকের মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধীতাকারী শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার, আলবদর, প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অধিকাংশই রাতারাতি ভোল পাল্টে 16th division (ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়দানকারীদেরকে ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত এ নামে আখ্যায়িত করা হয়) এর সদস্য হিসেবে যোগদান করে। ৫৬ জন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য (পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) পাকিস্তান সরকারের দালালি করার কারণে ১৯৭২ সনে সদস্যপদ হারান। তাদের মধ্যে ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন এ কে ফয়জুল হক, মঈনুদ্দিন মিয়াজী । পাকিস্তান সরকারের দালালি করার পরও সংসদ সদস্য হিসেবে বহাল থাকেন আউং শু-প্রু চৌধূরী এবং তিনিও ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচন করেন। তিনি ৯৮ বছর বয়সে ০৮ আগস্ট ২০১২ মারা যান। তার শেষ কৃত্য অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বীর বাহাদুর উশেচিং পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন।

---

[৬৪৭] New Age সম্পাদক নূরুল কবীর এক TV Talk Show তে ভারতীয় দালাল নির্মূল কমিটি গঠনের কথা বলেন।

www.pathagar.com

টেবিল ৮.১

পাকিস্তান সরকারের দালালি করার পর যারা আওয়ামী লীগ মন্ত্রী - এমপি হয়েছেন বা ছিলেন

ক্রমিক	নাম	কোন কোন সনে এম পি/ মন্ত্রী হয়েছেন	মন্তব্য
১.	আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, চট্টগ্রাম-১২	১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ২০০৮ এমপি	তার মৃত্যুর পর তাকে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে প্রচার করা হয়
২.	আউং শু-প্রু চৌধুরী--বুমাং চীফ, উপজাতি/ বান্দরবান	১৯৭৩ আওয়ামী লীগ এমপি, ১৯৭৫ বাকশালের গভর্ণর, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ জাপা এমপি	
৩.	মঈনুদ্দিন মিয়াজী- যশোর	১৯৭৩ এমপি	
৪.	এ কে ফয়জুল হক (বাকেরগঞ্জ-৮)	১৯৭৩ এমপি, ১৯৯৬ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ টিকেটে সংসদে নির্বাচিত এবং পাট প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।	
৫.	মাওলানা নূরুল ইসলাম	৯৬ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।	
	বর্তমান সংসদে আওয়ামী লীগ এমপি		
৬.	ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন	২০০৯ মন্ত্রী	
৭.	এড. কামরুল ইসলাম	২০০৯ প্রতিমন্ত্রী	
৮.	ডাঃ আনোয়ার হোসেন পিরোজপুর --৩	২০০৯ এমপি	
৯.	মোঃ মোসলেম উদ্দিন ময়মনসিংহ --৬	২০০৯ এমপি	
১০.	কর্ণেল ফারুক খান গোপাল গঞ্জ - ১	২০০৯ মন্ত্রী	
১১.	ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর চাঁদপুর	২০০৯ মন্ত্রী	
১২.	এ বি এম গোলাম মোস্তফা	২০০৯ এমপি	
১৩.	এ এইচ এন আশিকুর রহমান	২০০৯ এমপি	

উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের যে সকল সদস্য স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন কখনই তারা রাজাকার আলবদর হিসেবে চিহ্নিত হননি। যদিও তাদের মধ্যে তিন জন ডাঃ

www.pathagar.com

মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য এবং দু'জন শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতাবিরোধীদের অনেকেই এখনো মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রভাব বিস্তার করছেন। তারা Members of The 16th Division হিসেবে গলা উচু করে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করছেন ।

ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতিয়তাবাদীদের বাইরে অন্যান্য

স্বাধীনতাবিরোধীদের বর্তমান অবস্থান

স্বাধীনতাযুদ্ধে শুধু ইসলামপন্থী-মুসলিম জাতিয়তাবাদীরাই পাকিস্তানের অখন্ডতার জন্য পক্ষ নিয়েছেন তা নয় উপজাতিসমূহ, চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। বিভুরঞ্জন সরকারের ভাষায় " বামদের একটা অংশ এবং মুসলিম লীগ বা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছে" ।[৬৪৮] ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর পর মশিউর রহমান যাদু মিয়াসহ কতিপয় চীনপন্থীকে বন্দী করলেও তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকদের কোন ভূমিকা ছিল না। মস্কোপন্থী আনোয়ার জাহিদ ও আহমেদুল কবীর[৬৪৯] ১৯৭১ সনে টিক্কা সরকারের অধীনে উপনির্বাচনে Pakistan Peoples Party (PPP) এর প্রার্থী হতে চেয়েও কখনো রাজাকার হননি বরং আহমেদুল কবীর মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'দৈনিক সংবাদ' এর আমৃত্যু সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন,"দেশের জনগণই বাধ্য করবে মক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্রিত হতে এবং তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ করতে।[৬৫০] সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সিরাজুল হোসেন খান ও অলি আহাদসহ হাজার হাজার বামপন্থী নেতা কর্মী স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করেও রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত হননি। অলি আহাদ ১৯৭২-৭৩ সনে এ আজাদি ঝুটা হায় বলে "আজাদ বাংলা"র সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।[৬৫১]

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ছাড়া সম্প্রদায়গতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের (বর্তমানে পার্বত্যজেলাসমূহ- খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) সকল উপজাতি

---

৬৪৮ বিজয়ের মাসে যে প্রশ্নের উত্তর খোজা জরুরী, বিভুরঞ্জন সরকার, দৈনিক যুগান্তর; তারিখ: ৫ ডিসেম্বর ২০১০

৬৪৯ আহমেদুল কবীর মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতা ছিলেন পরবর্তীতে তিনি গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত আওয়ামী লীগে যোগদানের পূর্বে গণতন্ত্রী পার্টির নেতা ছিলেন।

৬৫০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, এম এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃ: ৪৩০

৬৫১ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, অলি আহাদ, পৃ: ৫৫৪

www.pathagar.com

স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করে। পরবর্তীতে ভারতের প্ররোচনায় উপজাতিরা জনসংহতি নামে দেশ বিচ্ছিন্ন করার যুদ্ধে অবতীর্ণকারীদের সাথে সরকার চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এদেরকে ১৯৭১ সনের ভূমিকার জন্য কেউ স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে না বা দেশ ভাঙার যুদ্ধ করার দায়ে তাদেরকে কোন বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক বিচ্ছিন্নতাবাদী বলেনি বরং সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা (Attorney General) তাদের নেতার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া দরকার বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

বাংলা ভাগ (বঙ্গভঙ্গ) রদকারী আর পাকিস্তান ভাগ রদকারী

১৯০৫ সনে সুবে বাংলাকে ব্রিটিশরাজের প্রশাসনিক স্বার্থে ভাগ করা হয়েছিল; আর তা গিয়েছিল এ অঞ্চলের বাঙালি মুসলমানদের অনুকূলে। হিন্দুদের প্রবল সন্ত্রাসী বিরোধিতার ফলে এ সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। সে সময় বাঙালি মুসলমানরা ছিল স্বাধীনতাকামী আর পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা শাসক হিসেবে ঘাতক-নির্যাতনকারী ও এ অঞ্চলের হিন্দুরা ছিল শাসক শ্রেণীর দোসর, যোগসাজশকারী-দালাল।[৬৫২] আজ তাদেরকে দেশ প্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬৫৩]

১৯৭১ সনে পূর্ববঙ্গ ছিল পাকিস্তানের অংশ। এ অঞ্চলের বাঙালি মুসলমানরা অধিকাংশ মুসলমান তাদের স্বার্থে স্বাধীন হতে চায়; হিন্দুরা ভারতে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। । পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা শাসক হিসেবে ঘাতক-নির্যাতনকারী ও এ অঞ্চলের কতিপয় মানুষ ছিল শাসক শ্রেণীর দোসর-যোগসাজশকারী-দালাল।

ড. ওয়াজেদ মিয়া বনাম মাওলানা সাঈদী

দেশের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের স্বামী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া (সুধা) মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। তিনি রাজাকার, আলবদর বা আল শামস ছিলেন এমন কোন তথ্যও কারো জানা আছে বলে মনে হয় না। তবে তিনি পাকিস্তান সামরিক জান্তার অনুগত সহযোগী ছিলেন, এ তথ্য তিনি নিজেই দিয়েছেন।

শেখ মুজিবের ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন কার্যতঃ তার অধীন চলে আসে। ৮ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাসহ সকল শহর-গঞ্জে সরকারী অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কলকারখানাসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ করে দেয়।[৬৫৪] অথচ ড. ওয়াজেদ মিয়া নিজে লিখেছেন "আমি

---

৬৫২ আজ তাদেরকে দেশ প্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ইতিহাস বদলানো হচ্ছে।

৬৫৩ অষ্টম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বই।

৬৫৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, এম এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃ: ৭৮

www.pathagar.com

৯ তারিখ সকালে অফিসে যাওয়ার পথে গাড়ির রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সম্পূর্ণ শুনেছিলাম"।[৬৫৫]

ড. ওয়াজেদ মিয়া ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের অধীনে থেকে নিয়মিত অফিস করেছেন। তিনি প্রতিনিয়ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। তার ভাষায় "অফিসে পৌছেই (০৫ আগস্ট ১৯৭১) আমি মেজর হোসেনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করি। তাকে না পেয়ে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলীর অফিসে ফোন করি। রাও ফরমান আলী ঐ সময় কিছু দিনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে[৬৫৬] থাকায় তাঁর অফিস থেকে আমাদের ব্যাপারে ব্রিগেডিয়ার কাদির দায়িত্বে রয়েছেন এ কথা জানিয়ে আমাকে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়।"[৬৫৭] "পরের দিন (০৬ আগষ্ট ১৯৭১) সকালে অফিসে এসেই ব্রিগেডিয়ার কাদিরের দফতরে ফোন করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি নেই।"[৬৫৮]

বিপরীতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম। কিন্তু ১৯৭১ সনে তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না।"[৬৫৯] শাহরিয়ার কবির বলেন, "যুদ্ধকালীন সময়ে সাঈদী জামায়াতের উল্লেখযোগ্য কোন নেতা না থাকায় তৎকালীন পত্র পত্রিকায় সাঈদীর ব্যাপারে খুব একটা লেখালেখি না হলেও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কাছে সাঈদীর অপরাধের তথ্য আছে।"[৬৬০] তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলেন। আর এ কারণে ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউটর বলেন, "১৯৭১ এ তৎকালীন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন এজাজের সঙ্গে বৈঠক করে পাকিস্তান রক্ষার অঙ্গিকার করেন সাঈদী?"[৬৬১] এটাই যদি যুদ্ধাপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ হয়, তা হলে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়াকে (সুধা) যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা দিয়ে মরণোত্তর বিচার করা হবে কি?

ঘাদানিক, ইসলাম ও যুদ্ধাপরাধ

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির মূল টার্গেট হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামী সংগঠন। শাহরিয়ার কবির বলেন "আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম যদি ইসলাম হয় তাহলে আমরা

---

৬৫৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, এম এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃ: ৭৮

৬৫৬ এম এ ওয়াজেদ মিয়া ২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশ হওয়াকে স্বীকার না করে একে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবেই গণ্য করেন।

৬৫৭ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, এম এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃ: ৯৭

৬৫৮ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, এম এ ওয়াজেদ মিয়া; পৃ: ৭১, ৯৬-৯৭, ৯৮

৬৫৯ রাষ্ট্র বনাম মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মামলার সাক্ষী আবেদ খান উক্ত মন্তব্য করেন।

৬৬০ আমাদের সময় ০১.০৭.২০১০

৬৬১ আমাদের সময় ০৩.১১.২০১১

www.pathagar.com

পাকিস্তান থেকে আলাদা কেন হলাম।"[৬৬২] স্বাধীনতা বিরোধীতাকারীদের মধ্যে একমাত্র ইসলামপন্থীদেরকেই টার্গেট তার। তিনি বলেন গোলাম আযমকে বাইরে রেখে বাকী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রহসন। গোলাম আযমকে বন্দী করার পর তিনি বলেন, তাকে এসি রুমে রাখতে হবে, ভাল খাবার দিতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে, মরে গেলে বিচার করা যাবে না।[৬৬৩]

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যাদের নাগরিকত্ব বাতিল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় তাদের তালিকায় প্রথম ছিলেন নূরুল আমিন, অষ্টম স্থানে রয়েছে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় আর অধ্যাপক গোলাম আযমের স্থান হচ্ছে ১২তম। ঘাদানিকের কোন নেতা কোনদিন রাজা ত্রিদিব রায়কে যুদ্ধাপরাধী বলেননি বরং তার ছেলে রাজা দেবাশীষ রায়ের সঙ্গে বসে আদিবাসী[৬৬৪] অধিকারের নামে দেশকে আরো একবার অনিশ্চিতয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

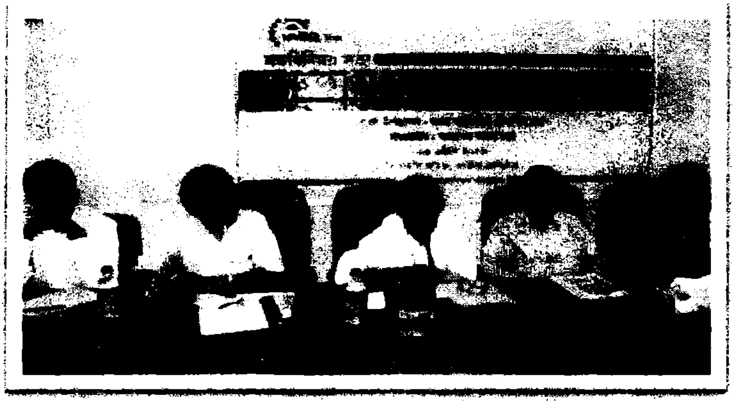

Prof Ajoy Roy speaks at a view exchange meeting titled 'Compendium on IP laws in Bangladesh' at the National Press Club in the city yesterday. On his left are Justice Gholam Rabbani and Ayesha Khanam and on his right are Dalim Chandra Barman and Raja Debashish Roy.Photo: STAR

ঘাদানিকের সকল নেতাই কোরানিক আইন বন্ধ করার জন্য সরাসরি কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহর দেয়া বিধান ও রাসূলের পথ অনুসরণ করে চলার জন্য যে উপদেশ

---

৬৬২ যুদ্ধাপরাধ বিতর্ক এবং কতিপয় বুদ্ধিমান মানুষের গল্প, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ,পৃঃ ২৬-২৭। সারকথা নেয়া হয়েছে।

৬৬৩ আমার দেশ, তারিখঃ ১৮.০১.২০১২

৬৬৪ উপজাতিদেরকে তারা আদিবাসী ঘোষণা দেয়ার জন্য মরণপণ করেছেন। সরকার তাদেরকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

www.pathagar.com

দেয়া হয় তথা ফতওয়াকে বন্ধ করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। কোরআনের আইন অনুযায়ী নারী পুরুষসহ পৃথিবীর সকল কিছুর অধিকার প্রদানের পরিবর্তে নিজস্ব মনগড়া অধিকার সনদ তৈরী করে ৯০ শতাংশ মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে যারা আল্লাহর শেষ নবী মানেন না সেই কাদিয়ানী মতে বিশ্বাসীদের রক্ষায় তারা জীবনপণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ঘাদানিকের বিশ্বাস হচ্ছে ইসলাম বিরোধী।

In mid-June 1995 Jamaat-e Islami, a religious fundamentalist political party of Bangladesh announced their decision to demolish the Complex of Ahmadya Muslim Jammat at Bakshi Bazar in Dhaka. Nirmul Committee strongly condemned that announcement and declared its pledge to resist the fanatic and terrorist act of Jamaat-e-Islami. According to the declaration Nirmul Committee organised a protest rally at Central Shaheed Minar which is near the Ahamadya Complex on 29 June 1995.

After holding the rally Nirmul Committee brought out a procession and marched towards Ahmadya Complex. Leaders and workders of Nirmul Commttee then took position in front of Ahmadya Complex to protect it from the attack of Jamaat-eIslami. (from right) Maulana Abdul Awal, Taher Ahmed, journalist Kamal Lohani, poet Shamsur Rahman, Professor Kabir Chowdhury, journalist Faiz Ahmed, writer journalist Shahriar Kabir, Barrister Shawkat Ali Khan, Justice K M Sobhan, Advocate Gaziul Haque and other leaders are seen in front of the rally.

Ref:Try the war criminals of '71 at a special tribunal
Edited by Shahriar Kabir// pp-40

www.pathagar.com

খণ্ড : তিন

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার
আইনগত বিশ্লেষণ

The state calls its own violence law,
but that of the individual crime
-Max Stirner

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচারের প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতাত্তোর শেখ মুজিব আমলেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের বিচারের জন্য দু'টি আইন প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে সকল কলাবরেটর ও বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ সকল যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিয়ে সে অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হয়। শেখ মুজিবের ধারাবহিকতায় জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ আমলে স্বাধীনতাবিরোধী বা যুদ্ধাপরাধী নিয়ে সরকারীভাবে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। বরং Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Orber 1972 বাতিলসহ সকল মহলকে রাজনীতিতে সম-অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি সকল মহলকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী ইস্যুটি কবরস্থ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু RAW এর অর্থায়নে বামপন্থী রাজনীতিবিদ, কতিপয় বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতকে আবারো জীবন্ত করেছেন। ডাঃ এম এ হাসান War Crimes Facts Finding Committee (WCFFC) গঠনের মাধ্যমে গত ২০ বছর যাবৎ এ ইস্যু নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৮ সনে জাতি আবার ১৯৭১ -এর দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক পর্যায়ে উপনীত হয়।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ আইন আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংশোধন করা হয়েছে। কেবল তাই নয় সেটার আলোকে সংবিধানও সংশোধন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, ৫ম সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Orber 1972 স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সংশোধিত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ২০০৯ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে তদন্তকারী টিম এবং প্রসিকিউশন টিম। আন্তর্জাতিক আইনে বিচার হবে প্রচারণায় আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞরা বাংলাদেশ সফর শুরু করেন এবং এ বিষয়ে তাদের আইনী মতামত দিতে শুরু করেন। ১৯৯৮ সনে ৬০টি দেশ রোম স্ট্যাটিউট রেটিফাই করার পর International Criminal Court (ICC)-এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশ সফরে এসে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক এম্বাসাডর এ্যাট লার্জ Stephen J. Rapp বলেন, বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিচার হবে বিশ্ববাসীর জন্য একটি ম্যাসেজ।[৬৭৪] এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, আন্তর্জাতিক আইন, সনদ এবং বিচারের

---

[৬৭৪] ১৩. ০১. ২০১১ তারিখের Stephen J. Rapp এর সংবাদ সম্মেলন ।

www.pathagar.com

সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আবশ্যক বলে প্রতীয়মান। সামগ্রিক বিশ্লেষণের পূর্বে প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি, সনদ, চুক্তি, রায় প্রভৃতির একটি প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করা হলো ।

আন্তর্জাতিক আইন ও সনদ

১. লন্ডন চুক্তি ১৯৪৫ ও লন্ডন সনদ ১৯৪৫
২. ন্যুরেমবার্গ নীতিমালা ১৯৪৫
৩. জেনোসাইড কনভেনশন ১৯৪৮
৪. আইসিসিপিআর ১৯৬৬
৫. রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮
৬. বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ১৯৭৪

বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান

৭. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ; মুজিবনগর, বাংলাদেশ; ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
৮. বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান
৯. বাংলাদেশ সংবিধান
১০. যুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনুগত্য ঘোষণার আদেশ
১১. যুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনা
১২. রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১
১৩. Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972
১৪. The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Repeal) Ordinance, 1975
১৫. স্বাধীনতার পক্ষের নেতাকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, কর্মকর্তা–কর্মচারীদেরকে কৃত অপরাধের জন্য দায়মুক্তি প্রদান
১৬. ২০০৮ সনের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহার
১৭. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংক্ষেপে ICT'73
১৮. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) (সংশোধন) আইন ২০০৯ সংক্ষেপে ICT'09
১৯. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০
২০. যুদ্ধাপরাধ বিচার দেশে দেশে

- ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল
- টোকিও ট্রায়াল
- কম্বোডিয়া ট্রায়াল
- রুয়ান্ডা ট্রায়াল
- সিয়েরা লিওন ট্রায়াল
- সার্বিয়া ট্রায়াল
- বাংলাদেশ ট্রায়াল

www.pathagar.com

২১. খ্যাতনামা আইনজীবীদের মতামত

- যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের প্রখ্যাত আইনজীবী স্টিভেন কেয়ি কিউসি এর মতামত
- ব্রিটিশ আইন বিশারদ Michael J Beloff QC এর মতামত
- আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ (সংশোধন) ২০০৯ সম্পর্কে জেয়াদ-আল-মালুম[৬৭৫] ও তানিয়া আমীরের অভিমত
- আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ (সংশোধন) ২০০৯ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বার এসোসিয়েশনের মতামত
- আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ (সংশোধন) ২০০৯ সম্পর্কে বাংলাদেশের সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের আইনজীবী প্যানেলের অভিমত
- Mr Soli J. Sorabjee, Former Attorney General for India এর মতামত ।
- ঢকায় যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক এম্বাসাডর এ্যাট লার্জ Stephen J. Rappএর Press Conference
- যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক এম্বাসাডর এ্যাট লার্জ Stephen J. Rapp এর পত্র
- যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য John Boozman এর পত্র
- HUMAN RIGHTS WATCH এর পত্র এবং Specific Recommendations
- Nine Bedford Row International (9BRI) এর পত্র
- Lord Eric Avebury এর মতামত ।
- David Bergman এর মতামত ।
- উইকিলিকসে প্রকাশিত বাংলাদেশে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ জেমস্ এফ মরিয়ার্টির মতামত ।
- International Bar Association, War Crimes Committee এর মতামত ।

২২. যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন, বিধি-বিধান, বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের মতামতের সঙ্গে বাংলাদেশী আইন, বিধি-বিধানের তুলনামূলক পর্যালোচনা

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রসিকিউটর টীমের সদস্য ।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক আইন, সনদ, সংবিধি ও চুক্তি

লন্ডন চুক্তি ১৯৪৫[৬৭৬] ও লন্ডন সনদ ১৯৪৫[৬৭৭]

মস্কো ঘোষণা ১৯৪৩[৬৭৮] অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত ইউরোপীয় অক্ষ শক্তির (জার্মান, হাঙ্গেরী, ইটালী, রুমানীয়া, বুলগেরিয়া) প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ৮ আগস্ট ১৯৪৫ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্সের মধ্যে লন্ডনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ তদন্ত, বিচার সম্পূর্ণ করার জন্য সাতটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত লন্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুন্যাল গঠন, এর কার্যাবলী নির্ধারণ ও পরিচালনার জন্য এসব রাষ্ট্রের উদ্যোগে একটি সনদ প্রণীত হয়। এই সনদটি লন্ডন চার্টার বা সনদ ১৯৪৫ নামে পরিচিত এবং লন্ডন সনদকে উল্লিখিত লন্ডন চুক্তির অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। লন্ডন সনদ ১৯৪৫ অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে প্রথম বারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে পরাজিত ইউরোপীয় অক্ষ শক্তির প্রধান প্রধান সামরিক ও বেসামরিক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়। এ ট্রাইবুনালে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দু'জন করে এবং ফ্রান্সের একজন বিচারককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে বিচার কার্যক্রমটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের মর্যাদা লাভ করে। এ সনদের অনুচ্ছেদ ৬-এ অপরাধ ও অপরাধীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে--

'ইউরোপীয় অক্ষশক্তির দেশ সমূহের প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের জন্য লন্ডন চুক্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের সেই সকল ব্যক্তি যারা ইউরোপীয় অক্ষশক্তির দেশসমূহের স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে অথবা সংস্থানের সদস্য হিসেবে নিম্নবর্ণিত অপরাধ সংজ্ঞান করেছে তাদের বিচার ও শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকবে। ট্রাইব্যুনালের অধিক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী বা এদের যে কোন একটিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে যার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে।

(ক) **শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ** হচ্ছে একটি আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, উদ্যোগ গ্রহণ বা যুদ্ধ শুরু বা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অথবা আন্তর্জাতিক কোন চুক্তি, সমঝোতা, আশ্বাস বা অঙ্গীকার লংঘন করে যুদ্ধ শুরু করা এবং বর্ণিত কার্যবিধি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন সম্মিলিত পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করা।

---

[৬৭৬] পরিশিষ্টঃ ১

[৬৭৭] পরিশিষ্টঃ ২

[৬৭৮] The Moscow Declaration was signed during the Moscow Conference on October 30, 1943. The formal name of the declaration was "Declaration of the Four Nations on General Security". It was signed by the foreign secretaries of the Governments of the United States, the United Kingdom, the Soviet Union and China.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 বিধানাবলী[৬৭৯]

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) শীর্ষক সংবিধিটি ১৯৬৬ সনে প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ আইসিসিপিআর-এ স্বাক্ষর করেছে ফলে এই সংবিধির আলোকে যে কোন আইন প্রণয়ন ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সংবিধির Article 14 যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অনুচ্ছেদ-১৪ : ১.আদালত ও ট্রাইবুনালের নিকট সকল ব্যক্তিই সমান। আইনের দ্বারা গঠিত উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য শুনানীর মাধ্যমে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই বিচার পাবার অধিকার রাখে। নৈতিকতা বিষয়ক, গণতান্ত্রিক সমাজে গণ-শৃঙ্খলা অথবা জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার্থে অথবা পক্ষগুলোর ব্যক্তিজীবনের স্বার্থে অথবা আদালত যদি কোন বিশেষ কারণে মনে করে যে, ন্যায় বিচারের জন্যই প্রকাশ্য বিচার বন্ধ করা প্রয়োজন তা হলে, আদালত জনসাধারণ ও গণ-মাধ্যমকে সম্পূর্ণ বিচারিক পর্যায়ে অথবা বিচারের কোন পর্যায়ে বিচারিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষকরণে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু ফৌজদারী মামলায় যে কোন রায় অবশ্যই প্রকাশ্য হতে হবে যদি না এতে শিশু/কিশোর অপরাধীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক অথবা শিশুর অভিভাবক বিষয়ে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটায়।

২. আইন দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ হিসেবে দাবী করার অধিকার রাখেন।

৩. অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত সকলেই নিম্নোক্ত সুবিধা পাবার অধিকার রাখে-

ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অতিসত্ত্বর ও বোধগম্য ভাষায় তাকে অবহিত করতে হবে।

খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের জবাব প্রদানের প্রস্তুতি এবং তার পছন্দমত আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

গ) বিচারিক কার্যক্রমে অযৌক্তিক কালক্ষেপন করা যাবে না।

ঘ) অভিযুক্তের উপস্থিতিতে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে, ব্যক্তিগতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের জবাব প্রদানের জন্য অথবা অভিযুক্তের

---

[৬৭৯] পরিশিষ্ট : ৫

www.pathagar.com

পছন্দমত আইনী সহায়তা প্রাপ্তির অধিকার দিতে হবে। যদি তার আইনী সহায়তা না থাকে অথবা যে ধরণের আইনী সহায়তা পাওয়ায় কথা তা না পেয়ে থাকে এবং ন্যায় বিচারের জন্য যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য এটি প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং তার পক্ষে এর খরচ বহন করা প্রয়োজন হয় এবং যদি তার এই খরচ বহনের সামর্থ্য না থাকে তবে রাষ্ট্রের এ ধরণের সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা অথবা তার বিপক্ষের সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য এবং তার স্বপক্ষের সাক্ষীর উপস্থিতি এবং তার স্বপক্ষের সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য সে তার বিপক্ষের সাক্ষীদের অনুরূপ সুবিধা পাবে।

চ) যদি আদালতের ভাষা বুঝে না থাকে তবে অভিযুক্ত বিনা খরচে অনুবাদকের সাহায্য পাবে।

ছ) তার নিজের বিপক্ষে অথবা দোষ স্বীকার করতে অভিযুক্তকে বাধ্য করা যাবে না।

৪. কিশোর অভিযুক্তের ক্ষেত্রে তাদের বয়স এবং পুনর্বাসনের দিকটি বিবেচনায় রেখে আদালতের কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।

৫. দণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক অপরাধী আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট উচ্চতর ট্রাইবুনালে রিভিউ-এর অধিকার প্রাপ্ত হবেন।

৬. ফৌজদারী অপরাধে চূড়ান্তভাবে দণ্ডিত অপরাধীর দন্ড যদি বাতিল হয় অথবা মার্জনা করে দেয়া হয় এই কারণে যে, বিচারের ক্ষেত্রে সাংঘাতিকভাবে অনিয়ম হয়েছে, এক্ষেত্রে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার হকদার যদি না এটা প্রমাণিত হয় যে, অজানা তথ্য না পাওয়ার ক্ষেত্রে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি আংশিক অথবা পুরোপুরিভাবে দায়ী।

৭. প্রত্যেক দেশের দন্ডবিধি ও আইন অনুসারে একবার কোন ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে দণ্ড প্রাপ্ত অথবা খালাসপ্রাপ্ত হলে একই অপরাধে একই ব্যক্তিদের পুনরায় বিচারের সম্মুখীন করা যাবে না।

রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮[৬৮০]

বাংলাদেশ রোম স্ট্যাটিউট স্বাক্ষরকারী দেশ। এ সংবিধি মেনে চলা তার জন্য বাধ্যতামূলক। জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ অনুসারে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধবন্দী বা বেসামরিক লোকদের হত্যা বা নির্যাতনের বিচারের বিষয়টি এ সংবিধিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এ সংবিধির অনুচ্ছেদ ৮-এ জেনেভা কনভেশনের বিধি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীর বিচার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৬৮০ পরিশিষ্ট- ১৯। এখানে উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

রোম ষ্ট্যাটিউট এর ৫,৬,৭,৮ অনুচ্ছেদে শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধ এর আওতায় সকল অপরাধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যা এই সংবিধির অধীনে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক বিচার্য। এ সংবিধিতে বলা হয়েছে--

১. প্রসিকিউটর যে কোন ব্যক্তির তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করলে (অনুচ্ছেদ ১৫) বা কোন স্বাক্ষরকারী সদস্য দেশ কর্তৃক প্রসিকিউটর বরাবর অপরাধ বিচারের জন্য প্রেরণ করা হলে বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক যে কোন অপরাধের বিচারের জন্য প্রেরণ করা হলে প্রসিকিউটরের রিপোর্টের ভিত্তিতে উক্ত আদালত বিচারের ব্যবস্থা করবে (অনুচ্ছেদ ১৪)।

২. এই সংবিধিটি কার্যকর হওয়ার পূর্বে সংঘটিত অপরাধের বিচার আন্তর্জাতিক আদালত করতে পারবে না (অনুচ্ছেদ ২৪)।

৩. যে কোন ব্যক্তি এককভাবে বা অন্যের সংগে জড়িত হয়ে বা অন্যের সহায়তায় এই সংবিধিতে উল্লেখিত অপরাধ করলে তার বিচার করা হবে (অনুচ্ছেদ ২৫)।

৪. রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এই বিচার হতে রেহাই পাবে না। যেমন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি বা সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিচার হতে রেহাই পাবে না (অনুচ্ছেদ ২৭)।

৫. সামরিক কমান্ডার নিজের সিদ্ধান্তের জন্য কৃত অপরাধ ও অধীনস্থ সৈনিকদের কৃত অপরাধের জন্য বিচার হতে রেহাই পাবে না (অনুচ্ছেদ ২৮)।

৬. সরকার বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মানার কারণে অপরাধ সংঘটিত হলে উক্ত অধীনস্থ ব্যক্তি বিচারের দায় হতে রেহাই পাবে না (অনুচ্ছেদ ৩৩)।

৭. সভাপতি বিচারক অন্য কোন সদস্য বিচারকের অনুরোধে কোন বিশেষ বিচারিক কার্য হতে বিরত থাকতে অনুমতি দিতে পারবে না। বাদীপক্ষ বা আসামীপক্ষ যে কোন বিচারকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ বিচারক আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন। আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে (অনুচ্ছেদ ৪১)।

বিচার/ প্রসিকিউটর/ রেজিস্টার অপসারণ

১. বিচারক প্যানেলের বিচারক, প্রসিকিউটর, ডেপুটি প্রসিকিউটর, রেজিস্টার বা ডেপুটি রেজিস্টারকে গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধির নিয়ম কানুন লংঘন করলে বা সংবিধি মেনে চলতে অক্ষম হলে অপসারণ করা হবে। বিশেষ করে বিচারের ক্ষেত্রে বিচারিক প্যানেলের দুই তৃতীয়াংশের সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য দেশের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবে (অনুচ্ছেদ ৪৬ ও ৪৭)।

www.pathagar.com

২. মামলার গ্রহণযোগ্যতা, আদালতের অধিক্ষেত্র নিয়ে চার্জগঠন বা বিচারিক চেম্বারের কোন আদেশের এপীলেট চেম্বারের কাছে আপীল করতে পারবে না (অনুচ্ছেদ ১৯)।

১৯৭৪ বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় চুক্তি[৬৮১]

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ৯ এপ্রিল, ১৯৭৪ তারিখে ভারতের দিল্লীতে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ধারা ১৩, ১৪ ও ১৫ অনুযায়ী চিহ্নিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিচার না করে পাকিস্তান সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ অপরাধের জন্য পরবর্তীতে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং বাংলাদেশের জনগণ তাদেরকে ক্ষমা করে পাকিস্তান সরকারের সাথে নতুন করে সম্পর্ক সৃষ্টি করার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত চুক্তির আওতায় ভারত উপমহাদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ অপরাধের বিষয়টি উক্ত চুক্তির মাধ্যমে মিমাংসা করা হয়েছিল।

৭. ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীকৃতি দেয়া হলে দিল্লী চুক্তিতে প্রস্তাবিত সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশের যোগদানের সুযোগ ঘটলো। তদনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আজিজ আহমদ ৫ই এপ্রিল থেকে ৯ই এপ্রিল, ১৯৭৪ পর্যন্ত বৈঠকে মিলিত হন এবং দিল্লী চুক্তিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রশ্ন, বিশেষ করে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর প্রশ্ন এবং পাকিস্তানস্থ বাঙালি, বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানি ও ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের স্ব-স্ব দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পাদনের প্রশ্নে আলোচনা করেন।

১৩. আপসরফার জন্য সরকারত্রয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে উপমহাদেশে শান্তি ও মৈত্রীর স্বার্থে তিনজন মন্ত্রী ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর প্রশ্ন আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, এ সকল বন্দী যে বহুবিধ অপরাধ ও বাড়াবাড়ি করেছে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক কানুনের বিধি অনুসারে তা যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরুদ্ধ অপরাধ ও গণহত্যা এবং এ ব্যাপারে বিশ্বজনীন সাধারণ মতৈক্য রয়েছে যে, ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর মত অপরাধের অভিযোগে আনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, তারা যদি কোন অপরাধ করে থাকে তাঁর দফতর তার নিন্দা করেছেন এবং গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

১৪. এ প্রসঙ্গে তিনজন মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, আপসরফা ও নিষ্পত্তির জন্য দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিন দেশের দৃঢ় সংকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে

---

৬৮১ পরিশিষ্ট : ১৮ (চুক্তিটির ইংরেজী ভার্সন)।

www.pathagar.com

বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে। মন্ত্রীগণ আরো উল্লেখ করেন যে, স্বীকৃতি দানের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পেলে তিনি বাংলাদেশে সফরে যাবেন এবং সৌহার্দ্য এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অতীতকে ভুলে যেতে এবং ক্ষমা করে দেবার জন্য তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছে আবেদন জানাবেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত বর্বরতা ও ধংসযজ্ঞের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি চান জনগণ অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করুক। তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের মানুষ ক্ষমা করতে জানে।

১৫. উপরিউক্ত অবস্থার আলোকে, বিশেষ ভাবে অতীতের ত্রুটি ক্ষমা করে দেবার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, ক্ষমা করে দেবার কার্যক্রম হিসেবেই বাংলাদেশ সরকার বিচারের ব্যাপারে অগ্রসর না হতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্থির করা হয় যে, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে দিল্লী চুক্তির অধীনে বর্তমানে সম্পাদনাধীন লোকবিনিময় প্রক্রিয়ার অনান্য যুদ্ধবন্দীর সাথে পাকিস্তানে চলে যেতে দেয়া যায়।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ও যুদ্ধাপরাধের বিচার

বাংলাদেশ ভূখন্ডে সংঘটিত বা সংঘটিত ব্য যে কোন যুদ্ধাপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার সম্পর্কিত The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ ভূখন্ডে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভারতের দিল্লিতে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিস্বাক্ষরিত হয়। ঐ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চিহ্নিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার না করে পাকিস্তান সরকারের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং এভাবেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত বিষয়টি মিমাংসা করা হয়। বাংলাদেশের কোন সামরিক বা আধা সামরিক বা বেসামরিক কর্মকর্তা বা ব্যক্তি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সরকার কর্তৃক The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 সংশোধন করে The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Amendment) 2009 করা হয়েছে। সংশোধিত আইনটি উল্লেখিত চুক্তির সঙ্গে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক বা জনগণের ইচ্ছার পরিপন্থী। ১৯৭৪ সনের সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অক্ষুন্ন রেখে আইনটির প্রয়োগ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের উপর বিশ্ব আস্থাহীন হবে। তবে, বাংলাদেশের সামনে যে পথটি খোলা রয়েছে তা হলো চুক্তিটি সংসদে ratify না করার কারণ দেখিয়ে একতরফাভাবে অমান্য করার কোন ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, আদেশ, সংবিধানসহ দেশীয় আইনসমূহ এবং প্রাসঙ্গিক কথা

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র[৬৮২] ; মুজিবনগর, বাংলাদেশ; ১০ এপ্রিল, ১৯৭১[৬৮৩]

স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় মাইল ফলক হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যা ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে কার্যকর হয়।[৬৮৪] এ ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়; আর এ রাজনৈতিক সরকারই স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিজয় প্রান্তে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার" এ তিনটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে নির্ধারিত হয়। এ ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে--

- "সংবিধান প্রণীত হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন,এবং
- রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন।
- রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।
- একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।"

এ ঘোষণাপত্রের প্রথম ব্যত্যয় ঘটে যখন ভারতের চাপে "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার" এ তিনটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পরিবর্তন করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টের যৌথ হাউসের সভায় বলেন, "মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, বাংলাদেশের নেতৃবর্গ ইতিমধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে তাদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তারা যে আদর্শগুলি রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র লিখেছেন তার কপি আপনাদের টেবিলে দেয়া হল"[৬৮৫]।

---

৬৮২ পরিশিষ্ট : ৬

৬৮৩ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ এর ঘোষণা মূলতঃ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে করা হয়।

৬৮৪ মেজর (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি) জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা হচ্ছে প্রথম মাইল ফলক।

৬৮৫ বাংলাদেশে 'র', আবু রুশদ, পৃঃ ৫১

www.pathagar.com

দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের শর্ত (সংবিধান প্রণীত হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন) ভঙ্গ করে সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অথবা তিনি মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করেন।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দেশ স্বাধীন হলে রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করতে হয় তা তৎকালীন সকল নেতাই জানতেন; তাই তারা স্বাধীনতার ঘোষণপত্রেই এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে অর্পণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ৭২ সনে গৃহীত বাংলাদেশের মূল সংবিধানে জ্ঞাতসারেই এ ঘোষণাপত্রটি সন্নিবেশিত করা হয়নি; ১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগ এ ঘোষণাপত্রটি সংবিধানের বই-এর অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত করে।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২

১৯৭২ সনের ১১ জানুয়ারী বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ জারী করা হয়। এ আদেশানুযায়ী ১৯৭০ সনে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণ-পরিষদ নামে সাংবিধানিক পরিষদ (Constituent Assembly)[৬৮৬] গঠন করা হয়। এ আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয় এবং শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সাংবিধানিক পরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের পর নতুন সংবিধান অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন।[৬৮৭]

শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে ১১ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ জারী করেন। যেহেতু ঐ তারিখ হতেই তা কার্যকর হয় সেহেতু সংবিধান প্রণয়ন করা ছাড়া ১২ জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিব বাংলাদেশে সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়া ছিল অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ এর পরিপন্থী। আর এ কারণে শেখ মুজিবের উপর সংবিধান ভংগের প্রথম দায় বর্তায়।

---

৬৮৬ সাংবিধানিক পরিষদ (Constituent Assembly) হচ্ছে সেই সংসদ যা কেবল সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত হয় এবং সংবিধান গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৬৮৭ Article : 8 ...the Cabinet shall appoint as President a citizen of Bangladesh who will hold the office of President until another President enters upon the office in accordance with the Constitution as framed by the Constituent Assembly.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সংবিধান

১৯৭০ সনে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা। নির্বাচন প্রাক্কালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (Legal Framework Order) ১৯৭০ ঘোষণা করা হয়।[৬৮৮] এ অর্ডারের আওতায় সকল দল পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিপালন নিশ্চিত করা, ইসলামী নীতি, কোরান ও সুন্নাহ অনুসরণ করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যবাধকতামূলক ছিল। আদেশের কোন ব্যত্যয় ঘটলে এ আদেশের প্রদত্ত ক্ষমতাবলেই রাষ্ট্রপতি সংসদসহ সংবিধান বাতিল করতে পরেন। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সনের নির্বাচনের পূর্বে যে ইশতেহার প্রকাশ করে তাতে উল্লেখ ছিল যে, তারা কোরান-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবে না। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের সকল প্রকার ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করাসহ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। আওয়ামী লীগের এ ঘোষণায় আস্থা প্রকাশ করেই মানুষ এ দলকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল।

পাকিস্তানের জন্য নির্বাচিত সংসদ বাংলাদেশের সাংবিধানিক গণ-পরিষদ (Constituent Assembly)[৬৮৯] হিসেবে গণ্য করার আইনগত সুযোগ ছিল বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন না। কিন্তু তারপরও তা করা হয়েছে। অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী ১৯৭০ সনে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে[৬৯০] গঠিত সাংবিধানিক গণ-পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশ সংবিধান প্রণীত ও অনুমোদিত যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখ হতে কার্যকর হয়। মাহমুদুর রহমান মান্নার উপস্থাপনায় এক টিভি আলোচনায় আসিফ নজরুল বলেন, বতর্মান সুপ্রীম কোর্ট যেভাবে আদেশ দিচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে যদি কোন কোর্ট রায় দেয় যে, পাকিস্তানের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (Legal Framework Order) ১৯৭০ অনুযায়ী নির্বাচিত কোন সংসদ ১৯৭২ সনের সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে না, তাই ১৯৭২ সনের সংবিধান বাতিল, তাতে কারো বলার কিছু থাকবে না।[৬৯১]

---

৬৮৮ পরিশিষ্ট : ২২

৬৮৯ ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেই সংবিধানিক গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) হয়েছে। বলা হয়েছে "আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদেরকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মান রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদ গঠন করিলাম"

৬৯০ আওয়ামী লীগের ৫৬ জন, পিডিপির ৩ জন, জামায়াতের ১ জন, নেজামে ইসলামীর ১ জন, ন্যাপ (ওয়ালী)র ১ জন ও স্বতন্ত্র ৮ জন মোট ৭০ জনকে সংবিধানিক পরিষদ (Constituent Assembly) এর সদস্য করা হয়নি।

৬৯১ প্রফেসর আসিফ নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক, সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক। ১৪.০৬.২০১১ তারিখের 'বাংলা ভিশনের' সংবাদপত্র পর্যালোচনা অনুষ্ঠান ছিল।

www.pathagar.com

সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের ২ নং উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন; এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে"

সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদের ৩ টি উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে

১. এই ভাগের বিধানাবলির সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান- প্রবতর্ন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে ।
২. রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে ।
৩. সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয় "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী ।"

সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের ১ নং উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না ।"

এবং সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের ১ নং উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে "অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইন বলে যে দন্ড দেয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিক বা তাহা ভিন্ন দন্ড দেয়া যাইবে না ।"

এবং সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের ২ নং উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে "এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দন্ডিত করা যাইবে না ।"

এবং সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের ৩ নং উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে "এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান সম্বলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।"

www.pathagar.com

এবং সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে "কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্বণ ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দন্ড মকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।"

যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম সংশোধনী ১৯৭৩

১৯৭২ সনের মূল সংবিধানে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যাজনিত অপরাধ ইত্যাদি অপরাধের বিচার সম্পর্কিত বিষয়ে কোন বিধান ছিল না। সে কারণে ১৯৭৩ সনে সংবিধানের ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নিম্নরূপ সংশোধনী আনা হয়--

অনুচ্ছেদ ৪৭(৩)

"এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান সম্বলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।"

অনুচ্ছেদ ৪৭ক (১)

"যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।"

অনুচ্ছেদ ৪৭ক (২)

"এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।"

প্রকৃতপক্ষে, ২০-০৭-১৯৭৩ তারিখ হতে কার্যকর আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংবিধান সম্মত করার জন্যই সংবিধানে অনুচ্ছেদ নং ৪৭(৩) এবং ৪৭ক (১) ও (২) সংযোজন করা হয় এবং ১৫-০৭-১৯৭৩ হতে উক্ত সংশোধনীর ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা দেয়া হয়।

৩০ জুন ২০১১ তারিখে জাতীয় সংসদ বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে পঞ্চদশ সংশোধনীর সংবিধানে আমূল পরিবর্তন আনে। জাতির কাছে এ সংশোধন

www.pathagar.com

অগ্রহণযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোর জরিপ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের সাথে প্রায় ৯১ শতাংশ মানুষ একমত হতে পারেনি।[৬৯২] মহাজোটের শরিকদলগুলোর সংসদ সদস্যগণ সংসদে ভোট দিয়ে বাইরে এর সমালোচনা করেছেন। সংবিধান ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে এর রূপ দেয়া হয়-

"এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য বা **অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন** কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান সম্বলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

সংবিধান ও আইনের অসামঞ্জস্যতা

(ক) সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী " সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন; এবং অন্যকোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে" অথচ এ সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদ এর পুরো পরিপন্থী ধারা সংযোগ করে (ধারা দ্রষ্টব্য) সংবিধানের সবোর্চ্চ মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর মর্যাদা সংবিধানের মর্যাদার উপর স্থান দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এবং খোদ সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন।

(খ) সংবিধানে ২৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। কিন্তু এ কথা (ইতিহাস বিশ্লেষণ পর্বে) প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৯৭১ সনে চীনপন্থী সমাজতন্ত্রী দল ও বুদ্ধিজীবী, উপজাতিসমূহ, বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার থাকা স্বত্ত্বেও এবং কেবল ইসলামপন্থী ব্যক্তি ও দলগুলোকে স্বাধীনতা বিরোধী চিহ্নিত করে তাদের প্রতি নাগরিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে যা সংবিধান লংঘনের শামিল। দুঃখজনক যে চিত্রাংকন ও ব্যঙ্গচিত্রে দাড়ি-টুপিধারীদেরকে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসীদেরকে জন্তু-জানোয়ার, হায়ানা ইত্যাদিতে চিত্রায়িত করে একদিকে ধর্মীয়

---

[৬৯২] অন লাইন জরিপ, দৈনিক ইত্তেফাক; তারিখ : ০২.০৭.২০১১

www.pathagar.com

অনুভূতিতে আঘাত হেনে সংবিধান লংঘনসহ দন্ডবিধির ২৯৫(ক) ও ২৯৮ ধারায় অপরাধ করছেন;[৬৯৩] অন্যদিকে নাগরিক বৈষম্য সৃষ্টি করে সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে দন্ডবিধির ১৫৩(ক) ধারায় অপরাধ করছে।[৬৯৪]

(গ)বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করার কারণে হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে কলাবরেটর আদেশে বিচার করা হয়। অনেকের বিচার কার্যক্রম চলাকালে সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমার আওতায় তারা সকল দায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে বন্দী জীবন থেকে মুক্ত হন। সংবিধানের ৩৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একই অপরাধে তাদের দু'বার বিচার করার সুযোগ নেই। যেহেতু সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে একবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেহেতু The আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ বা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ২০০৯ অনুযায়ী তাদেরকে দ্বিতীয়বার বন্দী করে সংবিধানের ৩৫(২) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধীর সংজ্ঞা ও ট্রাইব্যুনালের আওতা বা ইখতিয়ারের সঙ্গে সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। পক্ষান্তরে ৯ জুলাই ২০০৯ তারিখে সংশোধিত The International Crimes (Tribunals) Act 2009 এ বর্ণিত সংজ্ঞা ও ট্রাইব্যুনালের আওতা বা ইখতিয়ারের সঙ্গে সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদের মিল নেই। পরবর্তীতে ৩ জুলাই, ২০১১ তারিখে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংশোধন ২০০৯ এর মধ্যে যে অসঙ্গতি ছিল তা দূর করা হয়েছে। তবে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার পর সংবিধান সংশোধন করে নতুন সংশোধনীর আলোকে পুরোনো বিষয়ের বিচার করাটাই অসাংবিধানিক বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন।

শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সংবিধান প্রদত্ত কোন সুযোগ সুবিধা পাবে না। কোন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বলে অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানের কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না। এরই ধারাবাহিকতায় ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন অপরাধ শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ করলে তারা এ সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রাপ্য হবেন না।

---

৬৯৩ দন্ডবিধির ২৯৫(ক) ধারায় অপরাধ : প্রতিহিংসাবশতঃ কোনশ্রেণীর লোকের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমননা করা।

দন্ডবিধির ২৯৮ ধারায় অপরাধ : কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তার শ্রবণের মধ্যে কোন কথা উচ্চারণ করা বা শব্দ করা অথবা তার দৃষ্টিগোচরে কোন অংগভংগি করা বা কোন বস্তু স্থাপন করা।

৬৯৪ দন্ডবিধির ১৫৩(ক) ধারায় অপরাধ : কোন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা।

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ ব্যতীত সকল নাগরিক সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রাপ্য হবেন ও উচ্চ আদালতে প্রতিকারের জন্য হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন।

সংবিধানের ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অনুচ্ছেদ ৪৭ (৩)-এ কোন বেসামরিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিষয় উল্লেখ করা ছিল না। সামরিক ব্যক্তিদের সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রদত্ত অধিকারসমূহ তথা মৌলিক অধিকারসমূহের জন্য উচ্চ আদালতে প্রতিকারের জন্য আবেদন করতে পারেন না। ২০০৯ সনে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংশোধন করে এবং পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে 'যে কোন বেসামরিক ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠীর' বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ৪৭ (৩) এর অভিযোগ আনার বিধান করা হয়। কোন বেসামরিক ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ৪৭ (৩) এর অভিযোগ আনা হলে বেসামরিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি বা তারা সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রদত্ত অধিকারসমূহ তথা মৌলিক অধিকারসমূহের জন্য উচ্চ আদালতে প্রতিকারের জন্য আবেদন করতে পারবেন, এ মর্মে কোন সংশোধনী আনয়ন করা হয়নি।

যুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনুগত্য ঘোষণার আদেশ

২৬ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে বিধায় মুজিব নগর সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও প্রবাসে নিয়োজিত সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য ত্যাগ করে এ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার আদেশ প্রদান করে। নিম্নবর্ণিত আদেশের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে সকলকে জেলা প্রশাসক ও জেলা জজের নিকট এবং প্রবাসে diplomatic representative এর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।

Laws continuance enforcement order

Mujibnagar
Dated 10th of April, 1971

I, Syed Nazrul Islam, the Vice–President and acting President of Bangladesh, in exercise of the powers conferred on me by the Proclamation of Independence dated tenth day of April, 1971 do hereby order that all laws that were in force in Bangladesh on 25th March, 1971, shall subject to the proclamation aforesaid continue

www.pathagar.com

to be so inforce with such consequential changes as may be necessary on account of the creation of the sovereign independent state of Bangladesh formed by the will of the people of Bangladesh and that all government officials – civil, military, judicial and diplomatic who take the oath of allegiance to Bangladesh shall continue in their offices on terms and conditions of service so long enjoyed by them and that all district judges and district magistrates, in the territory of Bangladesh and all diplomatic representatives elsewhere shall arrange to adminster the oath of allegiance to all government officials within their jurisdiction.

This order shall be deemed to have come force into effect from 26th day of March 1971.

SYED NAZRUL ISLAM
Acting President

আইনের ধারাবাহিকতা ও প্রয়োগ আদেশ

মুজিবনগর
১০ এপ্রিল, ১৯৭১

আমি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণায় আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই মর্মে আদেশ প্রদান করছি যে, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে যেসব আইন ও বিধিবিধান কার্যকর ছিল সে-সমস্তই প্রয়োজনীয় অবস্থাগত পরিবর্তনসহ পূর্বোক্ত ঘোষণা সাপেক্ষে বলবৎ থাকবে এবং সকল সরকারি, বেসামরিক, সামরিক, বিচার বিভাগীয়, কূটনৈতিক কর্মকর্তা-কর্মচারী যাঁরা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন তাঁরা সকলেই তাঁদের স্বস্ব পদে চাকুরিবিধির শর্তানুযায়ী যেভাবে কর্মরত ছিলেন তাঁরা সেভাবেই কর্মরত থাকবেন এবং বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সকল জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যত্র কর্মরত কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের আওতাধীন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন।

এই আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বাঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এ আদেশ বলে দেশের অভ্যন্তরে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী জেলা প্রশাসক ও জেলা জজের নিকট আনুগত্যের শপথ নেয়া তো দূরে থাক জেলা প্রশাসক বা জেলা জজরাই আনুগত্যের শপথ নেননি। কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের সকলেই তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অধীন আনুগত্য পোষণ করেন। তবে প্রবাসে diplomatic representative এর নিকট আনুগত্যের শপথ নেয়ার পরিবর্তে কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী পক্ষ ত্যাগ করে মুজিব নগর সরকারের অধীন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

যুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনা

১৯ এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ১৮ দফা নির্দেশনা জারী করে; এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নির্দেশনাগুলো ছিল--

১. কোন বাঙালি কর্মচারী শত্রুপক্ষের সাথে সহযোগিতা করবেন না। প্রতিটি কর্মচারী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন (দফা ১)।

২. কেউ পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অথবা তাদের এজেন্টদের সাহায্য করবেন না। যে করবে তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হবে (দফা ১৩)।

Laws continuance enforcement order দ্বারা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনুগত্য ঘোষণার আদেশ যেমন কোন কাজে আসেনি, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনাও তেমনি কেউ মান্য করেননি বরং এ নির্দেশ অমান্য করে যারা কর্মরত ছিলেন বা চাকরিতে যোগদান করেছেন, এমন ব্যক্তিবর্গের কিছু নাম এ গ্রন্থের ইতিহাস খন্ডে দেয়া হয়েছে।

রাজাকার এবং রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১[৬৯৫]

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ২৮ মে ১৯৭১ তারিখে পূর্ব প্যাকিস্তান রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১ জারী করে। এ অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে এ অধ্যাদেশের ১১ ধারা অনুযায়ী আনসার আইন ১৯৪৮ রহিত করে রাজাকার বাহিনীকে সামরিক বাহিনীর সহযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। অধ্যাদেশের ধারা ১ অনুযায়ী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এই আইন বলবৎ হলেও ৪ ধারা অনুযায়ী পাকিস্তানের যে কোন নাগরিককে রাজাকার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করার বিধান রাখা হয়।

রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১ ধারা ১২ (১) অনুযায়ী বিলুপ্ত আনসার বাহিনীতে কর্মরত আনসার কর্মকর্তাসহ সকল সদস্য রাজাকার হিসেবে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়োগকৃত এসব আনসার কর্মকর্তাসহ সকল সদস্য

---

[৬৯৫] পরিশিষ্ট- ১০

www.pathagar.com

ছাড়াও দখলদার পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসন বেশ কয়েক হাজার[৬৯৬] ব্যক্তিকে রাজাকার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল।

রাজাকার বাহিনীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ রাজাকারের পরিচালক এবং অধিক্ষেত্র অনুযায়ী জেলা প্রশাসকগণের উপর ন্যস্ত ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনী এ বাহিনীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করে। রাজাকার বাহিনীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নীচে দেয়া হলো–

ধারা ৭ : পুলিশ বাহিনীতে রাজাকারদেরকে অঙ্গীভূতকরণ

(১) প্রাদেশিক পুলিশবাহিনীতে সকল রাজাকার বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজাকার অঙ্গীভূত ও অঙ্গীভূতির মেয়াদ সম্পর্কিত বিষয়াদি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে।

(২) যে সময়ের জন্য রাজাকারদেরকে পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে সেই সময়ে তাহাদেরকে অবশ্যই পুলিশ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

ধারা ৮ : রাজাকার বাহিনীর পরিচালক

(১) প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী উক্ত সরকার কর্তৃক রাজাকার বাহিনীর পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হইবে।

(২) প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী রাজাকারদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

(৩) পরিচালককে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ উপায়ে বা নির্দেশনা অনুযায়ী ৮ ধারার আওতায় নিয়োগকৃত পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তব্য পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

ধারা ৯ : ক্ষমতা প্রত্যার্পণ

প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক এই আইনের ধারা ৮(১) ও ১০ এর সকল ক্ষমতা বা আংশিক ক্ষমতা পরিচালককে বা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত এবং তাহার পক্ষে দায়িত্ব পালন করিবেন এমন কর্মকর্তাকে বা জেলা প্রশাসকগণকে তাহাদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োগের জন্য প্রদান করিতে পারিবেন।

---

[৬৯৬] কারো মতে রাজাকারের সংখ্যা ২০,০০০ আবার কারো মতে ৩৭,০০০ ।

www.pathagar.com

রাজাকার এবং রাজাকার অধ্যাদেশ ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাজাকাররা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিল না বরং সশস্ত্র সরকারী কর্মচারী ছিল, সরকারী বেতন ভাতাদি গ্রহণ করত। এ বাহিনী পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বেশ কিছু রাজাকার গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করে। যুদ্ধকালে বেশ কিছু রাজাকার মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধে মারা যায়[৬৯৭] বা আহত হয় এবং দেশ স্বাধীন হবার পর পরই আক্রোশের শিকার হয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্য কর্তৃক অনেক রাজাকার বিচার বহির্ভূতভাবে নিহত হয়। অনেক রাজাকারকে বন্দী করে হাজতে প্রেরণ করা হয় যাদের মধ্যে অনেককের বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়; আবার অনেকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তি লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর পরই অধিকাংশ রাজাকার তদানীন্তন সরকারী দল তথা আওয়ামী লীগে মিশে গিয়ে[৬৯৮] আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হিসেবে কাজ করে (ঘটনাটি এমন যে, একজনের বাড়ি ফরিদপুর, ঢাকায় বসবাসকালে সে রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে, স্বাধীন হবার পর পর সে ফরিদপুর গিয়ে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেয়)।

রাজাকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী উক্ত বাহিনীর পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তা, সকল জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা রক্ষা, পরিচালনা, পুলিশ বাহিনীতে অঙ্গীভূতকরণ ইত্যাদি সকল প্রকার কার্যাবলী পালন করেছিলেন। এ অধ্যাদেশের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে রাজাকারদের দায়িত্ব পালনের জন্য রাজাকার বাহিনীর পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা তথা জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সহকারী কমিশনার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্য এবং সচিবালয়ে সংশ্লিষ্টগণ দায়ী।

রাজাকার বাহিনীকে পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সহায়ক বাহিনী হিসেবে গণ্য করার যে সকল কারণ বিদ্যমান সেই একই কারণে তৎকালীন পুলিশ বাহিনীও সহায়ক বাহিনী হিসেবে গণ্য।

---

৬৯৭ কতজন রাজাকার যুদ্ধের সময় নিহত হয় তার কোন পরিসংখ্যান নেই।

৬৯৮ সুযোগসন্ধানী "সিক্সটিনথ্ ডিভিশন" সৃষ্ট এই ব্যাধি অচিরেই সংক্রমিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মধ্যে। তারপর কে যে "সিক্সটিনথ্ ডিভিশনের" লোক, কে যে মুক্তিযোদ্ধা আর কে যে দল পরিবর্তনকারী রাজাকার-সব যেন একাকার হয়ে এমন এক লুটতরাজের রাজত্ব শুরু করে যে, ঢাকা শহরে নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক জরুরী দায়িত্ব পালন ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। মূলধারা '৭১, মঈদুল হাসান, ২য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ : ১৯৭

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পক্ষের নেতাকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, কর্মকর্তা–কর্মচারীদের কৃত অপরাধের দায়মুক্তি

১ মার্চ ১৯৭১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক নেতাকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা–কর্মচারী কর্তৃক কৃত কোন কাজ বা অপরাধসহ ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে নিয়োজিত অবস্থায় অপরাধমূলক কোন কাজ হলে তার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না মর্মে Bangladesh National Liberation Struggle (Indemnity) Order 1973 জারী করা হয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীনতার পক্ষের ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কর্তৃক যে কোন অপরাধ কর্মের (তা যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধ পর্যায়ের পড়ুক না কেন) জন্য দায়মুক্তি (Indemnity) প্রদান করা হয়।

THE BANGLADESH NATIONAL LIBERATION STRUGGLE (INDEMNITY) ORDER, 1973

(PRESIDENT'S ORDER NO. 16 OF 1973).

[*28th February, 1973*]

WHEREAS it is expedient to provide for indemnity to persons in the service of the Republic and to other persons in respect of act done in connection with the national liberation struggle, the maintenance or restoration of order;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 3 of the Fourth Schedule to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following order:-

1. (i) This Order may be called the Bangladesh National Liberation Struggle (Indemnity) Order,1973.

   (ii) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the 26th day of the March, 1972.

2. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie in any Court against any person for or on account of or in respect of any act done during the period from the 1st day of March, 1971 to the 16th day of December, 1971, in connection with the struggle for national liberation or for maintenance or restoration of order up to the 28th day of February, 1972.

www.pathagar.com

3. A public prosecutor shall, upon the Government certifying that a case against any person in the service of the Republic or against any other person for or on account of or in respect of any act done by him during the period from the 1st day of March, 1971, and the 28th day of February, 1972, is an act done in connection with national liberation struggle or for maintenance or restoration of order, apply to the court and upon submission of such application the court shall not proceed further with the case, which shall be deemed to be withdrawn, and the accused person shall forthwith be discharged.

4. The Government may make rules for carrying out the purposes of this Order.

(এটা প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পৃক্ত এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়োজিত ছিলেন, তাদের ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তির বিধান করা প্রয়োজন।

সেহেতু বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সিডিউলের প্যারা ৩ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত আদেশ দান করেন

১. (ক) এ আদেশ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম (ইনডেমনিটি) আদেশ, ১৯৭৩ হিসাবে অভিহিত হবে।

(খ) ১৯৭২ সনে ২৬ মার্চ হতে এ আদেশ কার্যকরী হবে।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত থাকার কারণে ১৯৭২ সনে ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে কোন কাজ করা হলে তার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

এ আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটরের বক্তব্য চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১ মার্চ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কৃত কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকারী উকিল যদি এ মর্মে প্রত্যয়ণ করেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন, তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বিচার করা যাবে না এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে জামিন পাবেন।

৪. সরকার এ আদেশ বাস্তবায়নকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।)

www.pathagar.com

অপরাধের এক পক্ষের দায়মুক্তি ও আন্তর্জাতিক বিধি বিধান

১৯৭১ সনের ০১ মার্চ হতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা কোন ধরণের অপরাধমূলক কাজ করেন, যার জন্য ১৯৭৩ সনে এসে দায়মুক্তি (Indemnity) প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়? এ বিষয়টি সকলের নিকট পরিস্কার যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বিহারি ও অন্যান্য অবাঙালিদের উপর যে হত্যাকান্ড চালানো হয় তার দায়মুক্তি (Indemnity) প্রদানের জন্যই ০১ মার্চ ১৯৭১ থেকে Bangladesh National Liberation Struggle (Indemnity) Order 1973 আইন কার্যকর দেখানো হয়।

জেনোসাইড কনভেনশন ১৯৪৮, জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯, আইসিসিপিআর ১৯৬৬ এবং রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ অনুসারে যুদ্ধকালে উভয়পক্ষের বেসামরিক নেতৃবৃন্দ সামরিক কমান্ডারসহ দায়ী সকলেরই যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধসহ সকল ধরণের অপরাধের অভিযোগে বিচার করার বিধান রয়েছে; কোন এক পক্ষকে দায়মুক্তি (Indemnity) প্রদানের কোন সুযোগ নেই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নীত করা ও ন্যায় বিচার মূখ্য হলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে Bangladesh National Liberation Struggle (Indemnity) Order 1973 আইনটি রহিত করে সকল মানবতাবিরোধী অপরাধীকেই বিচারের আওতায় আনা আবশ্যক।

শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার অভিযোগ থেকে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ ১৯৭৫ সনে সেনা অভ্যুত্থানকারীদেরকে দায়মুক্তি প্রদান করেছিলেন।[৬৯১] আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সনে সরকার গঠনের পর উক্ত দায়মুক্তি প্রদান সম্পর্কিত আইনটি রহিত করে শেখ মুজিব হত্যার বিচার করা হয় এবং উক্ত বিচারের রায় ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় এবং পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১ মার্চ ১৯৭১ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক নেতাকর্মী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনীসহ সকল বাহিনীর সদস্য, মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীগণসহ যারা হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ইত্যাদি করেন বা ঐ সকল অপরাধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন বা নেতৃত্ব দেন তাদেরকেও বিচারের আওতায় আনার জন্য উক্ত দায়মুক্তি আদেশ রহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

---

[৬৯১] ১৯৭৫ সনে সেনা অভ্যুত্থানকারীদেরকে দায়মুক্তি প্রদান করে যে আইন পাশ করা হয়েছিল তা ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদের আওয়ামী লীগ সরকার বাতিল করে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কলাবরেটরস (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২[৭০০]

পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীদের দ্বিতীয় ক্যাটাগরীর মানুষ হচ্ছে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও সরকারের কলাবরেটর ব্যক্তিগণ, যাদেরকে দালাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৭১ সনের ১৩ ডিসেম্বর কলাবরেটর আইন প্রণয়নের জন্য তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব সভা আহ্বান করেন।[৭০১] এ যোগসাজশকারীদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সনের ২৪ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির ৮নং আদেশ জারী করা হয় যা The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972 বা বাংলাদেশ কলাবরেটর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২। এ আইনের অধীনে যাদের বিচার করা যাবে তা ভূমিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

কোন ব্যক্তি নিজে বা ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন সংগঠনের সদস্য হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্বর শক্তি প্রয়োগে বাংলাদেশকে দখলকারী পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে গণহত্যা, মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটন, নারী পুরুষ ও শিশুদের বিরুদ্ধে পৈশাচিক আচরণ, বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণের সম্পদ ও সম্মানের হানিকর কাজে সহযোগিতা করেছে, এবং, শব্দ বা সংকেতের মাধ্যমে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর অবৈধ দখল অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে, শক্তিশালী করতে এবং সমর্থন বাড়াতে অথবা প্রলম্বিত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে অথবা যুদ্ধ শুরু করেছে অথবা বাংলাদেশী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

এবং এ ধরনের সহযোগিতা আতংক ও সন্ত্রাস সংঘটনে ভূমিকা রেখেছে এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনে বাংলাদেশের জনগণের ও বিশ্বের সুস্থচিন্তার অধিকারী জনগণের নীতিবোধকে আতংকিত করেছে এবং এ অবস্থায় এটি অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এ ধরনের ব্যক্তিবর্গকে সার্থকভাবে এবং প্রয়োজনীয় আইনের বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদান করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে এবং এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের ত্বরিত ও উপযুক্ত বিচার নিশ্চিতকল্পে একটি বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও সরকারকে সহায়তাকারী কলাবরেটরদের অপরাধসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সবগুলো ধারাই দন্ডবিধির (বাংলাদেশ দন্ডবিধি বা BPC হিসেবে পরিচিত) আলোকে প্রচলিত আদালতেই তাদের বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতো; কিন্তু আসামীদের সংখ্যা বেশী (massive) হওয়াতে সরকারকে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হয়েছিল। সরকারের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা প্রমাণিত হয়-

---

৭০০ পরিশিষ্ট - ১৪

৭০১ ১৩.১২.১৯৭১ সনে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সভায় "Trial of Colleborator" and "Screening of Employees of Government, Semi- government and Autonomous bodies" সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হয়।

www.pathagar.com

- কলাবরেটর আদেশে আসামীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৬০০০ জন
- কলাবরেটর আদেশে বন্দীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪২০০০ জন
- ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ছিল ৭৩টি
- ১৯৭২ সনের এপ্রিল হতে ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ প্রায় দু'বছরে বিচার হয়েছে ২৮৪৮ জনের
- প্রচলিত আদালতে বিচার করা হলে এর ১০ শতাংশ বিচার করা সম্ভব হতো না।

১৬ মে ১৯৭৩ প্রথম সাধারণ ক্ষমার আওতায় প্রায় ৪৫০০ জন এবং ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ তারিখে দ্বিতীয় সাধারণ ক্ষমার আওতায় প্রায় ২৬০০০ জন আসামী হাজত ও জেল থেকে বের হয়ে আসে। যারা হাজতে বন্দী ছিল না তাদেরকে নিকটস্থ মহকুমা হাকীমের নিকট আত্মসমর্পণ করে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিতে বলা হয়। যাদেরকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় নেয়া হয়নি বা মুক্তি দেয়া হয়নি তাদের বিরুদ্ধে চার ধরণের অপরাধের অভিযোগ ছিল–

১. খুন, হত্যা	– দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩০৪ ধারা
২. ধর্ষণ	– দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা
৩. ঘর ও নৌযান জ্বালানো	– দণ্ডবিধির ৪৩৬ ও ৪৪৮ ধারা
৪. গুলি ও বিস্ফোরক ব্যবহার করে ক্ষতি সাধন	– দণ্ডবিধির ৪৩৫ ধারা

৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ দ্বিতীয় দফা সাধারণ ক্ষমার পর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে যায় এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ তারিখে The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972 বাতিল না করা পর্যন্ত আর কোন মামলার রায় হয়নি। ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ হতে ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পূর্বে মামলার কার্যক্রম পরিচালনায় কোন বাধা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে শেখ মুজিব নিজেই The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972 আওতায় আর বিচার চাননি। বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের[১০২] আমলে The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972 বাতিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সৃষ্ট ট্রাইবুনালে আরো অনেক আসামীর বিচার করা যেতো। অথবা ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বন্ধ করে প্রচলিত আদালতে তাদের বিচার করা যেতো; কিন্তু এর কোনটাই আর করা হয়নি। এ ব্যাপারে US Ambassador at Large on War Crimes Issue, Mr Stephen J. Rapp ১৩ জানুয়ারী ২০১১ তারিখ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন–

---

[১০২] খন্দকার মোশতাক আহমেদের পর তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন।

www.pathagar.com

"It would have been possible, and it remains possible, for a national system to try people for murder, for rape, for robbery, for pillage, for arson as ordinary crimes even those crimes are committed on a massive scale" [৭০৩]

(এটা সম্ভব ছিল এবং এখনো সম্ভব; খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, লুটতরাজ, ইত্যাদি গতানুগতিক অপরাধ তা যতই ব্যাপক হোক না কেন, দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতেই সেগুলোর বিচার করা সম্ভব।)

The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Repeal) Ordinance, 1975

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে নতুন মাত্রা সংযোগ করে। ১৯৭৩ সনের ৩০ নভেম্বরে শেখ মুজিব ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার পর The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972 মূলতঃ অকার্যকর হয়ে পড়ে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে শেখ মুজিব ঘোষিত সাধারণ ক্ষমাকে চূড়ান্ত রূপ দানের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Repeal) Ordinance, 1975 আদেশ রহিত করা হয়। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি হিসেবে জাতিকে বিভক্ত না করে বিচারপতি আবু সা'দাত মোহাম্মদ সায়েম একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগের ধারাবাহিকতার নীতি গ্রহণ করেন।

THE BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIALTRIBUNALS) (REPEAL) ORDINANCE, 1975
(ORDINANCE NO. LXIII OF 1975).

[31st December, 1975]

An Ordinance to repeal the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972.

WHEREAS it is expedient to repeal the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972), and to provide for certain matters ancillary thereto;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamations of the 20th August, 1975, and 8th November, 1975, and in exercise of all

---

৭০৩ Press conference of Stephen J Rapp , January 13, 2011, মতামত ।

www.pathagar.com

powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:

Short title:

1. This Ordinance may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Repeal) Ordinance, 1975.

Repeal of PO No 8 of 1972: 2. (1) The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972), hereinafter referred to as the said Order, is hereby repealed.

2. Upon the repeal of the said Order under sub-section (1), all trials or other proceedings there under pending immediately before such repeal before any Tribunal, Magistrate or Court, and all investigations or other proceedings by or before any Police Officer or other authority under that Order, shall abate and shall not be proceeded with.

3. Nothing in sub-section (2) shall be deemed to affect–

(a) the continuance of any appeal against any conviction or sentence by any Tribunal, Magistrate or Court under the said Order; or

(b) except to the extent provided in that sub-section, the operation of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897).

(এই আদেশটিতে মাত্র তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে-

১ম অনুচ্ছেদে অধ্যাদেশটির নামকরণ করা হয়েছে "The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Repeal) Ordinance, 1975"

২য় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- এই আইন বাতিলের আগে যাদের নামে যে কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের সামনে মামলার কার্যক্রম বিষয়ক যাই চলতে থাকুক না কেন, তা আর সামনে অগ্রসর হবে না এবং মামলার কার্যক্রম যেখানে যে অবস্থায় আছে তা সে অবস্থাতেই থেমে যাবে।

৩য় অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ 'ক' তে বলা হয়েছেঃ যারা উক্ত আইনে ইতোমধ্যে দন্ডিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আপিল করেছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বাতিল অধ্যাদেশ প্রযোজ্য হবে না।

৩য় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশ 'খ' তে বলা হয়েছে ঃ জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টের ৬ নম্বর সেকশন মতে ইতোমধ্যে উক্ত আইনে দন্ডিতদের ক্ষেত্রে উক্ত আইন বাতিলকরণ অধ্যাদেশটি কার্যকরী নয়।)

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩

বাংলাদেশের সংবিধানে ১ম সংশোধনী আনয়ন করা হয় ১৫-০৭-১৯৭৩ তারিখে এবং ঐ দিন হতেই তা কার্যকর হয়। সংবিধানে সংশোধনী আনার পর স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০-০৭-১৯৭৩ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন ১৯৭৩ সংসদ অনুমোদন করে। ২০-০৭-১৯৭৩ তারিখে প্রণীত এই আইনটি তাৎক্ষণিকভাবে প্রযোজ্য। এ আইনের ১(৩) ধারায় বলা হয় It shall come into force at once. (এ আইন অবিলম্বে কার্যকর হবে)। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে প্রযোজ্য হলেও আইনের ৩(১) ধারায় ট্রাইবুনালের আওতা বা ইখতিয়ার উল্লেখ আছে A Tribunal shall have the power to try and punish any person irrespective of his nationality who, being a member of any armed, defence or auxiliary forces commits or has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the following crimes. অর্থাৎ পূর্বের অপরাধের বিচার করার অনুমোদন দেয়া হয়।

আইনের অনুচ্ছেদ ৩(২) এ বলা হয়েছে, নিম্নবর্ণিত কৃতকর্মসমূহ কিংবা এদের কোনো একটি ট্রাইবুনালের আওতাধীন অপরাধসমূহ হবে যার জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতাও থাকবে, যথা: (ক) মানবতাবিরুদ্ধ অপরাধসমূহ (খ) শান্তিবিরুদ্ধ অপরাধসমূহ (গ) গণহত্যা (ঘ) যুদ্ধাপরাধ

আইনের অনুচ্ছেদ ৪ এ বলা হয়েছে–

(১) যখন ৩ ধারায় নির্দিষ্ট কোনো অপরাধ কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়, তখন তাদের প্রত্যেকে ঐ অপরাধে এমনভাবে দায়ী থাকবেন যেন ঐ অপরাধটি একমাত্র তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

(২) ৩ ধারায় নির্দিষ্ট কোনো অপরাধ সংঘটনে কোনো নিয়ন্ত্রক কিংবা উচ্চ পদস্থ অফিসার যিনি আদেশ, অনুমতি, মৌনসম্মতি দিয়েছেন কিংবা অংশগ্রহণ করেছেন কিংবা ঐ অপরাধ সংঘটনে পূর্ব পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন কিংবা শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালনে কিংবা তার নিয়ন্ত্রণাধীন বা অধস্তন ব্যক্তিদেরকে নিয়ন্ত্রণে অথবা অবক্ষণে তিনি ব্যর্থ অথবা বিরত ছিলেন যা দ্বারা ঐ ব্যক্তিগণ অথবা অধীনস্থগণ অথবা তাদের কেউ এ ধরনের কোন অপরাধ করেছেন কিংবা যিনি এ ধরনের অপরাধ নিবারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি এই অপরাধে দোষী হবেন।

আইনের অনুচ্ছেদ ৫ এ বলা হয়েছে–

(১) যে কোন সময়েই হউক একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক পদ তার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে কিংবা শাস্তি হ্রাস পেতে বিবেচিত হবে না।

www.pathagar.com

(২) প্রকৃত ঘটনা যে নিজ দেশীয় আইন কিংবা তার সরকার কিংবা একজন উর্ধতন কর্মকর্তার আদেশ অনুসরণ করে অভিযুক্ত কাজটি করেছেন তাতে তিনি দায়মুক্ত হবেন না, তবে দন্ড হ্রাসে বিবেচিত হতে পারে যদি ট্রাইবুনাল বিবেচনা করেন ন্যায়বিচারের যতোটা প্রয়োজন।

শাহরিয়ার কবির আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সম্পর্কে তার বই 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্ষ ও বিপক্ষ' র ভূমিকায় লিখেন, "এ আইন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করবে, কারণ এর আগে কোন দেশ গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের জন্য এ ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি।" তিনি আরো জানান যে, আইনটি প্রণয়নের জন্য জেনেভাস্থ 'আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ কমিশনের' চেয়ারম্যান আয়ান ম্যাকডরমাট ও আন্তর্জাতিক আদালতের আইনজ্ঞ অধ্যাপক অটো ভন ট্রিফ্‌টারারের[৭০৪] সহযোগিতা নেয়া হয় এবং তারা 'পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখেন'।

আন্তর্জাতিক আইনের আবশ্যকতা

কোন ঘটনার সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্র জড়িত থাকলেই আন্তর্জাতিক বিধি বিধান ও আইনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এবং পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ অনেক দেশই জড়িত ছিল। যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের সামরিক বাহিনী, বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও সরকার জড়িত থাকায় এ দেশে সংঘটিত অপরাধসমূহ বিচারের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সরকার ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন প্রণয়নের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশে প্রণীত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর ভূমিকায় বলা হয়েছে --'এটি একটি আইন যা গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক আইন যা অভিযুক্তদের বন্দী করা, বিচারে সোপর্দ করা ও শাস্তি বিধান করা হবে।'

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর ভূমিকা ও সংজ্ঞা মতে আন্তর্জাতিক আইন, সনদ, চুক্তি, কনভেনশন ইত্যাদি সকল পক্ষের জন্য প্রযোজ্য এবং গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করা সম্ভব। এ আইনে কোন সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই। কোন পক্ষের জন্য প্রযোজ্য তা উল্লেখ করা না থাকাতে ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সকল গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হতে কোন বাধা নেই। আইনের ৩(২) ধারায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তির বিপক্ষে অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধসহ অন্যান্য অপরাধের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

---

[৭০৪] যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্ষ ও বিপক্ষ, শাহরিয়ার কবির ; পৃ : ১১৯

www.pathagar.com

শাহরিয়ার কবিরের দাবী মতে ৯৩ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী থেকে ১৯৫ জন সামরিক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে তাদের বিচারের জন্য নির্ধারণ করা হয় যা "যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত আইন প্রণীত হয়েছে তার ভেতর এই আইনটি সবচেয়ে মানসম্পন্ন।"[৭০৫] ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী, ১৯৭১ সনের আগস্ট থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সনের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় হাইকমান্ডের অধীন বাংলাদেশী মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর যে সকল সদস্য যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে সকলের জন্যেই আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ প্রযোজ্য হবে; কারণ-

১. পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশী বেসামরিক নাগরিক হত্যা, নির্যাতন করেছে।
২. ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণ ১৯৭১ সনের আগস্ট থেকে ১৯৭৪ সনের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশী বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেছে।
৩. জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধের পর বিজিত রাষ্ট্রের নাগরিকগণের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব হচ্ছে বিজয়ী শক্তি তথা- ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও বাংলাদেশী মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনী যারা ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় হাইকমান্ডের অধীন ছিলেন তারা পাকিস্তানী নাগরিক ও বাংলাদেশী বেসামরিক নাগরিক যারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কলাবরেটরহিসাবে কাজ করেছে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়।
৪. ভারতীয় সামরিকবাহিনী বাংলাদেশকে দুর্বল ও ভারত নির্ভর করার জন্য এ দেশের সকল সমরাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম লুট করে।
৫. আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ হিসেবে বুদ্ধিজীবী হত্যায় ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণ জড়িত ছিল।

কেবল নিজ দেশের কোন ব্যক্তির অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করার প্রয়োজন নেই। স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরোধিতাকারী বর্তমানে যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে এবং তাদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংশোধন করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশী। দেশের প্রচলিত আইন দ্বারাই তাদের বিচার করা সম্ভব আর

---

৭০৫ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্ষ ও বিপক্ষ, শাহরিয়ার কবির; পৃ: ১৯

www.pathagar.com

সেটা সম্ভব না হলে নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে যেমনটি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশীয় আইনেও বিদেশীদের বিচার করা হয়, তাতে কোন বাধা নেই যেমন কোন বিদেশী প্রকাশ্যে ধুমপান করলে একজন বাংলাদেশীর মত ৫০ টাকা সাজা প্রদানে কোন বাধা নেই। কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করলে বা বাংলাদেশে অবস্থান করে কোন অপরাধ করে পালিয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিধি বিধান দ্বারা ঐ অপরাধীর বিরুদ্ধে বিচার কার্য পরিচালনা করা।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন (সংশোধন) ২০০৯[৭০৬]

২০০৮ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর ইশতেহারে ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী বিচারে অগ্রসর হলে তাদের সামনে দু'টি বড় বাধা এসে হাজির হয়।

১. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংক্ষেপে ICT 1973 অনুসারে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যে তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় তারা সকলেই পাকিস্তানের নাগরিক ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য। পাকিস্তান ও মিত্রশক্তি এ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে অগ্রসর না হওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অঙ্গীকার থেকে বাংলাদেশ সরে আসে।

২. দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে তারা যুদ্ধাপরাধী নন, তারা যোগসাজসকারী বা সহায়তাকারী, তাদের বিচার করতে হলে The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972 অনুযায়ী তা করতে হবে। এক্ষেত্রে বড় বাধা হচ্ছে –

   - ১৯৭৫ সনের ৩১ ডিসেম্বর The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972 বাতিল হওয়ার পূর্বে ১৯৭৩ সনে শেখ মুজিব কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও বর্তমানে এ আইন সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজের অভাব।
   - যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধাপরাধী আইনের আওতায় আনতে হলে সংবিধান ও ICT Act 1973 সংশোধন করা প্রয়োজন।

২০০৯ সনের যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন দ্বারা ১৯৭৩ এর মূল আইনের যে সংশোধন আনা হয় তা হলো ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বা আওতা পুনঃনির্ধারণ[৭০৭]।

---

৭০৬ পরিশিষ্ট- ১৫

৭০৭ The International Crimes (Tribunals) (Amendment)Act 1973 অনুযায়ী এ ট্রাইব্যুনালের ইখতিয়ার ছিল "A Tribunal shall have the power to try and punish any person irrespective of his nationality who, being a member of any armed, defence or auxiliary forces commits or

www.pathagar.com

"A tribunal shall have the power to try and punish any individual or group of individuals, or any member of any armed forces, defence or auxiliary forces, irrespective of his nationality, who commits or has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the crimes mentioned in sub-section (2)"

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন বেসামরিক ব্যক্তি যিনি (পাকিস্তান) সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করেছেন তিনি যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত। ফলে যুদ্ধাপরাধীদের সংখ্যার পরিধি বিস্তৃত হয়। নবম সংসদ শপথ নেওয়ার পর সে অধিবেশনে ২৯ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে মহাজোট যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করে এবং বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে বিচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭৩ এর মূল আইনের সংজ্ঞা ও ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বা আওতা অনুযায়ী পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কিছু কর্মকর্তা যুদ্ধাপরাধী। কিন্তু ২০০৯ সনের যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত আইনে ট্রাইব্যুনালের সংশোধিত এখতিয়ার বা আওতায় প্রায় দু'লক্ষ[৭০৮] লোককে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর The Bangladesh National Liberation Struggle (Indemnity) Order, ১৯৭৩ বাতিল হলে এ সংখ্যা আরো বেড়ে কয়েক লক্ষ হবে।

'যুদ্ধাপরাধী'র সংজ্ঞা ও ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার নির্ধারণে বাংলাদেশের ও আন্তর্জাতিক আইনসমূহের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য বর্তমানে নেই। তবে ১৯৭৩ সনের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে 'যুদ্ধাপরাধী'র সংজ্ঞা ও ট্রাইব্যুনালের ইখতিয়ারে আন্তর্জাতিক আইনসমূহের মৌলিক পার্থক্য ছিল। এ আইনে শুধু সামরিক পোষাকধারী বা তাদের সহযোগী বাহিনীর সদস্যদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে অপরাধ জনিত কারণে যুদ্ধাপরাধী বলা হতো কিন্তু ২০০৯ সনের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) (সংশোধিত) আইন এবং লন্ডন চার্টারে বর্ণিত যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা ও ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বা আওতা একইভাবে সকল সামরিক, আধাসামরিক, বেসামরিক ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হয়।

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন (সংশোধন) ২০০৯-এ ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারী

---

has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the following crimes."

৭০৮ ৯৩০০০ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সদস্য, ৮৬০০০ সহযোগী এবং এর বাইরেও দেশী বিদেশী অনেক সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনকারী সামরিক-বেসামরিক প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে মর্মে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে বাংলাদেশ ভূখন্ডে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষের সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার সুযোগ রয়েছে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষাবলম্বনকারী তদানীন্তন পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, রাজাকার বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বেসামরিক ব্যক্তিগণকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিবেচনা করে তদন্তক্রমে বিচার করার সুযোগ রয়েছে।

একইভাবে জেনেভা কনভেনশন, ১৯৪৯ অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী ০১ (এক) বছরের মধ্যে দখলদার শক্তি হিসেবে[৭০৯] সকল পক্ষের বিচার করার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আইন অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের মুক্তি বাহিনী, ভারতীয় বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর যে কোন সদস্য কর্তৃক কোন যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে তাও বর্তমান আইনের আওতায় বিচার করার সুযোগ আছে। বর্তমানে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) আইন, ২০০২ অনুযায়ী কোন বিজয়ী শক্তি বা দখলদার শক্তি যদি তাদের নিজস্ব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে তাহলে জাতিসংঘের সহায়তায় বা ভিকটিমের অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বপ্রণোদিত হয়ে ঐ সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদান করার সুযোগ রয়েছে।

আইনজ্ঞদের মতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এ সংশোধনী আনার পরও যে সকল challenge মোকাবেলা করতে হবে,[৭১০] সেগুলো হলো

(i) the amendment of the jurisdiction after 38 years of the offences committed[৭১১]

(ii) "Res Judicata"[৭১২] and

(iii) the Amnesty of 1975 (actually in1973)[৭১৩].

---

৭০৯ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন দখলদার শক্তি হিসেবে ছিল পাকিস্তান এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী ০১ (এক) বছরের মধ্যে দখলদার শক্তি হিসেবে ছিল ভারত, বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী।

৭১০ http:// bangladeshonlinelawyers.com/ law/ index.php? option= com_content&view= article&id= 53&Itemid= 55 date 29.07.2011

৭১১ আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এ যুদ্ধাপরাধীর সংগা অনুসারে সামরিক বাহিনী ও সহযোগী বাহিনীর সদস্য নির্ধারণ করে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা দেয়া হয়। ২০০৯ সনে এ আইন সংশোধন করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করায় এ বিচার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য করা হচ্ছে বলে দেশে-বিদেশে বিশ্বাস জন্মেছে।

৭১২ Res Judicata হচ্ছে এক অপরাধের জন্য দ্বিতীয় বার বিচার করা, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ।

৭১৩ ১৯৭৪ সনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দুই দুইবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পর ক্ষমাপ্রাপ্তদের দ্বিতীয় বার বিচার করা।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল)(সংশোধন) আইন ২০০৯ এর অধীনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০ এ বছরের ২৫ মার্চ হতে কার্যকর গণ্য করে ২১ জুলাই ২০১০ জারী করা হয়। প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধিমালা ২৮ অক্টেবর ২০১০ প্রথম সংশোধন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিধিমালাগুলো হলো-

বিধি - ২

❶ ২১ জুলাই ২০১০ তারিখে

(১) "অভিযুক্ত" বলিতে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে 'ফরমাল চার্জ' দাখিল হইবে তাহাকে বুঝাইবে;

(৭) "কাউন্সেল" অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি এ্যাডভোকেট হিসাবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে তালিকাভুক্ত;

(১১) "ফরমাল চার্জ" অর্থ তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রসিকিউটর কতৃক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ বা অপরাধসমুহ সম্পর্কে পিটিশন আকারে ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত অভিযোগকে বুঝাইবে ;

❷ ২৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে সংশোধিত

(১) "অভিযুক্ত" বলিতে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের তদন্ত শুরু হইয়াছে তাহাকে বুঝাইবে।

বিধি-৩

❶ ২১ জুলাই ২০১০ তারিখে

(২) তদন্তের সামগ্রিক কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান ও দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চিতকরণে সরকার তদন্তকারী সংস্থার একজন সদস্যকে প্রধান তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে মনোনীত করিতে পারেন।

❷ ২৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে সংশোধিত

(২) সরকার তদন্ত সংস্হার কোন সদস্যকে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন

(ক) সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য ;

(খ) কোন তদন্ত কাজের নিয়ন্ত্রণ এবং দ্রুত অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য; এবং

(গ) সংস্থার দক্ষ পরিচালনার লক্ষ্যে অন্য যে কোন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য।

বিধি-৯

❶ ২১ জুলাই ২০১০ তারিখে

(১) কার্যকর ও সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তদন্তের যে কোন পর্যায়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য প্রসিকিউটরের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের নিকট হইতে গ্রেফতারী পরওয়ানা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

(২) যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইবে সেই ব্যক্তি যে এলাকায় বসবাস করেন সেই সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উক্ত গ্রেফতারী পরওয়ানা তামিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী গ্রেফতারী পরওয়ানা তামিলের সময় উক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

❷ ২৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে সংশোধিত

(১) কার্যকর ও সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তদন্তের যে কোন পর্যায়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য প্রসিকিউটরের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের নিকট হইতে গ্রেফতারী পরওয়ানা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইবে সেই ব্যক্তি যে এলাকায় বসবাস করেন সেই সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উক্ত গ্রেফতারী পরওয়ানা তামিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী গ্রেফতারী পরওয়ানা তামিলের সময় অথবা পরবর্তিতে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই আইনের অধীন ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি ইতোমধ্যে অন্য কোন অপরাধ বা মামলা সংশ্লিষ্ট কাষ্টডিতে থাকেন এবং ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের কার্যকর ও যথাযথ তদন্তের স্বার্থে কোন আটকাদেশ দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে তবে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে কাষ্টডিতে আটক রাখার নির্দেশ প্রদানসহ প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারী করিতে পারিবেন।

বিধি-২০

❶ ২১ জুলাই ২০১০ তারিখে

(১) দরখাস্ত আকারে 'ফরমাল চার্জ' দাখিলের সময় সেখানে অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের ও সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা, এবং ঘটনাস্থলসহ ঘটনার তারিখ ও সময় বিধৃত করিতে হইবে।

(২) যদি ইতোমধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার না হইয়া থাকেন তাহা হইলে অভিযুক্তের উপস্হিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রসেস জারীর নিমিত্তে চীফ প্রসিকিউটর বা এই প্রসংগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রসিকিউটর সংশ্লিষ্ট কেসের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজাদি, দলিলাদি ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবেন।

❷ ২৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে সংশোধিত

www.pathagar.com

(১) দরখাস্ত আকারে 'ফরমাল চার্জ' দাখিলের সময় সেখানে অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের ও সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা, এবং ঘটনাস্থলসহ ঘটনার তারিখ ও সময় বিধৃত করিতে হইবে।

(২) যদি ইতোমধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার না হইয়া থাকেন তাহা হইলে অভিযুক্তের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রসেস জারীর নিমিত্তে চীফ প্রসিকিউটর বা এই প্রসংগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রসিকিউটর সংশ্লিষ্ট কেসের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজাদি, দলিলাদি এবং দ্রব্যাদি ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবেন।

বিধি-৬৬

❶ ২১ জুলাই ২০১০ তারিখে

অত্র বিধিমালা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং ট্রাইব্যুনালের সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে প্রয়োজন ও অনিবার্য বলিয়া মনে করিলে ট্রাইব্যুনাল এই বিধিমালার যে কোন সংশোধনী, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি আনিতে পারিবেন।

❷ ২৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে

সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে প্রয়োজন ও অনিবার্য বলিয়া মনে করিলে ট্রাইব্যুনাল এই বিধিমালার যে কোন সংশোধনী, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি আনিতে পারিবেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০প্রণয়ন, সংশোধন, প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক কার্যপ্রণালী বিধিমালা

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল)(সংশোধন) আইন ২০০৯ এর ২২ ধারার ক্ষমতাবলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তার জন্য কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করে। নিজের প্রয়োজনানুসারে এটি সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ক্ষমতাও ট্রাইব্যুনালকে দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে অন্যান্য যে সকল দেশে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত বিচার আদালত গঠিত হয়েছে সেখানে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সংসদ এই কার্যপ্রণালী বিধিমালা প্রণয়ন,সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদির ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল)(সংশোধন) আইন ২০০৯ এর অধীনে ইতোমধ্যে দু'টি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে এবং প্রতিটি ট্রাইব্যুনাল স্বাধীন। প্রথম ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধিমালা ট্রাইব্যুনাল ২ এর জন্য প্রযোজ্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ ট্রাইব্যুনাল ২ প্রথম ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধিমালা সংশোধন পূর্বক প্রয়োগ করা শুরু করে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই

যুদ্ধাপরাধের বিচার দেশে দেশে

পৃথিবীর আদিকাল থেকেই যুদ্ধ হয়েছে, যুদ্ধে বেসামরিক ব্যক্তির জীবনহানি ঘটেছে, বিনা কারণে সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে; এ সবের বিচার খুব একটা হয়নি। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদীদের মারার অভিযোগে তাদের কুট চক্রান্তে[৭১৪] আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইহুদীদের শত্রু জার্মান ও তার সহযোগীদেরকে যুদ্ধে বেসামরিক ব্যক্তি হত্যার অভিযোগে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করে। আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান মিত্রশক্তি জাপানে নাপাম বোমায় লক্ষ লক্ষ বেসামরিক মানুষ হত্যা করে। কিন্তু International Military Tribunals for the Far East এর মাধ্যমে পরাজিত শক্তির বিচার করা হয়। এরপর যুগোস্লোভিয়া, কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন প্রভৃতি দেশে যুদ্ধাপধীদের বিচার হয়েছে বা প্রক্রিয়া চলছে। প্রত্যেকটি বিচারের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ বাংলাদেশ ট্রায়ালের অবস্থা নিম্নে দেয়া হলো।

নুরেমবার্গ ট্রায়াল

Aryan Theory বা Blue Blood Theory হিটলারকে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য কতটুকু উদ্বুদ্ধ করেছিল তা এখনো গবেষণার বিষয়। সাম্প্রতিক প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দেখা যায় যে হিটলার Hollywood এ বসে সারা বিশ্ব শাসন করতে চেয়েছিলেন।[৭১৫] একজন Aryan কি কারণে একটি Non-aryan দেশের মাটিতে বসে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের বাসনা করবেন তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণগুলো হিটলারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল অন্যভাবে। আজকের জার্মানরা যেভাবে চিন্তা করেন যে, তুর্কীরা (Turkish) একদিন তাদের দেশ দখল করে নিবে, শাসন করবে, সে সময় জার্মানরা ভাবতো ইহুদীরা তাদের শাসন করবে। সে সময় জার্মানীতে চিকিৎসক ২৫ শতাংশ, শিল্প শ্রমিক ৫০ শতাংশ, পারমাণবিক পদার্থবিদ শত ভাগ ও সামরিক বাহিনীর ৩ লক্ষ সদস্য ছিল ইহুদী। হিটলার বিশ্বাস করতেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদীদের মুনাফিকী ভূমিকা ছিল জার্মানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তার হিসেব ছিল ইহুদীদেরকে বিতাড়িত না করলে জার্মানদের

---

[৭১৪] Protocol of the Learned Elders' Zion নামক দলিল ইহুদীদের গোপন পরিকল্পনায় বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের দিগ্-নির্দেশনা দেয়া আছে।

[৭১৫] http://theweek.com/article/index/225754/hitlers-bizarre-plan-to-rule-the-world-from-hollywood accessed on 01.09.2012

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ তাদের হাতে চলে যাবে। তিনি তাদেরকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নেন। যদিও অন্য একটি গবেষণা পত্রে দেখা যায় যে হিটলার ইহুদীদের প্ররোচনাতেই এ হত্যাযজ্ঞ চালান যার মূল কারণ ছিল–

জার্মানি ইহুদীদের কট্টর অংশ Protocol of the learned elders zions অনুসরণ করতো আর উদারপন্থী তা অনুসরণ করতো না। কট্টর ইহুদীরা সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন নিয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, এবং এজন্য প্রয়োজন ছিল একটি যুদ্ধের। উদারপন্থী ইহুদীদেরকে দাবার ঘুটি বানিয়ে হিটলারের মাধ্যমে তাদেরকে হত্যা করিয়ে বিশ্বের সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করা হয় এবং তারা ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কট্টর ইহুদীদের Protocol of the learned elders zions অনুসারেই তারা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়াকে প্ররোচিত করে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানী সারা দুনিয়ায় যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স মিলে মিত্রশক্তি গড়ে তুলে। ইউরোপের অক্ষশক্তি জার্মানী, হাঙ্গেরী, ইটালী, রুমানীয়া ও বুলগেরিয়া এবং সুদূর প্রাচ্য জাপানের পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি জার্মানীকে চারটি টুকরো করে দখল করে নেয়।[৭১৬] মস্কো ঘোষণা ১৯৪৩ অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত ইউরোপীয় অক্ষ শক্তির প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ৮ আগস্ট ১৯৪৫ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্সের মধ্যে লন্ডনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা 'লন্ডন চুক্তি ১৯৪৫' এবং বিচারের নীতিমালা প্রণয়ন করে যা 'নুরেমবার্গ নীতিমালা ১৯৪৫' হিসেবে পরিচিত।

এ নীতিমালায় আলোকে International Military Tribunal গঠিত হয় যা যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত প্রথম সামরিক ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল । ১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের মামলার প্রথম শুনানী হয় বার্লিনে। নভেম্বর ১৯৪৫ সনে এ বিচার ন্যুরেমবার্গে স্থানান্তরিত হয় এবং পরবর্তীতে তা ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ ট্রাইব্যুনালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি বেসামরিক মানুষকে হত্যার দায়ে হিটলার বাহিনীর সামরিক কমান্ডার, কেন্দ্রীয় নেতা, ও মন্ত্রীসহ সর্বমোট ৯৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ২৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে নিম্নরূপ রায় প্রদান করা হয়--

ফাঁসি	– ১২ জন
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড	– ০৩ জন
২০ বছরের কারাদণ্ড	– ০২ জন

---

৭১৬ জার্মানীর চার অংশ রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের হাতে শাসিত হয়।

www.pathagar.com

১৫ বছরের কারাদণ্ড – ০১ জন
১০ বছরের কারাদণ্ড – ০১ জন
বেকসুর খালাস প্রাপ্ত – ০৩ জন

অন্যান্য দেশের যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য জাতিসংঘের অনুমোদন নেয়া হলেও ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল গঠনে তেমনটি করা হয়নি। তবে মিত্রশক্তির প্রধান প্রধান দেশগুলোর সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে এটি আন্তর্জাতিক অনুমোদনের মর্যাদা লাভ করে। Colonel Sir Geoffery Lawrence নেতৃত্বে ব্রিটেনের দু'জন; আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়নের দু'জন করে ও ফ্রান্সের একজন সামরিক কর্মকর্তাকে ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়।

টোকিও ট্রায়াল

যে সকল নীতিমালার ভিত্তিতে জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়েছিল ঐ একই নীতিমালার ভিত্তিতে জাপানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য টোকিও ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জার্মানীর মিত্র জাপান সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দ যারা তিন ধরণের অপরাধ করেছেন তাদের বিচার করার উদ্দেশ্যে টোকিও ট্রায়াল শুরু হয়। জাপানের নেতৃবৃন্দ যারা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করেন তারা 'ক' শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীতে ছিলেন ২৮ জন সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। প্রচলিত মানবতাবিরোধী অপরাধ যারা করেছেন তাদেরকে 'খ' শ্রেণী এবং যারা এধরণের আদেশকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন তারা 'গ' শ্রেণীভুক্ত।

১১ জন বিচারক নিয়ে গঠিত টোকিও ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার Sir William Webb। যুক্তরাষ্ট্র হতে দু'জন এবং কানাডা, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন, ব্রিটিশ ভারত, নেদারল্যান্ডস, ফিলিপিন্স ও নিউজিল্যান্ড হতে একজন করে বিচারক নিয়োগ করা হয়। আদালত ৭ জনকে মৃত্যুদন্ড, ১৬ জনকে আজীবন কারাদন্ডসহ ২৯৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে।

কম্বোডিয়া ট্রায়াল

কম্বোডিয়া একটি রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত রাষ্ট্র। নরদম সিহানুক ১৯৪১-৭০ পর্যন্ত দীর্ঘদিন রাজা হিসেবে এ রাষ্ট্রটি পরিচালনা করেন। ১৯৭০ সনের মার্চে সিহানুক সরকারের যুক্তরাষ্ট্রপন্থী দুই সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রেম লোন নল ও প্রিন্স সিসোওয়াথ সিসিক মাতাক, রাজা নরদম সিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং একই বছর অক্টোবরে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পলপটের খেমাররুজ বাহিনী সরকারী বাহিনীকে পরাজিত করে সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। পলপট রাষ্ট্রের নামসহ চরিত্র বদল করে সুশাসনের ঘোষণা দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু দেশের নাম রাখেন গণতান্ত্রিক কম্পুচিয়া।

www.pathagar.com

১৯৭৮ সালে কমিউনিস্ট ভিয়েতনামের সাথে প্রচন্ড সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা পূর্ণাঙ্গ ভিয়েতনামী আগ্রাসনে রূপ নেয়। ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন দখল করার একদিন পর ১৯৭৯ সালের ৮ জানুয়ারী ভিয়েতনাম সমর্থিত সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভিয়েতনামে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং কম্বোডিয়ায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

১৯৮৩ সানের ১০ জানুয়ারী ভিয়েতনাম পশ্চিমে বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। তারা ৩১ জানুয়ারী একটি উদ্বাস্তু শিবির দখল করে এবং ৩০ হাজার অধিবাসীকে থাইল্যান্ডের দিকে ঠেলে দেয়। মার্চে ভিয়েতনাম কম্বোডীয় থাইল্যান্ড সীমান্তে শিবিরগুলোর মধ্যে বড় ধরণের আক্রমণ শুরু করে। খেমাররুজ গেরিলাদের কাজে লাগায়, সীমান্ত অতিক্রম করে এবং সেই সাথে থাই সেনাদের সাথে সংঘর্ষের প্ররোচনা দেয়। ভিয়েতনাম ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে তার প্রায় সকল সেন্য কম্বোডিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

কম্বোডিয়ায় জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালের ২৮ মে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর দুটি শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দল নতুন সংবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত অন্ত র্বর্তীকালীন সরকারে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে সম্মত হয়। ২১ সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। ২৪ সেপ্টেম্বর এটি কার্যকর হয় এবং নরদম সিহানুক পুনরায় রাজ সিংহাসনে আসীন হন।

কম্বোডিয়ান প্রশাসন জাতিসংঘের নিকট গণতান্ত্রিক (সমাজতান্ত্রিক) কম্পুচিয়ার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে যারা ১৯৭৫ সনের ১৭ এপ্রিল থেকে ১৯৭৯ সনের ৬ জানুয়ারী সময়ের মধ্যে কম্বোডিয়ান দন্ডবিধি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও প্রথা এবং আন্তর্জাতিক সংবিধিসমূহ মারাত্মকভাবে লংঘন করেছেন তাদের বিচারে সহায়তা করার আবেদন করে।

পলপটের খেমাররুজ বাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহ লংঘন করে যে অত্যাচার নির্যাতন করে তার বিচার চেয়ে রাজতান্ত্রিক কম্বোডিয়া জাতিসংঘের নিকট আবেদন করলে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে ৫৭/২২৮ নম্বর রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে বিচারের অনুমোদন দেয়।

বিচারের জন্য দুটি চেম্বার বা আদালত গঠন করা হয় --

১. **বিচারিক আদালত-** এতে তিনজন কম্বোডিয়ার বিচারক এবং জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত দুইজন আন্তর্জাতিক বিচারক ছিলেন। ৭ জন বিচারক নিয়ে গঠিত কম্বোডিয়ান ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন নিউজিল্যান্ডের Silvia Cartwright। কম্বোডিয়া হতে চার জন এবং ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া হতে একজন করে বিচারক নিয়োগ করা হয়।

২. **আপীল আদালত-** এতে চারজন ছিলেন কম্বোডিয়ার বিচারক এবং জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত তিনজন আন্তর্জাতিক বিচারক।

www.pathagar.com

বিচারিক আদালতে কমপক্ষে চারজন এবং আপীল আদালতে কমপক্ষে পাচঁজন একমত হলে সেটাকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণের বিধান রাখা হয়।

তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য একজন কম্বোডীয় কর্মকর্তা এবং একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা (জাতিসংঘ মনোনীত) নিয়োগ প্রাপ্ত হন। আলোচ্য ট্রায়ালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল যে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ সরকার বা অন্য কোন উৎস হতে কোন প্রকার আদেশ উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন না। তারা কেবল গণতান্ত্রিক কম্পুচিয়ার (পলপট বাহিনী) শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার ন্যায় প্রসিকিউটর টীমেও একজন কম্বোডিয় এবং একজন জাতিসংঘ মনোনীত আন্তর্জাতিক প্রসিকিউটর রয়েছেন। তদন্তকালে বা প্রসিকিউটিংকালে কোন দ্বিমত বা মতানৈক্য দেখা দিলে তা নিরসনকল্পে তিনজন কম্বোডিয় এবং জাতিসংঘ কর্তৃক মনোনীত দু'জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত পঁচিশজনের বডি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আসামীগণ ১৯৯৬ সনের International Covenant or Civil and Political Rights এর ১৪ ও ১৫ ধারা অনুযায়ী সকল অধিকার প্রাপ্য হন।

কম্বোডিয়ার গণহত্যার জন্য ৫ (পাঁচ) জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, এরা হলেন:

১. কাইং গুয়াক ইয়েভ (Kaing Guek Eav) যিনি কমরেড ডয়িক (Comrade Duck) নামে পরিচিত ছিলেন। খেমাররুজ সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান ছিলেন। ৩৫ বছরের জেল হয়। আপিল আদালত তাকে আজীবন কারাবাস দিয়েছে।
২. নূয়েন চি (Nuon Chea) তিনি পলপটের Second-in-command ছিলেন, যার পরিচিতি ছিল "Brother Number Two" হিসেবে। তিনি খেমাররুজ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তার বিচার চলছে।
৩. খিউ সাম্পান (Khieu Samphan) যিনি খেমাররুজ সরকারের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি ছিলেন, তার বিচার চলছে।
৪. ইয়েং সেরাই (Ieng Sary) খেমাররুজ সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিচার চলাকালে রাজা সিহানুক ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
৫. ইয়েং থিরিথ (Ieng Thirith) যিনি Ieng Saryর স্ত্রী যার আসল নাম Khien Thirith। তিনি খেমাররুজ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। তাকে মুক্তি দেয়া হলে প্রসিকিউশন আপিল করে।

রুয়ান্ডা ট্রায়াল

প্রজাতন্ত্রী রুয়ান্ডা পূর্ব-আফ্রিকার একটি ভূমি পরিবেষ্টিত (landlocked) দেশ। পনের শতকে এ দেশের রাজতন্ত্র তার আধিপত্য হারাতে থাকে এবং ১৮৮৪ সনে বার্লিন

www.pathagar.com

সম্মেলনের মাধ্যমে বুরুন্ডিসহ এ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায় জার্মানী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে রুয়ান্ডা-বুরুন্ডি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় বেলজিয়াম।

জার্মানী এবং বেলজিয়াম উভয় আমলেই সংখ্যালঘিষ্ঠ টুট্‌সি (Tutsi) এথ্নিক গ্রুপকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হুটু (Hutu) এথ্নিক গ্রুপের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এর ফলে বরাবরই উভয় গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। ১৯৫০ সন থেকে এ উত্তেজনা চরম রূপ নিতে থাকে এবং তাতে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সনের মধ্যে দাঙ্গায় ১ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

১৯৫৯ সনে বেলজিয়াম তাদের আনুকূল্যের দিক পরিবর্তন করে হুটু গ্রুপকে অধিকতর সুযোগ দিতে থাকে। রুয়ান্ডা ১৯৬২ সনে বুরুন্ডি থেকে আলাদা হয়ে রাজতন্ত্র বিলুপ্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। হুটু গ্রুপের গ্রেগরি কায়িবান্দা (Gregoive Kayibanda) রুয়ান্ডার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সনে জুভেনাল হাবায়ারিমানা (Juvenal Habyarimana) এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কায়িবান্দাকে হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

১৯৯০ সনে টুট্‌সি প্রভাবিত Patriotic Front (RPF) উগান্ডা সীমানা পেরিয়ে রুয়ান্ডার উত্তরাংশ দখল করে। এভাবেই সেদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৯৩ সনে হুটু ও টুটসি গ্রুপের মধ্যে তাঞ্জানিয়ার আরুশাতে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ১৯৯৪ সনের ৬ এপ্রিল কিগালি বিমানবন্দরের (Kigali Airport) কাছে বুরুন্ডি ও রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্টদ্বয়কে বহনকারী বিমান অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে ভূপাতিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। মাত্র ১০০ (একশ) দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষের ৫ থেকে ১০ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

১ জানুয়ারী ১৯৯৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ পর্যন্ত রুয়ান্ডাতে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে রুয়ান্ডার নাগরিকদের দ্বারা সংঘটিত একই ধরনের অপরাধের বিচারের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ৮ নভেম্বর ১৯৯৪ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৯৩৫ নম্বর প্রস্তাব অনুমোদনের ভিত্তিতে ২৯ জুন ১৯৯৫ ট্রাইব্যুনালের বিধিমালা ও সাক্ষ্য আইন প্রণয়ন করা হয়।

তিন জন বিচারক সমন্বয়ে ট্রায়াল এবং পাঁচ জন বিচারক সমন্বয়ে আপীল চেম্বার গঠন করা হয়। সর্বমোট ২১ জন বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়। রুয়ান্ডা ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে অপরাধ সংঘটনকারী রুয়ান্ডার অপরাধীদের বিচারের জন্য এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ট্রায়াল চেম্বার বিচারকদেরকে জাতিসংঘ কর্তৃক সদস্যদেশসমূহ হতে নিয়োগ দেয়া হয়। সাবেক যুগোস্লেভিয়ার আন্তর্জাতিক আপীল চেম্বারের বিচারকগণকে রুয়ান্ডার আপীল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক ট্রাইবন্যালের যিনি প্রসিকিউটর ছিলেন তাকেই রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর নিয়োগ দেয়া হয়। প্রসিকিউটর মামলার তদন্ত ও মামলা পরিচালনা উভয় কাজই করেন।

www.pathagar.com

২৫ জন বিচারক নিয়ে ৪ (চার)টি চেম্বারে গঠিত রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনালের ১ম, ২য় ও ৩য় এবং আপীল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে Erik Møse, William Sekule, Khalida Rachid Khan, Patrick Robinson। নরওয়ে-১ (প্রেসিডেন্ট), মাদাগাস্কার-২, তাঞ্জানিয়া-২ (একজন প্রেসিডেন্টসহ), রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ওগান্ডা, কেনিয়া, ঘানা, জর্ডান, দঃ করিয়া, পাকিস্তান-১ (প্রেসিডেন্ট), সেন্ট কিট্স্ এন্ড নেভিস, কেমারুন, বুরকিনা ফেসো, তুরস্ক, ও ডেনমার্কের একজন করে এবং আপীল আদালতে জেমাইকা (প্রেসিডেন্ট), যুক্তরাষ্ট্রের, ইটালী, চীন, তুরস্ক, মাল্টা, কানাডার একজন করে ৭ (সাত) জনকে বিচারক নিয়োগ করা হয়।

৯২জন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং বিচারের মধ্যমে নিম্ন বর্ণিত রায় ঘোষিত হয়–

যাবজ্জীবন	- ২১ জন
৪৫ বছরের কারাদণ্ড	- ০১ জন
৩০-৪০ বছরের কারাদণ্ড	- ০৩ জন
২০-২৯ বছরের কারাদণ্ড	- ০৯ জন
১০-১৯ বছরের কারাদণ্ড	- ১০ জন
০১-০৯ বছরের কারাদণ্ড	- ০৩ জন
০১ বছরের নীচে	- ০৩ জন
খালাস	- ১০ জন
পলাতক	- ০৯ জন
বিচার চলছে	- ০৩ জন
মারা গিয়েছে	- ০৩ জন
অভিযোগ প্রত্যাহার	- ০২ জন
অন্যান্য	- ১৫ জন

সিয়েরা লিওন ট্রায়াল

গণতন্ত্রী সিয়েরা লিওন পশ্চিম আফ্রিকার একটি মুসলিম অধ্যুষিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৮০৮ সনে ব্রিটিশ উপনিবেশ হবার পর ১৯৬১ সনে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটিতে ছোট বড় ১৬টি এথ্নিক গ্রুপ রয়েছে যাদের মধ্যে মেন্ডি (Mende) এবং টেমনি (Temne) সবচেয়ে বড়। এ দু'টি গ্রুপ মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের উপর। রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী হলেও Krio ভাষা হচ্ছে তাদের lingua franca। ধর্মীয় সংঘাতের ইতিহাস এখানে বিরল।

সিয়েরা লিওন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, বিশ্বের প্রথম দশটি ডায়মন্ড উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে একটি। দেশটির প্রধান রাজনৈতিক দল হচ্ছে Sierra Leone People's Party (SLPP) এবং All People's Congress (APC)। ১৯৬১

www.pathagar.com

সনে ২৭ এপ্রিল তারিখে দেশটি যখন স্বাধীন হয় তখন SLPP নেতা স্যার মিল্টন মারগ্যাই (Sir Milton Margai) দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৬২ সনের সাধারণ নির্বাচনে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সনে তার মৃত্যুর পর তার সৎভাই স্যার এলবার্ট মারগ্যাই (Sir Albert Margai) প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু এলবার্ট স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব দেখান এবং তার বিরুদ্ধে তার Mende উপজাতি দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে।

১৯৬৭ সনের নির্বাচনে APCর সিয়াকা স্টিভ্যান্স (Siaka Stevens) উপজাতি ও এলবার্টের ঘনিষ্ঠ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডেভিস লামসামা (Brigadier General David Lamsama) রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে স্টিভেন্সকে গৃহবন্দী করেন। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এনরিউ জুক্সন স্মিথ (Brigadier Andrew Jukon Smith) এর নেতৃত্বে ২৩ মার্চ অন্য একটি সেনা অভ্যুত্থানে জেনারেল লানসামা বন্দী হন এবং অভ্যুত্থানকারীরা National Reformation Council (NRC) গঠন করেন। ১৯৬৮ সনে পুনরায় সেনা অভ্যুত্থান ঘটানো হয় তারা নিজেদের কে Anti Corruption Revolutionary Movement হিসেবে ঘোষণা করে। এর নেতৃত্ব প্রদান করেন বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জন অ্যামাডু বাঙ্গুরা (Brigadier General John Amadu Bangura)। সংবিধান পুনর্জীবিত করা হয় এবং স্টিভেন্সকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়। সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনা কমেনি বরং বারবার তা চলতে থাকলেও ব্যর্থতার কারণে সেনা কর্মকর্তাদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দেশটি পরিচালনা করতে সকল সরকার ব্যর্থ হয়। ডায়মন্ড (Diamond) অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। National Patriotic Front of Liberia (NPFL) এবং কর্পোরাল ফুডে সেবামা সামকোর (Corporal Foday Saybama Samkoh) নেতৃত্বে সিয়েরা লিয়নে হত্যাযজ্ঞ চলে। এতে করে ৫০হাজার থেকে ২.৫ লক্ষ মানুষ মারা যায় বলে ধারণা করা হয়।

১৯৯৬ সনের ৩০ নভেম্বর থেকে সিয়েরা লিওনে যে সকল মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয় এবং যারা এসকল মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিচার করার সে দেশের সরকারের অনুরোধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৪ আগস্ট ২০০০ সনে রেজুলেশন নম্বর ১৩১৫/২০০০ অনুসারে সিয়েরা লিওনের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হয়।

বিচার আদালত দুই ধরণের। বিচারিক আদালত ও আপীল আদালত। বিচারিক আদালতে সিয়েরা লিওনের একজন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক নিয়োজিত আন্তর্জাতিক বিচারক দু'জন রয়েছেন। আপীল আদালতে দুইজন সিয়েরা লিওনের এবং তিনজন আন্তর্জাতিক বিচারক নিয়োগপ্রাপ্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের মতামত রায় হিসেবে গণ্য

www.pathagar.com

হয়। আইন মোতাবেক অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামী ছাড়া অন্যান্য আসামীদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে দন্ড প্রদান করা হয়। আদালত ইচ্ছা করলে আসামীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

সিয়ারা লিয়নের Justice Jon M. Kamanda আপীল আদালতের প্রেসিডেন্ট এবং নাইজেরিয়ার বিচারপতি Justice Emmanuel Ayoola ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োজিত। দুটি ট্রায়াল চেম্বারের একটির প্রেসিডেন্ট কানাডার Pierre G Boulet ও অন্যটির প্রেসিডেন্ট উগান্ডার Julia Sebulinde. জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক আন্তর্জাতিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একাধারে তদন্তকারী ও প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করেন।

২১জন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং বিচারের মধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি প্রদান করা হয় -

৫২ বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত	– ১ জন
৪০-৫০ বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত	– ৪ জন
১৫-২৫ বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত	– ৩ জন
বেকসুর খালাস প্রাপ্ত	– ১ জন
সাজা ভোগ করা শেষ করেছেন	- ৪ জন
বিচার চলছে	- ৪ জন
মারা গেছে	- ৪ জন

যুগোশ্লাভিয়া ট্রায়াল

১৯১৪ সনে ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, বসনিয়া, হারজেগোভিনা রাজ্যগুলো মেসিডোনিয়া[৭১৭] রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সনে মার্শাল টিটো ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে সেদেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্শাল টিটোকে সমর্থন করে। দেশটি বিভিন্ন রাজ্যের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও "টিটোবাদ" জাতিগত অস্থিরতা দূর করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৮০ সনে টিটোর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা জাতিগত অনাস্থাকে উসকে দেয়।

১৯৮৭ সনে স্লোবোদান মিলোসেভিচ সার্বিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে সার্বিয়া, ভজভোডিনা, কসোভো, ক্রোশিয়ার অংশ, বসনিয়া-হাজেংগোভিনার বৃহদাংশ এভং মেসিডোনিয়া নিয়ে বৃহত্তর সার্বিয়া রাজ্যের স্বপ্ন দেখেন। এ অবস্থায় স্লোভেনিয়া এবং ক্রোশিয়া ২৫ জুন ১৯৯১ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সার্বিয়া স্লোভেনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করলে ইউরোপীয়ান কমিউনিটি শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে

---

[৭১৭] এটি গ্রীক মেসিডোনিয়া নয়।

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়। একই সনের সেপ্টেম্বরে মেসিডোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং বসনিয়া হার্জেগোভিনা স্বাধীনতার লক্ষ্যে জনমত যাচাই করার জন্য নির্বাচন করেন।

বসনিয়া স্বাধীনতা লাভ করলে রাদোভান কারাদজিচ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন এবং ১৯৯৬ সন পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। তিনি ১৯৯৫ সনে সেব্রেনিসায় বেশ কয়েক হাজার বসনীয় মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সে বছরই তিনি বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো অবরোধ করে জাতিসংঘের কর্মচারীদেরকে গণবন্দী করার নির্দেশ দেন। জাতিসংঘের অনুরোধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কারাদজিচ এবং কর্ণেল জেনারেল রাতকো ম্লাদিচের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে।

বসনীয় সার্ব সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে এবং আদেশদাতারূপে কারাদজিচ অসার্ব জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী। কারাদজিচের অপরাধমূলক কর্মকান্ড হিসেবে অভিযোগ জানানো হয় তিনি ধর্মীয় বা জাতীয় পরিচিতির কারণে বেসামরিক নাগরিকদেরকে বেআইনীভাবে স্থানান্তর করে জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করে মানবতার বিরুদ্ধে একের পর এক অপরাধে অপরাধী।

প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় ১৯৯১ সন থেকে ৪(চার) দফায় জেনেভা কনভেনশন, গণহত্যা, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন ও মানবতাবিরোধী আইন মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়। মার্চ- জুন ১৯৯৯ মধ্যে ৬২০০০ জনকে হত্যা করা হয়। ২০০২ সনের ৩ জানুয়ারী পর্যন্ত ১০৩৫৬ জন কসোভো আলবেনিয়ানকে হত্যা করা হয়। ৫২০৪৩ জনকে বাড়ি ছাড়া করা হয়। চার দফায় প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় মোট ৩,৫৪,০৯৯ জন (প্রায়) মারা যায়।

প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ২৫ মে ১৯৯৩ তারিখে ৮২৭ নং রেজুলেশন গ্রহণ করে। জাতিসংঘ প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় ICTY আদালতে ১৬ জন স্থায়ী এবং ১২ জন অস্থায়ী বিচারককে ৪(চার) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়। স্থায়ী বিচারকদের মধ্যে ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, মালটা, নেদারল্যান্ডস, গায়ানা, তুর্কি, চীনা, সেনেগাল, আমেরিকান, জার্মান, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজন করে বিচারক রয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে রয়েছেন জ্যামাইকার প্যাট্রিক লিপটন রবিনসন (Patrik Lipton Robinson) এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার O-Gon Kwon এবং অস্থায়ী বিচারক হিসেবে সুইডেন, জামাইকা, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সুইজারল্যান্ড, কঙ্গো, পাকিস্তান, বুলগেরিয়া, কানাডা, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও ইতালী থেকে একজন করে বিচারক রয়েছেন।

প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ১৬১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ইতোমধ্যে ১২৬ জনের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। এতে

www.pathagar.com

১৩ জনকে বেকসুর খালাস দে'য়া হয়, ৬৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দে'য়া হয়, ৩৬ জনের মামলা প্রত্যাহার করা হয়, বাকীদের মামলা দেশীয় আদালতে স্থানান্তর করা হয়; ৩ জন বিচার শেষ হবার পূর্বেই মারা যায়।

কারাদজিচের সাথে অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে সার্বিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচ (ক্ষমতায় থাকাকালীন যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত সর্বপ্রথম ব্যক্তি), বসনীয় সার্ব সেনাবাহিনীর কমান্ডার রাতকো ম্লাদিচ এবং তাদের তথাকথিত প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী মমসিলো ক্রাইসনিক (২৭ বছর কারাদন্ডপ্রাপ্ত), প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মিলান বেবিক (১৩ বছর কারাদন্ড প্রাপ্ত), একই পদের আরেকজন বিলইয়ানা প্লাবসিক (১১ বছরের জেল), ঐ প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী মিলান মার্টিচ (৩৫ বছরের জেল) এবং ক্রোট সেনাবাহিনীর জেনারেল আন্টে গোটোভিনা (বিচারাধীন)। এদের মধ্যে মিলোসোভিচ ও বাবিক বন্দী অবস্থায় মারা যান। রাদোবান কারাদজিচ হলেন ৪৪তম সন্দেহভাজন সার্ব যাকে হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধবিষয়ক আদালতে পাঠানো হয় বিচারের জন্য।

১৬১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং বিচারের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি প্রদান করা হয় -

যাবজ্জীবন	- ০৪ জন
৩০ বছরের উপর কারাদণ্ড	- ০৭ জন
২৬-৩০ বছরের মধ্যে কারাদণ্ড	- ০৭ জন
২১-২৫ বছরের মধ্যে কারাদণ্ড	- ০৬ জন
১৬-২০ বছরের মধ্যে কারাদণ্ড	- ২০ জন
১১-১৫ বছরের মধ্যে কারাদণ্ড	- ১৮ জন
০৬--১০ বছরের মধ্যে কারাদণ্ড	- ২২ জন
০০-০৫ বছরের মধ্যে কারাদণ্ড	- ০৯ জন
বেকসুর খালাস	- ১৬ জন
বিচার চলছে	- ১৬ জন
মারা গিয়েছে	- ১৬ জন
অভিযোগ প্রত্যাহার	- ২০ জন

বাংলাদেশ ট্রায়াল

১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 প্রণয়ন করা হয়। ১৯৫ জন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার নাম গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক চাপ, প্রায় চার লাখ বাংলাদেশীকে

www.pathagar.com

পাকিস্তান থেকে ফেরত আনাসহ অন্যান্য কারণে ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে সকল যুদ্ধাপরাধীকে মুক্তি দেয়া হয়।

রাজনৈতিক কারণে আওয়ামী লীগ, ভারত-রাশিয়াপন্থী ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী দল ও ব্যক্তিগণ এ দেশের ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি ও দলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী ইত্যাদি প্রচারণা চালাতে থাকে। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে সকল চীনপন্থী সমাজতন্ত্রী দল ও ব্যক্তি, মস্কোপন্থী মুজাফফর ন্যাপ (গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ হলেন-আহমেদুল কবীর, কাজী জাফর আহমেদ, সিরাজুল হোসেন খান), সকল উপজাতি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী **(৫৭ জন সংসদ সদস্যের তালিকা ৯৯, ১০০, ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অংশ গ্রহণ করেন।**

১৯৭৫ সনের পট পরিবর্তনের পর রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের উন্মেষ ঘটলে এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় 'সমাজতন্ত্র' তার রাজত্ব হারালে বাংলাদেশের সকল সমাজতন্ত্রী-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভারতপন্থী হতে থাকে। তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর ইসলাম বিরোধীতাকে তারা এক করে দেখতে থাকলে দেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে।

"যুদ্ধাপরাধের বিচার যতটা আইনী তার চেয়ে বেশী রাজনৈতিক" ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ ট্রায়াল শুরু হয়। আইনের নাম The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এবং সরকারের সংশ্লিষ্টদের বারবার "আন্তর্জাতিক মানের বিচার হবে" উচ্চারণেও কেউ আশ্বস্ত নয়। আদালতের রেজিষ্টার শাহনুর ইসলাম[৭১৮] বলেন এটি একটি National trial, আইনমন্ত্রী বলেন এটি International Trial. পরে অবশ্য আইনমন্ত্রী এটি একটি National trial বলেছেন। এ অবস্থায় কোন International Act দ্বারা এ বিচার কাজ পরিচালনা করার সুযোগ থাকে না।

বাংলাদেশ ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে An act of provide for the detention, prosecution and punishment of persons for genoside, crimes against humanity , war crimes and other crimes under international law. তবে এ আইনের অনুচ্ছেদ ২(ডি) তে যাদের বিচারের আওতায় আনা হবে তারা পাকিস্তান Army Act, 1952 (XXXIX of 1952), the Air Force Act, 1953 (VI of 1953), or the Navy Ordinance, 1961 (XXXV of 1961), and includes the rules and regulations made under any of them; এবং অনুচ্ছেদ ২(এ) তে যাদের বিচারের আওতায় আনা হবে তারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীসমূহের "auxiliary forces includes forces placed under the control of the Armed Forces for operational, administrative, static and other purposes;

---

৭১৮ দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে তিনি ঐ ট্রাইবুনালের সদস্য হন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের যুদ্ধ অপরাধ সম্পর্কিত ট্রাইবুনাল গঠনের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ বরাবর কোন আবেদন করা হয়নি অথবা বাংলাদেশের হয়ে অন্য কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘ বরাবর কোন অনুরোধ করেনি অথবা জাতিসংঘ স্বেচ্ছায় এ দেশের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত ট্রাইবুনাল গঠনের কোন উদ্যোগ নেয়নি; অর্থাৎ এ ট্রাইবুনাল গঠনে আন্তর্জাতিক কোন অনুমোদন নেই। ২৫ মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর section 6 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশের যুদ্ধ অপরাধ সম্পর্কিত আদালতের বিচারক হচ্ছেন সকলেই এ দেশীয়। এ আদালতে বিচারকরা হলেন-

বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক নাসিম[৭১৯]	চেয়ারম্যান
বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর	সদস্য
অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এ,কে,এম, জহির আহমেদ	সদস্য

২২ মার্চ ২০১২ খ্রিস্টাব্দ International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর section 6 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় ট্রাইবুনালের বিচারক নিয়োগ দেন; এ আদালতে বিচারকরা হলেন–

বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর	চেয়ারম্যান
বিচারপতি ওবায়দুল হাসান	সদস্য
জেলা জজ শাহনুর ইসলাম	সদস্য

দ্বিতীয় ট্রাইবুনাল গঠনের মধ্য দিয়ে ট্রাইবুনাল বা প্রথম ট্রাইবুনাল পুনঃগঠন করা হয়

বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক নাসিম	চেয়ারম্যান
বিচারপতি আনোয়ারুল হক	সদস্য
অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এ,কে,এম, জহির আহমেদ[৭২০]	সদস্য
বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন[৭২১]	সদস্য

৭১৯ ১৯৯৪ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের সময় গঠিত গণ-তদন্ত কমিশনের ৪০ সদস্যের ২৫ নম্বর সদস্য ছিলেন এডভোকেট নিজামুল হক নাসিম। পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান এবং ২০১০ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতির আদেশে। যেহেতু তিনি মামলার একটি পক্ষ এবং ঐ গণ-তদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন তাই তার কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। বিচারপতিদের কোড অব কনডাক্ট বা আচরণবিধি অনুসারে তিনি এই মামলার বিচারক বা চেয়ারম্যান থাকতে পারেন না।

৭২০ প্রথম ট্রাইবুনালের বিচারক এ, কে, এম, জহির আহমেদ ২৮.০৮.২০১২ তারিখে আদালতের কার্যক্রমের বিরতি পর্যায়ে পদত্যাগ করেন। সরকার যদিও স্বাস্থ্যগত কারণে তার পদত্যাগ উল্লেখ করেছেন কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, বিচারিক দ্বন্দ্বের কারণেই তিনি পদত্যাগ করেছেন।

৭২১ তিনি একজন এডভোকেট ছিলেন, ২০১০ সনে হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান।

www.pathagar.com

(এ,কে,এম, জহির আহমেদ পদত্যাগ করার পর)
Skype কেলেঙ্কারীর পর ট্রাইবুনাল দু'টি পুনঃগঠন করা হয়-

প্রথম ট্রাইবুনাল

বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর	চেয়ারম্যান
বিচারপতি আনোয়ারুল হক	সদস্য
বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন	সদস্য

দ্বিতীয় ট্রাইবুনাল

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান	চেয়ারম্যান
বিচারপতি মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মিয়া	সদস্য
জেলা জজ শাহনুর ইসলাম	সদস্য

সর্বশেষ পর্যায়ে ট্রাইবুনাল যেভাবে গঠিত হয়েছে-

প্রথম ট্রাইবুনাল

বিচারপতি এম এনায়েতুর রহিম	- চেয়ারম্যান	যোগদান: ২৪.০২.২০১৪
বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন	- সদস্য	যোগদান: ২৯.০৮.২০১২
বিচারপতি আনোয়ারুল হক	- সদস্য	যোগদান: ২৫.০৩.২০১

দ্বিতীয় ট্রাইবুনাল

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান	চেয়ারম্যান	যোগদান: ১৩.১২.২০১২
বিচারপতি মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মিয়া	সদস্য	যোগদান: ১৩.১২.২০১২
বিচারপতি শাহনুর ইসলাম	সদস্য	যোগদান: ২২.০৩.২০১২

[আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যক্রম চলার কারণে এ অধ্যায়ের বাকী অংশটুকু প্রকাশ করা হলো না]

www.pathagar.com

অধ্যায় : তিন

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আন্তর্জাতিক মান এবং বিচার বিভাগ

১৯৭১ সনে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কেবল রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধাপরাধের নামে বিচার শুরু হয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের কোন উপাদান না পেয়ে আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছেন "যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নয়, মানবতাবিরোধীদের বিচার হচ্ছে।" ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর এটিকে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল হিসেবে ঘোষণা দিলেও এর গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনার মুখে তিনি "এটি কোন আন্তর্জাতিক আদালত নয়, এটি দেশীয় আদালত" বলতে বাধ্য হন। তবে তিনি এ আদালতে "আন্তর্জাতিক মানদন্ড (International standard) বজায় রাখবে" বলে ঘোষণা দেন।

আন্তর্জাতিক মানদন্ড বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন --

(১) আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি ও সংবিধির সংগতিপূর্ণ আলোকে আইন ও বিধি
(২) আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আদালত কাঠামো
(৩) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অরাজনৈতিক তদন্তকারী টীমের ব্যবস্থা
(৪) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ
(৫) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অরাজনৈতিক ও প্রাজ্ঞ বিচারক নিয়োগ
(৬) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ

আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি ও সংবিধির সংগতিপূর্ণ আলোকে আইন ও বিধি

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা ছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ। বিভিন্ন দেশ এতে জড়িত থাকায় স্বাভাবিতভাবেই এ আইন প্রণয়নের সময় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দেশীয় আইন ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয়। ২০০৯ সনে এ আইনে সংশোধন আনা ও এর আলোকে কার্যপ্রণালী বিধিমালা প্রণয়ন করার সময় আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি ও সংবিধির সঙ্গে সংগতি রাখার প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার ছিল বলে বিশ্লেষকগণ মত ব্যক্ত করেন। কারণ ইতোমধ্যেই রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এ ধরণের অপরাধ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের একটি আন্তর্জাতিক মানদন্ড হিসেবে সকল জাতির জন্য গ্রহণীয় হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করার সময় অনুসরণীয় বিষয়গুলো রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এর অনুচ্ছেদ ২১(১) এ বলা হয়েছে-

www.pathagar.com

(ক) রোম স্ট্যাটিউট, অপরাধের উপাদানসমূহ; কার্যপ্রণালী বিধিমালা ও সাক্ষ্য বিধি প্রথমে বিবেচনায় নিতে হবে।

(খ) প্রযোজ্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও এর নীতিমালা এবং (এ সংক্রান্ত) আন্তর্জাতিক আইনসমূহসহ যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক আইন বিবেচনায় নিতে হবে।

(গ) যদি উপরোক্ত দু'টির কোনটিই পাওয়া না যায়, তবে রোম স্ট্যাটিউট ও এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সকল আইন, প্রথা ও মানদন্ডের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, যা দেশীয় আদালতের সাধারণ ক্ষমতার আওতায় গণ্য এমন আইন প্রণয়ন করা যাবে।

রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ অনুচ্ছেদ ২১(৩) এর প্রায়োগিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, যে কোন আইন প্রণয়নে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে এবং লিঙ্গ, বয়স, জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম বা বিশ্বাস, রাজনীতি বা মতাদর্শ, জাতীয় পরিচয়, গোষ্ঠীগত পরিচয়, সম্পদ, জন্ম বা অন্য কোন মর্যাদা মানুষের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ বা বৈষম্য আনয়ন করতে পারবে না।

রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এর অনুচ্ছেদ ২২(২) এ বলা হয়েছে, অপরাধের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা থাকতে হবে এবং কোনভাবেই আংশিক সাদৃশ্য দ্বারা সংজ্ঞার পরিধিকে বাড়ানো যাবে না। যদি কোন অস্পষ্টতা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে তদন্তনাধীন, অভিযুক্ত অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অপরাধীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হবে। অনুচ্ছেদ ২৫ (২) এ বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করে সে জন্য ব্যক্তিগতভাবে সেই দায়ী হবে।

১৯৭৩ সনে প্রণীত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ অনুসরণ করার সুযোগ ছিল না। তবে ২০০৯ সনে আইনটি সংশোধনকালে রোম স্ট্যাটিউটে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে তা অনুসরণ করার সুযোগ ও বাধ্যবাধকতা ছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ ও সংশোধিত ২০০৯ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) বিধিমালা ২০১০ একাধারে বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইনসমূহসহ আন্তর্জাতিক সংবিধি, সনদ ও চুক্তি অনুসৃত হয়নি। কেবল রাজনৈতিক বিবেচনায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষদেরকে ঘায়েল করার জন্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন এবং তা প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদেরকে চিহ্নিত করা, ১৯৭৩ সনের মূল আইনে যুদ্ধাপরাধী বা মানবতাবিরোধী অপরাধের সুস্পষ্ট যে সংজ্ঞা এবং ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার যা ছিল তাকে ২০০৯ সনে সংশোধনের মাধ্যমে পরিধি বাড়ানো হয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অনুকূলে না নিয়ে প্রতিকূলে নেয়া এবং ব্যক্তিগত অপরাধকে সামষ্টিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে সংগঠনকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করানোর একটি প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে এটি আন্তর্জাতিক মান অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আদালত কাঠামো

রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এর অনুচ্ছেদ ৩৪(বি) তে বলা হয়েছে আদালতের An Appeals Division, a Trial Division and a Pre-Trial Division থাকবে। অনুচ্ছেদ ৩৯(২) এ বলা হয়েছে-

(ক) প্রতিটি বিভাগ (আপীল বিভাগ, বিচারিক বিভাগ ও প্রাক-বিচারিক বিভাগ) সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কার্য সম্পন্ন করবে।

(খ) (i) আপীল বিভাগের বিচারকের নিয়ে আপীল আদালত গঠিত হবে

(ii) বিচারিক বিভাগের ৩ জন বিচারক নিয়ে বিচারিক আদালতের কাজ সম্পন্ন করা হবে

(iii) রোম স্ট্যাটিউট, বিধিমালা ও সাক্ষ্যবিধি অনুসারে প্রাক-বিচারিক বিভাগের ৩ (তিন) জন অথবা ১ (এক) জন বিচারক নিয়ে এ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এর অনুচ্ছেদ ৩৯(৪) এ বলা হয়েছে, আপীল বিভাগের বিচারকগণ কেবলমাত্র আপীল বিভাগের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিচারিক বিভাগ ও প্রাক-বিচারিক বিভাগের বিচারকদেরকে বিভাগ পরিবর্তন করা যাবে; তবে যিনি কোন মামলার প্রাক-বিচারিক আদালতে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, তিনি কোন ভাবেই ঐ মামলার বিচারিক আদালতে বসতে পারবেন না।

আর অনুচ্ছেদ ৩৬(৭) এ বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হলে একই দেশের দুই জন বিচারক একই আদালতে বসতে পারবেন না। যদি কোন ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হন তাহলে তিনি যে দেশের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অধিকতরভাবে ভোগ করেন, তিনি ঐ দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন।

রোম স্ট্যাটিউটের আলোকে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে তা হবে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আদালতের কাঠামো গঠন। এ কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন স্তর/বিভাগের কার্যক্রম হবে-

আন্তর্জাতিক আদালত সমূহে প্রাক-বিচার আদালত (Pre-trial stage) বিচারিক আদালত থেকে আলাদাভাবে গঠিত; অর্থাৎ এ স্তরের বিচারক বা বিচারক প্যানেল এবং বিচারিক আদালতের বিচারক বা বিচারক প্যানেল আলাদা আলাদা। সকল স্তরের বিচারকগণ বিভিন্ন দেশ হতে জাতিসংঘ কর্তৃক নিয়োজিত হন।

প্রাক-বিচারিক স্তর (Pre-trial stage/ Division)

আদালতের কার্যক্রম মূলতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত যার প্রথমটি হচ্ছে প্রাক বিচার স্তর (Pre-trial stage)। এ স্তরের বিচারক বা বিচারক প্যানেল যে সকল কাজগুলো করেন–

www.pathagar.com

১. অভিযোগ আমলে নেওয়া বা না নেওয়া
২. তদন্ত করার জন্য আদেশ
৩. সমন, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী
৪. জামিন প্রদান বা হাজতে প্রেরণ
৫. হুলিয়া ও ক্রোকী পরোয়ানা জারী
৬. তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করা
৭. বিচারিক আদালতে মামলার নথি ও আসামীদেরকে প্রেরণ।

বিচারিক স্তর (Trial stage / Division)

আন্তর্জাতিক আদালত সমূহে বিভিন্ন দেশ থেকে জাতিসংঘে বিচার স্তরের বিচারকদেরকে নিয়োগ করে থাকে। এ স্তরের কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

১. অভিযোগ গঠন হবে কি হবে না শুনানীর মাধ্যমে তা নির্ধারণ।
২. অভিযোগ গঠন হলে সাক্ষী ও জেরার কার্যক্রম।
৩. অন্তর্বর্তীকালীন আপীল (Interlocutory appeal) হলে বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা (যে কোন পর্যায়ে এক বা একাধিকবার হতে পারে)।
৪. যুক্তিতর্ক শ্রবণ।
৫. রায় প্রদান, শাস্তি প্রদান অথবা বেকসুর খালাস আদেশ।

আপীল স্তর (Appeal stage/ Division)

জাতিসংঘের নিয়োজিত বিচারকদের দ্বারা আপীল আদালত গঠিত হওয়ার কথা। আপীল আদালতের কার্যক্রম হচ্ছে-

১. অন্তবর্তীকালীন আপীল শুনানী ও আদেশ প্রদান
২. বিচার আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হলে তা গ্রহণ ও আইন অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা।
৩. চূড়ান্ত রায় প্রদান শাস্তি বহাল রাখা অথবা শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো-কমানো, খালাস প্রদান ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অপরাধ আদালত প্রাক-বিচার স্তর এবং বিচার স্তরের বিচারক প্যানেল একই ব্যক্তিদের দ্বারা গঠন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ সাক্ষী ও জেরা পর্যায়ে (অন্যান্য পর্যায়সহ) আসামী পক্ষকে কোন প্রকার সহযোগিতা না করে বাদী পক্ষকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ডাঃ এম এ হাসান বলেছেন যে, আদালত বাদী পক্ষকে সহযোগিতা না করলে তারা মামলা চালাতে পারতেন না। তৃতীয়তঃ অন্ত বর্তীকালীন আপীল (Interlocutory appeal) এর সুযোগ না থাকায় বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকের ভুল বা স্বেচ্ছাচারিতার কোন প্রতিকার থাকছে না।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অরাজনৈতিক তদন্তকারী টীমের ব্যবস্থা

বিচারিক কার্যক্রম মূলত শুরু হয় তদন্ত কার্যক্রম দিয়ে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারের প্রথম সোপান। তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজে কোন সুবিধার আশায় অথবা ধর্ম, বর্ণ, জন্ম, মতবাদ ইত্যাদি বিবেচনা না করে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অনাহূতভাবে সহযোগিতা করতে যাওয়া, বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে নিয়ে তাদেরকে দিগ্‌নির্দেশনা দেওয়া, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সমাবেশ ঘটিয়ে প্রভাব বিস্তার করা সব কিছুই স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্ত কাজের অন্তরায়।

যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধ একটি গুরুতর অপরাধ হওয়াতে বিজয়ী শক্তি দ্বারা তদন্ত পরিচালনা করলে তা নিরপেক্ষ হবে না বিবেচনা করেই জাতিসংঘ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করে। কিন্তু বাংলাদেশে যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে তার তদন্তকারী সদস্যগণ রাজনৈতিক বিবেচনায় একপক্ষীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। তদন্তকারী টিমের প্রধান প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব আব্দুল মতিন ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রসংঘের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তার নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সদস্য যারা ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মী ছিলেন তাদের নিয়োগও বাতিল করা প্রয়োজন ছিল। তা না করে কেবল রাজনৈতিক বিবেচনায় তদন্তকারী দল নিয়োগ করে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার যে দাবী করা হচ্ছে তা সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ

বিচারের নাম 'আন্তর্জাতিক' আর আইনজীবী হবেন দেশীয়, তাহলে বিচারের মানও দেশীয় হতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর ১৭ (২) ধারায় বিনাশর্তে বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের বিধান রাখা হয় ও ১৯৭৩ সনের এক সরকারি Press releaseএর মাধ্যমে বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছিল তৎকালীন সরকার। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কার্যপ্রণালী বিধিমালা ২০১০ এর বিধি নম্বর ৪২ এ বলা হয় "The Tribunal may allow appearance of any foreign counsel for either party provided that the Bangladesh Bar Council permits such counsel to appear." সরকারের প্রধান আইনজীবী তথা এটর্ণী জেনারেল আসামীদের পক্ষে বিদেশী আইনজীবী নিয়োগ করতে দিবেন না স্পষ্ট করে বলে দিলে সরকারী ঘরাণার যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডা. এম. এ. হাসান হতাশা প্রকাশ করে বলেন, "এটা হলে তো বলা হবে, বিচার আন্তর্জাতিক মানের নয়।"'[৭২২]

---

[৭২২] RTV Talk Show, তারিখ : ০৩.১০.২০১১

www.pathagar.com

সরকারের আইনজীবীগণও এ আইনের যথাযথ প্রয়োগের সাথে পরিচিত না হওয়াতে তাদের Performance এ কেউ খুশী হতে পারেননি। তাদের বিরুদ্ধে সরকারী ঘরাণার ব্যক্তিগণ বক্তব্য দিলে প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, "আমাদের নিয়ে যদি এতই সন্দেহ থাকে তবে নতুন প্রসিকিউটর নিয়োগ দিন।"[৭২৩] সরকারও বিদেশী আইনজীবী নিয়োগ করতে পারতেন তাদের পক্ষে সুষ্ঠু আইনী লড়াই করার জন্য।

রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এর অনুচ্ছেদ ৬৭ (বি) এ বলা হয়েছে, আদালতে আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ থাকতে হবে। আদালতের আইনী যোগ্যতা থাকতে হবে যাতে যথাযথভাবে আইনের বিধানাবলী পূরণে সক্ষম হয়।

রোম স্ট্যাটিউট স্বাক্ষরকারী বাংলাদেশ সরকার, তার প্রধান কুশলী যখন বলেন আসামীদেরকে বিদেশী আইনজীবী নিয়োগ করতে দিবেন না; তখন আন্তর্জাতিক সংবিধি ভঙ্গের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এতে করে সরকার

- বিচারের নামে বিচার বিভাগীয় মোহর লাগিয়ে অবিচার করার নাটক মঞ্চস্থ করেছে।
- আন্তর্জাতিক সংবিধি ভঙ্গকারী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করছে, যা দ্বারা জাতীয় বৈশিষ্টে কালিমা মাখা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অরাজনৈতিক ও প্রাজ্ঞ বিচারক নিয়োগ

যুদ্ধাপরাধ অথবা মানবতাবিরোধী অপরাধ অথবা গণহত্যা জনিত অপরাধের জন্য এ পর্যন্ত যত দেশে বিচার হয়েছে বা বিচার চলেছে তা জাতিসংঘের অনুমোদনক্রমে ও নিয়োজিত বিচারকদের দ্বারাই আদালত পরিচালিত হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে বিচারকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ করা। জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশ থেকে এ সংক্রান্ত প্রাজ্ঞ বিচারকদেরকে আদালতের তিনটি বিভাগ তথা Pre-trial Division, Trial Division, Appeal Division এ নিয়োগ করে থাকে।

শাহরিয়ার কবিরের "বিজয়ীরাই পরাজিতদের বিচার করে"[৭২৪] কথা বিবেচনা করেই জাতিসংঘ বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য রোম স্ট্যাটিউটের আলোকে বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করে। কিন্তু বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক কোন বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং রাজনৈতিকভাবে বিজয়ীদের পক্ষের মানুষদেরকে বিচারকের আসনে বসানো হয়েছে। আসামী পক্ষকে তারা সরাসরি বলে দিয়েছে আপনারা "জাস্টিস পাবেন না।"[৭২৫]

---

[৭২৩] দৈনিক আমার দেশ, তারিখ: ১৮.০৩.২০১২

[৭২৪] সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২

[৭২৫] দৈনিক আমার দেশ, তারিখ : ০৯.০৪.২০১২

www.pathagar.com

এছাড়াও আইনমন্ত্রী বিচারকদের এধরনের বিচার করার অভিজ্ঞতা নেই বলে স্বীকার করে Stephen J. Rapp এর নিকট তাদের প্রশিক্ষণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল একই সঙ্গে প্রাক-বিচারিক আদালত ও বিচারিক আদালত পরিচালনা করছেন যা রোম স্ট্যাটিউটের পরিপন্থী।

দেশীয় আদালতে আন্তর্জাতিক আইনে বিচার করতে গিয়ে বাংলাদেশ তথা সরকারকে বেশ বেকায়দায় পড়তে হয়। প্রথমেই হোচট খায় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক। এ ছাড়া আদালত পরিচালনা করতে গিয়ে আইন ও বিধি ভঙ্গ করে বিভিন্ন আদেশ আদালতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আইনমন্ত্রীকে বলতে হয় বিচারকগণ এ ধরনের আইনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয়। বিচারকগণও এ ধরণের বিচারিক কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত না থাকায় তারাও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[৭২৬] Lord Avebury[৭২৭] মত ~~দেন~~ যে, "ট্রাইবুনালের বিচারক, প্রসিকিউটর এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাবৃন্দের সংশ্লিষ্ট জটিল আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। যদিও বলা হয় এরা আইসিসি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে, এই তথ্যটি সত্য নয় কেননা আইসিসি নিজেই এটি যাচাই করে তথ্যটি মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে।"[৭২৮] আর এ কথা বলার মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল যে আন্তর্জাতিক মানদন্ড স্বীকৃত নয় এবং বিচার যে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবে না তা পরিস্কার।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ

১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পাকিস্তানের কোন অভ্যন্তরীণ ঘটনা ছিল না। বিষয়টি সারা বিশ্বকে নাড়া দেয় এবং দুটি বৃহৎ শক্তির আশ্রয়ে দু'পক্ষ দু'দিকে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যেহেতু বিষয়টি আন্তর্জাতিক এবং যেহেতু অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ প্রণয়ন করা হয় এবং যেহেতু আদালতের নাম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং যেহেতু বিচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদন্ড বজায় রাখার বার বার ঘোষণা দেয়া হয়েছে; সেহেতু দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ এমন হওয়া উচিৎ যাতে সরকার বা বিরোধী পক্ষ, মিডিয়া, Civil Society সহ কোন পর্যায়ের বক্তব্য ও ভূমিকা এমন না হয় যেন এ ট্রাইব্যুনালের তদন্তকারী দল, প্রসিকিউটর ও বিচারকগণ কোন ভাবে মানসিক চাপে পড়েন। এটি হচ্ছে রাজনৈতিক পরিবেশগত আন্তর্জাতিক মানদন্ড।

---

[৭২৬] Stephen J. Rapp এর press conference। তারিখ : ১৩.০১.২০১১।

[৭২৭] Lord Eric Avebury, Chairman of the International Bangladesh Foundation and Co-Chair of the Chittagong Hill Tracts Commission. On 27 July 2011, he received the Law Minister of Bangladesh, Mr Shafiq Ahmed at Flodden Road.

[৭২৮] http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=3073 date:31.07.2011 (Lord Eric Avebury, এর পুরো বক্তব্য পরিশিষ্ট : ২৪ দেওয়া গেলো)।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলাদেশে সরকারী ঘরাণার বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের বক্তব্য এবং এগুলি মিডিয়ায় প্রচার প্রকাশের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সরকারী দল ও তার অঙ্গ-সংগঠনগুলো মিছিল-মিটিং ও দীর্ঘ (১৪ কিলোমিটার) মানববন্ধন করে তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রসিকিউটর ও বিচারকদের উপর মানসিক চাপের মাধ্যমে বিচারের রায় তাদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন।

আবদুল কাদের মোল্লার মামলার রায় প্রকাশের পর বামপন্থীরা 'ঢাক, ঢোল, করতালসহ নানা সরঞ্জামের বাদ্যবাজনার তালে তালে' নৃত্য, 'ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, রাজাকারের ফাঁসি চাই' জাতীয় শ্লোগান, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, ইসলাম প্রিয় মানুষের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার দাবী নিয়ে শাহবাগে জমায়েত করার মাধ্যমে[৭২৯] রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মামলায় ফাঁসির রায় প্রদান করা হয়। সারা দেশের মানুষ এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশের গুলিতে প্রায় শতাধিক জন মানুষ মারা যায়।

এ দিকে শাহবাগের নায়করা আল্লাহ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ও ইসলামের অবমাননাকর ব্লগে (Blog) দেয়া লেখা প্রকাশিত হলে দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। সরকার তাদের পক্ষাবলম্বন করে দেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করে- এক দল আস্তিক আর অপর দল নাস্তিক।

বিচারের নামে ধোকা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ ও সংশোধিত আইন ২০০৯ অনুসারে ট্রাইব্যুনাল গঠন হওয়ার পূর্বে এবং পরে বার বার ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এটি একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল; এখানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হবে। ২০০৯ সনে আইনটি সংশোধন করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি পাশ কাটিয়ে তাদের সহায়তাকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের বিচার করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীগণ, এমনকি আইনমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এই আদালতকে বার বার আন্তর্জাতিক আদালত ঘোষণা করলেও একপর্যায়ে এসে আইনমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, এটি একটি National Court এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নয় বরং মানবতাবিরোধীদের বিচার হবে। অর্থাৎ বিচারের বিষয়ে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

(১) ১৯৫ জন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পরিবর্তে Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 অনুসারে

---

[৭২৯] দৈনিক জনকণ্ঠ, ০৮.০২.২০১৩

www.pathagar.com

যাদের একবার বিচার হয়ে গিয়েছে অথবা সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মুক্ত জীবন যাপন করছিলেন তাদেরকে বাংলাদেশের সংবিধান, দেশীয় আইন, আন্তর্জাতিক সনদ ও সংবিধি ভঙ্গ করে একই অপরাধের জন্য দ্বিতীয় বারের মতো বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করানো হয়েছে বা হচ্ছে।

(২) আন্তর্জাতিক আদালতকে দেশীয় আদালতে পরিবর্তন করার মাধ্যমে ১৯৫ জন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার বিষয়টি কবরস্থ করা হয়েছে। দেশীয় আদালতকে আর আন্তর্জাতিক আদালতে রূপ দেয়ার কোন সুযোগ সরকারের হাতে থাকছে না; যদিও সরকারের অনেক মন্ত্রী ও আওয়ামী ঘরাণার বুদ্ধিজীবীগণ দাবী করছেন যে, পরবর্তীতে ১৯৫ জন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে। বিষয়টি স্রেফ প্রতারণামূলক প্রচারণার জন্য বলা হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন।

(৩) শাহরিয়ার কবির বলেন যে, ১৯৭২ সনের আইনটির ত্রুটির কারণে ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন প্রণয়ন করা হয় যা তার ভাষায় "এ আইন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করবে, কারণ এর আগে কোন দেশ গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের জন্য এ ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি।" এ ক্ষেত্রে ---

- প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন প্রণয়ন করার সময় ১৯৭২ সনের কলাবরেটর আইনটি বাতিল হয়েছিল কি না?
- ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন প্রণয়ন করার সময় ১৯৭২ সনের Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 টি বাতিল করা হয়ে থাকলে এ আইন বাতিল করার জন্য জিয়াউর রহমানকে কেন দায়ী করা হয়?
- ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 অনুসারে যাদের বিচার হচ্ছিল তাদেরকে ১৯৭৩ সনের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে প্রসিকিউট করা হয়েছিল কিনা?
- শাহরিয়ার কবিরের ভাষায় ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনটি 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করবে, কারণ এর আগে কোন দেশ গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের জন্য এ ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক আইন' হলে ২০০৯ ও

www.pathagar.com

২০১৩ সনে এ আইন সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল বা কার স্বার্থে তা করা হলো?

- ১৯৭৩ সনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন প্রণয়ন করার পর পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী কোন বাঙালির বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সনের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত কোন মামলা করা হয়নি কেন?

বিচারক ও বিচার বিভাগ নিয়ে প্রশ্ন

রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এর অনুচ্ছেদ ৪১ (২) এ বলা হয়েছে যে, একজন বিচারক সকল দিক থেকেই নিরপেক্ষ, তা প্রমাণ করতে হবে। তাকে আরো প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি পূর্বে কোন ভাবেই এ ধরণের মামলায় জড়িত ছিলেন না। বাদী বা বিবাদী পক্ষের যে কেউ এ ধরনের বিচারকের বিষয়ে আপত্তি তুলতে পারেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ (সংশোধিত) ২০০৯ এর ৬(৮) ধারা অনুযায়ী আসামী বা বাদী কোন পক্ষই ট্রাইব্যুনালের সদস্য বা বিকল্প সদস্যের বৈধতা বা অন্য কোন ব্যাপারে কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ নেই মর্মে যে বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে Human Rights Watch তার বিরোধিতা করেছে। বস্তুত বিষয়টি রোম স্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এবং ICCPR 1966 এর পরিপন্থী। তাই ধারাটি সংশোধনের দাবী রাখে।

ডা. এম এ হাসান এক সাক্ষাৎকারে বলেন;"যারা প্রসিকিউশনে আছেন, তারা তো কিছু জানেই না। আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। কোনো আন্তর্জাতিক আদালত তারা দেখেনি। এ রকম কোনো প্রসিকিউশনের ভেতরে তারা যায়নি। এ কারণেই আমি মনে করি, প্রসিকিউটরদের সার্বিক যোগ্যতা ও মেধার অভাব রয়েছে। এই যোগ্যতা ও মেধার অভাবের কারণেই মামলাগুলো যেভাবে সাজানোর দরকার ছিল সেভাবে সাজাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন : যদি কিছু নাই জানেন তাহলে প্রসিকিউটররা মামলা চালাচ্ছেন কিভাবে?

ডা. এম এ হাসান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "তারা পারছেন, কারণ আদালত তাদের ছাড় দিচ্ছেন। কিন্তু মামলাগুলো সাজানো এবং পরিচালনায় এমন সব সমস্যা হচ্ছে, চাইলেই বিচারক খারিজ করে দিতে পারেন।"[৭৩০]

স্কাইপে সংলাপ বিচারক ও বিচার বিভাগকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ব্রিটিশদের তৈরী আদালত অবমাননা আইন ১৮৪০ (Contempt to Court Act 1840) খড়গ হিসেবে থাকায় এ আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেলো। তারপরও কিছু আচরণ ও

---

৭৩০ সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২; পৃ: ৩০-৩২

www.pathagar.com

বিতর্কিত আদেশের কারণে বিচার বিভাগ নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিচার বিভাগ নিয়ে মানুষের মূল্যায়নকে উপলব্ধি করতে বা মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হলে এ জন্য সাধারণ মানুষ নয় বিচার বিভাগই দায়ী থাকবে। নিম্নে বিচার বিভাগ নিয়ে মানুষের মূল্যায়নের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো–

টেবিল ৪.১

বিচার বিভাগ নিয়ে মানুষের মূল্যায়ন চিত্র

ক্রমিক	প্রশ্ন	হাঁ (শতাংশ)	না (শতাংশ)	পত্রিকা
১.	'বাংলাদেশ বিচার বিভাগ সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত' টিআইবির জরিপের এ তথ্য সমর্থন করেন কি?	৯৬.৭৪	৩.২৬	কালের কণ্ঠ, ২৬.১২.২০১০
২.	দুর্নীতির শীর্ষে এবার বিচার বিভাগ, টিআইবির এই রিপোর্ট কি সমর্থন করেন?	৮২.৫৪	১৭.৪৬	সমকাল, ২৬.১২.২০১০
৩.	দুর্নীতির শীর্ষে বিচার বিভাগ। টিআইবি'র জরিপের এ তথ্য সঠিক বলে মনে করেন?	৯০.০০	৮.০০	ইত্তেফাক, ২৬.১২.২০১০
৪.	টিআইবির জরিপ বলছে বাংলাদেশে সেবাখাতে বিচার বিভাগ সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত। আপনি কি তা মনে করেন?	৯২.৩৩	৭.৩৬	আমাদের সময়, ২৬.১২.২০১০
৫.	আইন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, বিচার বিভাগের দুর্নীতি নিয়ে জরিপ চালিয়ে টিআইবি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধীতাকারীদের পক্ষ নিয়েছে। তার এ বক্তব্য যৌক্তিক বলে মনে করেন কি?	১১.৯৫	৮৮.০৫	কালের কণ্ঠ, ২৬.১২.২০১০
৬.	'টিআইবি চেয়ারম্যান বলেছেন, দেশে আইনের শাসন নেই। চলছে অঘোষিত ফ্যাসিবাদ।' আপনি কি তার সঙ্গে একমত?	৭১.৮৩	৮.৫০	যুগান্তর, ৩০.১২.২০১০
৭.	'আইনের শাসনের দুর্বলতার কারণে কেউ কোথাও বিচার পাচ্ছেন না' অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের এ মন্তব্যের সঙ্গে কি আপনি একমত?	৯২.৩৫	৭.৬৫	আমাদের সময়, ৩০.১২.২০১০
৮.	'বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা কম' সুজনের বৈঠকে বক্তাদের এ বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত?	৯২.৯২	৬.৫৯	প্রথম আলো, ৩০.১২.২০১০

www.pathagar.com

ক্রমিক	প্রশ্ন	হ্যাঁ (শতাংশ)	না (শতাংশ)	পত্রিকা
৯.	'দুর্নীতি নিয়ে টিআইবির রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর' আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের এ বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত?	৭.৫৯	৯১.৮৮	আমাদের সময়, ২৮.১২.২০১০
১০.	বিচার বিভাগের ওপর জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করায় টিআইবি প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা ও আদালতে তলব কি সমর্থন করেন?	১.০৫	৯৮.২৫	বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৮.১২.২০১০
১১.	টিআইবির শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কি সমর্থনযোগ্য?	১২.২	৮৬.১	মানবজমিন, ২৮.১২.২০১০
১২.	বিচার বিভাগের ব্যাপারে টিআইবির প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্ত্রীদের অভিযোগ যৌক্তিক বলে মনে করেন কি?	১৪.৮১	৮৩.৮২	প্রথম আলো, ২৭.১২.২০১০
১৩.	দেশের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ বিচার বিভাগের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার' টিআইবির এ প্রতিবেদন সমর্থন করেন কি?	৯৪.৭৪	৪.৮৭	প্রথম আলো, ২৬.১২.২০১০
১৪.	দুদক চেয়ারম্যান বলেছেন, 'দেশে দুর্নীতির বাস্তব চিত্র টিআইবির রিপোর্টের চেয়েও ভয়াবহ।' আপনি কি তাই মনে করেন?	৯২.১৪	৭.৫১	যুগান্তর, ২৬.১২.২০১০
১৫.	আইন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, দুর্নীতি নিয়ে টিআইবির তথ্য ষড়যন্ত্রমূলক। আপনি কি একমত?	১.২৪	৯৮.২৯	বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬.১২.২০১০
১৬.	আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ বলেছেন, বিচার বিভাগ নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদন বিভ্রান্তিকর। আপনি কি একমত?	১.৩৩	৯৭.১৬	বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৭.১২.২০১০
১৭.	স্পীকার বলেছেন, আদালতের রায়ে যদি জনগণ ক্ষুব্ধ হয়, তাহলে তারা একদিন আদালতকেও রুখে দাঁড়াতে পারে।	৯০.০৪	৯.৭৫	যুগান্তর, ০১.০৬.২০১২
১৮.	'বিচার বিভাগ স্বাধীন কিন্তু বিচারকেরা নন' ব্যারিস্টার রফিকুল হকের এ বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত?	৯৩.১১	৬.৩৮	প্রথম আলো, ১৩.০৬.২০১২

বিচার বিভাগ নিয়ে মানুষের অনাস্থার পরিধি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, রাজনৈতিক বিবেচনায় মানবতা বিরোধী অপরাধের যে বিচার করা হবে তাতে মানুষের কোন আস্থা থাকছে না।

www.pathagar.com

অধ্যায় : চার

যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন, সংবিধি, সনদ, চুক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের আইন, বিধি-বিধানের তুলনামূলক পর্যালোচনা

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 সংশোধন করে The International Crimes (Tribunals) Act, 2009 জারী করা হয়। ২০১০ সনে ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং প্রসিকিউটর ও তদন্তদল নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে বিচার এ সরকারের আমলে শেষ করার লক্ষ্যে ২০১২ সনে দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। International Crimes (Tribunals) Act, 2009 জারী করার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) কার্যপ্রণালী বিধিমালা ২০১০ জারী করা হয়। দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের কৌতূহল, বাংলাদেশে Rule of law এর অবস্থা, সকল বিষয়ে অতিমাত্রিক রাজনৈতিকায়ন, সরকারের মন্ত্রী ও সরকারী দলের নেতা-চিন্তকদের বহুমাত্রিক মন্তব্য এ বিচারের ব্যাপারে সকল পর্যায়ে আলোচনা-সমালোচনার বিষয় হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সংরক্ষণ করে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হচ্ছে কিনা তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। সে জন্য যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কিত বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের বিভিন্ন ধারা বা বিধানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন, সংবিধি, চুক্তি, সনদ ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত ইত্যাদির যে সকল বিষয় নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ আবশ্যক–

১. ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদিত আইন (Law with retrospective effect)
২. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান (Equality before court)
৩. মানবাধিকার সংরক্ষণ (Protection of Human Rights)
৪. অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত 'নিরপরাধ' হিসাবে গণ্য (Innocent until proved guilty)
৫. দেশী-বিদেশী আইনজীবী নিয়োগের অধিকার (Local and Foreign pleader appointment)
৬. তথ্য প্রাপ্তির অধিকার (Right to Information)
৭. বন্দী করা বা রাখা (Arrest and Custody)
৮. সাক্ষ্য ও সাক্ষী (Evidence and Witnesses)

www.pathagar.com

৯. দোষ স্বীকার করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা (Compelled to Confess)
১০. উচ্চতর ট্রাইবুনালে যাওয়ার অধিকার (Right to appear before Higher Tribunal)
১১. একই অপরাধে একাধিকবার বিচার করা (Res Judicata)
১২. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার (Jurisdiction of International Crimes Tribunal)
১৩. অন্তর্বর্তীকালীন আপীল (Interlocutory Appeals)
১৪. পরাজিত এবং বিজয়ী উভয় শক্তির যুদ্ধাপরাধের বিচার (Trial of both parties)
১৫. বিচারক নিয়ে প্রশ্ন এবং বিচার প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা (Question on Bench and Judicial Process)
১৬. বিচারের আওতায় কারা কারা আসবে (Jurisdiction of Court)

[আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যক্রম চলার কারণে এ অধ্যায়ের বাকী অংশটুকু প্রকাশ করা হলো না]

www.pathagar.com

খণ্ড : চার

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার

Religion is fundamental glue for the political order itself, because it helps establish and nurture the nations of self and collectively. Thus, religion is a primary element in the development of nationalism and has been a crucial factor in political life throughout the world during the last two centuries.

John Armstrong
Nations Before Nationalism

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

রাষ্ট্র (State) এবং জাতিরাষ্ট্রের (Nation-state) মধ্যে পার্থক্য একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়। পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষাভাষীদের জাতিসত্ত্বা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ অঞ্চলের মানুষের মনে অজানা আতঙ্ক-অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। বাঙালি জাতি রাষ্ট্র (Bangali nation state) গঠন করতে গিয়ে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের যেমন আতঙ্কিত করা হয়েছে, তেমনি আঘাত দেয়া হয়েছে পাহাড়ি অবাঙালি তথা- চাকমা, খাসিয়া, জৈন, লুসাই, মারমা, পাংখো, কুকী ভাষা-ভাষী ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে। উপজাতি এ সকল জনগোষ্ঠী বাঙালি ভাষাভিত্তিক জাতিতে লীন হতে কোন ভাবেই আগ্রহী হয়নি। বরং তারা বিদ্রোহ করেছে। ১৯৭২ সনেই সংসদে এ বিষয়ে যে বিতর্ক হয় তা এখানে তুলে ধরা হলো[৭৩১]।

মিসেস সাজেদা চৌধুরী (এন.ই-১৬৫ : মহিলা-৩) : বৈধতার প্রশ্ন, জনাব স্পীকার সাহেব! শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলতে চেয়েছেন যে, সংবিধানে তাঁদের উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। আমি বলব, তাঁরাও আজকে স্বাধীন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সঙ্গে তাঁদেরও একটা জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যাদাজনক নয়?

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আমাদের জাতির পিতা শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধুর কাছে যুক্ত-স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। এই স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনের কথা বলেছিলাম, আমাদের উপজাতিদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছিলাম। জানি না [বাধা প্রদান]

জনৈক সদস্য : মিষ্টার লারমা একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত এলাকার দাবি জানাচ্ছেন। এইভাবে এক দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

জনাব আঃ রাজ্জাক ভূইয়া আপনার প্রস্তাব পেশ করুন।

জনাব আঃ রাজ্জাক ভূইয়া (ইন. ই. ১১৫ ঃ ঢাকা-১২) : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে,

"সংবিধান-বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক:

---

[৭৩১] ১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল, ড. সাঈদ-উর রহমান, মৌলি প্রকাশনী, প্রকাশকাল : জুন ২০০৪ ; পৃ: ১৩৩-১৩৮

www.pathagar.com

"৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

জনাব স্পীকার : পরিষদের সম্মুখে জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূইয়া প্রস্তাব এনেছেন যে, "সংবিধান-বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক :

"৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (পি. ই.-২৯৯ : পার্বত্য চট্টগ্রাম-১) : মাননীয় স্পীকার সাহেব, জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূইয়া সংশোধনী-প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাঙালি' বলে পরিচিত হবেন।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, সংবিধান-বিলে আছে, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে"; এর সঙ্গে সুস্পষ্ট করে বাংলাদেশের নাগরিকগণকে 'বাঙালি' বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, তাতে করে ভালভাবে বিবেচনা করে যা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিৎ বলে মনে করি।

আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষা বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা চৌদ্দ-পুরুষ-কেউ বলেন নাই, আমি বাঙালি।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙালি জাতি বলে কখনও বলা হয় নাই। আমরা কোন দিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (পি. ই.-২৯৯ : পার্বত্য চট্টগ্রাম-১) : মাননীয় স্পীকার আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহীত হল। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদস্বরূপ আমি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিষদের বৈঠক বর্জন করছি।

(অতঃপর মাননীয় সদস্য পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।)

www.pathagar.com

দীর্ঘ দিন যাবৎ 'বাঙালি' পরিচিতি হিন্দু ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমর্থক হিসেবে গণ্য হয়ে আসেছ। শত বছর পূর্বে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "ইস্কুলের মাঠে বাঙালি আর মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ"। সম্প্রতি ক্রিকেট তারকা সৌরভ গাঙ্গুলী এক টিভি অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করেন"বাঙালি বিয়ের দিন সকালে ছেলেকে সবচেয়ে প্রথম কোন রীতি পালন করতে হয়? এবং এর উত্তর ঃ বিষ্ণু পূজো"[৭৩২] ইত্যাদি উক্তি দ্বারা 'বাঙালি' আর 'হিন্দু' এক ও একক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধে বলেন,"হিন্দু মুসলমান মিলন একটি গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজে আসে নাই।"

বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বলে পরিচিত নব গোপাল মিত্র যার রাজনৈতিক সম্মিলনীর নাম ছিল 'হিন্দু মেলা'। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বলতে গিয়ে জমশের রহমান বলেন "বাঙালি জাতীয়তাবাদে 'বিসমিল্লাহ' হারাম; কিন্তু মঙ্গলপ্রদীপ-দুর্গাপূজা জায়েজ। মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলে বাঙালি অনুষ্ঠান শুরু করা হয় এদেশে। দুর্গাপূজাকে 'জাতীয় উৎসব'[৭৩৩] বলে বিবৃতি দেয়া হয়ে থাকে। এটাই হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আসল চেহারা।"[৭৩৪] আর এ কারণেই একজন মুসলমান তার মুসলমানিত্ব বাদ দিয়ে 'বাঙালি' হতে রাজি নন। কিন্তু আওয়ামী লীগ 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বরণ করে 'মিল্লাতে মুহাম্মদী'র বিশ্বাস ত্যাগ করেছে। এ দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম 'আমি মুসলমান নই হিন্দুও নই আমি বাঙালি'[৭৩৫] বলে মুসলমানিত্ব বিসর্জন দিয়েছেন। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতেই ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের অংশ হিসেবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ১৫০ কোটি মানুষের বন্ধন ছিড়ে কেন বাংলাদেশের মুসলমান ২৫-৩০ কোটি মানুষের সঙ্গে ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ হবে তা পরিস্কার নয়।[৭৩৬] যেখানে ইংল্যাড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড আর অ্যামেরিকা ইংরেজি ভাষাভাষী হওয়ার পরও কেউ ইংলিশ, আইরিশ, স্কটিশ বা আবার কেউবা অ্যামেরিকান। কিন্তু তারা Civilization এর দিক থেকে সকলেই খ্রিস্টান; খ্রিস্টীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের অংশ।

---

৭৩২ জি-বাংলা, দাদাগিরি; তারিখ : ১৬.১০.২০১০

৭৩৩ সার্বজনীন দুর্গাপূজা ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, শাহরিয়ার কবির, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০.১০.২০০৪। পরিশিষ্ট: ২৩ দ্রষ্টব্য

৭৩৪ জাতীয়তাবাদে স্বরূপ অন্বেষায়, জমশের রহমান; আহমেদ মুসা সম্পাদিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ; পৃ: ২৭১

৭৩৫ দৈনিক আমার দেশ; ১৪.০৭.২০১১

৭৩৬ ডিজিটাল বাংলাদেশে কম্প্যুটারের ভাষায় বলা যায়- RAM যত বড় হবে কাজ করতে তত সুবিধা। ১৫০ কোটি মানুষের connectivity আর ২৫/৩০ কোটি মানুষের connectivity এক কথা নয়। ১৫০ কোটি মানুষের RAM আর ২৫/৩০ কোটি মানুষের RAM এক সমান নয়।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালি রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) গঠনের দিকে মুসলমানরা সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৩ সনের Bengal Pact সুবে বাংলাকে হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ শাসনের Magna Carta বলা হলেও হিন্দু নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের কৃষ্ণনগর সম্মেলনে ঐ চুক্তি বাতিল করে দেন।

শেরে বাংলা ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে পাকিস্তান, ভারত, বাংলা এ তিনটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপ-রেখা প্রদান করেন। গান্ধী, নেহেরু-প্যাটেলরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় সুবে বাংলাকে একটি জাতিরাষ্ট্রে (Nation-state) উত্তরণের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে দেন। Jaswant Singh বলেন,"How do you divide a geographic (also geographical) unity? Simply by drawing lines on maps? Through a surgical operation, Mountbatten had said and tragically Nehru and Petel and the Congress party had assented, Jinnah, in any event having demanded adopting to just such a recourse."[৭৩৭] তিনি আরো উল্লেখ করেন,"Gandhi no longer spoke so vehemently against it (partition) and began to repeat the arguments which Sardar Patel had already used."[৭৩৮]

পাকিস্তান সৃষ্টি ও জিন্নাহর মৃত্যুর পর এটিকে একটি জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) করার প্রক্রিয়া পাঞ্জাবীদের স্বৈরাচারী মনোভাব এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কুশলী আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এটিকে জাতি-রাষ্ট্র ঘোষণার পরিবর্তে ভাষা-রাষ্ট্র (Language-state) ঘোষণায় প্রাথমিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ১৯৭৫ সনের পটপরিবর্তন বাংলাদেশকে একটি ভাষা-রাষ্ট্র (Language-state) থেকে জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) করার দিকে পরিচালিত করে।

জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) গঠনের জন্য প্রয়োজন reconciliation (সামঞ্জস্যবিধান)। খোন্দকার আবদুল হামিদ বলেন, "একই রাষ্ট্রের একাধিক এথনিক গ্রুপ, কালচারাল গ্রুপ, রিলিজিয়াস গ্রুপ থাকতে পারে কিন্তু জাতিসত্তাবোধ বা জাতীয় ভাবাদর্শের মেইনস্ট্রিম থেকে তারা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না।"[৭৩৯] বাংলাদেশে একাধিক এথনিক গ্রুপ, কালচারাল গ্রুপ, রিলিজিয়াস গ্রুপ রয়েছে; রয়েছে তাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। কিন্তু ৯০ শতাংশ বাংলাভাষী মুসলমানের দেশে সকল এথনিক গ্রুপ বা রিলিজিয়াস গ্রুপকে ইসলামী মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে। অনুরূপভাবে বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন না তাদেরকে অবশ্যই এ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সকল বিবেচনায় এ দেশকে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন অনেকগুলো reconciliation --

---

[৭৩৭] Jinnah India Partition Independence, Jaswant Singh; p Introduction 5

[৭৩৮] Jinnah India Partition Independence, Jaswant Singh; p 458

[৭৩৯] বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, খোন্দকার আবদুল হামিদ; আহমেদ মুসা সম্পাদিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ; পৃ: ২৮

www.pathagar.com

১. এ দেশে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বিপুল সংখ্যক হিন্দু বসবাস করে। তাছাড়া রয়েছে খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ। সংবিধানের ৮(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে যেখানে সকল নাগরিকের সমানাধিকার রয়েছে সেখানে মুসলমানকে মুসলমানিত্ব, হিন্দুকে হিন্দুত্ব আর খ্রিষ্টান-বৌদ্ধকে স্ব স্ব ধর্মের মৌলিকত্ব ত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষ হতে বলে সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় অধিকারে আঘাত হানা হচ্ছে।

২. এ দেশে বসবাসকারী চাকমা, খাসিয়া, জৈন, লুসাই, মারমা, পাংখো, কুকী ভাষা-ভাষী ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে বাঙালি করতে গিয়ে শেখ মুজিব বলেছিলেন 'তোরা বাঙালি হয়ে যা'। এর বিরোধিতা করেন ঐ সকল উপজাতির নেতৃবৃন্দ। তাদেরকে বাঙালি করার চেষ্টা না করে বাংলাদেশী করার চেষ্টা করতে হবে।

৩. ১৯৭১ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল পাকিস্তানকে ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ করার পক্ষে আর এক দল পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে কাজ করে। এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ একই ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী, একই ভাষায় কথা বলে, একই আচার আচরণে অভ্যস্ত। তার পরও শুধু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তারা বিভক্ত হয়ে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর তারা সকলেই নিজেদেরকে বাংলাদেশী হিসেবে মনে করেন। এ কারণে ১৯৭৩ সনে ৩০ নভেম্বর দেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয় সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে reconciliation এর পথ বেছে নেনে।

৪. বিপুল সংখ্যক উর্দূ ভাষী মানুষ যারা বিহার, উড়িষ্যাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সহায় সম্বল হারিয়ে বাচার আশায় পূর্ববঙ্গে আসেন তারাও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বিভক্ত হয়ে বাংলা ভাষাভাষীদের শত্রুতে পরিণত হন। জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) গঠনের জন্য প্রয়োজন তাদেরকেও এ দেশের নাগরিক হবার সুযোগ দে'য়া এবং মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

৫. বর্তমানের burning issue মানবতাবিরোধী অপরাধের কারণে যাদের বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে, reconciliation এর স্বার্থে এ কার্যক্রম বন্ধ করা প্রয়োজন।

প্রত্যেক ভাষাভাষী তার ভাষার মর্যাদা, ধর্মীয় সম্প্রদায় তার ধর্মীয় মর্যাদা পাবে এবং বর্ণ তার কর্মে কোন বাধা পাবে না, অতীত কর্মকান্ড তার রাষ্ট্র বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করতে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে না; তখনই হবে একটি জাতি-*রাষ্ট্র* (Nation-state)। *বিপরীতে যখন কোন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও চিন্তা চেতনার বসবাস*কারী মানুষ তাদের পূর্বের কোন কর্মকান্ডের কারণে অন্য দশজন থেকে তাকে আলাদা করা হয়, তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়, তার ভবিষ্যতকে অন্ধকার করে দেয়া হয়; তখন ঐ রাষ্ট্র আর জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) হতে পারে না। সেখানে দেখা দেয় হানাহানি এবং গৃহযুদ্ধ। Reconciliation রাষ্ট্রের মধ্যে উপরাষ্ট্র বানানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করে; হানাহানি, বিবাদ আর গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) গঠনে অবদান রাখে। পাবর্ত্য জেলা সমূহের মানুষেরা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করাসহ আলাদা পাবর্ত্য রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও শুধু ভৌগোলিক সীমা সংরক্ষণ করার জন্য

www.pathagar.com

তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকার অসম চুক্তি করে। সে অঞ্চলের মানুষের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করাসহ প্রতিটি পরিবারের ভূমি পাওয়া নিশ্চিত করা হবে বলে বর্তমান সরকার ঘোষণা করে; আর এটাই হচ্ছে Reconciliation ।[৭৪০]

বাংলাদেশের মুসলমানগণ নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক ভাবেন না বরং 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পন্ন'[৭৪১] হিসাবে বারবার প্রমাণ করেছেন। ১৯৪৬ সনে কলকাতায় মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করলেও বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে হিন্দুদের উপর কোন জুলুম হয়নি। ১৯৪৭ সনে এ অঞ্চল পাকিস্তান হলে এবং ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধ হলে স্বচ্ছল হিন্দুরা ভারতে পাড়ি জমান। জমি-বাড়ি-পুকুর ইত্যাদি গোপনে একাধিক মুসলমানের নিকট দলিল মূলে বিক্রয় করে ক্রেতাদেরকে বিবাদ, হামলা-মামলায় জড়িয়ে দিয়ে তারা একদিন চুপিসারে ভারতে পাড়ি জমায়। তারপরও অবশিষ্ট হিন্দুদের উপর কখনো কোন আক্রমণ করেননি মুসলমানরা বরং তাদেরকে রক্ষা করার জন্য নিজেরা নিজেরা ঝগড়া বিবাদ করেছেন।

জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোন্দল কেউ কামনা করে না, তাই কেউ কেউ ভাল উদ্দেশ্য থেকেই সকল সম্প্রদায়কে বিলুপ্ত করে অসাম্প্রদায়িক একটি জাতি গড়তে চায়। আর অনেকে সম্প্রদায়কে সমুন্নত রেখে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি-সম্পর্ক স্থাপন করে সহ-অবস্থানে বাস করতে চায়। মতের এ ধরনের পার্থক্য সব সময়ই ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

নিরপেক্ষ শব্দটি এখন পৃথিবীতে অচল; আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, "হয় আমার পক্ষে না হলে আমার বিপক্ষে অর্থাৎ শত্রু পক্ষে।" সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর পৃথিবীর NATO জোট আর WARSAW জোট নেই। আমরা NATO জোটভুক্ত নই এবং আমরা WARSAW জোটভুক্ত নই বলে একসময় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Alignment Movement-NAM) দানা বেধেছিল। ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে এমনই একটি Non-Religion Movement বা Null-Religion Movement; আমি হিন্দু বিশ্বাসী নই অথবা আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নই, এমন একটি অবস্থা হচ্ছে আমি ধর্মনিরপেক্ষ; অন্য কথায় অসাম্প্রদায়িক।[৭৪২] বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ; ধর্মীয় জীবন বিশ্বাস সকলের মধ্যেই বিরাজমান। কোন মুসলিম ১০০% বিধান পালন করতে না পারলেও ইসলামী জীবনাদর্শের ১% থেকে ৯০% পর্যন্ত অনুসরণ করার চেষ্টা করেন[৭৪৩]; হিন্দু হলেও অনুরূপভাবে তার ধর্মীয় কার্যকলাপে তিনি অংশগ্রহণ করেন; অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীরাও যার যার ধর্মের বিধানে বিশ্বাসী।[৭৪৪]

---

৭৪০ ২১.১০.২০১০ সরকারী ঘোষণা। শেখ হাসিনার সঙ্গে পাবর্ত্য কমিটির সাক্ষাতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

৭৪১ ইসলামী পরিভাষায় একে বলে 'ইহসান'।

৭৪২ একজন মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না কারন তার ধর্ম আছে; অসাম্প্রদায়িক হতে পারে না, হতে পারে সম্প্রদায় সম্প্রীতি সম্পন্ন মানুষ।

৭৪৩ সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে ১০০% অনুসরণের কোন সুযোগ নেই বলে বিশ্বাস।

৭৪৪ যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে তারাও নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আস্থাশীল, কিন্তু দ্বিমুখী চরিত্রের কারণে তারা অন্যকে তার ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তনের আহবান জানান।

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই

শেষকথা

(১)

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সনের ইতিহাসের একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এ লেখা। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম থেকেই ধারাবাহিকভাবে একমুখী প্রচারণার কবলে পতিত। বলা চলে ৭১ এর ইতিহাস অনেকাংশে দুর্বৃত্তায়ন কবলিত। এ অবস্থা মানুষের বহুমাত্রিক চিন্তা চেতনাকে লোপ করেছে। ইতিহাসের পেছনের যে ইতিহাস থাকে নতুন প্রজন্মের নিকট তা বিস্মৃত।

খণ্ডিত বা বিকৃত ইতিহাস জীবনবোধকে বিপথে চালিত করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার (বীর উত্তম)[৭৪৫] এর বই '১৯৭১ ভেতরে বাইরে'র প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, "একটি জাতির জন্মইতিহাস সব সময় সত্য ও তথ্যনির্ভর হওয়া উচিত। অতীতে ব্যক্তিস্বার্থকে উর্ধে স্থান দিতে গিয়ে জাতির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা হয়েছে।"[৭৪৬]

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ কে খন্দকার (বীর উত্তম) বলেন, "সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিযোগিতা এখনো চলছে। যে জাতি সত্যকে লালন করতে পারে না, প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করে, সেখানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"[৭৪৭] তাই ইতিহাসের পেছনের ইতিহাস সকলকে জানানো বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এ লেখার প্রথম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ সার্বভৌম ও উন্নত দেশ হিসেবে মাথা উচু করে দাড়ানোর জন্যে স্বাধীন হয়েছে। ব্রিটিশদের বিভাজন নীতির কবলে পড়ে ভারতবর্ষ দুশ বছর পরাধীন থেকেছে। সে ইতিহাস আমাদের জানা। কেউ কেউ এখনো দেশে সেই বিভাজন নীতি চালু রেখে ফায়দা হাসিল করতে চায়। দেশকে উন্নতির দিকে নিতে হলে বিভাজনের পথ পরিহার করে সকল মানুষকে একত্রে নিয়ে এগুতে হবে। সকলের নিকট এ আবেদনটি করা এ লেখার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি জাতি-রাষ্ট্র গঠনের জন্য সব ধরণের দ্বন্দ্ব (Conflict) ভুলে মীমাংসার (reconciliation) পথে চলার জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। দেশ যখন অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত (emergent tiger)

---

৭৪৫ ২০০৯-২০১৩ সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ছিলেন।

৭৪৬ প্রথম আলো, ০৩.০৯.২০১৪। বক্তারা ছিলেন - অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সারওয়ার আলী প্রমুখ।

৭৪৭ প্রথম আলো, ০৩.০৯.২০১৪

www.pathagar.com

হবার পথে তখন ঐক্যবদ্ধ (consolidated) একটি জাতি-রাষ্ট্রকে বিভাজিত করে অকার্যকর রাষ্ট্র (failed state) হিসেবে চিহ্নিত করা কাদের স্বার্থে সে বিষয়টি উপলব্ধি করানোও এ লেখার আরো একটি উদ্দেশ্য।

(২)

যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন প্রণয়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ ও গণহত্যা ইত্যাদি 'যুদ্ধাপরাধ' শ্রেণীভুক্ত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ন্যুরেমবার্গ নীতিমালা ১৯৪৫ ও জেনোসাইড কনভেনশন ১৯৪৮ হচ্ছে প্রধান দু'টি আন্তর্জাতিক instrumente যা আন্তর্জাতিক অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও এই বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছে।

Universal Declaration of Human Rights ১৯৪৮, ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 1998, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, International Criminal Court (ICC) ২০০২ ইত্যাদি সনদ, সংবিধি আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের প্রক্রিয়া ও এর মানবিক বিষয়গুলোর দিগ্‌-নির্দেশনা দিয়েছে।

International Court of Justice I International Criminal Court (ICC) আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের জন্য দু'টি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। ২০০২ সনের ০১ জুলাই থেকে ICC তার কার্যক্রম শুরু করে এবং আদালত গঠনের পরে বিশ্বে ঘটে যাওয়া আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের অনুমোদনক্রমের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক আদালতে অনেক মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হয়, যেমন-কম্বোডিয়া ট্রায়াল, রুয়ান্ডা ট্রায়াল, সিয়েরা লিওন ট্রায়াল, যুগোশ্লাভিয়া ট্রায়াল ইত্যাদি।

ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর আইনে বিচার করার কারণে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালকে অনৈতিক ও আইন বহিঃর্ভূত বিচার হিসেবে অনেক আইনজ্ঞ মত দিয়েছেন। তাছাড়া বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহের বিচারকদের দ্বারা এর বিচারিক কাজ অনুষ্ঠিত হওয়াতে এর নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। একই কারণে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের মতই টোকিও ট্রায়ালও বিতর্কিত।

কম্বোডিয়া ট্রায়ালে দেশী ও বিদেশী বিচারক, প্রসিকিউটর, তদন্তকারী, বিবাদী পক্ষের কুশলী ইত্যাদি একত্রে দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে এটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হয়েছে। এবং এ আদালতের নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি সকলের নিকট বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে। তা ছাড়া এ আদালতের প্রস্তুতকৃত দলিলপত্রাদি, নির্দেশনা ও কর্ম-পদ্ধতি নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বিচারের পথ দেখায়।

(৩)

www.pathagar.com

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নীতিকে apartheid[748] (অ্যাপারথেইড) বলে। ১৯৪৮-১৯৯৪ পর্যন্ত African National Party সরকার বর্ণবাদী নীতির মাধ্যমে এ মানবতাবিরোধী অপরাধ জন্ম দেয়। দেশের সংখ্যাগুরু কালো মানুষদের সকল ধরণের অধিকার খর্ব করে।

১৯৪৮ সনের নির্বাচিত সংসদ দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষদেরকে 'সাদা', 'কালো', 'রঙ্গিন' ও 'ভারতীয়' এ চারটি ভাগে ভাগ করে। তাদের আবাসিক এলাকা আলাদা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৬০-৬৩ সনের মধ্যে প্রায় ৩৫ (পয়ত্রিশ) লক্ষ কালো মানুষকে বাস্তু ভিটা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ১৯৭০ সনে সংসদে কালো মানুষদের প্রতিনিধিত্ব বাতিল করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়।

১৯৫০ সন থেকেই বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। কালো মানুষদের প্রতিনিধিত্বকারী দল African National Congress (ANC) এবং এ দল ত্যাগকারীদের সংগঠন Pan Africanist Congress (PAC) এই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থেকে। ১৯৬০ সনের ২১ মার্চ Pan Africanist Congress (PAC) মিছিল বের করলে Sharpeville শহরে পুলিশের গুলিতে ৬০ (ষাট) জন কৃষ্ণাঙ্গ মারা যায়, যা Sharpeville massacare নামে পরিচিত। African National Congress (ANC) I Pan Africanist Congress (PAC) নিষিদ্ধ করা হয় এবং দু'দলের নেতৃবৃন্দসহ ১৮,০০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

African National Congress (ANC) তাদের সামরিক শাখা গঠন করে। সামরিক শাখার নাম Umkhonto we Sizwe (সংক্ষেপে MK)। Nelson Mendela[৭৪৯] এই সামরিক শাখার উপ-প্রধান ছিলেন। ১৯৬১ সনে Battle of Blood River[৭৫০] anniversaryতে তারা প্রথম নাশকতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ অপরাধে Nelson Mendelaকে ১৯৬২ সনের ৫ আগস্ট গ্রেফতার করা হয়।

১৯৭৬ সালে বিদ্যালয়ের বেতন বাড়ানোর প্রতিবাদে ছাত্ররা আন্দোলন করলে সোয়েটোতে (Soweto) পুলিশ গুলি চালায়। এতে ৭০০ জন[৭৫১] ছাত্র মারা যায়।

---

748 Apartheid word meaning is "the state of being apart" literally "aparthood".

৭৪৯ ম্যান্ডেলা তাঁর পরিবারের প্রথম সদস্য যিনি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। স্কুলে পড়ার সময়ে তাঁর শিক্ষিকা মিদঙ্গানে তাঁর ইংরেজি নাম রাখেন "নেলসন"।

৭৫০ ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৮ তারিখে Slag van Bloedrivier (Blood river) ৪৭০ জন Voortrekkers ও ১৫০০০-২১০০০ জন Zuluর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের পর Zulu সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়।

৭৫১ অন্য হিসেব মতে ১৭৬ জন ছাত্র মারা যায়

www.pathagar.com

Nelson Mendela ১৯৯০ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি একাধারে ২৭ বছর জেল জীবন শেষে মুক্ত হন। এরই মধ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। কারামুক্তির পর ম্যান্ডেলা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯০ হতে ১৯৯৪ পর্যন্ত তিনি এই দলের নেতা ছিলেন। এই সময়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ অবসানের লক্ষ্যে F W de Klerk (ডি ক্লার্ক) সরকারের সাথে আলোচনায় বসেন।

১৯৯২ সনের ১৭ জুন রাতে Boipatong (বৈপাটং) শহরে বাড়িতে বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) জন কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করা হয়; hv Boipatong Massacare হিসেবে পরিচিত। এ জন্যে দায়ী করা হয় Inkatha Freedom Party (IFP)কে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পুলিশ IFPকে সহায়তা করে। ম্যান্ডেলা সে সময় ডি ক্লার্কের সরকারকে এই গণহত্যায় জড়িত থাকার জন্য অভিযোগ করেন। এ কারণে African National Congress (ANC)র নেতা Nelson Mendelai সঙ্গে সরকারের আলোচনা ভেঙ্গে যায়। উল্লেখ্য যে Boipatong Massacare নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৯২ সনের ১৬ জুলাই Resolution ৭৬৫ গ্রহণ করা হয়।[৭৫২]

১৯৯২ এর ৭ সেপ্টেম্বর ANCর সমর্থকগণ Bisho (বিসো)তে জমায়েত হলে সেনাবাহিনী তাতে আক্রমণ চালায়। এতে ২৮ জন ANC সমর্থক মারা যায়। এটাকে Bisho Massacare বলে। এ গণহত্যা ঘটলে Boipatong Massacare এর পর ANC নেতা Nelson Mendelaর সঙ্গে সরকারের ভেঙ্গে যাওয়া আলোচনা আবার শুরু হয়। এই শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ হবার পর ১৯৯৪ সালে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সব বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। African National Congress (ANC) নির্বাচনে জয় লাভ করে। Nelson Mendela দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হন। তিনি F W de Klerk এবং Thabo Mbekiকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন। Nelson Mendela বলেন, "During my lifetime ও have dedicated myself to the struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities."[753]

---

৭৫২ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী দাঙ্গা নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৮০ সনের ১৩ জুন Resolution 473, ১৯৭৬ সনের ১৯ জুন Resolution 392, ১৯৭৭ সনের ৩১ অক্টোবর Resolution 417, ১৯৮৪ সনের ১৭ আগাস্ট Resolution 554, ১৯৮৪ সনের ২৩ অক্টোবর Resolution 556 গ্রহণ করা হয়।

753 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela /9734032/Nelson-Mandela-in-his-own-words.html accessed on 01.09.2014

www.pathagar.com

১৯৯৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিক সরকার চিলির Retting Report[৭৫৪] থেকে উৎসাহিত হয়ে Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34/1995 নামে পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করে। Truth and Reconciliation Commission (সংক্ষেপে TRC) নামে পরিচিত এ সংস্থার কাজের পদ্ধতি ছিল একটি আদালতের মতোই। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সব মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠিত হয়েছে তার সামাজিক সমাধান দেওয়ার জন্যে এ কমিশন কাজ করে।

(৪)

দক্ষিণ আফ্রিকার ঐ সময়ের বর্ণবাদী নীতির মতই বাংলাদেশে "চিন্তাবাদী" নীতি বিরাজ করছে; যা দেশকে বর্ণবাদের কুফল বহণকারী চিন্তাবাদে বিভক্ত করেছে। একে aparthood আখ্যা দেওয়া যায়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামপন্থী বা মুসলিম জাতীয়তাবাদী। ১৯৭১ সনে বিভক্তির প্রশ্নে এদের অনেকেই ভারতীয় আগ্রাসনের বিপক্ষে পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে ভূমিকা রাখেন। সংখ্যালঘু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠ হয়। ১৯৭৩ সনে শেখ মুজিব (দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা Nelson Mendelai পুর্বেই) দেশের সকল চিন্তার মানুষকে দেশ গঠনে ভুমিকা রাখার জন্যে reconciliationর ঘোষণা দেন। ২০০৮ সন পর্যন্ত মোটামুটি সে ধারাতেই দেশ পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু ২০০৯ সনে উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা (মূলত ক্ষমতার চালিকা শক্তি হচ্ছে কম্যুনিস্ট নাস্তিকরা) ক্ষমতায় অধিষ্ঠ হলে দেশে aparthood প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগুরু কালো মানুষদের সকল ধরণের অধিকার যে ভাবে খর্ব করে হয়, একই কায়দায় এ দেশের Pan Islamic (ইসলামপন্থী বা মুসলিম জাতীয়তাবাদী) মানুষদের সকল ধরণের অধিকার কেঁড়ে নেওয়া শুরু হয়।

মাদরাসা শিক্ষিত ছাত্ররা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পাড়ে তার ব্যবস্থা করা হয়। মাদরাসা শিক্ষিত যে সকল মেধাবি তরুণরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার

১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ General Augusto Pinochet চিলির ক্ষমতা দখল করে এবং ১১ মার্চ ১৯৯০ প[৭৫৪] ১র্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠ থাকেন। এ সময়ে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে দমন করার জন্যে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করেন। এ সময়ের মধ্যে ২২৭৯ জনকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করা হয়। গ্রেফতার করার পর ৯৫৭ জনকে গুম করা হয়। তা ছাড়া রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৬৪ জন মরা যায়। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্টিত হলে President Patrico Aylwin AzÓcar মানবতাবিরোধী অপরাধ এ সব অপরাধ বিষয়ে কি করা হবে Raul Retting কে প্রধান করে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট্য কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের রিপোর্টকে The National Commission for Truth and Reconciliation Report বলা হয়।

www.pathagar.com

মাধ্যমে চাকরিতে যোগদান করেন, তাদের পদোন্নতি বন্ধ করা হয়। কর্মস্থলের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে সংখ্যালঘুদেরকে বসানো হয়।

সংবিধান ও আইন দ্বারা সংখ্যাগুরু Pan Islamic মানুষদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়। Pan Islamic দলগুলোকে কোন সভা সমাবেশ করতে দয়া হচ্ছে না। ইসলামী দল নিষিদ্ধ না করলেও তাদের দলীয় কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলের কার্যালয় সার্বক্ষণিকভাবে পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়।

রাজনৈতিক যে কোন শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে সন্ত্রাসী সমাবেশ আখ্যায়িত করে চধহ ওংষধসরপ দলগুলোর উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। বিনা কারণে নেতা কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। চধহ ওংষধসরপ দলগুলোর এমন কোন নেতা কর্মী নেই যে কমপক্ষে একবার হাজতে যায়নি। আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায়ের প্রতিবাদে মানুষ রাস্তায় নেমে আসলে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। আবার এই সাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধেই মামলা করা হয়। কেবল একটি উপজেলাতেই ৩৫০০০ লোককে আসামী করে মামলা রুজ্জু করা হয়।

Pan Islamic টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা সংকোচনের জন্যে ১০০০০ (দশ হাজার) টাকার উপর যারা অনুদান দিচ্ছে তাদেরকে হয়রানী করা হচ্ছে। লিল্লাহ বর্ডিংগুলোতে যাকাতের টাকা প্রদানকারীকে হয়রানী করা হচ্ছে। কোরআন, হাদিস, ইসলামী বই রাখার দায়ে জঙ্গী বানিয়ে পংগু করা হচ্ছে। চধহ ওংষধসরপ অর্থনীতি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে ইসলামী ব্যংকগুলোকে জঙ্গী অর্থায়নদাতা সাজানো হচ্ছে। মসজিদ মাদরাসাগুলোতে সার্বক্ষনিক গোয়েন্দা নজরদারি করা হচ্ছে। দাড়ি টুপিধারীদেরকে নাটক সিনেমায় সমাজের নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকল যন্ত্র সংখ্যাগুরু Pan Islamic মানুষদের বিরুদ্ধে কাজ করছে।

সংখ্যাগুরু Pan Islamic মানুষদের যে কোন সমাবেশ দেশে নিষিদ্ধ। প্রকাশ্য ময়দানে ওয়াজ মাহফিল, তফসির মাহফিল, সীরাত মাহফিল, ইসলামী জলসা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের সাথে সাংর্ঘষিক কিছু ওরস ও খানকার জমায়েতকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

জনমানুষের হাজারো দুর্ভোগকারী শাহবাগের নাস্তিক সমাবেশকে সরকার সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করে। এ সমাবেশ ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রচারণা এতটাই তুঙ্গে নিয়ে যায় যে ইসলামপ্রিয় সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। আল্লামা শফির নেতৃত্বে ২০১৩ সনের ৪ এপ্রিল শাপলা চত্বরে ২০ লক্ষ মানুষের জমায়েত নাস্তিকদের ভিত নাড়িয়ে দেয়। সরকার নাস্তিকদের পক্ষ নিলে আল্লামা শফির নেতৃত্বে পরিচালিত অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম ২০১৩ সনের ৫ মে ঢাকা ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা

www.pathagar.com

দেয়। সরকার গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদেরকে শাপলা চত্বরে জমায়েত করায়। রাতের আঁধারে নীরহ্ আলেম ওলামাদের উপর বর্বরচিত আক্রমণ চালায়। এতে শত শত নীরহ্ আলেম ওলামা মারা যায়।

বাংলাদেশের সামগ্রীক চিত্র দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী apartheid চিত্রের ব্যতিক্রম কিছু নয়। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশের aparthood এর কোন ঘটনা নিয়ে জাতিসংঘে আলোচনা হয়নি।

(৫)

১৯৭০ সনের জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ দেশ রক্ষার নামে এ দেশে যে সব অপরাধ সংগঠিত হয় তার ৯৫ % করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী। আর বাকী ৫% অপরাধের সঙ্গে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সহায়ক ব্যক্তিবর্গ জড়িত। ১৯৭১ সনে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে যারা ছিলেন বা যারা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন; সকল সিদ্ধান্তই রাজনৈতিকভাবে গৃহীত।

পাকিস্তান সামরিক ও সহায়ক বাহিনীর সদস্যদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ জারী করা হয় এবং বিভিন্ন বিশ্লেষণ করে ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। সামরিক বাহিনীর সহযোগীদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সনে কলাবরেটর আইন প্রণয়ন করা হয় এবং প্রায় ৮৬০০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪২০০০ জনকে বন্দী করা সম্ভব হয়, বাকীরা পলাতক থাকে। ১৯৭৩ সনের শেখ মুজিব দুই দফা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে প্রায় ৩০,৫০০ জন মানুষ বন্দী জীবন থেকে মুক্ত হন। যারা কখনো গ্রেফতার হননি তাদেরকে নিকটস্থ মহকুমা হাকিমের নিকট আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ সৃষ্টি লগ্নে যে বিভক্তি রেখা অঙ্কিত হয়েছিল তা মুছে ফেলার জন্য দেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা যথার্থ ও সময়োপযোগী ছিল। এই ইস্যুতে শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের পর বিচার প্রক্রিয়া গ্রহণের আর কোন যৌক্তিকতা নেই বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিদেশী সরকার সমূহের সহযোগিতায় এবং আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করা এখন সময়ের দাবী। অন্যথায় দেশে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে যোগসাজশকারী, স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে দেশে অশান্তি ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের সংশোধনী ২০০৯ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ার নামে দীর্ঘ ৪০ বছর পর ৫% অপরাধের সাথে যারা জড়িত এ দেশের মানুষের বিচার করা ব্যবস্থা জাতিকে নতুন ভাবে বিভক্ত করে। উল্লেখ্য যে ৫% অপরাধের সাথে যারা জড়িত তাদের মধ্যে কেবল ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের বিচার করার নামে এ দেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস করার অপচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

"স্বাধীনতার ৪০ বছর পর জাতিকে বিভাজনের যে পথ বেছে নেয়া হয়েছে তা জাতিকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে দুর্বল করবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের মানুষ বিপরীতে লাভবান হবে মাড়োয়ারী, বুর্জোয়া, সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" -- আমরা এ আশংকা করেছিলাম।[755] আমাদের সেই শংকা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার সব জনপদেই আজ বিভাজন। বিভাজন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা তাদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে-সাদী বিএনপির নেতা-কর্মীদের ছেলে মেয়েদের সাথে করান না।[756]এমনকি দাওয়াত দেওয়াও প্রায় বন্ধ।

আমেরিকানরা তাদের সাদা-কালো বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে যখন রাস্তায় No division, Integretion Integretion প্লাকার্ড নিয়ে মিছিল করে তখন আমরা জাতির স্থপতির reconciliation নীতিকে অশ্রদ্ধাভরে বর্জন ও বিষর্জন দিয়ে বিভাজন নীতি কেন গ্রহণ করছি তা বোধগম্য নয়।

বিভাজনের সুযোগে রাষ্ট্রদূতগণ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণ অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলান। ভারত ও আমেরিকা বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রকাশ্যে অযাচিত হস্তক্ষেপ শুরু করে।

(৬)

ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অনেকগুলো মামলার রায় ঘোষণা করেছে। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, আবদুল কাদের মোল্লা, আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী, অধ্যাপক গোলাম আযম, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আবদুল আলীম, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, চৌধুরী মঈনুদ্দিন, আশরাফ হোসেন প্রমুখের।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের অনুপস্থিতিতে তাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। তার কোন রাজনৈতিক দল নেই যারা তার পক্ষে কিছু বলবে। অন্যান্য আলেমগণ রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী অপবাদ নেবার ভয়ে কোন প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেনি। মামলায়ও তার পক্ষে কিছু বলার কেউ ছিল না।

---

৭৫৫ ১ম সংস্করণ।

৭৫৬ বিপরীত চিত্রও একই।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়ের পর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে থাকে। এ রায় জামায়াতে ইসলামী যেমন প্রত্যাখান করে তেমনি বামপন্থীরা তা প্রত্যাখান করে। Bloggers and Online Activists Network নামে নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থীরা শাহবাগে অবস্থান নেয়। ধীরে ধীরে এ অবস্থান কর্মসূচির সাথে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল এবং অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন একাত্মতা ঘোষণা করে। ইমরান এইচ সরকার, আহমেদ রাজীব হায়দার, নিতাই ভট্টাচার্য (ছদ্মনাম আরিফুর রহমান), শাকিল আহমেদ অরণ্য, এফ এম শাহীন, আসিফ মহিউদ্দিন, মাহবুব রশিদ, ইব্রাহিম খলিল, ওমি রহমান পিয়ালদের মত নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীরা এ কর্মকান্ডের মূল অভিনেতা। ইমরান এইচ সরকার মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত হলেও মূল নেতা পর্দার আড়ালেই রয়ে গেছেন। তবে বড় বড় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ড. জাফর ইকবাল, প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর আনিসুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুন, আসাদুজ্জামান নূর, হাসান ইমাম, নাসির উদ্দিন ইফসুফ, প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে বেশ তৎপর দেখা যায়।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায় প্রকাশিত হবার পর এর প্রতিবাদে সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। এ সব নিরস্ত্র নারী-পুরুষ-শিশুর উপর সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ-র‍্যাব নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে শতাধিক জনের উপর মানুষ মারা যায়। হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। আমরা যে আশঙ্কা করেছিলাম "অন্যথায় দেশে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে যোগসাজশকারী, স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে দেশে অশান্তি ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে" তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

(৭)

মামুন ইমতিয়াজ বলেন," মুক্তিযুদ্ধ চলাকাল থেকে আজোবধি দেশে দুটি ধারা চলছে। প্রথমটি ধর্মীয় ধারা, যারা ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধর্মহীন, ইসলাম বিদ্বেষী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ধর্মহীন, ইসলাম বিদ্বেষী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামপন্থী বা মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের রাজাকার বলে অভিহিত করে আসছে। শাহবাগ থেকে দেশকে রাজাকারমুক্ত করার ঘোষণা এসেছে। দেশকে রাজাকারমুক্ত করার নেপথ্যে আছে ইসলামপন্থী বা মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদেরকে দেশ থেকে নির্বাসনে পাঠানো। মূল টার্গেট হচ্ছে ইসলামকে বিতাড়িত করা। শাহবাগের অর্জন হচ্ছে

www.pathagar.com

দেশকে রাজাকারমুক্ত করার নামে স্কুল কলেজ থেকে জোর করে সমাবেশে নিয়ে কোমল শিশু-কিশোরদেরকে ইসলাম বিদ্বেষী করার সুযোগ পেয়েছে।"[৭৫৭]

দ্য ইকনোমিস্ট বলেছে, Unrest in Bangladesh devided a nation.[৭৫৮] ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর এম মার্তি মুলিয়ানা বাংলাদেশের মানবতাবিরোধী বিচার প্রসঙ্গে বলেন, " এখানে যে বিচার চলছে তা দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়। এ নিয়ে তার সরকারের কোন বক্তব্য নেই। তবে বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র হিসেবে তারা মনে করেন, এ ধরণের বিচারের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের বিষয়টি সবার উপরে রাখা উচিৎ।"[৭৫৯]

এ কথাটি পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শাহরিয়ার কবির তার বই 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পক্ষ ও বিপক্ষ'র ভূমিকায় বলেন, "এ আইন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করবে, কারণ এর আগে কোন দেশ গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের জন্য এ ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি।" শাহবাগে নাস্তিক ব্লগারদের দাবীর ফলে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক আইন'টিতে আবারো 'মৌলিক'(!) সংশোধন আনা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার নষ্ট করা হয়। এটি দেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সংবিধির পরিপন্থী কাজ হয়েছে। শাহবাগে 'বিচার চাই না ফাঁসি চাই' শ্লোগানের পর সুলতানা কামাল বলেন, "চাপ প্রয়োগে রায় সমাজের জন্য ভাল নয়।"[৭৬০]

(৮)

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রীম কোর্টের রায় নিয়ে দেশ বিদেশে প্রশ্ন দেখা দেয়। আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করায় বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বসহ সকল দেশ ও সংস্থার বিরাগভাজন হয়। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন," আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসি নিয়ে আমাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।[৭৬১]

---

৭৫৭ শাহবাগে অর্জন, শাহবাগ বর্জন, মামুন ইমতিয়াজ. নয়াদিগন্ত, ১৩.০৩.২১০৩

৭৫৮ The Economist, London, 09.03.2013

৭৫৯ দৈনিক মানবজমিন, ১৫.০৩.২০১৩

৭৬০ আমার দেশ, ১৫.০২.২০১৩

৭৬১

www.pathagar.com

আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসি [৭৬২]

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লাকে উর্দূ ভাষী (বিহারি) কাদের কসাই সাজিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ফাঁসির রায় প্রদান করে। এবং সরকার তা কার্যকর করে। তাঁর লাশ কড়া পাহারায় একটি নিস্তব্ধ পৃথিবীকে ভেদ করে রাতেই তাঁর গ্রামের বাড়িতে সমাহিত করা হয়। দিনের আলোতে যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর নামাযে জানাযায় শরিক হতে না পারে সে জন্যেই ছিল এ ব্যবস্থা। কিন্তু সারা দুনিয়ায় প্রায় তিন হাজার গায়েবানা জানাজায় আবদুল কাদের মোল্লার জন্যে দোয়া হয়। এর বাইরে কোটি কোটি মানুষ নীরবে নিভৃতে কেঁদেছেন।

মামুন ইমতিয়াজ বলেন, "পারস্যের সুফী সাধক আবদুল কাদের জিলানী যাকে বড় পীর হিসেবে এ দেশের মানুষ শ্রদ্ধা করে, ভারতবর্ষে ফার্সি ভাষী ইতিহাসবিদ আবদুল কাদের বাদাউনী, মরক্কোর বিখ্যাত লেখক আবদুল কাদের আল ফাসি, ভারতবর্ষে ফার্সি ভাষী কবি ও সুফী সাধক আবদুল কাদের বেদিল, মরক্কোর আধ্যাত্মিক লেখক আবদুল কাদের ইবনে শাকরুন, আলজেরিয়ার সুফী সাধক ও মুজাহিদ আবদুল কাদের আল দেযাইরি, ভারতবর্ষে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুল কাদের সিদ্দিকী ক্বাদরী, ব্রিটিশ ভারতে বিখ্যাত মুসলিম নেতা স্যার আবদুল কাদের, পাকিস্তানের পারমানবিক বোমার জনক আবদুল কাদের খান, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আবদুল কাদের আওদাহ, গুয়ান্তানামো কারাগারে পাঁচ জন আবদুল কাদের (সিরিয়ান, আলজেরিয়ান ও চীনের উইঘরের একজন করে এবং দুই জন ইয়ামেনী) বিশ্বের কাছে পরিচিত। এ মানের কোন আবদুল কাদেরকে আমরা এত দিন পাইনি। আবদুল কাদের মোল্লা জীবিত থাকাকালে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। শাহাদাৎ বরণ করার পরই আমরা বিশ্বমানের একজন আবদুল কাদেরকে পেলাম, যাকে নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে।"[৭৬৩]

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা ১৯৭১ সনে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন প্রমান করে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি পত্রিকায় কলাম লিখেছেন।[৭৬৪] মুক্তিযোদ্ধা ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর, ডঃ জাফরুল্লাহ খান, আ শ ম আব্দুর রবসহ অনেকেই টেলিভিশনের টক-শোতে সাফাই গেয়েছেন। বিপরীতে, জাহানারা ইমাম,

---

[৭৬২] আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসির পূর্বে তিনি তার স্ত্রীকে যে পত্র লিখেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রণি তাকে নিয়ে যে প্রবন্ধগুলো লেখেন সেগুলো পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

[৭৬৩] আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসির পর facebook থেকে প্রাপ্ত।

[৭৬৪] পরিশিষ্টে

www.pathagar.com

কবীর চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুনসহ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অনেক মহারথী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ছিলেন জাতি তা জানতে পেরেছে।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায়

আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর। ১৯৭১ সনে তিনি কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন না। রাষ্ট্র বনাম মাওলান দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী মামলার রাষ্ট্র সাক্ষী আবেদ খান বলেন, ১৯৭১ সনে তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না। এর অর্থ হচ্ছে তিনি এখন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, আর তাই তাঁর বিরুদ্ধে এ মামলা। আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী বলেন, "আমি যুদ্ধাপরাধী কিংবা রাজাকার নই। আমার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ বানোয়াট। আমার বিরুদ্ধে যে ২০টি অভিযোগ আনা হয়েছে তার একটিও যদি সত্য হয় তাহলে আমি যেন ঈমান নিয়ে মরতে না পারি । রোজ কিয়াকমতের দিন যেন রসুল (সা.) এর শাফায়াত আমি না পাই।"[৭৬৫]

আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারক প্রথমেই বলেন," আমরা আজকের আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায় দিচ্ছি না, ৪০ বছর আগের দেলু শিকদারের মামলার রায় দিচ্ছি।"দেলু শিকদারের আর আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী যে এক ব্যক্তি নন, তা আদালত ভাল করেই জানেন। তারপরও দেলু শিকদারের দায় দায়িত্ব আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর উপর চাপিয়ে [একই পদ্ধতিতে উর্দূ ভাষী (বিহারি) কাদেরের দায় দায়িত্ব আবদুল কাদের মোল্লার উপর চাপিয়ে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়] ফাঁসির রায় প্রদান করে। ০৫.০৪.২০১৩ তারিখে এক টিভি টক শো'তে মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী অন্য মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান ওমরের বরাত দিয়ে বলেন যে, দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী রাজাকার ছিলেন না। আর আবদুল কাদের মোল্লা ৭২ সন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শুনা করেছেন। তার বিষয়টিও যথাযথ পরীক্ষা করা হয়নি।

এ মামলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী সুখ রঞ্জণ বালী। তিনি যখন আল্লামা সাঈদীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজী হননি তখন তাঁকে বৈরী সাক্ষী (Hostile witness) ঘোষণা করা হয়। আর তখন আল্লামা সাঈদীর বিপক্ষে তাকে সাফাই সাক্ষী (Defence Witness) হিসেবে ঘোষণা করেন। সাফাই সাক্ষ্য দিতে এলে তাকে ট্রাইব্যুনাল গেট থেকে সরকার পক্ষের লোকজন অপহরণ করে। ট্রাইব্যুনাল থেকে কোন protection পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে কিছু দিন পর তাকে ভারতের কারাগারে পাওয়া যায়।

---

[৭৬৫] ট্রাইবুনালে যুক্তিতর্ক শেষে বক্তব্য (০৬.১২.২০১২)

www.pathagar.com

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মামলার রায়

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য। তাঁর পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার, অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ সৃষ্টি পর তাঁকে দালাল আইনে হাজতে প্রেরণ করলে সেখানেই তিনি মারা যান।[৭৬৬]

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী দাবী করেন ১৯৭১ সনের পুরো সময়ই তিনি পাকিস্তানে (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান) ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি হাই কোর্টের একজন বিচারপতিকে সাফাই সাক্ষী দিয়েছিলেন। ট্রাইব্যুনাল তাঁর এ সাফাই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি। অনেকে মনে করেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী Organization of Islamic Conference (OIC)র মহাসচিব পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কালে শেখ হাসিনা তাঁকে সোনা চোরাকারবারী বলে আখ্যা দেন। তিনি শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি আমার সোনা নিয়ে টানাটানি করেন কেন? আর এ অপরাধেই তাঁকে যুদ্ধাপরাধ মামলায় জড়িয়েছেন।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মামলার রায় ঘোষণার আগের দিন internet এ তা প্রকাশ পায়।

লন্ডন প্রবাসী চৌধুরী মঈনুদ্দিন ও আশরাফ হোসেনের মামলার রায়

অন্যান্য মামলা থেকে এ মামলাটি আলাদা। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পরই চৌধুরী মঈনুদ্দিন ও আশরাফ হোসেন পলাতক। আশ্রয় নেন লন্ডনে, নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন যুক্তরাজ্যে।

অন্যান্য মামলার আসামীরা বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু এ দুজন বিদেশী নাগরিক। মূল অপরাধী ১৯৫ জন পাকিস্তানের নাগরিকের বিচারের কোন চিন্তা করা হয়নি। বিদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে যদি বিচারের ব্যবস্থা নিতেই হয়, তা হলে ১৯৫ জন পাকিস্তানের নাগরিকের বিচারের ব্যবস্থা নেওয়া ছিল ন্যায়ানুগ। তাদের বিষয়ে নীরব থেকে ইসলামপন্থী দুজন বিদেশী নাগরিকের বিচার স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নের জন্ম দেয়।

(৯)

মামুন ইমতিয়াজ বলেন,"শাহবাগ ক্রেজ দেশের বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দার প্রান্তে এনেছে, হাতে শিকল পড়িয়েছে বিচারকদেরকে। হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ

---

৭৬৬ কারো কারো মতে ফজলুল কাদের চৌধুরী হাজতে থাকা অবস্থায় বলেছিলেন, "মুজিব পুরো বাংলা সোনা বানিয়ে দিলেও আমার সাড়ে তিন হাত জায়গা মাটি রেখো।" এই কথা শুনে শেখ মুজিব তাঁকে slow poissoning করে হত্যা করে।

www.pathagar.com

আমলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কোন মামলার বিচার নিষ্পত্তি করার জন্যে ৯০ দিন সময় বেধে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আপীল আদালতের উপর কোন সময় সীমা সামরিক সরকারও বেধে দিতে পারেনি। হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও তাকে ফেরৎ এনেছে সুপ্রীম কোর্ট। এবার শাহবাগের তরুণ তুর্কিদের কাছে সংসদ এতটাই নতি স্বীকার করে যে, দেশের সুপ্রীম কোর্টকেও হাত পা বেধে বিচার করার নির্দেশ দিয়েছে।"[৭৬৭]

বাংলাদেশে জাতিসংঘের সহায়তা ও নির্দেশনা ব্যতীত সরকার যুদ্ধাপরাধের বিচার পরিচালনা করছে। এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিচার হিসেবে দেশ বিদেশে সমালোচিত হয়েছে। নেতৃত্ব শূন্য করার লক্ষ্যে জামায়াত ও বিএনপির বর্তমান শীর্ষ নেতাদের বিচারের আয়োজন করা হয়েছে যাদের অধিকাংশই ১৯৭১ সনে ছাত্র ছিলেন। ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে বিচার দেশকে ইসলামী বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ইতোমধ্যে তুরস্ক, সৌদি আরব, তিউনিসিয়া, মিশরসহ মুসলিম দেশগুলো এ বিচারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং একে 'দানবীয় অবিচার' হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।[৭৬৮]

আগেই বলা হয়েছে আওয়ামী লীগ, চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি, উপজাতি, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বা অন্য দলের নেতা-কর্মী যারা বর্তমানে আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় পার্টি, বিকল্প ধারাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত সে সব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ সরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য এ বিচার পরিচালনা করছে।

শাহবাগের লক্ষ মানুষ দেখে তারা ভেবেছিলেন দেশের ষোল কোটি মানুষ তাদের সাথে একাকার। তারা আরো ভেবেছিলেন দেশের ষোল কোটি মানুষ 'ধর্ম বিযুক্ত বাদী ' (Secular এর বাংলা করেছেন বদরুদ্দিন ওমর[৭৬৯]) হয়ে গিয়েছে। তাদের বক্তব্যে, লেখায়, আচার আচরণে, কৃষ্ণের মুদ্রায় নৃত্য আর বিকৃত রুচির গান-শ্লোগান শতকরা পচাত্তর জন মানুষকে আঘাত করেছে।

আধ্যাত্মিক ইসলামিক সংগঠন (Spiritual Islamic Organization) হেফাজাতুল ইসলামের ডাকে 'ধর্ম যুক্ত' মানুষদের সাড়ায় তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন দেশে আজ দুই ভাগে বিভক্ত। 'ধর্ম যুক্ত' (Pan Islamic) মানুষেরা সংখ্যাগুরু আর 'ধর্ম বিযুক্তবাদী' (Secular) মানুষেরা সংখ্যালঘু। মুনতাসির মামুন,

---

৭৬৭ শাহবাগে অর্জন, শাহবাগ বর্জন, মামুন ইমতিয়াজ, নয়াদিগন্ত, ১৩.০৩.২১০৩

768 প্রথম আলো, ২১.০৩.২০১৩

৭৬৯ দৈনিক যুগান্তর, ০৭.০৩.২০১৩

www.pathagar.com

আবদুল গাফফার চৌধুরীসহ 'ধর্ম বিযুক্ত' বুদ্ধিজীবীরা ইতোপূর্বেই তাদের লেখায় জাতি বিভক্তির কথা স্বীকার করেছেন।

(১০)

ইতোমধ্যে পেন্ডোরার বাক্স খোলা হয়েছে। জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ ও জাসদ নেতারা পরস্পরের বিপক্ষে গণহত্যার অভিযোগ আনেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ তার উপর "দশম জাতীয় সংসদের প্রথম বাজেট অধিবেশনটি ছিল খুবই প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য" শিরোনামে যা লিখেন তার সংক্ষেপ ---

স্বাধীনতা-উত্তর জাসদের গণবাহিনীর প্রসঙ্গ টেনে কাজী ফিরোজ রশীদ সাহেব বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের পরে যেন প্রতিবিপ্লব না হয়, সে জন্য বিএলএফ গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাহিনীর একজন সিরাজুল আলম খান বিএলএফ থেকে বের হয়ে জাসদ তৈরি করেন। আমরা যারা ছাত্রলীগ-যুবলীগ-আওয়ামী লীগ করতাম, তাদের এই জাসদ আর গণবাহিনী মাঠেঘাটে হত্যা করেছে।"

জাসদের মঈন উদ্দীন খান বাদল বলেন, সরকারের শরিক একটি দলকে [জাসদ] আনন্দচিত্তে জবাই করা হচ্ছে। দলটির ঠিকুজি উদ্ধার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "ইতিহাসের মাইন ফিল্ডে হাঁটলে যেকোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত জাসদ যা করেছে, ইতিহাস বলবে, তা সঠিক, নাকি ভুল ছিল। আমাদেরও ২০ হাজার লোক মারা গিয়েছিল।"

আওয়ামী লীগের দাবি, জাসদ তাদের ৩০-৩৫ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছিল। জাসদ নেতাদের দাবি, সরকারি দল আওয়ামী লীগ তাদের ২০ হাজার নেতা-কর্মী হত্যা করেছে। এতে একজন বালকও মনে করবে দুই দলই গণহত্যার জন্য দায়ী, দুই দলই মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে।

বিষয়টি সংসদের কার্যবিবরণীতে রেকর্ড হয়ে রইল। আওয়ামী লীগ ও জাসদ পরস্পরের যত লোক হত্যা করেছে তার যোগফল ৫৫ থেকে ৬০ হাজার। এটা তাদেরই হিসাব, অন্যদের নয়। একদিন তারা মানুষকে "আনন্দচিত্তে জবাই" করেছে, এখন ইতিহাসচর্চা করতে গিয়ে দুই দল দুই দলকে জবাই করছে।"[770]

(১১)

দেশের জন্যে এটাই শেষ সরকার নয়। বিপরীত ধারার সরকার ক্ষমতায় এলে অনেকগুলো গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার শুরু করতে পারে। এ সংসদে[৭৭১] সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও তার বর্তমান সহযোগী

---

৭৭০ দশম জাতীয় সংসদের প্রথম বাজেট অধিবেশনটি ছিল খুবই প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য, সৈয়দ আবুল মকসুদ; প্রথম আলো, ৮ জুলাই ২০১৪

৭৭১ ১০ ম সংসদ

www.pathagar.com

দল জাসদের দাবী অনুসারে ১৯৭২-৭৫ সময়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার মানুষ এ দুদলের হাতে নিহত হয়েছে। আর এ জন্যে এ দুদলই গণহত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারের সম্মুখীন হতে পারে।

২০০৯ সনের পরে এ সরকার যে সব গণহত্যা করেছে তা নিম্নে দেওয়া হল

(১) শাপলা চত্বর গণহত্যা

(২) সাতক্ষীরার গণহত্যা

(৩) আল্লামা সাঈদীর মামলার রায় ঘোষিত হবার পর সারা দেশে প্রতিবাদকারীদের উপর গুলিবর্ষণের মাধ্যমে গণহত্যা

(৪) নারায়ণগঞ্জের গণহত্যা

(৫) রামু গণহত্যা

(৬) সৈয়দপুর গণহত্যা

(৭) সারাদেশে গুম খুন অপহরণ

(৮) বিচারিক হত্যা

দেশের নাজুক অবস্থায় সরকারকে নিরপেক্ষ ও বাস্তবানুগ চিন্তা করতে হবে। তার সামনে অনেক পথই খোলা রয়েছে, আমরা শুধু তার বিবেচনার জন্যে কয়েকটি পথের সুপারিশ করছি--

(ক)

১. দেশের মানুষ আজ দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিধাবিভক্ত জনগোষ্ঠী নিয়ে কোন জাতি-রাষ্ট্র গঠন হতে পারে না। তাই বিভাজনের এই পথ পরিহার করে reconciliation নীতি গ্রহণ করা আজ জরুরী। শ্লোগান হয়া উচিৎ No division, Integretion Integretion.

২. এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল বন্ধ করে দেয়া আবশ্যক। ১৯৭৩ সনে সাধারণ ক্ষমার আওতায় বন্দিদেরকে যেভাবে মুক্তি দেয়া হয়েছিল অনুরূপভাবে যারা বন্দি অবস্থায় আছে তাদেরকে মুক্তি দেয়া আবশ্যক।

(খ)

১. একবার যাদের ১৯৭২ সনে কলাবরেটর আইনে বিচার করা হয়েছে বা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় যারা মুক্ত হয়েছেন তাদেরকে দ্বিতীয়বার বিচারের কাঠগড়ায় উঠানো হবে সংবিধান এবং সকল আন্তর্জাতিক আইন ও সংবিধির পরিপন্থী; বিষয়টির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

(গ) যুদ্ধাপরাধের যদি বিচার করতেই হয়-

১. ৯৫% মানুষ হত্যাসহ সকল অপরাধের সাথে জড়িত পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ১৯৫ জন সদস্যের বিচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

২. (অ) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল নামে দেশীয় আদালত বন্ধ করে দেয়া আবশ্যক। অন্যান্য দেশে এ জাতীয় অপরাধের বিচার শুরু করার পূর্বে জাতিসংঘের অনুমোদন নেয়া হয়। এ দেশে যে বিচার কার্যক্রম চলছে তার জন্যে এ ধরণের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি। প্রথমত সেই অনুমোদন নেয়া আবশ্যক।

(আ) দ্বিতীয়তঃ জাতিসংঘের অনুমোদন ক্রমে আন্তর্জাতিক বিচারক, প্রসিকিউটর ও তদন্তকারী দল নিয়োগ করা দরকার।

(ই) আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখা।

(ঈ) আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ যে সংশোধনী আনা হয়েছে ২০০৯ সনে তা যথেষ্ট নয়; এতে আরো পরিবর্তন আনতে হবে।

৩. এ দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালের নামে দেশীয় ট্রাইবুন্যালের বিচারিক সকল কার্যক্রম বন্ধ করে হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সকল দলিলাদি প্রেরণ করা যেতে পারে। যাদেরকে বন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছে তাদেরকে জামিনে অথবা বন্দি অবস্থায় সেখানে পাঠানো যেতে পারে। ঐ আদালত তাদের বিধি বিধান অনুসারে তদন্তকারি কর্মকর্তা, প্রসিকিউটর ও বিচারকগণ নিয়োগসহ পুনরায় সকল বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) ইসলামকে আঘাত না করা

১. এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালের নামে দেশীয় ট্রাইবুন্যালে যা করা হয়েছে, এ দেশের মানুষসহ বিশ্ববাসী বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব এটিকে ইসলামের উপর আঘাত হিসেবেই দেখেছে। আল্লামা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীসহ যাদেরকেই এ বিচারের আওতায় আনা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ইসলামপন্থী। আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসি হবার পর সকল দেশ ও মিডিয়া " ইসলামী নেতার ফাঁসি" হিসেবেই দেখেছে।

২. রাজনৈতিক বিবেচনায় ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোকে নেতাদের বিরুদ্ধে বিচার পরিচালনা না করে আওয়ামী লীগ, চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি, উপজাতি, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বা অন্য দলের নেতা-কর্মী যারা বর্তমানে সরকারি দলসমূহের সাথে সম্পৃক্ত সে সব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

(খ) এর ৩ নম্বর সুপারিশের আলোকে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

৩. যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধের সকল বিচারের জন্য ইধহমষধফবংয National Liberation Struggle (Indemnity) Order ১৯৭৩ বতিল করা একান্ত আবশ্যক।

৪. বাংলাদেশের নিরাপত্তা নষ্ট করার লক্ষ্যে ভারত সকল অস্ত্র সস্ত্র লুট করে নিয়ে গিয়ে যে অপরাধ করেছে তার বিচারের ব্যবস্থা করা।

(ঙ)

১. কেবলমাত্র সহযোগিতার অপরাধে যদি নিজ সন্তানকে বিদেশের মাটি থেকে আনার জন্য সরকার মরিয়া হয়ে উঠতে পারে তা হলে মূল অপরাধকারীদেরকে আনার ব্যাপারে এত অনীহা কেন, জাতির এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ১৯৫ জনের সদস্যকে এনে বিচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(চ)

১.১৯৭১ সনের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন পক্ষের কতজন মানুষ মারা গিয়েছে এর শুমারী করা।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। এর সার্বভৌমুত্ব টিকিয়ে রাখা সকল নাগরিকের কর্তব্য। দেশের সার্বভৌমুত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন নাগরিকদের ঐকতান। এ দেশের কোন মানুষ স্বপ্নেও ভাবে না যে এ দেশটি আবার পাকিস্তান হবে অথবা সে পাকিস্তানের নাগরিক। অনুরূপভাবে ভারতের নাগরিক হয়েও কেউ নিজেকে ভাবে না। সকল নাগরিকের একটি common point-এ একমত পোষণ করে যে তাঁরা স্বাধীন ও সার্বভৌমুত্ব দেশের নাগরিক।

এ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম। তাঁদের ঈমান আকিদার বিরোধী কোন আইন, বিধি, নীতি বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। এ প্রচেষ্টা গ্রহণ থেকে বিরত থেকে সকল নাগরিকের সাম্যতা (Equity) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বাংলাদেশ সকলের কাম্য।

www.pathagar.com

অধ্যায় : পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : ১

লন্ডন চুক্তি ১৯৪৫

London Agreement of August 8th 1945

AGREEMENT by the Government of the **UNITED STATES OF AMERICA**, the Provisional Government of the **FRENCH REPUBLIC**, the Government of the **UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND** and the Government of the **UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS** for the Prosecution and Punishment of the **MAJOR WAR CRIMINALS** of the **EUROPEAN AXIS**

WHEREAS the United Nations have from time to time made declarations of their intention that War Criminals shall be brought to justice;

AND WHEREAS the Moscow Declaration of the 30th October 1943 on German atrocities in Occupied Europe stated that those German Officers and men and members of the Nazi Party who have been responsible for or have taken a consenting part in atrocities and crimes will be sent back to the countries in which their abominable deeds were done in order that they may be judged and punished according to the laws of these liberated countries and of the free Governments that will be created therein;

AND WHEREAS this Declaration was stated to be without prejudice to the case of major criminals whose offenses have no particular geographical location and who will be punished by the joint decision of the Governments of the Allies;

NOW THEREFORE the Government of the United States of America, the Provisional Government of the French Republic, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics (hereinafter called "the Signatories") acting in the interests of all the United Nations and by their representatives duly authorized thereto have concluded this Agreement.

Article 1.

There shall be established after consultation with the Control Council for Germany an International Military Tribunal for the trial of

www.pathagar.com

war criminals whose offenses have no particular geographical location whether they be accused individually or in their capacity as members of the organizations or groups or in both capacities.

Article 2.

The constitution, jurisdiction and functions of the International Military Tribunal shall be those set in the Charter annexed to this Agreement, which Charter shall form an integral part of this Agreement.

Article 3.

Each of the Signatories shall take the necessary steps to make available for the investigation of the charges and trial the major war criminals detained by them who are to be tried by the International Military Tribunal. The Signatories shall also use their best endeavors to make available for investigation of the charges against and the trial before the International Military Tribunal such of the major war criminals as are not in the territories of any of the Signatories.

Article 4.

Nothing in this Agreement shall prejudice the provisions established by the Moscow Declaration concerning the return of war criminals to the countries where they committed their crimes.

Article 5.

Any Government of the United Nations may adhere to this Agreement by notice given through the diplomatic channel to the Government of the United Kingdom, who shall inform the other signatory and adhering Governments of each such adherence.

Article 6.

Nothing in this Agreement shall prejudice the jurisdiction or the powers of any national or occupation court established or to be established in any allied territory or in Germany for the trial of war criminals.

Article 7.

This Agreement shall come into force on the day of signature and shall remain in force for the period of one year and shall continue thereafter, subject to the right of any Signatory to give, through the diplomatic channel, one month's notice of intention to terminate it. Such termination shall not prejudice any proceedings already taken or any findings already made in pursuance of this Agreement.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ২

লন্ডন সনদ ১৯৪৫

Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis ("London Agreement")

I. Constitution of the International Military Tribunal

Article 1

In pursuance of the Agreement signed on 8 August 1945, by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the United States of America, the Provisional Government of the French Republic and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics, there shall be established an International Military Tribunal (hereinafter called "the Tribunal") for the just and prompt trial and punishment of the major war criminals of the European Axis.

Article 2

The Tribunal shall consist of four members, each with an alternate. One member and one alternate shall be appointed by each of the Signatories. The alternates shall, so far as they are able, be present at all sessions of the Tribunal. In case of illness of any member of the Tribunal or his incapacity for some other reason to fulfil his functions, his alternate shall take his place.

Article 3

Neither the Tribunal, its members nor their alternates can be challenged by the prosecution, or by the Defendants or their Counsel. Each Signatory may replace its member of the Tribunal or his alternate for reasons of health or for other good reasons, except that no replacement may take place during a trial, other than by an alternate.

Article 4

(a) The presence of all four members of the Tribunal or the alternate for any absent member shall be necessary to constitute the quorum.

(b) The members of the Tribunal shall, before any trial begins, agree among themselves upon the selection from their number of a President, and the President shall hold office during that trial, or as may otherwise be agreed by a vote of

www.pathagar.com

not less than three members. The principle of rotation of presidency for successive trials is agreed. If, however, a session of the Tribunal takes place on the territory of one of the four Signatories, the representative of that Signatory on the Tribunal shall preside.

(c) Save as aforesaid the Tribunal shall take decisions by a majority vote and in case the votes are evenly divided, the vote of the President shall be decisive; provided always that convictions and sentences shall only be imposed by affirmative votes of at least three members of theTribunal.

Article 5

In case of need and depending on the numbers of the matters to be Lied, other Tribunals may be set up; and the establishment, functions and procedure of each Tribunal shall be identical, and shall be governed by this Charter.

II. Jurisdiction and General Princilples

Article 6

The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for the trial and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, whether as individuals or as members of organizations, committed any of the following crimes.

The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal for which there

shall be individual responsibility:

(a) Crimes against peace: namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;

(b) War crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to Wave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;

www.pathagar.com

(c) Crimes against humanity: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.

Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any persons in execution of such plan.

Article 7

The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible officials in Government Departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment.

Article 8

The fact that the Defendant acted pursuant to order of his Government or of a superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires.

Article 9

At the trial of any individual member of any group or organization the Tribunal may declare (in connection with any act of which the individual may be convicted) that the group or organization of which the individual was a member was a criminal organization.

After receipt of the Indictment the Tribunal shall give such notice as it thinks fit that the prosecution intends to ask the Tribunal to make such declaration and any member of the organization will be entitled to apply to the Tribunal for leave to be heard by the Tribunal upon the question of the criminal character of the organization. The Tribunal shall have power to allow or reject the application. If the application is allowed, the Tribunal may direct in what manner the applicants shall be represented and heard.

Article 10

In cases where a group or organization is declared criminal by the Tribunal, the competent national authority of any Signatory shall have the right to bring individuals to trial for membership therein before national, military or occupation courts. In any such case the criminal

www.pathagar.com

nature of the group or organization is considered proved and shall not be questioned.

Article 11

Any person convicted by the Tribunal may be charged before a national, military or occupation court, referred to in Article 10 of this Charter, with a crime other than of membership in a criminal group or organization and such court may, after convicting him, impose upon him punishment independent of and additional to the punishment imposed by the Tribunal for participation in the criminal activities of such group or organization

Article 12

The Tribunal shall have the right to take proceedings against a person charged with crimes set out in Article 6 of this Charter in his absence, if he has not been found or if the Tribunal, for any reason, finds it necessary, in the interests of justice, to conduct the hearing in his absence

Article 13

The Tribunal shall draw up rules for its procedure. These rules shall not be inconsistent with the provisions of this Charter.

III. Committee for the Investigation and Prosecution of Major War Criminals

Article 14

Each Signatory shall appoint a Chief Prosecutor for the investigation of the charges against and the prosecution of major war criminals. The Chief Prosecutors shall act as a committee for the following purposes:

(a) to agree upon a plan of the individual work of each of the Chief Prosecutors and his staff,

(b to settle the final designation of major war criminals to be tried by the Tribunal,

(c) to approve the Indictment and the documents to be submitted therewith,

(d) to lodge the Indictment and the accompanying documents with the Tribunal,

(e) to draw up and recommend to the Tribunal for its approval draft rules of procedure, contemplated by Article 13 of this Charter. The Tribunal shall have power to accept, with or without amendments, or to reject, the rules so recommended.

www.pathagar.com

The Committee shall act in all the above matters by a majority vote and shall appoint a Chairman as may be convenient and in accordance with the principle of rotation: provided that if there is an equal division of vote concerning the designation of a Defendant to be tried by the Tribunal, or the crimes with which he shall be charged, that proposal will be adopted which was made by the party which proposed that the particular Defendant be tried, or the particular charges be preferred against him.

Article 15

The Chief Prosecutors shall individually, and acting in collaboration with one another, also undertake the following duties:

(a) investigation, collection and production before or at the Trial of all necessary evidence,

(b) the preparation of the Indictment for approval by the Committee in accordance with paragraph (c) of Article 14 hereof,

(c) the preliminary examination of all necessary witnesses and of the Defendants,

(d) to act as prosecutor at the Trial,

(e) to appoint representatives to carry out such duties as may be assigned to them,

(f) to undertake such other matters as may appear necessary to them for the purposes of the preparation for and conduct of the Trial.

It is understood that no witness or Defendant detained by any Signatory shall be taken out of the possession of that Signatory without its assent.

IV. Fair Trial for Defendants

Article 16

In order to ensure fair trial for the Defendants, the following procedure shall be followed:

(a) The Indictment shall include full particulars specifying in detail the charges against the Defendants. A copy of the Indictment and of all the documents lodged with the Indictment, translated into a language which he understands, shall be furnished to the Defendant at a reasonable time before the Trial.

www.pathagar.com

(b) During any preliminary examination or trial of a Defendant he shall have the right to give any explanation relevant to the charges made against him.

(c) A preliminary examination of a Defendant and his Trial shall be conducted in, or translated into, a language which the Defendant understands.

(d) A Defendant shall have the right to conduct his own defence before the Tribunal or to have the assistance of Counsel.

(e) A Defendant shall have the right through himself or through his Counsel to present evidence at the Trial in support of his defence, and to cross-examine any witness called by the Prosecution.

V. Powers of the Tribunal and Conduct of the Trial

Article 17

The Tribunal shall have the power:

(a) to summon witnesses to the Trial and to require their attendance and testimony and to put questions to them,

(b) to interrogate any Defendant,

(c) to require the production of documents and other evidentiary material,

(d) to administer oaths to witnesses,

(e) to appoint officers for the carrying out of any task designated by the Tribunal including the power to have evidence taken on commission.

Article 18

The Tribunal shall:

(a) confine the Trial strictly to an expeditious hearing of the issues raised by the charges,

(b) take strict measures to prevent any action which will cause unreasonable delay, and rule out irrelevant issues and statements of any kind whatsoever,

(c) deal summarily with any contumacy, imposing appropriate punishment, including exclusion of any Defendant or his Counsel from some or all further proceedings, but without prejudice to the determination of the charges.

Article 19

The Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence. It shall adopt and apply to the greatest possible extent expeditious and

www.pathagar.com

non-technical procedure, and shall admit any evidence which it deems to have probative value.

Article 20

The Tribunal may require to be informed of the nature of any evidence before it is offered so that it may rule upon the relevance thereof.

Article 21

The Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof. It shall also take judicial notice of official governmental documents and reports of the United Nations, including the acts and documents of the committees set up in the various Allied countries for the investigation of war crimes, and the records and findings of military or other Tribunals of any of the United Nations.

Article 22

The permanent seat of the Tribunal shall be in Berlin. The first meetings of the members of the Tribunal and of the Chief Prosecutors shall be held at Berlin in a place to be designated by the Control Council for Germany. The first trial shall be held at Nuremberg, and any subsequent trials shall be held at such places as the Tribunal may decide.

Article 23

One or more of the Chief Prosecutors may take part in the prosecution at each Trial. The function of any Chief Prosecutor may be discharged by him personally, or by any person or persons authorized by him.

The function of Council for a Defendant may be discharged at the Defendant's request by any Counsel professionally qualified to conduct cases before the Courts of his own country, or by any other person who may be specially authorized thereto by the Tribunal.

Article 24

The proceedings at the Trial shall take the following course:

(a) The Indictment shall be read in court.

(b) The Tribunal shall ask each Defendant whether he pleads "guilty" or " not guilty."

(c) The Prosecution shall make an opening statement.

(d) The Tribunal shall ask the Prosecution and the Defence what evidence (if any) they wish to submit to the Tribunal, and the

www.pathagar.com

Tribunal shall rule upon the admissibility of any such evidence.

(e) The witnesses for the Prosecution shall be examined and after that the witnesses for the Defence. Thereafter such rebutting evidence as may be held by the Tribunal to be admissible shall be called by either the Prosecution or the Defence.

(f) The Tribunal may put any question to any witness and to any Defendant, at any time.

(g) The Prosecution and the Defence shall interrogate and may cross-examine any witnesses and any Defendant who gives testimony.

(h) Defence shall address the court.

(i) The Prosecution shall address the court.

(j) Each Defendant may make a statement to the Tribunal.

(k) The Tribunal shall deliver judgment and pronounce sentence.

Article 25

All official documents shall be produced, and all court proceedings conducted, in English, French and Russian, and in the language of the Defendant. So much of the record and of the proceedings may also be translated into the language of any country in which the Tribunal is sitting, as the Tribunal considers desirable in the interests of justice and public opinion.

VI. Judgment and Sentence

Article 26

The judgment of the Tribunal as to the guilt or the innocence of any Defendant shall give the reasons on which it is based, and shall be final and not subject to review.

Article 27

The Tribunal shall have the right to impose upon a Defendant, on conviction, death or such other punishment as shall be determined by it to be just.

Article 28

In addition to any punishment imposed by it, the Tribunal shall have the right to deprive the convicted person of any stolen property and order its delivery to the Control Council for Germany.

Article 29

In case of guilt, sentences shall be carried out in accordance with the orders of the Control Council for Germany, which may at any time reduce or otherwise alter the sentences, but may not increase the

www.pathagar.com

severity thereof. If the Control Council for Germany, after any Defendant has been convicted and sentenced, discovers fresh evidence which, in its opinion, would found a fresh charge against him, the Council shall report accordingly to the Committee established under Article 14 hereof for such action as they may consider proper, having regard to the interests of justice.

VII. Expenses

Article 30

The expenses of the Tribunal and of the Trials shall be charged by the Signatories against the funds allotted for maintenance of the Control Council for Germany.

পরিশিষ্ট : ৩

নুরেমবার্গ নীতিমালা ১৯৪৫

Principle I

Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefore and liable to punishment.

Principle II

The fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law.

Principle III

The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible Government official does not relieve him from responsibility under international law.

Principle IV

The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him.

Principle V

Any person charged with a crime under international law has the right to a fair trial on the facts and law.

www.pathagar.com

Principle VI

The crimes hereinafter set out are punishable as crimes under; international law:

a. Crimes against peace:
   i. Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, agreements or assurances;
   ii. Participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the acts mentioned under (i).

b. War crimes:

Violations of the laws or customs of war which include, but are not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave-labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or illtreatment of prisoners of war, of persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity.

c. Crimes against humanity:

Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connection with any crime against peace or any war crime.

Principle VII

Complicity in the commission of a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as set forth in Principles VI is a crime under international law.

পরিশিষ্ট : ৪

Genocide Convention 1948

১৯৪৮ সনের ৯ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের Resolution 260 (III) A অনুযায়ী Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Genocide Convention 1948 হিসেবে পরিচিত) প্রণীত কনভেনশনের অনুচ্ছেদগুলো

www.pathagar.com

Article 1

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.

Article 3

The following acts shall be punishable:

(a) Genocide; (b) Conspiracy to commit genocide;

(c) Direct and public incitement to commit genocide;

(d) Attempt to commit genocide; (e) Complicity in genocide.

Article 4

Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.

Article 5

The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3.

Article 6

Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.

Article 7

Genocide and the other acts enumerated in Article 3 shall not be considered as political crimes for the purpose of extradition.

The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant extradition in accordance with their laws and treaties in force.

পরিশিষ্ট : ৫

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 বিধানাবলী

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) শীর্ষক সংবিধিটি ১৯৬৬ সনে প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ আইসিসিপিআর-এ স্বাক্ষর করেছে ফলে এই সংবিধির আলোকে যে কোন আইন প্রণয়ন ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

করা বাংলাদেশের জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সংবিধির অনুচ্ছেদ ১৪ যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট --

Article 14

1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.

2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.

3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

(a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;
(b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;
(c) To be tried without undue delay;
(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;

www.pathagar.com

(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court;
(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.

5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

পরিশিষ্ট : ৬

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং; যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

www.pathagar.com

এবং; যেহেতু সংবিধান প্রনয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগনকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং; যেহেতু এই আহূত পরিষদ- সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং; যেহেতু পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং; যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং; যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক,ও নিরপরাধ নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করেছে এবং এখনও অনবরত করছে,

এবং; যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপ মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়নের এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করে তুলেছে,

এবং; যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা, ও বিপ্লবী উদ্দিপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখন্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে,

যেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদেরকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মান রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিসদ গঠন করিলাম,

এবং; পারস্পরিক আলোচনা করিলাম,

এবং; বাংলদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ও সামজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ,

সার্বভৌম গণপজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করলাম,

এবং; এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেছি যে, সংবিধান প্রণীত হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন,

এবং; রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্র এর সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন। ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী

www.pathagar.com

নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। করারোপের ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকরী হইবেন। গণপরিষদের আহ্বান ও মুলতবীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

এবং; বাংলদেশের জণগনকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদান করবেন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য সম্পাদন করবেন।

আমরা বাংলাদেশের জণগন এর নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হলে, রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত সকল ক্ষমতা উপ-রাষ্ট্রপতির উপর ন্যাস্ত হবে এবং তিনি রাষ্ট্রপতির সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবে।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, জাতিমন্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদেগর উপর যে দায় দায়িত্ব বর্তাবে তা পালন ও বাস্তবায়নের এবং জাতিসংঘের সনদ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেছি যে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬মে মার্চ তারিখে কার্যকর হয়েছে বলে গন্য করা হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলী কে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।[৭৭২]

পরিশিষ্ট : ৭

PROVISIONAL CONSTITUTION OF BANGLADESH ORDER, 1972

WHEREAS by the Proclamation of Independence order, dated the 10th April, 1971 provisional arrangements were made for the governance of the People's Republic of Bangladesh;

And WHEREAS by the said Proclamation the President is invested with all executive and legislative authority and the power to appoint a Prime Minister;

---

৭৭২ হাতে লেখা মূল কপির সঙ্গে কিছু অমিল রয়েছে। সূত্র : মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর দলিল ও ইতিহাস, রাজিব আহমেদ, বইপত্র, ২০১৩

www.pathagar.com

And WHEREAS the unjust and treacherous war as referred to in the said Proclamation has now ended;

And WHEREAS it is the manifest aspiration of the people of Bangladesh that a parliamentary democracy shall function in Bangladesh;

And WHEREAS in pursuance of the said objective it is necessary immediately to make certain provisions in that behalf.

NOW THEREFORE in pursuance of the proclamation of Independent Order, dated the 10th April, 1971 and all other powers enabling him in that behalf the President is pleased to make and promulgate the following Order;

1. This order may be called the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972.
2. It extends to the whole of Bangladesh,
3. It shall come into force at once.
4. Definition:

"Constituent assembly" referred to all this Orders means the body comprising of the elected representative of the People of Bangladesh return to the N.A. and P.A. seats in the elections held in December, 1970, January, 1971 and March, 1971 not otherwise disqualified by or under any law.

5. There shall be a Cabinet of Ministers, with the Prime Minister at the head.
6. The President shall in exercise of all his functions act in accordance with the advice of the Prime Minister.
7. The President shall commission as Prime Minister a member of the Constituent Assembly, who commands the confidence of the majority of the member of the Constituent Assembly. All other Ministers, Ministers of state and Deputy Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
8. In the event of a vacancy occurring in the Office of the president at any time prior to the framing of the Constitution by the Constituents Assembly, the Cabinet shall appoint as President a citizen of Bangladesh who hold the office of President until another President enters upon the office in accordance with the constitution as framed by the Constituent Assembly.

www.pathagar.com

9. There shall be a high Court of Bangladesh, consisting of Chief Justice and so many other judges as may be appointed from time to time.
10. The Chief Justice of the High Court of Bangladesh shall administer an oath of office to the President and the President and the President shall administer an oath of office to the Prime Minister, other Ministers, and Ministers of State and Deputy Ministers. The form of the oath shall be as prescribed by the Cabinet.

Dated this eleventh day of January, One thousand nine hundred and seventy-two, being the twenty-sixth day of Poush, One thousand three hundred and seventy -eight.

DACCA
SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
The 11th January, 1972
President of the People's Republic of Bangladesh

পরিশিষ্ট : ৮

মুজিবনগরে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১৮ দফা নির্দেশনামা জারি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সরকারের আদেশ মেনে চলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। নির্দেশগুলো নিম্নরূপঃ

১. কোন বাঙালি কর্মচারী শত্রুপক্ষের সাথে সহযোগিতা করবেন না। প্রতিটি কর্মচারী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন। শত্রু-কবলিত এলাকায় অবস্থা বিশেষে বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবেন।
২. সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিফৌজকে সাহায্য করবেন।
৩. সকল কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য অবিলম্বে নিকটতম মুক্তিসেনা শিবিরে যোগ দেবেন। শত্রুর সাথে সহযোগিতা করবেন না।
৪. বাংলাদেশ সরকার ছাড়া অন্য কারো বাংলাদেশ থেকে কর, খাজনা ও শুল্ক আদায়ের অধিকার নেই।
৫. যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে নৌ চলাচল সংস্থার কর্মচারীরা কোনো অবস্থায় শত্রুর সাথে সাহায্য করবেন না।
৬. নিজ নিজ এলাকায় খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার ওপর লক্ষ্য রাখবেন।

www.pathagar.com

৭. চুরি, ডাকাতি, কালোবাজারী, মজুতদারির ওপর কাঠোর নজর রাখবেন।

৮. ধর্মের দোহাই দিয়ে ও অখণ্ডতার বুলি আউড়ে এক শ্রেণীর দেশদ্রোহী মানুষকে বিভ্রান্ত করছে– এদের চিহ্নিত করে রাখুন। এদের সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করুন। তাদের মুক্তিফৌজদের হাতে অর্পণ করুন।

৯. গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলুন এবং রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের মুক্তিবাহিনীর নিকটতম ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

১০. শত্রুপক্ষের গতিবিধির খবর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে জানাবেন।

১১. মুক্তিবাহিনীর চলাচলের জন্য চাহিবামাত্র সরকারি যানবাহন হস্তান্তর করবে হবে।

১২. বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিবাহিনী ছাড়া জ্বালানী বিক্রি করা চলবে না।

১৩. কেউ পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অথবা তাদের এজেন্টদের সাহায্য করবেন না। যে করবে তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

১৪. গুজবে কান দেবেন না। চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ হবেন না।

১৫. সকল সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে নিজ নিজ আগ্নেয়াস্ত্রসহ নিকটতম মুক্তিবাহিনী শিবিরে রিপোর্ট করতে হবে।

১৬. শত্রুবাহিনীর ধরা পড়া কিংবা আত্মসমর্পণকারী সৈন্যকে মুক্তিবাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হবে।

১৭. পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সকল প্রকার যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা যাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৮. তথাকথিত পাকিস্তান বেতারের মিথ্যা প্রচারণা আদৌ বিশ্বাস করবেন না।

পরিশিষ্ট : ৯

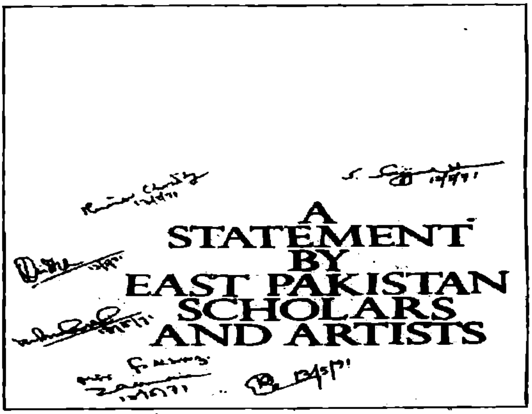

www.pathagar.com

মূল বিবৃতি

১৭ মে ১৯৭১ তারিখে দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত ঐ বিবৃতিতে তারা বলেছিলেন–

'নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সি বলে পরিচিত একটি সংস্থা তাদের ভাষায় 'ঢাকায় বিপজ্জনক ব্যাপক হত্যাকান্ডে' উদ্বেগ প্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছেন আমরা তা পাঠ করে হতবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের অধ্যাপক, কলেজ শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীবৃন্দ আমাদের নিরাপত্তা, কল্যাণ ও ভবিষ্যতের জন্য আইসিইউ'র উদ্বেগ প্রকাশকে গভীরভাবে অনুধাবন করছি। যাই হোক, ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই না করে, যা কিনা পন্ডিত ব্যক্তিদের প্রথম গুণ বলে বিবেচিত, এরূপ সন্মানিত, বিদ্বান ও সুধী ব্যক্তিরা এমন একটা বিবৃতি প্রকাশ করায় আমরা মর্মাহত হয়েছি। সত্যানুসন্ধানই যাদের জীবনের লক্ষ্য তেমন একটি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাই অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমাদের মহান সঙ্গীরা পন্ডিত ও জ্ঞানান্বেষীর এ মৌল নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি অভিযোগকে সম্বল করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং অভিমত প্রকাশ করেছেন। .... আমাদের অনেকেই গুলীবিদ্ধ ও নিহতের তালিকায় তাদের নাম দেখতে পেয়ে হতবাক হয়েছেন। ..... নেহাত নাচার হয়েই আমাদের জানাতে হচ্ছে আমরা মৃত নই। .... আমাদের পেশাগত কাজের স্বাভাবিক রীতি অনুসারেই আমরা ঢাকা টেলিভিশনের পর্দায় আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ নিয়েছি।...... আমাদের মৃত্যুর খবর যে অতিরঞ্জিত এটা জানিয়ে দিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয়-স্বজন এবং ছাত্রদের আশ্বস্ত করেছি।

ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে গোলযোগ চলাকালে আমাদের অধিকাংশই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজ নিজ গ্রামে চলে গিয়েছিলাম, এ কারণেই হয়তো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সময় নির্দিষ্ট করে বলার কারণ আছে। কেননা এ সময়টাতেই দেশের প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকারকে অমান্য করার কাজ পুরাদমে চলছিলো। নির্বাচনে জনগণের কাছ থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ম্যান্ডেট পেয়ে চরমপন্থীরা স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে সম্প্রসারিত ও রূপায়িত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলো, যারাই জনতার অর্পিত আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের উপর দুর্দিন নেমে এসেছিল।

এ সময়েই ব্যাপকভাবে শিক্ষার অঙ্গনকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির কাজে অপব্যহার করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত সরূপ বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ

www.pathagar.com

হলে ছাত্ররা লেখাপড়া বা খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিলো না। তা ছিলো বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তা ছিলো মেশিনগান, মর্টার ইত্যাকার সমরাস্ত্রের গোপন ঘাঁটি। ফ্যাসিবাদি সন্ত্রাসবাদ ও রাজনৈতিক দলের অসহিষ্ণুতার এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ এড়ানোর জন্য আমাদের অধিকাংশই আমাদের গ্রামগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাকিস্তানকে খন্ড-বিখন্ড করার সশস্ত্র প্রয়াস নস্যাৎ এবং প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগে কেউ শহরে ফিরে আসতে পারেনি।

অবশ্য আমাদের কিছু সহকর্মী বাড়ীতে না ফিরে সীমান্ত পার হয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ভারতীয় দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার 25 এপ্রিলের খবরে দেখা যাচ্ছে যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পনেরজনকে স্টাফ হিসেবে নেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আরো শিক্ষকদের তাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্ন ভারত সরকারের কাছে বিপুল অংকের বরাদ্দ দাবী করেছে।

পাকিস্তানী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রাপ্য সেটা না পেয়ে আমরা অসুখী। আমাদের এ অসন্তোষ আমরা প্রকাশ করেছি একই রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যাপক স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে ভোট দিয়ে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ চরমপন্থীরা এ সহজ সরল আইন সঙ্গত দাবীকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে রূপান্তরিত করায় আমরা মর্মাহত হয়েছি। আমরা কখনও এটা চাইন, ফলে যা ঘটেছে তাতে আমরা হতাশ ও দুঃখিত হয়েছি।

বাঙালী হিন্দু বিশেষ করে কোলকাতায় মারোয়াড়ীদের আধিপত্য ও শোষণ এড়ানোর জন্যেই আমরা বাংলার মুসলমানেরা প্রথমে 1905 সালে বৃটিশ রাজত্বকালে আমাদের পৃথক পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেই এবং আবার 1947 সালে ভোটের মাধ্যমেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম ভাইদের সাথে যুক্ত হওয়ার সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। উক্ত সিদ্ধান্তে অনুতপ্ত হওয়ার আমাদের কোনো কারণ নেই।

পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু প্রদেশ হিসেবে সারা পাকিস্তানকে শাসন করার অধিকার আমাদের আছে। আর সেটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যেই এসে গিয়েছিলো। ঠিক তখনই চরমন্থীদের দুরাশায় পেয়ে বসলো এবং তারা জাতীয় অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুললো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন দিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আলোচনাকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে সংখ্যাগুরু দল হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু উল্টোটাই ঘটে গলো এং নেমে এলো জাতীয় দুর্যোগ।

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আমরা পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত এবং বর্তমান সরকার অবস্থা অনুকূলে হওয়ার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার ইচ্ছা আবার ঘোষণা করেছেন। এমতাবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের আমাদের বন্ধু একাডেমিশিয়ানরা আমাদের কল্যাণের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করায় আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো বড় ধরনের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা ও নিন্দা করছি।'

এতে সই করেছিলেন যারা :

১. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২. প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, সাবেক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, পাকিস্তান সরকার, লেখক, নাট্যকার
৩. এম কবীর, ইতিহাস বিভাগের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. ড. মীর ফখরুজ্জামান, মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, রিডার বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬. নুরুল মোমেন, নাট্যকার, সিনিয়র লেকচারার, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. জুলফিকার আলী, ওএসডি, বাংলা একাডেমী
৮. আহসান হাবিব, কবি
৯. খান আতাউর রহমান, চিত্র পরিচালক- অভিনেতা ও সঙ্গীত পরিচালক
১০. শাহনাজ বেগম (রহমতউল্লাহ) গায়িকা
১১. আশকার ইবনে শাইখ, নাট্যকার, সিনিয়র লেকচারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১২. ফরিদা ইয়াসমিন, গায়িকা
১৩. আব্দুল আলীম, পল্লী গায়ক
১৪. আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, লেখক, ঢাকা টেলিভিশন
১৫. এ এইচ চৌধুরী, পরিচালক-প্রযোজক, লেখক, ঢাকা টেলিভিশন
১৬. ড. মোহর আলী, রিডার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭. মুনীর চৌধুরী, বাংলা বিভাগের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৮. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
১৯. খন্দকার ফারুখ আহমেদ, গায়ক
২০. সৈয়দ আবদুল হাদী, গায়ক
২১. নীনা হামিদ, গায়িকা
২২. এম এ হামিদ, গায়ক
২৩. লায়লা আর্জুমান্দ বানু, গায়িকা

www.pathagar.com

২৪. শামসুল হুদা চৌধুরী, চীফ ইনফরমেশন অফিসার, ইপিআইডিসি (পরে জাতীয় সংসদের স্পিকার)
২৫. বেদারউদ্দিন আহমেদ, শিল্পী
২৬. সাবিনা ইয়াসমিন, গায়িকা
২৭. ফেরদৌসী রহমান, গায়িকা
২৮. মোস্তফা জামান আব্বাসী, গায়ক
২৯. সরদার জয়েনউদ্দীন, ছোট গল্পকার
৩০. সৈয়দ মুর্তজা আলী, লেখক, সমালোচক
৩১. কবি তালিম হোসেন, নজরুল একাডেমী
৩২. শাহেদ আলী, ছোট গল্পকার, ইসলামিক একাডেমী
৩৩. কবি আবদুস সাত্তার, সম্পাদক, মাহে নও
৩৪. ফররুখ শীয়র, নাট্যকার, সুপার ভাইজার, রেডিও পাকিস্তান (ঢাকা কেন্দ্র)
৩৫. কবি ফররুখ আহমেদ,প্রাইড অব পারফরম্যান্স
৩৬. সম্পাদক আবদুস সালাম, পাকিস্তান অবজারভার
৩৭. সম্পাদক এস জি বদরুদ্দিন, মর্নিং নিউজ
৩৮. সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, দৈনিক পাকিস্তান
৩৯. ফতেহ লোহানী, চিত্রপরিচালক, অভিনেতা, প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
৪০. হেমায়েত হোসেন, লেখক, প্রাক্তন সম্পাদক, এলান, রেডিও পাকিস্তান (ঐ)
৪১. বিএম রহমান, লেখক, ঢাকা
৪২. মবজুলুল হোসেন, নাট্যকার, রেডিও পাকিস্তান (ঐ)
৪৩. আকবরউদ্দীন, লেখক,গ্রন্থকার, ঢাকা
৪৪. আকবর হোসেন, লেখক, ঢাকা
৪৫. এএফএম আব্দুল হক, লেখক, প্রাক্তন পরিচালক, পাবলিক ইন্সট্রাকশন সদস্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন
৪৬. অধ্যক্ষ এ কিউএম আদমউদ্দিন, শিক্ষাবিদ
৪৭. আলী মনসুর, নাট্যশিল্পী
৪৮. কাজী আফসারউদ্দীন আহমেদ, লেখক
৪৯. সানাউল্লাহ নুরী, লেখক
৫০. শামসুল হক, কবি ও লেখক
৫১. সরদার ফজলুল করিম, লেখক
৫২. বদিউজ্জামান, লেখক
৫৩. শফিক কবীর (সাক্ষর শফিকুল কবীর), লেখক
৫৪. ফওজিয়া খান, গায়িকা
৫৫. লতিফা চৌধুরী গায়িকা

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ১০

পূর্ব পাকিস্তানে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে প্রনীত পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১

ধারা- ১ : সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, সীমানা এবং বলবৎকরণ

(১) অধ্যাদেশটির শিরোনাম হইবে পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১

(২) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এই আইন বলবৎ হইবে

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

ধারা- ২ : সংজ্ঞা

(১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশে

(ক) পরিচালক বলিতে এই আইনের ধারা-৮ এর আওতায় রাজাকারের পরিচালক বুঝাইবে ।

(খ) নির্ধারিত বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রনীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে ।

ধারা - ৩ : রাজাকার বাহিনী গঠন

এই অধ্যাদেশের বিধিবিধান আনুসাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বলিতে রাজাকার বাহিনী বুঝাইবে ।

ধারা- ৪ : নিয়োগ

পাকিস্তানের যে কোন নাগরিক এই আইনের আওতায় প্রণীত শর্তাবলী পূরণ করিলে তাহাকে রাজাকার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে ।

ধারা- ৫ : প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিতকরণ

প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে নিয়োগকৃত রাজাকারদেরকে প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত করা হইবে ।

ধারা- ৬ : রাজাকারের দায়িত্ব

বিধিবদ্ধ উপায়ে রাজাকারেরা দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে ।

ধারা- ৭ : পুলিশ বাহিনীতে রাজাকারদেরকে অঙ্গীভূতকরণ

(১) প্রাদেশিক পুলিশবাহিনীতে সকল রাজাকার বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজাকার অঙ্গীভূত ও অঙ্গীভূতির মেয়াদ সম্পকিত বিষয়াদি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে ।

www.pathagar.com

(২) যে সময়ের জন্য রাজাকারদেরকে পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে সেই সময়ে তাহাদেরকে অবশ্যই পুলিশ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা হইবে।

ধারা- ৮ : রাজাকার বাহিনীর পরিচালক

(১) প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী উক্ত সরকার কর্তৃক রাজাকার বাহিনীর পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হইবে।

(২) প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী রাজাকারদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রন করা হইবে।

(৩) পরিচালককে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ উপায়ে বা নির্দেশনা অনুযায়ী ৮- ধারার আওতায় নিয়োগকৃত পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তব্য পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

ধারা- ৯ : ক্ষমতা প্রত্যার্পন

প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক এই আইনের ধারা ৮(১) ও ১০ এর সকল ক্ষমতা বা আংশিক ক্ষমতা পরিচালককে বা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত এবং তাহার পক্ষে দায়িত্ব পালন করিবেন এমন কর্মকর্তাকে বা জেলা প্রশাসকগনকে তাহাদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োগের জন্য প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা- ১০ : বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই আইনের উদ্দেশ্যোবলী অর্জনের জন্য প্রাদেশিক সরকার বিধি প্রনয়ন করিতে পারিবেন।

(২) সাধারণভাবে উক্ত বিধি নিম্নবর্নিত সকল কার্যাবলী বা যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রনয়ন করা হইবে:

(ক) রাজাকারদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং কর্তব্য পালন

(খ) রাজাকারদের সংগঠন পরিচালনা ও শৃঙ্খলা রক্ষা

(গ) রাজাকারদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ

(ঘ) পুলিশ বাহিনীতে চাকুরী পূর্ণকালীন অন্তর্ভুক্তকালে রাজাকারদের বেতন ও অন্যান্যা শর্তাবলী নির্ধারণ

(ঙ) পরিচালক, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ

(চ) পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগনের ক্ষমতা এবং কর্তব্য নির্ধারণ

(ছ) রাজাকারদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি

www.pathagar.com

ধারা-১১: রহিতকরণ

আনসার আইন ১৯৪৮ এত দ্বারা রহিত করা হইলো ।

ধারা-১২: (১) আনসার আইন ১৯৪৮ বিলুপ্তির কারনে কোন পদ বিলুপ্ত হইলে বা পদবী পরিবর্তন হইলে উক্ত পদধারী ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত রাজাকার বাহিনীতে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপায়ে একই ধরনের পদে বা সমপর্যায়ের পদে নিয়োগ প্রদান করা হইবে ।

(২) যদি এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত সংগঠনে উপধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তিকে একই ধরনের পদ বা সমপর্যায়ের পদ না থাকা স্বত্তেও নিয়োগ প্রদান করা হইলে তাহা বিদ্যমান কোন আইন, বিধি বা চুক্তির সংগে সাংঘর্ষিক হইলে পদ বিলুপ্তি বা পদবী পরিবর্তনজনিত কারণে উক্ত ব্যক্তির চাকরিচ্যুতি ঘটিবে ।

(৩) যদি উপধারা-২ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির চাকুরীচ্যুতি ঘটে তাহা হইলে তাহার চাকুরীর নিয়ম অনুযায়ী তাহাকে গ্রাচুইটি ও পেনশন প্রদান করা হইবে । আর যদি উক্ত ব্যক্তির অনুরুপ কোন প্রাপ্যতা না থাকে সেক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার উক্ত ব্যক্তির গ্রাচুইটি বা পেনশন প্রাদেশিক সরকার নির্ধারিন করিতে পারিবে ।

ধারা-১৩ : সম্পদ, তহবিল ইত্যাদি

আনসার আইন ১৯৪৮ এর অধীনে গঠিত সংগঠনটির স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি তহবিল এবং দায় এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে এই অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত সংগঠনের অনুকূলে হস্তান্তরিত হইবে ।

আদেশক্রমে

টিক্কা খান
লেঃ জেঃ, গভর্নর, পূর্ব পাকিস্তান সরকার
২৮ শে মে ১৯৭১

এম. এ. আহাদ
উপসচিব, পূর্ব পাকিস্তান সরকার

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ১১

BENGAL'S ELITE DEAD IN A DITCH

By Nicholas Tomalin
From Dacca

BEFORE THEY surrendered at Dacca on Thursday, the Pakistani Army arrested and then shot more than 50 of the city's surviving intellectuals, scientists and businessmen. It was a closely planned elimination of elite Bengali citizens, carried out as a sudden military operation. It must therefore have been done with the full knowledge of the Pakistan high command, including the commanding officer, General Niazi.

The discovery of the bodies can only increases tension in Dacca, make revenge killings and riots more likely, and possibly even cause friction between the Mukti Bahini guerrillas and the Indian Army.

If the occupying forces have to clamp down on the liberated Bengalis, they could come to resent even Indian occupation; and there are small signs of this ominous development already in Dacca.

The murdered intellectuals were discovered in some isolated clay pits on the outskirts of the town, at a place called Rayar Bazar. I actually saw 35 bodies there, in a decomposed condition which indicates they were killed four or five days ago. There are probably many more and from kidnap reports, some in Dacca are putting the number of killed as high as 150.

UPI reports that among the victims were Dr. F. Rabbi, chief cardiologist of Dacca Medical College, and Dr. Munier Chowdhury, head of the Department of Bengali Language at Dacca University.

The killing ground is a brick-filed beyond the middle-class Dacca district of Danmondi. It is an oddly desolate place, despite the water hyacinths which float on the bluey-white clay pools.

Hundreds of Dacca citizens came here today, waling along the mud dykes to view the bodies, many of them looking for their own relatives.

The kidnapping was apparently done early in the morning last Tuesday, when squads of Punjabi soldiers drove to selected addresses, and took away men and women under armed guard. Probably they

www.pathagar.com

were taken to the Rayar Bazar brickfields and immediately shot, lined up along the mud dykes so as to fall into the pools.

There they still lie, with clay dust on them, beginning to decompose. There is one skeleton on a dyke picked dramatically bare by the Dacca dogs.

The Bengali crowds are circulating among these pools it a strange, gentle fashion. They don't seem angry here. Else-where they are wild. But here they were walking, talking in a gentle murmur, like tourists in a cathedral.

At one pool there was a particular large crowd, and the biggest pile of corpses. Here a Moslem, his mouth wrapped in his wool scarf, was howling and keening. It sounded like the muezzin call to prayer.

We asked the man his name. He said he was Abdul Malik, a Dacca businessman. In the water before him he had recognised the bodies of his three brothers, Badruzzaman, Shahjahan, and Mulluk Jahan. They lay side by side. They too were Dacca businessmen. It was a family firm. He had no other brothers.

"The Pak army came for them at seven o'clock in the morning on Tuesday," he said. "Just by chance, I had gone out early."

At this moment my companion began to cry. He was a Dacca student, named Najiur Rahman, who brought me to the brick-fields. He was looking for his brother-in-law.

Dr. Aminuddin is head of the Bengal Research Laboratories, with an Oxford Ph. D, and he was last seen at 7 o'clock on Tuesday morning when the Pakistan army took him away.

"I'm sorry, I must leave you, and look," said Rahman. His woollen scarf was now also around his face.

I was in Dacca for only three hours yesterday and during that time the news had scarcely spread. The crows were excited but quite good-natured, still waving to Indian troops and racing up and down in cars.

But there has been a great deal of shooting, particularly at night. Correspondents at the Intercontinental Hotel confirm that the atmosphere is explosive. The Bengalis allege that the hated Biharis, those "foreigners" from across the border who long ago came to settle here because they were Muslims, have been helping the Pakistani troops to murder Bengalis.

This was precisely what led to a riot and massacre of Bihari civilians in Jessore when I was there eight months ago.

www.pathagar.com

This murder of Dacca intellectuals is infinitely worse than anything that happened at Jessore. Therefore some kind of retribution is almost inevitable.

Apart from swiftly gathered hearsay in Dacca, and the evidence of other journalists in Dacca that such killings have been taking place, I can offer only the evidence of the two boys who drove me back to Dacca airport.

Both were Mukti Bahini. One, Pervez Mamasalek, told me proudly he had been Bihari-hunting the day before.

"We heard shooting," h said. "We knew it was those Bihari bastards killing our boys. We closed in on them in a circle. Two of us with stens rushed into their house." The Biharis had climbed a tree in the garden. They shot them down like crows from a branch. "Of course, we kill them, they killed us."

BANGLADESH GENOCIDE and WORLD PRESS
Compiled and edited by
FAZLUL QUADER QUDERI

Published by:
Amatul Quader
132/1, Jahanara Garden
Green Road, Dhaka-1205

Page No: 511-513

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ১২

বুদ্ধিজীবী হত্যায় মার্কিন গোয়েন্দাদের হাত ছিল ॥ ওয়ার ক্রাইমস কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনপ্রায় বাংলাদেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল 'হাইট' ও 'ডুয়েমপিক' নামের দুজন মার্কিন গোয়েন্দা। তারা পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বসে হত্যা করার জন্য এমন তিন হাজার বাঙালীর তালিকা তৈরি করেছিল, যারা পরিচিত ছিলেন প্রগতিশীল ও মার্কিনবিরোধী হিসেবে। পরবর্তীতে তালিকাটি পাওয়া যায় রাও ফরমান আলীর বেডরুমে। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ডা. এমএ হাসান স্বাক্ষরিত 'বুদ্ধিজীবী হত্যা, সিআইএ এবং প্রগতিশীল বাঙালীর স্বপ্নভগ্ন' শিরোনামের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এসব তথ্য।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাকিস্তানী বাহিনী ১৯৭১ সালে বাংলার মাটিতে নয় মাসব্যাপী যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতার সাফল্যকে নস্যাত করতে পরিকল্পিতভাবে এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ও সম্ভাবনাময় তরুণকে হত্যা করে। সেই সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় অহঙ্কারকে গুঁড়িয়ে জাতির নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ৪ লাখ ৬০ হাজার নারীর ওপর নিষ্ঠুরতম যৌন নির্যাতন চালায়। এ প্রেক্ষাপটে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি সাম্প্রতিক সময়ে বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়টি তদন্তের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তদন্তের শুরুতেই ঘৃণ্য আলবদর বাহিনী ও জামায়াত নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত ঘাতক বাহিনী তৈরির ব্যাপারে সিআইএ, আইএসআই ও ক'জন চিহ্নিত পাকিস্তানী জেনারেলের গোপন আঁতাতের তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করা গেছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা তৈরি করতে ভারতবিরোধী ও কমিউনিস্টবিরোধী চক্রের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে হাত মিলিয়েছিল চীনপন্থী সেই অংশ, যারা মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন ও পরবর্তী সময় পর্যন্ত চীনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছে। এ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর অনেক নিকটকর্মীসহ পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত এমন কিছু আমলা ও শিক্ষককে চিহ্নিত করা গেছে, যারা নিজেদের রং বদল করে মুক্তিযুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক বনে গেছেন। এই নিষ্ঠুর কাজে অংশগ্রহণ করে তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘ ও এনএসএফের প্রাক্তন কর্মীসহ এমন কিছু তরুণ যাদের কোন বিশেষ তালিকায় স্থান দেয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ পৃথকভাবে কাজ করায় চক্রান্তকারীদের নিকটজনও শেষ মুহূর্তে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

কমিটির তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, শেষ মুহূর্তে এভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে ফুটোপাত্রে পরিণত করা এবং অঞ্চলে প্রগতিশীল রাজনীতি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এ কাজে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন গোয়েন্দা হাইট ও ডুয়েমপিক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এসেছিল। এশীয় দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ৪৩ বছর বয়স্ক হাইটকে খুব ভাল করেই চিনত। তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংবলিত প্রচুর দলিল ছিল তাদের কাছে। তার গোপন মিশনের যাত্রাপথ ছিল ঢাকা, কায়রো, কলকাতা হয়ে ব্যাঙ্কক তৎকালীন দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী ঢাকায় প্রেরিত সিআইএ দলই উগ্রপন্থী আলবদর ও জামায়াতে ইসলামীর সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ তদারকি করেছে। ঢাকার পতনের পর হাইট ও ডুয়েমপিক জানুয়ারি মাসে ব্যাঙ্কক পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন চেয়ারম্যান এসডি শর্মা এক সংবাদ সম্মেলনে এদের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য ফাঁস করে দেন, যা এশিয়ার মার্কিন দূতাবাসসমূহ খণ্ড করতে পারেনি।

উক্ত হাইটের জন্ম ১৯২৮ সালে আমেরিকায়। সে ১৯৪৬-৪৯ পর্যন্ত মার্কিন সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিল। ১৯৫৩ সাল থেকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে কাজ করে। ১৯৫৪ সাল থেকে কলকাতা, দিল্লী, কায়রো প্রভৃতি স্থানে মার্কিন মিশনসমূহে সে পলিটিক্যাল অফিসার হিসাবে কাজ করে। ১৯৭১ সালে অপর সিআইএ এজেন্ট ডুয়েমপিককে নিয়ে সে বাংলাদেশে আসে। জেনারেল রাও ফরমান আলীর ডায়েরিতেও এই দুই সিআইএ এজেন্টের নাম উল্লেখ ছিল এবং তাদের নামের পরে ইংরেজিতে লেখা ছিল ইউএসএ, ডিজিআইএস জিইএস পলিটিক্যাল ৬০-৬২, ৭০। এই বাহিনীর সদস্যরা বাম আন্দোলন ঠেকাতে ১৯৬০ সালে ঢাকায় আসে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালায়। ১৯৬৯ সালের আন্দোলন ও সত্তরের নির্বাচনে এদের মুখ্য ভূমিকা ছিল বাম আন্দোলন ঠেকাবার জন্য তথাকথিত গণতান্ত্রিক নেতা ও ছাত্রনেতাদের বুদ্ধি পরামর্শ দেয়া। উনসত্তরের আন্দোলন ও সত্তরের নির্বাচনের পর থেকে স্বাধীনতামুখী নানা ঘটনাপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ নানা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পেছনে ধোঁয়াশা ও পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের ছাড় দেয়ার সঙ্গে এসব ঘটনার গভীর যোগাযোগ রয়েছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ১৩

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA. General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Easter Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenand-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assuance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provision of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign national, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre
16 December 1971

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)
16 December 1971

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ১৪

Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972*

(*no.58. Pub : 24th January, 1972- The above order made by the president on the advise of the Prime Minister of the People's Republic Of Bangladesh on the 24th January, 1972 is hereby published for general information)

Presidents Order No.8 of 1972

Whereas certain persons, individually or as members of organizations, directly or indirectly, have been collaborators of the Pakistan Armed Forces, which had illegally occupied Bangladesh by brute force and have aided or abetted the Pakistan Armed Forces of occupation in committing genocide and crimes against humanity and in committing atrocities against men, women and children and against the person, property and honor of the civilian population of Bangladesh and have otherwise aided or co-operated with or acted in the interest of Pakistan Armed Forces of occupation or contributed by any act, word or sign towards maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by the Pakistan Armed Forces or have waged war or aided or abetted in waging war against People's Republic of Bangladesh.

And whereas such collaboration contributed towards the perpetration of a reign of terror and the commission of crimes against humanity on a scale which has horrified the moral consciences of the people of Bangladesh and of right thinking people throughout the world; And whereas it is imperative that such persons should be dealt with effectively and be adequately punished in accordance with the due process of law; And whereas it is expedient to provide for the setting up of Special Tribunals for expeditious and fair trial of the offences committed by such persons; Now therefore, in pursuance of the proclamation of Independence of Bangladesh Order, 1972 in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order :

1. This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972

www.pathagar.com

2. It extends to the whole of Bangladesh. It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the 26th day of March, 1971.

In this Order, -

a) 'Code' means Code Of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)

b) 'Collaborator' means a person who has-

(i) Participated with or aided or abetted the occupation army in maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by such army;

(ii) rendered material assistance in anyway whatsoever to the occupation army by any act, whether by words, signs or conduct;

(iii) Waged war or abetted in waging war against the People's Republic Of Bangladesh;

(iv) Actively resisted or sabotaged the efforts of the people and the liberation forces of Bangladesh in their liberation struggle against the occupation army;

(v) by a public statement or by voluntary participation in propaganda within or outside Bangladesh on or by association in any delegation or committee or by participation in purported by-elections attempted to aid or aided the occupation army in furthering its design of perpetrating its forcible occupation in Bangladesh.

Explanation- a person who has performed in good faith functions which he was required by any purported law in force at the material time to do shall not be deemed to be a collaborator;

Provided that a person who has performed functions as direct object or result of which was the killing of any member of the civil population or the liberation forces of Bangladesh or the destruction of their property or the rape of or the criminal assault on their womenfolk, even if done under purported law passed by the occupation army, shall be deemed to be a collaborator.

c) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh:

www.pathagar.com

d) "Liberation Forces" includes all forces of the People's Republic of Bangladesh engaged in the liberation of Bangladesh;

e) "Occupation Army" means the Pakistan Armed Forces engaged in the occupation of Bangladesh.

f) "Special Tribunal" means a Tribunal under this order.

3. (a) Any Police Officer or any person empowered by the Government in that behalf may, without a warrant, arrest any person who may reasonably be suspected of having been a collaborator.

(b) Any Police Officer on any person making an arrest under clause (1) shall forthwith report such arrest to the Government together with a precise of the information or materials on the basis of which the arrest has been made, and, pending receipt of the order of the Government, may, by order in writing, commit any person so arrested to such custody as the Government may by general or special order specify.

(c) On receipt of a report under clause (2), the Government may by order in writing, direct such person to be detained for an initial period of six months for the purpose of inquiry into the case.

(d) The Government may extend the period of detention if, in the opinion of the Government, further time is required for completion of the inquiry.

(e) Any person arrested or detained before the commencement of this Order who is alleged to be a collaborator, shall be deemed to be arrested and detained under this Order and an order in writing authorizing such detention shall be made by the Government:

Provided that the initial period of detention of six months in the case of such person shall be computed from the date of this arrest.

4. Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law for the time being in force, any collaborator who has committed any offence specified in the Schedule shall be tried and punished by a Special Tribunal set up under this Order and no other Court shall have any jurisdiction to take cognizance of any such offence.

www.pathagar.com

5. (1) The Government may set up as many Special Tribunals as it may deem necessary to try and punish offences under this Order for each district or for such area as may be determined by it.

(2) A Special Tribunal shall consist of one member.

(3) No person shall be qualified to be appointed a member of a Special Tribunal unless he is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge.

6. (1) A Special Tribunal consisting of a Sessions Judge or an Additional Session Judge shall try and punish offences enumerated in parts I and II of the Schedule.

(2) A Special Tribunal consisting of a Sessions Judge or an Additional Session Judge shall try and punish offences enumerated in parts III and IV of the Schedule.

7. A Special Tribunal shall not take cognizance of any offence punishable under this Order except upon a report in writing by an officer-in-charge of a police station.

8. (1) the provisions of the Code insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Order, shall apply to all matters connected with, arising from or consequent upon trial by a Special Tribunal.

9. (1) A Special Tribunal shall not be bound to adjourn a trial for any purpose unless such an adjournment is, in its opinion, necessary in the interests of justice.

(2) No trial shall be adjourned by reason of the absence of any accused person if such accused person is represented by counsel, or if the absence of the accused person or his counsel has been brought about by the accused person himself, and the Special Tribunal proceed with the trial after taking necessary steps to appoint as advocate to defend an accused person who is not represented by counsel.

10. A Special Tribunal may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to the offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the

www.pathagar.com

commission thereof and any pardon so tendered shall, for the purpose of section 339 and 339A of the Code, be deemed to have been tendered under section 338 of the Code.

11. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,

(a) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in part I of the Schedule shall be punished with the death or transportation for life and shall also be liable to a fine;

(b) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in part II of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years and shall also be liable to a fine;

(c) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in part III of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding five years and shall also be liable to a fine;

(d) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in part IV of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding twoyears and shall also be liable to a fine;

12. Without prejudice to any sentence passed by Special Tribunal, the property immovable, movable, or any portion thereof, of a collaborator may, on his conviction, be forfeited to the Government, upon an order in writing made in this behalf by the Government.

13. If any accused in convicted of and sentenced for more then one offence, the sentences of imprisonment shall run concurrently or consecutively, as determined by the Special Tribunal.

14. Notwithstanding anything contained in the Code no person who is in custody, accused or convicted of any offence punishable under this order shall be released on bail.

15. The provisions of Chapter XXVII of the Code shall apply to a sentence of death passed by a Special Tribunal.

16. (1) A person convicted of any offence by a Special Tribunal may appeal to the High Court.

(2) The Government may direct a Public Prosecutor to present an appeal to the High Court from an order of acquittal passed by a Special Tribunal, upon intimation to the Special Tribunal by the Public Prosecutor that such an

www.pathagar.com

appeal is being filed, the person in respect of whom the order of acquittal was passed shall continue to remain in custody.

(3) The period of limitation for an appeal under clause (1) shall be 30 days from the date of sentence and for an appeal under clause

(4) Shall be 30 days from the date of the order of acquittal.

(5) The appeal may lie on matters of fact as well as law.

17. (a) If the Government has reasons to believe that a person, who, in the opinion of the Government, is required for the purpose of any investigation, enquiry or other proceedings connected with an offence punishable under this Order, is absconding or is otherwise concealing himself or remaining abroad to avoid appearance, the Government, may, by a written proclamation published in the official Gazette or in such other manner as may be considered suitable to make it widely known:

(i) direct the person named in the proclaimed to appear at a specified place at a specific time;

(ii) direct attachment of any property, moveable and immoveable or both,belonging to the proclaimed person.

Explanation-"Property belonging to the proclaimed person shall include property, movable and immovable, standing in the name of his wife, children, parents, minor brothers, sisters or dependents or any demander."

(b) If the property ordered to be attached is a debt or other movable property theattachment shall be made,-

(i) by seizure; or

(ii) by the appointment of an administrator; or

(iii) by an order in writing prohibiting the delivery or such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf; or

(iv) by all or any two of the methods mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) as the Government may direct.

(c) If the property ordered to be attached is immovable, the attachment shall be made in the case of land paying revenue to Government, by the Deputy Commissioner of the district in which the land is situate, and in all other case,-

(i) by taking possession of the property; or

www.pathagar.com

(ii) by the appointment of an administrator; or

(iii) by an order in writing prohibiting the payment of rent or delivery of the property to the proclaimed person or to anyone on his behalf; or

(iv) by all or any two of this methods mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) as the government may direct.

(d) If the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature,the Government may, if it thinks if expedient, order immediate sale thereof, and in such case the sale shall abide by the order of the Government.

(e) The powers, duties and liabilities of an administrator appointed under this Article shall be the same as those of a receiver appointed under Chapter XXXVI of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908).

(f) If any claim is preferred to, or objection made to the attachment of, any property attached under this Article, within seven days from the date of such attachment, by any person other than the proclaimed person, on the ground that the claimant or objector has an interest in such property, and that such interest is not liable to attachment under this Article, the claim or objection shall be inquired into, and may be allowed or disallowed inwhole or in part:

Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this clause may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative.

(g) Acclaim or an objection under clause (6) may be preferred or made before such person or authority as is appointed by the Government.

(h) Any person whose claim or objecting has been disallowed in whole or in part by an order under clause (6) may, within a period of one month from the date of such order, appeal against such order to an appellate authority, constituted by the Government, for such purpose, but subject to the order of such appellate authority, the order shall be conclusive.

(i) If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, theGovernment may make an order releasing the property from the attachment.

www.pathagar.com

(j) If the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the Government may pass an order forfeiting to the Government the property under attachment.

(k) When any property has been forfeited to the Government under clause (10), it may be disposed of in such manner as the Government directs.

18. Notwithstanding the provisions of the Code or of any other law for the time being in force, no action or proceeding taken or purporting to be taken under this Order shall be called in question by any Court, and there shall be no appeal from any order or sentenceof a Special Tribunal save as provided in section 16.

SCHEDULE

PART-I

Offences under sections 121, 121-A, 302, 304, 307, 376, 396 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of such offences.

PART- II

Offences under sections 308, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 333, 354, 363, 364, 365, 367,368, 369, 380, 382, 386, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 397, 435, 436, 437, 438, 449 and 450 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any such offences.

PART- III

Offences under sections 324, 332, 338, 343, 346, 348, 427, 428, 429, 430, 431 and 440 of the penal code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of the offences.

PART-IV

(a) Offences under sections 336, 337, 341, 342, 352, 357, 374, 426, 447 and 448 of the penal code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of the offences.

(b) Any act which is mentioned is clause (b) of Article 2 of this order but which is not covered by any of the parts in this schedule.

www.pathagar.com

THE INTERNATIONAL CRIMES (TRIBUNALS) ACT, 1973

ACT NO. XIX OF 1973

[20TH July, 1973]

with THE INTERNATIONAL CRIMES (TRIBUNALS) (AMENDMENT) ACT, 2009

An Act of provide for the detention, prosecution and punishment of persons for genocide, crimes against humanity, war crimes and other crimes under international law.

WHEREAS it is expedient to provide for the detention, prosecution and punishment of persons for genocide, crimes against humanity, war crimes and other crimes under international law, and for matters connected therewith;

It is hereby enacted as follows:-

1. Short title, extent and commencement
   - (a) This Act may be called the International Crimes (Tribunals) Act, 1973.
   - (b) It extends to the whole of Bangladesh.
   - (c) It shall come into force at once.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-
   - (a) "auxiliary forces includes forces placed under the control of the Armed Forces for operational, administrative, static and other purposes;

[Inserted new article in 2009]

   - (aa) "armed forces" includes the forces raised and maintained under Army Act, 1952 (XXXIX of 1952), the Air Force Act, 1953 (VI of 1953), or the Navy Ordinance, 1961 (XXXV of 1961).
   - (b) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh;
   - (c) "Republic" means the People's Republic of Bangladesh;

[Repealed in 2009]

www.pathagar.com

(d) "Service law" means the Army Act, 1952 (XXXIX of 1952), the Air Force Act, 1953 (VI of 1953), or the Navy Ordinance, 1961 (XXXV of 1961), and includes the rules and regulations made under any of them;
(e) "territory of Bangladesh" means the territory of the Republic as defined in article 2 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh;
(f) "Tribunal" means a Tribunal set up under this Act.

Jurisdiction of Tribunal and crimes

3. (1) A Tribunal shall have the power to try and punish any person irrespective of his nationality who, being a member of any armed, defence or auxiliary forces commits or has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the following crimes. 3. (1) A

[Changed in 2009]

3 (1) A Tribunal shall have the power to try and punish any individual or group of individuals, or any member of any armed, defence or auxiliary forces, irrespective of his nationality, who commits or has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the crimes mentioned in sub-section (2).

(2) The following acts or any them are crimes within the jurisdiction of a Tribunal for which there shall be individual responsibility, namely:-

(a) Crimes against Humanity: namely murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, abduction, confinement, torture, rape or other inhumane acts committed against any civilian population or persecutions on political, racial, ethnic or religious grounds, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated;
(b) Crimes against Peace: namely, planning, preparation, initiation of waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, agreements or assurances;
(c) Genocide: meaning and including any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, religious or political group, such as:
(i) Killing members of the group;

www.pathagar.com

(ii) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(iii) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(iv) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(v) Forcibly transferring children of the group to another group;

(d) War Crimes: namely, violation of laws or customs of war which include but are not limited to murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population in the territory of Bangladesh; murder or Ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages and detunes, plunder if public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
(e) Violation of any humanitarian rules applicable in armed conflicts laid down in the Geneva Conventions of 1949;
(f) Any other crimes under international law;
(g) Attempt, abetment or conspiracy to commit any such crimes;
(h) Complicity in or failure to prevent commission of any such crimes.

4. (1) When any crime as specified in section 3 is committed by several persons, each of such person is liable for that crime in the same manner as if it were done by him alone.

Liability for Crimes

(2) Any commander or superior officer who orders, permits, acquiesces or participates in the commission of any of the crimes specified in section 3 or is connected with any plans and activities involving the commission of such crimes or who fails or omits to discharge his duty to maintain discipline, or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crimes, or who fails to take necessary measures to prevent the commission of such crimes, is guilty of such crimes.

5. (1) The official position, at any time, of an accused shall not be considered freeing him from responsibility or mitigating punishment.

www.pathagar.com

Official position, etc. not to free an accused from responsibility for any crime

(2) The fact that the accused acted pursuant to his domestic law or to order of his Government or of a superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal deems that justice so requires.

6. (1) For the purpose of section 3, the Government may, by notification in the official Gazette, set up one or more Tribunals, each consisting of a Chairman and not less than two and not more than four other members.

(2) Any person who is or is qualified to be a Judge of the Supreme Court of Bangladesh or has been a Judge of any High Court or Supreme Court which at any time was in existence in the territory of Bangladesh or who is qualified to be a member of General Court Martial under any service law of Bangladesh may be appointed as a Chairman or member of a Tribunal.

[Changed in 2009]

(2) Any person who is a Judge or is qualified to be a Judge or has been a Judge of the Supreme Court may be appointed as a Chairman or member of a Tribunal.

[Inserted new article in 2009]

(2A) The Tribunal shall be independent in the exercise of its judicial functions and ensure fair trial.

(3) The permanent seat of a Tribunal shall be in Dacca:

Provided that a Tribunal may hold its sittings at such other place or places as it deems fit.

[Changed in 2009]

(3) The permanent seat of a Tribunal shall be in Dhaka:

Provided that a Tribunal may hold its sittings at such other place or places as it deems fit.

(4) If any member of a Tribunal dies or is, due to illness or any other reason, unable to continue to perform his functions, the Government may, by notification in the official Gazette, declare the office of such member to be vacant and appoint there to another person qualified to hold the office.

(5) If, in the course of a trial, any one of the members of a Tribunal is, for any reason, unable to attend any sitting thereof, the trial may continue before the other members.

www.pathagar.com

(6) A Tribunal shall not, merely by reason of any change in its membership or the absence of any member thereof from any sitting, be bound to recall and re-hear any witness who has already given any evidence and may act on the evidence already given or produced before it.

(7) If, upon any matter requiring the decision of a Tribunal, there is a difference of opinion among its members, the opinion of the majority shall prevail and the decision of the Tribunal shall be expressed in terms of the views of the majority.

(8) Neither the constitution of a Tribunal nor the appointment of its Chairman or members shall be challenged by the prosecution or by accused persons or their counsel.

7. (1) The Government may appoint one or more persons to conduct the prosecution before a Tribunal on such terms and conditions as may be determined by the Government; and every such person shall be deemed to be a Prosecutor for the purposes of this Act.

(2) The Government may designate one of such persons as the Chief Prosecutor.

8. (1) The Government may establish an Agency for the purposes of investigation into crimes specified in section 3; and any officer belonging to the Agency shall have the right to assist the prosecution during the trial.

(2) Any person appointed as a Prosecutor is competent to act as an Investigation Officer and the provisions relating to investigation shall apply to such Prosecutor.

(3) Any Investigation Officer making an investigation under this Act may, be order in writing, require the attendance before himself of any person who appears to be acquainted with the circumstances of the case; and such person shall attend as so required.

(4) Any Investigation Officer making an investigation under this Act may examine orally any person who appears to be acquainted with the fact and circumstances of the case.

(5) Such person shall be bound to answer all questions put to him by an Investigation Officer and shall not be excused from answering any question on the ground that the answer to such question will criminate, or may tend directly or indirectly to criminate, such persons:

www.pathagar.com

Provided that no such answer, which a person shall be compelled to give, shall subject him to any arrest or prosecution, or be proved against him in any criminal proceeding.

(6) The Investigation Officer may reduce into writing any statement made to him in the course of examination under this section.

(7) Any person who fails to appear before an Investigation Officer for the purpose of examination or refuses to answer the questions put to him by such Investigation Officer shall be punished with simple imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to Taka two thousand, or with both.

(8) Any Magistrate of the first class may take cognizance of an offence punishable under sub-section (70 upon a complaint in writing by an Investigation Officer.

(9) Any investigation done into the crimes specified in section 3 shall be deemed to have been done under the provisions of this Act.

9. (1) The proceedings before a Tribunal shall commence upon the submission by the Chief Prosecutor, or a Prosecutor authorised by the Chief Prosecutor in this behalf, of formal charges of crimes alleged to have been committed by each of the accused persons.

(2) The Tribunal shall thereafter fix a date for the trial of such accused person.

(3) The Chief Prosecutor shall, at least three weeks before the commencement of the trial, furnish to the Tribunal a list of witnesses intended to be produced along with the recorded statement of such witnesses or copies thereof and copies of documents which the prosecution intends to rely upon in support of such charges.

(4) The submission of a list of witnesses and documents under sub-section (3) shall not preclude the prosecution from calling, with the permission of the Tribunal, additional witnesses or tendering any further evidence at any stage of the trial:

Provided that notice shall be given to the defence of the additional witnesses intended to be called or additional evidence sought to be tendered by the prosecution.

(5) A list of witnesses for the defence, if any, along with the documents or copies thereof, which the defence intends to rely upon, shall be furnished to the Tribunal and the prosecution at the time of the commencement of the trial.

www.pathagar.com

10. (1) The following procedure shall be followed at a trial before a Tribunal, namely:-

(a) the charge shall be read out;

(b) the Tribunal shall ask each accused person whether he pleads guilty or not-guilty;

(c) if the accused person pleads guilty, the Tribunal shall record the plea, and may, in its discretion, convict him thereon;

(d) the prosecution shall make an opening statement;

(e) the witnesses for the prosecution shall be examined, the defence my cross-examine such witnesses and the prosecution may re-examine then;

(f) the witnesses for the defence, if any, shall be examined, the prosecution may cross-examine such witnesses and the defence may re-examine them;

(g) the Tribunal may, in its discretion, permit the party which calls a witness to put any question to him which might be pat in cross-examination by the adverse party;

(h) the Tribunal may, in order to discover or obtain proof of relevant facts, ask any witness any question it pleases, in any form and at any time about any fact; and may order production of any document or thing or summon any witness, and neither the prosecution nor the defence shall be entitled either to make any objection to any such question or order or, without the leave of the Tribunal, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such questions;

(i) the prosecution shall first sum up its case, and thereafter the defence shall sum up its case;
Provided that if any witness is examined by the defence, the prosecution shall have the right to sum up its case after the defence has done so;

(j) the Tribunal shall deliver its judgement and pronounce its verdict.

(2) All proceedings before the Tribunal shall be in English.

[Changed in 2009]

(2) All proceedings before the Tribunal shall be in Bangla or English.

www.pathagar.com

(3) Any accused person or witness who is unable to express himself in, or does not understand, English may be provided the assistance of an interpreter.

(4) The proceedings of the Tribunal shall be in public:

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, take proceedings in camera.

(5) No oath shall be administered to any accused person.

11.(1) A Tribunal shall have power-

(a) to summon witnesses to the trial and to require their attendance and testimony and to put questions to them;
(b) to administer oaths to witnesses;
(c) to require the production of document and other evidentiary material;
(d) to appoint persons for carrying out any task designated by the Tribunal.

(2) For the purpose of enabling any accused person to explain any circumstances appearing in the evidence against him, a Tribunal may, at any stage of the trial without previously warning the accused person, put such questions to him as the Tribunal considers necessary:

Provided that the accused person shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers to them; but the Tribunal may draw such inference from such refusal or answers as it thinks just;

(3) A Tribunal shall-

(a) confine the trial to an expeditious hearing of the issues raised by the charges;
(b) take measures to prevent any action which may cause unreasonable delay, and rule out irrelevant issues and statements.

(4) A tribunal may punish any person, who obstructs or abuses its process or disobeys any of its orders or directions, or does anything which tends to prejudice the case of a party before it, or tends to bring it or any of its members into hatred or contempt, or does anything which constitutes contempt of the Tribunal, with simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to Taka five thousand, or with both.

(5) Any member of a Tribunal shall have power to direct, or issue a warrant for, the arrest of, and to commit to custody, and to authorise

www.pathagar.com

the continued detention in custody of, any person charged with any crime specified in section 3.

(6) The Chairman of a Tribunal may make such administrative arrangements as he considers necessary for the performance of the functions of the Tribunal under this Act.

12. Where an accused person is not represented by counsel, the Tribunal may, at any stage of the case, direct that a counsel shall be engaged at the expense of the Government to defend the accused person and may also determine the fees to be paid to such counsel.

Provision for defence counsel

13. No trial before a Tribunal shall be adjourned for any purpose unless the Tribunal is of the opinion that the adjournment is in the interest of justice.

Restriction of adjournment

14.(1) Any Magistrate of the first class may record any statement or confession made to him by an accused person at any time in the course of investigation or at any time before the commencement of the trial.

Statement or confession of accused persons

(2) The Magistrate shall, before recording any such confession, explain to the accused person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him and no Magistrate shall record any such confession unless, upon questioning the accused making it, he has reason to believe that it was made voluntarily.

15.(1) At any stage of the trial, a Tribunal may with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to, any of the crimes specified in section 3, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the crime and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof.

Pardon of an approver

(2) Every person accepting the tender under this section shall be examined as a witness in the trial.

(3) Such person shall be detained in custody until the termination of the trial.

16.(1) Every charge against an accused person shall state-

www.pathagar.com

(a) the name and particulars of the accused person;
(b) the crime of which the accused person is charged;
(c) such particulars of the alleged crime as are reasonably sufficient to give the accused person notice of the matter with which he is charged.

(2) A copy of the formal charge and a copy of each of the documents lodged with the formal charge shall be furnished to the accused person at a reasonable time before the trial; and in case of any difficulty in furnishing copies of the documents, reasonable opportunity for inspection shall be given to the accused person in such manner as the Tribunal may decide.

17. (1) During trial of an accused person he shall have the right to give any explanation relevant to the charge made against him.

Right of accused person during trial

(2) An accused person shall have the right to conduct his own defence before the Tribunal or to have the assistance of counsel.

(3) An accused person shall have the right to present evidence at the trial in support of his defence, and to cross-examine any witness called by the prosecution.

18. A witness shall not be excused from answering any question put to him on the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind:

Provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding, except a prosecution for giving false evidence.

No excuse from answering any question

19. (1) A Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence; and it shall adopt and apply to the greatest possible extent expeditious and non-technical procedure, and may admit any evidence, including reports and photographs published in newspapers, periodicals and magazines, films and tape-recordings and other materials as may be tendered before it, which it deems to have probative value.

(2) A Tribunal may receive in evidence any statement recorded by a Magistrate or an Investigation Officer being a statement made by

www.pathagar.com

any person who, at the time of the trial, is dead or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which the Tribunal considers unreasonable.

(3) A Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof.

(4) A Tribunal shall take judicial notice of official governmental documents and reports of the United Nations and its subsidiary agencies or other international bodies including non-governmental organistions.

20.(1) The Judgement of a Tribunal as to the guilt or the innocence of any accused person shall give the reasons on which it is based:

Provided that each member of the Tribunal shall be competent to deliver a judgement of his own.

(2) Upon conviction of an accused person, the Tribunal shall award sentence of death or such other punishment proportionate to the gravity of the crime as appears to the Tribunal to be just and proper.

(3) The sentence awarded under this Act shall be carred out in accordance with the orders of the Government.

21. A person convicted of any crime specified in section 3 and sentenced by a Tribunal shall have the rights of appeal to the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh against such conviction and sentence:

Provided that such appeal may be preferred within sixty days **(Proposed amendment: thirty days)** of the date of order of conviction and sentence.

22. Subject to the provision of this Act, a Tribunal may regulate its own procedure.

23. The provisions of the Criminal Procedure Code, 1898 (V of 1898), and the Evidence Act, 1872 (I of 1872), shall not apply in any proceedings under this Act.

24. No order, judgement or sentence of a Tribunal shall be called in question in any manner whatsoever in or before any Court or other authority in any legal proceedings whatsoever except in the manner provided in section 21.

25. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any person for anything, in good faith, done or purporting to have been done under this Act.

www.pathagar.com

26. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

পরিশিষ্ট : ১৬

Liberation War Museum

www.liberationmuseum.org

Documents on Crimes against Humanity Committed by Pakistan Army and their agents in Bangladesh during 1971

next>>

Naming The Names: Introducing The War Criminals

Nos.	P.O.W No.	PA No.	Rank	Name	Unit
1	1	PA 477	Lt.Gen.	Amir Abdullah Khan Niazi	
2	2	PA 1170	Maj. Gen	Nazar Hussain Shah	16 DIV
3	3	PA 4404	Maj. Gen.	Mohhammad Hussain Ansari	9 DIV
4	4	PA 882	Maj. Gen.	Mohammad Jamshed	DG EPCAF
5	5	PA 1734	Maj. Gen.	Qazi Abdul Majid Khan	14 DIV
6	6	PA 1364	Maj. Gen.	Rao Farman Ali	Civil Affairs & Advisor to Governor E.P.
7	7	PA 1674	Brig.	Abdul Qadir Khan	93 BDE
8	8	PA 2235	Brig.	Arif Raja	HQ SIG
9	9	PA 1109	Brig.	Atta Muhammad Khan Malik	7 BDE
10	11	PA 1897	Brig.	Bashir Ahmed	CAF
11	12	PA 100088	Brig.	Fahim Ahmed Khan	HQ EC

www.pathagar.com

12	13	PA 1738	Brig.	Iftikhar Ahmed Rana	313 BDE
13	16	PA 3414	Brig	Manzoor Ahmed	57 HQ BDE
14	17	PA 3547	Brig.	Manzoor Hussain Atif	177 BDE
15	18	PA 2111	Brig.	Mian Mansoor Muhammad	39 DIV
16	19	PA 1148	Brig.	Mian Taskin uddin	91 BDE
17	20	PA 2729	Brig.	Mir Abdul Nayeem	34 HQ BDE
18	22	PA 1999	Brig.	Mohammad Aslam	53 BDE
19	23	PA 2103	Brig.	Mohammad Hayat	107/407 BDE
20	24	PA 1044	Brig.	Mohammad Shafi	23 HQ BDE
21	25	PA 1702	Brig	N.A.Ashraf	CMD Natore GRN
22	26	PA 3430	Brig.	S.A.Ansari	Rangpur GRN
23	27	PA 3548	Brig.	Saad Ullah Khan S.J.	27 BDE
24	28	PA 1880	Brig.	Syed Asghar Hasan	Sylhet Force
25	29	PA 2110	Brig.	Syed Shah Abul Qasim	C.C.ATY ECO
26	30	PA 2130	Brig.	Tajmmal Hussain Malik	205 HQ BDE
27	35	PA 1817	Col.	Fazle Hamid	314 HQ BDE
28	37	PA 3799	Col.	K.K.Afridi	9 DIV
29	44	PA 1963	Col.	Mohammad Khan	ISI
30	45	PA 100115	Col.	Mohammad Musharaf Ali	14ADMS DIV
31	58	PA 2200	Lt. Col.	Abdul Ghaffor	HQ SIGEA
32	67	PA 4489	Lt. Col.	Aftab H. Quereshi	33
33	57	PA 3568	Lt. Col.	Abdul Rehman Awan	CAF
34	60	PA 3347	Lt. Col.	Abdul Hamid Khan	ML HQ
35	65	PA 4087	Lt. Col.	Abdullah Khan	EPCAF
36	68	PTC 4318	Lt. Col.	Ahmed Mukhtar Khan	30 FF
37	72	PA 4062	Lt. Col.	Amir Mohammad Khan	7 SEC ML

www.pathagar.com

38	74	PTC 4329	Lt. Col.	Amir Nawaz Khan	13 FF
39	73	PA 5027	Lt. Col.	Amir Mohammad Khan	34 Punjab
40	55	PA 4745	Lt. Col.	A.Shams ul Zaman	22 FF
41	78	PA 4608	Lt. Col.	Ashiq Hussain	24 FF
42	81	PA 3248	Lt. Col.	Aziz Khan	32 Baluch
43	202	PTC 3239	Lt. Col.	Ghulam Yasin Siddiqi	ST HQ Dacca AA & QMG
44	97	PTC 3711	Lt. Col.	Isharat Ali Alvi	14 HQ Inf.Div
45	167	PA 4441	Lt. Col.	Mukhtar Alam Hijazi	EPCAF
46	170	PA 3600	Lt. Col.	Mustafa Anwar	15 Baluch
47	116	PA 4100	Lt. Col.	M.R.K.Mirza	33 Punjab
48	128	PA 4301	Lt. Col.	Matloob Hussain	18 Punjab
49	140	PA 2700	Lt. Col.	Mohammad Akram	Tochi Scout
50	152	PSS 2590	Lt. Col.	Mohammad Akbar	EPCAF
51	147	PTC 3645	Lt. Col.	Mohammad Nawaz	15 Baluch
52	169	PA 4766	Lt. Col.	Mumtaz Malik	HQ East Comd.
53	138	PA 4416	Lt. Col.	M.M.M.Baiz	8 Baluch
54	48	PA 100207	Col.	Mohammad Matin	72 ADMS MED BN
55	129	PA 2917	Lt. Col.	Mazhar Hussain Chauhan	ISSC
56	168	PA 3610	Lt. Col.	Mukthar Ahmed Sayed	HQ MLA Cav
57	171	PSS 2899	Lt. Col.	Mustafajan	HQ MLA Zone
58	175	PA 2821	Lt. Col.	Oman Ali Khan	SURVEY Sec
59	180	PA 5074	Lt. Col.	Reaz Hussain Javed	31 Punjab
60	178	PA 4550	Lt. Col.	Rashid Ahmed	HQ EPCAF
61	196	PA 4817	Lt. Col.	Seikh Mohammad Naeem	39 Baluch
62	192	PA 3932	Lt. Col.	Sarfaz Khan Malik	31 Punjab

www.pathagar.com

63	181	PA 4920	Lt. Col.	S.F.H.Rizvi	32 Punjab
64	182	PA 4560	Lt. Col.	S.H.Bokhari	29 CAV
65	205	PA 4368	Lt. Col.	Syed Hamid Safi	DEF Purchase
66	201	PA 3817	Lt. Col.	Sultan Badshah	8 EPCAF
67	200	PA 5178	Lt. Col.	Sultan Ahmed	31 Baluch
68	199	PA 4518	Lt. Col.	S.R.H.S.Jaffari	HQ SID EA
69	216	PSS 3743	Lt. Col.	Zaid Agha Khan	HQ EF LOG
70	122	PA 3837	Lt. Col.	M.Y.Malik	14 HQ DIV
71	231	PA 7059	Major	Abdul Ghafran	East Comd.
72	284	PA 5640	Major	Anis Ahmed	205 HQ INF BDE
73	290	PA 7214	Major	Arif Javed	22 CAV
74	304	PA 6736	Major	Atta Mohammad	29 Baluch
75	233	PSS 8394	Major	Abdul Hamid	31 Punjab
76	301	PA 7299	Major	A.S.P.Quereshi	25 Punjab
77	294	PA 7530	Major	Ashfaq Ahmed Cheema	39 Baluch
78	241	PSS 8547	Major	Abdul Khaleq Kayani	6 Punjab
79	256	PTC 4664	Major	Abdul Waheed Mughal	22 Baluch
80	235	PA 3838	Major	Abdul Hamid Khattak	ML HQ
81	262	PA 7251	Major	Ahmed Hassan Khan	EPCAF
82	283	PRR 4438	Major	Anees Ahmed Khan	15 Baluch
83	255	PA 4990	Major	Abdul Waheed Khan	31 Baluch
84	320	PA 5868	Major	Ch.Mohammad Jahangir	HQ MLA ZB
85	348	PA 4122	Major	Ghulam Mohammad	2 Baluch
86	358	PTC 4390	Major	Gulam Ahmed	EPCAF
87	344	PA 7439	Major	Ghazanfar Ali Nasir	EPCAF
88	363	PA 6959	Major	Hadi Hussain	24 FF
89	367	PA 6646	Major	Hasan Mujtaba	8 Baluch
90	376	PTC 5733	Major	Iftikhar Uddin Ahmed	33 Baluch
91	374	PA 6729	Major	Iftikhar Ahmed	8 Punjab
92	712	PA 5250	Major	Shah Muhamad Osman Faruqi	7 Sig. BN

www.pathagar.com

93	419	PA 4553	Major	Khursheed Oman	814 FIU
94	423	PTC 3947	Major	Khurshid Ali	Survey Sec.
95	414	PA 7576	Major	Khizar Hayat	4 FF
96	485	PA 7657	Major	Mehr Mohammad Khan	31 Baluch
97	431	PTC 5911	Major	M.Abdullah Khan	27 Bde
98	533	PA 7253	Major	Mohammad Afzal	8 Baluch
99	411	PA 7405	Major	M.Ishaq	EPCAF
100	553	PTC 3246	Major	Mohammad Hafiz Raja	34 Punjab
101	595	PA 6870	Major	Mohammad Younas	32 Punjab
102	504	PA 6793	Major	Mohammad Amin	107 HQ BDE
103	481	PS 3935 or 2935	Major	Mohammad Lodhi	Natore Grn
104	493	PA 6554	Major	Mirza Anwar Beg	88 ORD COY
105	428	PTC 4157	Major	M.A.K.Lodhi	16 HQ Div
106	459	PSS 4245	Major	Madad Hussain Shah	18 Punjab
107	544	PTC 3007	Major	Mohammad Ayub Khan	97 BDE
108	586	PSS 6110	Major	Mohammad Sharif Arian	33 Punjab
109	555	PA 5964	Major	Mohammad Iftikhar Khan	202 HQ BDE
110	455	PA 2818	Major	M.Yahya Hamid Khan	6 Punjab
111	592	PSS 6150	Major	Mohammad Yamin	ASC
112	527	PA 5141	Major	Mohammad Ghazanfar	ISSC
113	583	PA 7231	Major	Mohammad Sarwar	33 Punjab
114	579	PTC 3016	Major	Mohammad Siddique	205 HQ INF BDE
115	543	PSS 6092	Major	Mohammad Ashraf	HQ EPCAF
116	506	PSS 4634	Major	Mohammd Ashraf Khan	53 HQ BDE
117	604	PA 5312	Major	Mohammad Safdar	ISSC
118	496	PA 6067	Major	M.M.Ispahani	HQ Eastern Cmd.
119	562	PA 6440	Major	Mohammad Jamil	EPCAF
120	580	PA 7559	Major	Mohammad Safi	32 Punjab
121	547	PA 4320	Major	Mohd.Azim Qureshi Qures	ISSC
122	525	PA 6460	Major	Mohd.Zulficar Rathore	13 Engr.BN
123	615	PA 5962	Major	Mushtaq Ahmed	Det.630

www.pathagar.com

					ASC
124	634	PSS 7996	Major	Nasira Khan	26 FF
125	632	PA 4748	Major	Nasir Ahmed	409 GHQ FIU
126	654	PTC 4632	Major	Rana Zahoor Mohyydin Khan	18 Punjab
127	666	PA 8655	Major	Rifat Mahmood	31 FD Regt.
128	667	PSS 6148	Major	Rustam Ali	314 HQ Bde
129	651	ACO 390	Major	R.M.Mumtaz Khan	31 Baluch
130	702	PA 6063	Major	Sardar Khan	HQ MLA
131	510	ACO 2099	Major	Mohammad Azam Khan	12 A.K.
132	686	PRR 3389	Major	Saif Ullah Khan	ISSC
133	674	PA 6893	Major	S.T.Hussain	734 FIC
134	730	PSS 4224	Major	S.M.H.S.Bokhari	24 FF
135	689	PSS 8015	Major	Sajid Mahmud	32 Punjab
136	723	PA 7415	Major	Sher ur Rehman	29 CAV
137	695	PTC 5930	Major	Salamat Ali	EPCAF
138	690	PA 6858	Major	Sajjad Akhtar Malik	ISI
139	698	PA 5684	Major	Saleem Inayet Khan	57 HQ ML ZB
140	735	PA 7289	Major	Sultan Saud	EPCAF
141	705	PA 6542	Major	Sarfraz uddin	ISI
142	720	PA 5080	Major	Shaukatullak Khattak	36 Sig.BN
143	737	PA 7428	Major	Sultan Surkhro Awan	33 Punjab
144	704	PA 7076	Major	Sarfraz Alam	EPCAF
145	706	PA 6851	Major	Sarwar Khan	Tochi Scout
146	756	PA 6272	Major	Tafir ul Islam	HQ Natore
147	785	PSS 8124	Major	Zaumul Maluk	18 Punjab
148	806	PSS 8464	Captain	Abdul Waheed	33 FF
149	817	PA 10202	Captan	Aftab Ahmed	31 Baluch
150	858	PSS 8836	Captain	Arif Hussain Shah	ARTY EIZI EMD
151	815	PSS 9634	Captain	Abrar Hussain	30 FF
152	853	PSS 9959	Captain	Amjad Shabbir Bukhari	31 ED Regt.

www.pathagar.com

					ARTY
153	876	PA 10129	Captain	Ausaf Ahmed	53 Fd; Regt.
154	7508 9	PA 10185	Captain	Abdul Qahar	EPCAF
155	869	PA 10985	Captain	Ashraf Mirza	12 AK INF BN
156	802	PSS 9904	Captain	Abdul Rashid Nayyar	19 SIG BN
157	849	PSS 8005	Captain	Aman Ullah	HQ Natore GR
158	882	PSS 9363	Captain	Aziz Ahmed	31 FD Regt.
159	221	PSS 9440	Captain	Gulfraz Khan Abbasi	22 FF
160	951	PSS 8144	Captain	Ikramul Haq	29 CAV
161	947	PA 10241	Captain	Ijaz Ahmed Cheema	ISI
162	941	PSS 8867	Captain	Iftikhar Ahmed Gondal	31 Punjab
163	964	PSS 8821	Captain	Ishaq Parvez	24 FF
164	960	PSS 9614	Captain	Iqbal Shah	29 CAV
165	976	PSS 6910	Captain	Javed Iqbal	33 Baluch
166	972	PSS 9765	Captain	Jahangir Koyani	RFT CAMP
167	985	PA 7838	Captain	Karam Khan	315 HQ BDE
168	1047	PA 11554	Captain	Manzar Amin	25 FF
169	1255	PSS 9387	Captain	Muzaffar Hussain Naqvi	18 Punjab
170	1178	PA 11551	Captain	Mohammad Sajjad	80 Fd. Regt.
171	1201	PSS 8820	Captain	Mohammd Zakir Raja (Muhammad Zakar Khan, Arty)	ISSC
172	1126	PA 7862	Captain	Mohammad Arif	14 HQ DIV
173	1131	PSS 9018	Captain	Mohammad Ashraf	12 Punjab
174	1149	PSS 8977	Captain	Mohammad Iqbal	12 Punjab
175	1096	PSS 9927	Captain	Mohammad Rafi Munir	18 Punjab
176	1159	PSS 10287	Captain	Mohammad Jamil	6 Punjab
177	1238	PSS 9077	Captain	Naeem Sadiq	409 HQ FIU
178	1351	PSS 9454	Captain	Sher Ali	39 Baluch
179	1322	PSS 8093	Captain	Salman Mahmood	26 FF

www.pathagar.com

180	1325	PA 11009	Captain	Shamshed Sarwar	RFN CAMP
181	1343	PSS 7745	Captain	Shahid Rehman	29 CAV
182	1321	PSS 10431	Captain	Saleh Hussain	18 Punjab
183	1350	PSS 9508	Captain	Shaukat Nawaz Khan	6 Punjab
184	1396	PA 7898	Captain	Zahid Zaman	53 HQ BDE
185	1505	PSS 11843	Lt.	Munir Ahmed Butt	31 Baluch Regt
186	1553 2	PSS 12191	Lt.	Zafar Jang	38 FF
187	641	PSS 6127	Major	Nasir Ahmad Khan Sherwani	32 Punjab
188	338	PSS 8534	Major	Fayaz Muhammad	29 Baluch
189	487	PA 4992	Major	Mian Fakhruddin	91 HQ Inf.Bde
190	924	PSS 8880	Captain	Hidayat Ullah Khan	29 Baluch
191	1102	PSS 10828	Captain	Md.Siddiqui	27 Sig.Bn
192	993	PSS 10147	Captain	Khalil ur rahman	COD, Dacca
193	628	PA 6726	Major	Nadir Parvaiz Khan	6 Punjab
194	934	PSS 10384	Captain	Hassan Idris	EPCAF
PAKISTAN AIR FORCE					
195	6548 3	P 953	Air Cdre	Inam ul Hoque Khan	PF Dacca
196	6548 4	PAF 1069	Gr. Cpt.	M.A .Majid Baig	PF Dacca
197	6548 3	PAK 5332	Fl. Lt.	Khalil Ahmed	PAF
PAKISTAN NAVY					
198	7175 5	P 138	Rear Adm.	Mohammad Shariff	
199	7175 6	PN 108	Cmdr e	Ikramul Haq Malik	Port Trus
200	7175 7	219	Cmdr e	Khatib Masud Hussain	Base Comd

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ১৭

Simla Agreement
2 July 1972

This agreement on Bilateral Relations between India and Pakistan was signed after the 1971 India-Pakistan War, in which Pakistan was defeated conclusively and which resulted in the creation of Bangladesh. India refrained from attacking or finishing off Pakistan and signed this agreement with the hope that henceforth the countries in the region would be able to live in peace with each other. The then Pakistani Prime Minister, Zulfiqar Ali Bhutto, also promised the then Indian Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, that his country would accept the Line of Control (LOC) in the state of J&K as the de facto border and would not try to destabilise it. This was not formally entered in the agreement because Bhutto said it would cause domestic problems for him at this juncture. Mrs Gandhi magnanimously accepted his promise and did not formalise that part of the agreement. But Pakistan, as later events were to prove, never kept its part of the deal.

(I) The Government of India and the Government of Pakistan are resolved that the two countries put an end to the conflict and confrontation that have hitherto marred their relations and work for the promotion of a friendly and harmonious relationship and the establishment of durable peace in the sub-continent, so that both countries may henceforth devote their resources and energies to the pressing task of advancing the welfare of their peoples.

In order to achieve this objective, the Government of India and the Government of Pakistan have agreed as follows:

(i) That the principles and purposes off the Charter of the United Nations shall govern the relations between the countries;

(ii) That the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon between them. Pending the final settlement of any of the problems between the two countries, neither side shall unilaterally alter the situation and both shall prevent the organization, assistance

www.pathagar.com

or encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relations.

(iii) That the pre-requisite for reconciliation, good-neighbourliness and durable peace between them is a commitment by both countries to peaceful co-existence, respect for each other's territorial integrity and sovereignty and non-interference in each other's internal affairs, on the basis of equality and mutual benefit;

(iv) That the basic issues and causes of conflict which have bedevilled the relations between the two countries of the last twenty-five years shall be resolved by peaceful means;

(v) That they shall always respect each other's national unity, territorial integrity, political independence and sovereign equality;

(vi) That in accordance with the Charter of the United Nations, they shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of each other;

(II) Both Governments will take all steps within their power to prevent hostile propaganda directed against each other. Both countries will encourage the dissemination of such information as would promote the development of friendly relations between them;

(III) In order progressively to restore and normalize relations between the two countries step by step, it was agreed that;

(i) Steps shall be taken to resume communications, postal, telegraphic, sea, land including border posts, and air links including overflights;

(ii) Appropriate steps shall be taken to promote travel facilities for the nationals of the other country;

(iii) Trade and co-operation in economic and other agreed fields will be resumed as far as possible;

(iv) Exchange in the fields of science and culture will be promoted. In this connection delegations from the two countries will meet from time to time to work out the necessary details.

(IV) In order to initiate the process of the establishment of durable peace, both Governments agree that:

www.pathagar.com

(i) Indian and Pakistani forces shall be withdrawn to their side of the international border;

(ii) In Jammu and Kashmir, the line of control resulting from the cease-fire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual differences and legal interpretations. Both sides further undertake to refrain from the threat of the use of force in violation of this line;

(iii) The withdrawals shall commence upon entry into force of this Agreement and shall be completed within a period of thirty days thereof.

(V) This Agreement will be subject to ratification by both countries in accordance with their respective constitutional procedures, and will come into force with effect from the date on which the Instruments of Ratification are exchanged.

(VI) Both Governments agree that their respective Heads will meet again at a mutually convenient time in the future and that, in the meanwhile, the representatives of the two sides will meet to discuss further the modalities and arrangements for the establishment of a durable peace and normalization of relations, including the questions of repatriation of prisoners of war and civilian internees, a final settlement of Jammu and Kashmir and the resumption of diplomatic relations.

Sd/-
Indira Gandhi
Prime Minister
Republic of India

Sd/-
Zulfiqar Ali Bhutto
President
Islamic Republic of Pakistan

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ১৮

Tripartite Agreement between India, Bangladesh and Pakistan for normalisation of relations in the subcontinent

New Delhi, April 9, 1974.

1. On July 2, 1972, the President of Pakistan and the Prime Minister of India signed an historic agreement at Shimla under which they resolved that the two countries put an end to the conflict and confrontation that have hitherto marred their relations and work for the promotion of a friendly and harmonious relationship and the establishment of durable peace in the sub-continent. The Agreement also provided for the settlement of "their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon."
2. Bangladesh welcomed the Shimla Agreement. The Prime Minister of Bangladesh strongly supported its objective of reconciliation, good neighborliness and establishment of durable peace in the sub-continent.
3. The humanitarian problems arising in the wake of the tragic events of 1971 constituted a major obstacle in the way of reconciliation and normalisation among the countries of the sub-continent. In the absence of recognition, it was not possible to have tripartite talks to settle the humanitarian problems, as Bangladesh could not participate in such a meeting except on the basis or sovereign equality.
4. On April 17, 1973 India and Bangladesh took a major step forward to break the deadlock on the humanitarian issues by setting aside the political problems of recognition. In a Declaration issued on that date they said that they "are resolved to continue their efforts to reduce tension, promote friendly and harmonious relationship in the sub-continent and work together towards the establishment of a durable peace." Inspired by this vision and "in the larger interests of reconciliation, peace and stability in the sub-continent" they jointly proposed that the problem of the detained and stranded persons should be resolved on humanitarian considerations through simultaneous repatriation of all such persons except those Pakistani

www.pathagar.com

prisoners of war who might be required by the Government of Bangladesh for trial on certain charges.

5. Following the Declaration there were a series of talks between India and Bangladesh and India and Pakistan. These talks resulted in an agreement at Delhi on August 28, 1973 between India and Pakistan with the concurrence of Bangladesh, which provided for a solution of the outstanding humanitarian problems.
6. In pursuance of this Agreement, the process of three-way repatriation commenced on September 19, 1973. So far nearly 300,000 persons have been repatriated which has generated an atmosphere of reconciliation and paved the way for normalisation of relations in the sub-continent.
7. In February 1974, recognition took place thus facilitating the participation of Bangladesh in the tripartite meeting envisaged in the Delhi Agreement, on the basis of sovereign equality. Accordingly His Excellency Dr. Kamal Hossain, Foreign Minister of the Government of Bangladesh, His Excellency Sardar Swaran Singh, Minister of External Affairs, Government of India and His Excellency Mr. Aziz Ahmed, Minister of State for Defense and Foreign Affairs of the Government of Pakistan met in New Delhi from April 5th to April 9th, 1974 and discussed the various issues mentioned in the Delhi Agreement in particular the question of the 195 prisoners of war and the completion of the three-way process of repatriation involving Bengalese in Pakistan, Pakistanis in Bangladesh and Pakistani prisoners of war in India.
8. The Ministers reviewed the progress of the three-way repatriation under the Delhi Agreement of August 28, 1973. They were gratified that such a large number of persons detained or stranded in the three countries had since reached their destinations.
9. The Ministers also considered steps that needed to be taken in order expeditiously to bring the process of the three-way repatriation to a satisfactory conclusion.
10. The Indian side stated that the remaining Pakistani prisoners of war and civilian internees in India to be repatriated under the Delhi Agreement, numbering approximately 6,500, would be repatriated at the usual pace of a train on alternate days and the likely short-fall due to the suspension of trains from April 10th to April 19th, 1974 on account of Kumbh Mela, would be made up by running additional trains after

www.pathagar.com

April 19th. It was thus hoped that the repatriation of prisoners of war would be completed by the end of April 1974.

11. The Pakistan side stated that the repatriation of Bangladesh nationals from Pakistan was approaching completion. The remaining Bangladesh nationals in Pakistan would also be repatriated without let or hindrance.

12. In respect of non-Bengalese in Bangladesh, the Pakistan side stated that the Government of Pakistan had already issued clearances for movement to Pakistan in favour of those non-Bengalees who were either domiciled in former West Pakistan, were employees of the Central Government and their families or were members of the divided families, irrespective of their original domicile. The issuance of clearances to 25,000 persons who constitute hardship cases was also in progress. The Pakistan side reiterated that all those who fall under the first three categories would be received by Pakistan without any limit as to numbers. In respect of persons whose applications had been rejected, the Government of Pakistan would, upon request, provide reasons why any particular case was rejected. Any aggrieved applicant could, at any time, seek a review of his application provided he was able to supply new facts or further information to the Government of Pakistan in support of his contention that he qualified in one or other of the three categories. The claims of such persons would not be time-barred. In the event of the decision of review of a case being adverse, the Governments of Pakistan and Bangladesh might seek to resolve it by mutual consultation.

13. The question of 195 Pakistani prisoners of war was discussed by the three Ministers, in the context of the earnest desire of the Governments for reconciliation, peace and friendship in the sub-continent. The Foreign Minister of Bangladesh stated that the excesses and manifold crimes committed by these prisoners of war constituted, according to the relevant provisions of the U.N. General Assembly Resolutions and International Law, war crimes, crimes against humanity and genocide, and that there was universal consensus that persons charged with such crimes as the 195 Pakistani prisoners of war should be held to account and subjected to the due process of law. The Minister of State for Defense and Foreign Affairs of the Government of Pakistan said that his Government condemned and deeply regretted any crimes that may have been committed.

www.pathagar.com

14. In this connection the three Ministers noted that the matter should be viewed in the context of the determination of the three countries to continue resolutely to work for reconciliation. The Ministers further noted that following recognition; the Prime Minister of Pakistan had declared that he would visit Bangladesh in response to the invitation of the Prime Minister of Bangladesh and appeal to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the, past, in order to promote reconciliation. Similarly, the Prime Minister of Bangladesh had declared with regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971 that he wanted the people to forget the past and to make a fresh start, stating that the people or Bangladesh knew how to forgive.
15. In the light of the foregoing and, in particular, having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past, the Foreign Minister of Bangladesh stated that the Government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemency. It was agreed that the 195 prisoners of war may be repatriated to Pakistan along with the other prisoners of war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement.
16. The Ministers expressed their conviction that the above agreements provide a firm basis for the resolution of the humanitarian problems arising out of the conflict of 1971. They reaffirmed the vital stake the seven hundred million people of the three countries have in peace and progress and reiterated the resolve of their Governments to work for the promotion of normalisation of relations and the establishment of durable peace in the sub-continent.

Signed in New Delhi on April 9th, 1974 in three originals, each of which is equally authentic.

Sd/	Sd/-	Sd/-
(KAMAL HOSSAIN)	(SWARAN SINGH)	(AZIZ AHMED)
Minister of Foreign Affairs	Minister of External Affairs	Minister of State for
Government of Bangladesh	Government of India	Defense and foreign Affairs
		Government of Pakistan

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ১৯

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

রোম ষ্ট্যাটিউট ১৯৯৮ এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা

Article 4 : Legal status and powers of the Court

1. The Court shall have international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.
2. The Court may exercise its functions and powers, as provided in this Statute, on the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory of any other State.

Article 20 :

1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the Court with respect to conduct which formed the basis of crimes for which the person has been convicted or acquitted by the Court.
2. No person shall be tried by another court for a crime referred to in article 5 for which that person has already been convicted or acquitted by the Court.

Article 21(1) : The Court shall apply

a. In the first place, this Statute, Elements of Crimes and its Rules of Procedure and Evidence;

b. In the second place, where appropriate, applicable treaties and the principles and rules of international law, including the

www.pathagar.com

established principles of the international law of armed conflict;

Failing that, general principles of law derived by the Court from national laws of legal systems of the world including, as appropriate, the national laws of States that would normally exercise jurisdiction over the crime, provided that those principles are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms and standards.

Article 21(3):

The application and interpretation of law pursuant to this article must be consistent with internationally recognized human rights, and be without any adverse distinction founded on grounds such as gender as defined in article 7, paragraph 3, age, race, colour, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other status.

Article 22(1):

The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or convicted.

Article 22(2):

The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or convicted.

Article 24 (1) :

No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute.

Article 41 (2)

(a) A judge shall not participate in any case in which his or her impartiality might reasonably be doubted on any ground. A judge shall be disqualified from a case in accordance with this paragraph if, inter alia, that judge has previously been

www.pathagar.com

involved in any capacity in that case before the Court or in a related criminal case at the national level involving the person being investigated or prosecuted. A judge shall also be disqualified on such other grounds as may be provided for in the Rules of Procedure and Evidence.

(b) The Prosecutor or the person being investigated or prosecuted may request the disqualification of a judge under this paragraph

(c) Any question as to the disqualification of a judge shall be decided by an absolute majority of the judges. The challenged judge shall be entitled to present his or her comments on the matter, but shall not take part in the decision.

Article 27(1)

This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.

Article 27 (2)

Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person

Article 28

In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:

(a) A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:

www.pathagar.com

i) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and

(ii) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

(b) With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:

(i) The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;

(ii) The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and

(iii) The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Article 33 :

1. The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian shall not relieve that person of criminal responsibility unless:

(a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question;

(b) The person did not know that the order was unlawful; and

(c) The order was not manifestly unlawful.

Article 36(7)

No two judges may be nationals of the same State. A person who, for the purposes of membership of the Court, could be regarded as a

www.pathagar.com

national of more than one State shall be deemed to be a national of the State in which that person ordinarily exercises civil and political rights.

Article 39(2)

(a) The judicial functions of the Court shall be carried out in each division by Chambers.

(b) (i) The Appeals Chamber shall be composed of all the judges of the Appeals Division;

(ii) The functions of the Trial Chamber shall be carried out by three judges of the Trial Division;

(iii) The functions of the Pre-Trial Chamber shall be carried out either by three judges of the Pre-Trial Division or by a single judge of that division in accordance with this Statute and the Rules of Procedure and Evidence;

Article 39(4)

Judges assigned to the Appeals Division shall serve only in that division. Nothing in this article shall, however, preclude the temporary attachment of judges from the Trial Division to the Pre-Trial Division or vice versa, if the Presidency considers that the efficient management of the Court's workload so requires, provided that under no circumstances shall a judge who has participated in the pre-trial phase of a case be eligible to sit on the Trial Chamber hearing that case.

Article 51

1. The Rules of Procedure and Evidence shall enter into force upon adoption by a two thirds majority of the members of the Assembly of States Parties.
2. Amendments to the Rules of Procedure and Evidence may be proposed by
   (a) Any State Party;
   (b) The judges acting by an absolute majority; or
   (c) The Prosecutor.

Such amendments shall enter into force upon adoption by a two-thirds majority of the members of the Assembly of States Parties.

www.pathagar.com

Article 66 (1)

Everyone shall be presumed innocent until proved guilty before the Court in accordance with the applicable law.

Article 67 (b):

To have adequate time and facilities for the preparation of the defence and to communicate freely with counsel of the accused's choosing in confidence;

Article 82:

1. Either party may appeal any of the following decisions in accordance with the Rules of Procedure and Evidence:

(a) A decision with respect to jurisdiction or admissibility;

(b) A decision granting or denying release of the person being investigated or prosecuted;

(c) A decision of the Pre-Trial Chamber to act on its own initiative under article 56, paragraph 3;

(d) A decision that involves an issue that would significantly affect the fair and expeditious conduct of the proceedings or the outcome of the trial, and for which, in the opinion of the Pre-Trial or Trial Chamber, an immediate resolution by the Appeals Chamber may materially advance the proceedings.

2. A decision of the Pre-Trial Chamber under article 57, paragraph 3 (d), may be appealed against by the State concerned or by the Prosecutor, with the leave of the Pre-Trial Chamber. The appeal shall be heard on an expedited basis.

3. An appeal shall not of itself have suspensive effect unless the Appeals Chamber so orders, upon request, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.

4. A legal representative of the victims, the convicted person or a bonafide owner of property adversely affected by an order under article 75 may appeal against the order for reparations, as provided in the Rules of Procedure and Evidence.

www.pathagar.com

THE TIMES OF INDIA

Rest of World

The Times of India

You are here: Home » World » Rest of World

269,000 people died in Bangladesh war, says new study

PTI, Jun 20, 2008, 09.09am IST

LONDON: As many as 269,000 people died during the war leading to the liberation of Bangladesh in 1971, nearly five times more than the previously estimated figure, a new study says.

The study, titled 'Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from the world health survey programme', published in the*British Medical Journal* said "war causes more deaths than previously estimated, and there is no evidence to support a recent decline in war deaths".

Earlier estimates of casualties during the Bangladesh war were in the region of 58,000, the study noted.

The objective of the survey was to provide an accurate estimate of deaths in wars. The study analysed estimated deaths from war injuries in 13 countries over 50 years, including Bangladesh and Sri Lanka.

Between 1975 and 2002, the study says that the ongoing ethnic conflict in Sri Lanka between the government and Tamil Tigers accounted for the death of 215,000 people, while earlier estimates put the figure at around 61,000.

"Accurate estimates of war mortality are crucial for planning on several different levels. Political, military, and public health leaders must have credible information on the number of deaths to plan properly before, during, and after wars.

"The public must also be aware of the human cost of wars. Information on war deaths is useful in the investigation of the scope of war crimes, as in the Nuremburg Trials after the second world war or the international criminal tribunal for the former Yugoslavia," the study says.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ২১

জিয়ার উনিশ দফা কর্মসূচী

১. সর্ব উপায়ে নিজেদের একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।
২. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
৩. সংবিধানের চার মূলনীতি ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা, গনতন্ত্র বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।
৪. প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রম ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।
৬. দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভুখা না থাকে তার ব্যবস্থা করা।
৭. দেশে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে অন্তত সকলের জন্য মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করা।
৮. কোনো নাগরিক যাতে গৃহহীন না থাকে তার ব্যবস্থা করা।
৯. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
১০. সকল দেশবাসীর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
১১. সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সম্প্রদায়কে সংসংহত করে দেশ গঠনে নিয়োগ করা।
১২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দান।
১৩. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
১৪. সরকারি কর্মচারিদের দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা।
১৫. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।
১৬. সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।
১৭. প্রশাসন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।
১৮. দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।
১৯. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ২২

SALIENT EXTRACTS FROM
THE LEGAL FRAMEWORK ORDER, 1970
PRESIDENT'S ORDER P.O. 2 OF 1970
LEGAL FRAMEWORK ORDER 1970
(Gazette of Pakistan, Extraordinary, 30th March 1970)

No. F. 24 (1)/70-Pub.——The following Order made by the President is hereby published for general information: Whereas in his first address to the nation on the 26th March 1969, the President and Chief Martial Law Administrator pledged himself to strive to restore democratic institutions in the country;

And whereas in his address to the nation on the 28th November 1969, he reaffirmed that pledge and announced that polling for a general election to a National Assembly of Pakistan will commence on the 5th October 1970;

And whereas he has since decided that polling for elections to the Provincial Assemblies shall commence not later than the 22nd October 1970;

And whereas provision has already been made by the Electoral Rolls Order, 1969, for the preparation of electoral rolls for the purpose of election of representatives of the people on the basis of adult franchise;

And whereas it is necessary of making provision as to the Constitution of Pakistan in accordance with this Order and a Provincial Assembly for each province;

Now, therefore, in pursuance of the Proclamation of the 25th day of March 1969, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President and Chief Martial Law Administrator is pleased to make the following Order:—

4. *Composition of the National Assembly.*—

(1) There shall be a National Assembly of Pakistan consisting of three hundred and thirteen members of whom three hundred shall be elected to fill general seats and thirteen to fill seats reserved for women.

(2) In conformity with the population figures appearing in the Census of 1961, the number of seats in the National Assembly

www.pathagar.com

shall be distributed amongst the Provinces and the Centrally Administered Tribal Areas, as set out in Schedule I.

(3) Clause (1) shall not be construed as preventing a. woman from being elected to a general seat.

5. *Composition of the Provincial Assemblies.—*

(1) There shall be a Provincial Assembly for each Province consisting of the number of members, elected to fill general seats and to fill seats reserved for women, as set out in Schedule II in relation to such Province.

(2) Clause (1) shall not be construed as woman from being elected a general seat preventing a woman from being elected to a general seat.

6. *Principle of election.—*

(1) Except as provided in clause (2), the members shall, be elected to the general seats, from territorial constituencies by direct election on the basis of adult franchise in accordance with law.

(2) The President may, by regulation, make separate provision for election of members from the Centrally Administered Tribal Areas.

(3) As soon as practicable after the general election of members of the National Assembly, the members from a Province for the seats reserved for women in that Assembly shall be elected by persons elected to the general seats from that Province in accordance with law.

(4) The members for the seats reserved for women in a Provincial Assembly shall be elected by persons elected to the general seats in that Assembly in accordance with law.

12. *Oath of members of Assembly:—* A person elected as a member of an Assembly shall, before entering upon the office, take and subscribe before a person presiding at a meeting of the Assembly, an oath or affirmation in the following form, namely:—

"I ___________ do solemnly swear (or affirm that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and that I will discharge the duties upon which I am about to enter honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the provisions of the Legal Framework Order 1970, the Law and rules of the Assembly set out in that Order, and always in the interest of the solidarity, integrity, well-being and prosperity of Pakistan."

www.pathagar.com

14. *Summoning of National Assembly etc.—*

(1) After the close of the general election of members of the National Assembly, the President shall, for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, summon the National Assembly to meet on such day and at such time and place as he may think fit; and the National Assembly so summoned shall stand constituted on the day of its first meeting:

Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the President from summoning the National Assembly on the ground that all the seats of the members have not been filled.

(2) After meeting as convened under clause (1), the National Assembly shall meet at such times and places as the Speaker may decide.

(3) The National Assembly shall, subject to reasonable adjournments, meet from day to day to transact its business.

15. *Right of address etc. of President.—* The President may address the National Assembly and send a message or messages to the Assembly.

16. *Speaker and Deputy Speaker.—*

(1) The National Assembly shall, as soon as may be, elect two of its members to be respectively the Speaker and Deputy Speaker thereof and shall, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, elect another, member to be the Speaker or, as the case may be, Deputy Speaker.

(2) Until the Speaker and Deputy Speaker are elected, the Commissioner shall preside at the meetings of the National Assembly and, perform the functions of Speaker.

17. *Quorum and Rules of Procedure.—*

(1) If, at, an time during a meeting of the National Assembly, the attention of the person presiding at the meeting is drawn to the fact that the number of persons present is less than one hundred, the person presiding shall either suspend the meeting until the number of members present is not less than one hundred or adjourn the meeting.

(2) The procedure of the National Assembly shall be regulated by the rules of procedure set Out in Schedule III; in particular the National Assembly, shall decide how a decision relating to the Constitution Bill is to be taken.

www.pathagar.com

20. *Fundamental Principles of the constitution.*— The Constitution' shall be so framed as to embody the following fundamental principles:—

(1) Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan in which the Provinces and other territories which are now and may hereafter be included in Pakistan shall be so united in a Federation that the independence, the territorial integrity and the national solidarity of Pakistan are ensured and the unity of the Federation is not in any manner impaired.

(2) (a) Islamic Ideology which is the basis for the creation of Pakistan shall be preserved; and
(b) the Head of the State shall be a Muslim.

(3) (a) Adherence to fundamental principles of democracy shall be ensured by providing direct and free periodical elections to the Federal and the Provincial Legislatures on the basis of population and adult franchise;
(b) the Fundamental Rights of the citizens shall be laid down and guaranteed;
(c) the independence of the judiciary in the matter of dispensation of justice and enforcement of the fundamental rights shall be secured.

(4) All powers including legislative, administrative and financial, shall be so distributed between the Federal Government and the Provinces that the Provinces shall have maximum autonomy, that is to say maximum legislative, administrative and financial powers but the Federal Government shall also have adequate powers including legislative, administrative and financial powers, to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the country.

(5) It shall be ensured that:—
(a) the people of all areas in Pakistan shall be enabled to participate fully in all, forms of national activities; and
(b) within a specified period, economic and all other disparities between the Provinces and between different area in a Province are removed by the adoption of statutory and other measures.

21. *Preamble of the Constitution.*—

www.pathagar.com

The Constitution shall contain, in its preamble, an affirmation that:—

(1) the Muslims of Pakistan shall be enabled, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah; and

(2) the minorities shall be enabled to profess and practice their religions freely and to enjoy all rights, privileges and protection due to them as citizens of Pakistan.

22. *Directive Principles.—*

The Constitution shall set out directive principles of State Policy by which the State shall be guided in the matter of—

(1) promoting Islamic way of life;

(2) observance of Islamic moral standards;

(3) providing facilities for the teaching of Holy Quran and Islamiat to the Muslims of Pakistan; and

(4) enjoining that no law repugnant to the teachings and requirements of Islam, as set out in the Holy Quran and Sunnah, is made.

23. *ational and Provincial Assemblies to be the first Legislature.—*

The Constitution shall provide that.—

(1) the National Assembly, constituted under this Order, shall,—

   (a) be the first Legislature of the Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of one House, and

   b) be the first lower House of the Legislature of the Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of two Houses.

(2) The Provincial Assemblies elected in accordance with this Order shall be the first Legislatures of the respective Provinces for the full term.

24. *Time for framing the Constitution.—*

The National Assembly shall frame the Constitution in the form of a Bill to be called the Constitution Bill within a period of one hundred and twenty days from the date of its first meeting and on its failure to do so shall stand dissolved.

25. *Authentication of the Constitution. —*

www.pathagar.com

The Constitution Bill, as passed by the National Assembly, shall be presented to the President for authentication. The National Assembly shall stand dissolved in the event that authentication is refused.

26. *Purpose for which Assembly may meet.—*

(1) Save as provided in this Order for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, the National Assembly shall not meet in that capacity, until the Constitution Bill passed by that Assembly and authenticated by the President, has come into force.

(2) A Provincial Assembly shall not be summoned to meet until after the Constitution Bill passed by the National Assembly has been authenticated by the President, and has come into force.

27. *Interpretation and amendment of Order etc.—*

(1) Any question or doubt as to the interpretation of any provision of this Order shall be resolved by a decision of the President, and such decision shall be final and not liable to be questioned in any Court,

(2) The President and not the National Assembly shall have the power to make any amendment in this Order.

Areas	General	Women
East Pakistan	162	7
The Punjab	82	3
Sindh	27	1
Baluchistan	4	1
The North-West Frontier Province	18	1
Centrally Adminstered Ares	7	
T O T A L ..	**300**	**13**

পরিশিষ্ট ২৩

দৈনিক জনকণ্ঠ চতুরঙ্গ অক্টোবর ২০ বুধবার

সর্বজনীন দুর্গাপুজা এবং রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন

শাহরিয়ার কবির

দুর্গাপুজা বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। যখন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখ-িত হয়নি, যখন বাংলাদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিপ্রয়াণ ঘটেনি- তখন দুর্গাপুজা নিছক ধর্মীয় উৎসব ছিল না, দুর্গাপুজার প্রাঙ্গণ ছিল ধর্ম, বর্ণ, বিত্ত নির্বিশেষে বাঙালির মিলনমেলা। মুসলমানদের ঈদ এবং

www.pathagar.com

খ্রীস্টানদের বড়দিনের উৎসবও এক সময় ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধে ছিল। ধর্মের নামে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ ও হানাহানি তখনও বাঙালিত্বের চেতনাকে আচ্ছন্ন করেনি।

'৪৮-এর দেশভাগের পর বাংলাদেশ যখন ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়– এ দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দুর অভিপ্রয়াণ ছিল বাঙালিত্বের চেতনার উপর সবচেয়ে বড় আঘাত। ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকরা বাংলাকেও দু'টুকরো করেছিল। ধর্ম কীভাবে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় মনুষ্যত্বকে হত্যা করে তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই উপমহাদেশে সোয়া শ' বছরের সাম্প্রদায়িক হানাহানির ভেতর, যার চূড়ান্ত বহির্প্রকাশ ঘটেছে ভারতবর্ষের বিভক্তিকরণ এবং পাকিস্তানের অভ্যুদয়ে। ইংরেজরা চলে গেলে ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর শাসনে মুসলমানরা নিরাপদ থাকবে না– এই যুক্তিতে যারা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন তারা ঠিকই জানতেন পাকিস্তানের অভ্যুদয় কখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী নেতারা জিন্নাহকে এমনও বুঝিয়েছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ভারতের সব মুসলমান কখনও পাকিস্তান যাবে না, বরং ভারতের মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পাবে, তারা আরও হীনবল হবে। জিন্নাহ কোন যুক্তির ধার ধারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন, ক্ষমতার শীর্ষ আসনটি। ভারতবর্ষে গান্ধী, নেহরু, প্যাটেলের মতো নেতা থাকতে তার পক্ষে দিল্লির মসনদে বসা সম্ভব হবে না মূলত এই বিবেচনা থেকেই জিন্নাহ পাকিস্তান চেয়েছেন এবং এর জন্য হিন্দু আর মুসলমান দুটো আলাদা জাতি, এক সঙ্গে তারা থাকতে পারে না এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন।

পাকিস্তান হওয়ার পর এই জিন্নাহই আবার ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার কথা বলেছেন। আরও বলেছেন পাকিস্তানে মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ সবাই সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে। জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে। বিলেতফেরত আধুনিক ব্যারিস্টার ছিলেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকেও সেক্যুলার ছিলেন (যাকে এক সময় সরোজিনী নাইডু 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই জিন্নাহ পরে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন এবং এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন, যার জন্য বিপর্যস্ত ও ধ্বংস হয়েছে কয়েক কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা।

মাতৃভূমি বা জন্মভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার বেদনা মানুষ কখনও ভুলতে পারে না। তবে ধর্মীয় পরিচয়কে যদি বিবেচনায় আনা হয় দেখা যাবে, এই বেদনা মুসলমানের চেয়ে হিন্দু অনেক বেশি। ধর্মের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত মুসলমানরা মনে করে, তাদের কোনো মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি নেই। যেখানে ধর্মপালন-প্রচার ও জীবিকার সুযোগ রয়েছে, মুসলমান সেখানেই গেছে এবং এ কারণেই ইসলাম ধর্ম এত দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।

হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্যতম অনুষঙ্গ স্বদেশপ্রেম-স্বদেশকে মাতৃরূপ বন্দনা। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। এর সঙ্গে আরও যুক্ত রয়েছে ধর্মীয় আচার। ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় কতটুকু আছে জানি না– বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় আচারের ভেতর পৈত্রিক ভিটায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো একটি অবশ্যকর্তব্য। নিতান্ত বাধ্য না হলে বাঙালি হিন্দু সাধারণভাবে চিরদিনের জন্য ভিটেমাটির বাঁধন ছিঁড়তে পারে না। পাকিস্তান হওয়ার পর দেখেছি, ভারতের মুসলমান যারা পাকিস্তানে এসেছে সাধারণভাবে তাদের লক্ষ্য ছিল অধিক প্রাপ্তি, আর পাকিস্তানের যেসব হিন্দু ভারতে গেছে, তার প্রধান কারণ ছিল সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, তাদের বাধ্য করা হয়েছে জন্মভূমি ত্যাগ করতে। দেশভাগের সময় বিহার, গুজরাট, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের অনেক জায়গায় মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বটে তবে এই নির্যাতিতরা সবাই পাকিস্তানে আসেনি, অনেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় সরে গেছে। এমনকি পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন জিন্নাহর মতো নেতাও বম্বে ও দিল্লীতে সম্পত্তি কিনেছেন।

www.pathagar.com

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বাঙালি যেমন মেনে নিতে পারেনি, ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গও সচেতন বাঙালি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বাংলাদেশকে দু'টুকরো না করার জন্য সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু ও আবুল হাশিমের আন্তরিক উদ্যোগের কথা আমরা জানি। দুর্ভাগ্য এই যে, মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস উভয় দলের শীর্ষ নেতারা তখন পাঞ্জাবের মতো বাংলাকে দ্বিখ- করার পক্ষে ছিলেন। বাঙালিত্বের উপর প্রথম আঘাত এসেছিল ১৯০৫ সালে, যে আঘাতের চিহ্ন ছ' বছর পরই মিলিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সালের আঘাতের চিহ্ন কখনও মুছবে বলে মনে হয় না।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে মূলমন্ত্র হিসেবে প্রেরণা জুগিয়েছে তার প্রধান কারণ যদিও বাঙালির প্রতি পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকদের কলোনিসুলভ মনোভাব-এর পাশাপাশি লক্ষ্য ছিল বাঙালির চেতনায় যে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে এককভাবে পুজা অনুষ্ঠান করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালেই গ্রামাঞ্চলে বর্ণবিভেদ ভুলে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ একত্রিত হয়ে চাঁদা তুলে পুজার অনুষ্ঠান শুরু করেন, যা এখন সর্বজনীন পুজা হিসেবে পরিচিত। পুরো প্রত্যয়টিই ছিল নতুন। কারণ এর আগে এখানে এভাবে পুজা অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করা হয়নি। (বাংলাদেশের উৎসব, মুনতাসীর মামুন, ঢাকা-১৯১৪, পৃ. ৮৮)

মামুনের গবেষণা পূর্ববঙ্গের ভেতর সীমাবদ্ধ। আমরা যদি বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করি তাহলে দেখব, ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সর্বজনীন দুর্গাপুজা'য় অংশগ্রহণ করেছেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন। বাঙালিত্বের চেতনায় হিন্দু-মুসলিম দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়কে একযোগে ব্রিটিশ শাসকদের রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। কবিগুরুর মিছিলে অংশ নিয়েছেন ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালি। একে অপরের হাতে সৌভ্রাত্রের রাখি বেধেছেন। এভাবেই ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল বাংলাদেশের সুধী সমাজ।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে তখন উৎসাহিত করা হয়েছিল সর্বজনীন দুর্গাপুজা ও শারদোৎসবকে। বিজয়-সম্মিলন বাগধারাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রীবন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম সচেতনভাবে চেয়েছিলেন দুর্গাপুজাকে বাঙালির সামাজিক উৎসবে পরিণত করতে এবং বাঙালিত্বের চেতনায় এই উৎসব সম্পৃক্ত করতে। ১৯০৫ সালের বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে তিনি এক অসাধারণ ভাষণ প্রদান করেছিলেন, যেখানে দুর্গাপুজার ধর্মীয় পরিচয় অতিক্রম করেছিল স্বদেশপ্রেম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন– আশা করি আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়-সম্মিলন যে একটি নতুন জীবন লইয়া অপূর্বভাবে পরিপুষ্ট হইয়া পড়িল, সেই জীবনধারা কোনো দুর্দিনে কোনো সুদূরকালেও যেন শীর্ণ না হয়, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যে মিলন-উৎস বিধাতার সংকেত মাত্রে আমাদের দেশের পাষাণ-চাপা হৃদয় ভেদ করিয়া আজ অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আমাদের পাপে কোনো অভিশাপ কোনোদিন তাহাকে যেন শুষ্ক না করে।

'এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখ-ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খ-িত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম; বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম, এ কথা ভুলিয়াছিলাম যে, যে উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয়; সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে সুবর্ণম-িত এই যে নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালি জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কেহ একটি একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন চিরকাল ইহাই

www.pathagar.com

আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গিয়াছে, সেই তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

'একাকিনী যমুনা যেমন বহুদূর যাত্রার পরে একদিন সহসা বিপুলধারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, পূণ্য হইয়াছে, তেমনি আমাদের বাংলাদেশের বিজয়া-মিলন বহুকাল পরে আজ একটি দেশপ্লাবী সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সংহত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। আজ হইতে এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মতো আর কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়। আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধবসম্মিলন নহে, আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব।

'বন্ধুগণ, আজ আমাদের চোখের পর্দা যে কেমন করিয়া সরিয়া গিয়াছে সেই অভাবনীয় ব্যাপারের বার্তা বাংলায় কাহাকেও নূতন করিয়া শুনাইবার নাই। এতদিন আমরা মুখে বলিয়া আসিয়াছি; 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি তাহা আজ আমাদের কাছে যেমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তেমন কি পূর্বে আর কখনো হইয়াছিল? এ কি কোনো বক্তৃতায়, কোনো উপদেশে ঘটিয়াছে? তাহা নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয় এই আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম– বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখ- স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। সেই জন্যই আমাদের সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপর জননীর মাতৃদৃষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালি বাঙালির এত কাছে আসিয়া পড়িল আমাদের সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ মান-অপমান যে আমাদের সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে এ কথা বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেই জন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে, সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে, আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সম্মিলনে আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছে না-আনন্দের দিনে সমস্ত দেশের জন্য আমাদের গৃহদ্বার আজ অর্গলমুক্ত হইয়াছে। আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিতেছে। আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। (সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব-আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল। বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম।

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা, বাঙালিত্বের চেতনা ধ্বংস করা। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষ চরম নির্যাতন ভোগ করছেন গত তিন বছর ধরে, অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। সরাসরি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই, কিন্তু গত বছর দেখেছি, এ বছরও দেখছি– নীরবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা রেকর্ড সংখ্যক পূজাম-ব নির্মাণ করে। এখনও পূজাম-পে হামলা হয়, সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা এখনও প্রতিমা ভাঙে, লুট করে নিয়ে যায় পূজার উপকরণ, তারপরও তারা দুর্গাপূজা বন্ধ করতে পারেনি। এ প্রতিবাদ শুধু নির্যাতিত হিন্দুর নয়, এ প্রতিবাদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক সমগ্র বাঙালি জাতির। পুরাণে কিংবা ইতিহাসে অসুর ও পাশবশক্তি কেবল জয়ী হতে পারেনি।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলিম মৌলবাদীরা কিংবা ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের বহু রক্ত ঝরিয়েছে, তারপরও তারা ধর্মপালন থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারেনি। একজন মুসলিম মৌলবাদী যখন অমুসলমানকে হত্যা ও নির্যাতন করে তখন তা করা হয় ধর্মের নামে, ইসলামের দোহাই দিয়ে। একইভাবে হিন্দু মৌলবাদীরা যখন অহিন্দুদের হত্যা ও নির্যাতন করে সেটাও করা হয় হিন্দুত্বের দোহাই দিয়ে। মৌলবাদীদের কাছে ধর্ম হচ্ছে ক্ষমতায় থাকার বা যাওয়ার রাজনৈতিক হাতিয়ার, পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দানবীয় অস্ত্র। একজন শ্রেয়োচেতনার মানুষের কাছে ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের

www.pathagar.com

অন্তর্গত, যার সঙ্গে ক্ষমতা, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলাদলির কোনো সম্পর্ক নেই। যে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করে, হানাহানি-হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন মানুষকে প্ররোচিত করে সেটা ধর্মের নামে অধর্ম, যার মূলোৎপাটন ছাড়া মানুষ মানুষের মতো বাঁচতে পারবে না। ঈদ, বিজয়া, সম্মিলন বড় দিন বুদ্ধপূর্ণিমা এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে প্রকৃত অর্থে আবার সর্বজনীন সামাজিক উৎসবে পরিণত হবে, বাঙালিত্বের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে মানব জাতির মহামিলনের জয়গান গাইবে। এই প্রত্যয় ও স্বপ্ন নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে।

পরিশিষ্ট : ২৪

Lord Avebury[৭৭৩] confronts Law Minister over Bangladesh War Crimes Tribunal[৭৭৪]

July 28th, 2011 by Deirdre Montgomery

The Minister and Lord Eric Avebury also discussed the war crimes trials, and agreed that it was right and proper to bring alleged perpetrators of crimes committed during the liberation war to justice. Lord Avebury handed over a list of points he suggested might be addressed to ensure that the conduct of the trials would be fully in accordance with modern international norms, developed in the Rome Statute and connected procedures. The Minister said that the Bangladesh government had responded fully to the points raised by US War Crimes Ambassador Rapp in his letter of March 21, 2011. He said it was not necessary for the defendants to be represented by counsel of their choice, and that any lack of relevant experience on the part of Bangladesh counsel could be made up by training.

Matters of concern regarding the war crimes tribunal

(1) The refusal to allow foreign counsel to appear before the Tribunal. The decision maker, the Chairman of the Bar Council, is the Attorney General, a government appointee and a member of the prosecution team in the Chowdhury case at least. Further, the Attorney General and the Bar Council had commented that they would refuse the request before it was submitted, showing that it was predetermined;

(2) A number of members of the Tribunal participated in the Peoples' Inquiry Commission (or People's Court) that prejudged these cases in the early 1990s. Trials were held in which real suspects were convicted and

---

৭৭৩ Lord Eric Avebury, Chairman of the International Bangladesh Foundation and Co-Chair of the Chittagong Hill Tracts Commission. On 27 July 2011, he received the Law Minister of Bangladesh, Mr Shafiq Ahmed at Flodden Road.

৭৭৪ http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=3073 date: 31.07.2011

www.pathagar.com

effigies burnt to show the sentences of death passed. Some of those convicted then are now accused before the Tribunal – a copy is extant of the report naming the Chairman of the Tribunal as a member of the Commission;

(3) The failure to implement any of Ambassador Rapp's recommendations. Despite what may be said as to their effect, the Rules of Procedure are now worse than they were before. The Law Minister holds regular "strategy" meetings with the judges and prosecutors, which is inappropriate;

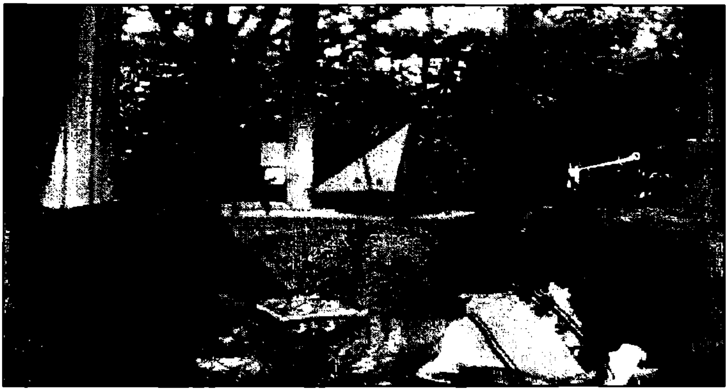

Lord Eric Avebury with Law Minister,
Shafique Ahmed, 27 July 2011

(4) The failure to amend the Act and the Constitution. The Law Minister represented to Ambassador Rapp that the Constitution couldn't be amended. This was untrue as the First Constitutional Amendment, the most egregious piece of legislation, was amended to the further detriment of accused. This was a misrepresentation to the US Government. Further, the Bangladesh Chief Justice misleadingly stated that interlocutory appeal lies with the Supreme Court, when there is no appeal except against conviction and sentence. There is no scope for challenging the judges, the Act, the Tribunal or any decision it issues. The Tribunal has adopted a rule that allows for review of its own decisions, the same judges being involved;

(5) Despite strong representations to act impartially and transparently, the Tribunal at the last hearing refused to give copies of written orders to the defence;

(6) At the last hearing the Tribunal in summing up the positions of the parties, made argument on behalf of the defence that were never

www.pathagar.com

made. This was clearly an attempt to bolster weak arguments by the prosecution;

(7) To date the prosecution has failed to disclose a single piece of paper. The Tribunal considers that the investigation is secret and therefore this is acceptable. This runs counter to the International Covenant on Civil and Political Rights to which Bangladesh is a State Party;

(8) The Tribunal has shown a complete disregard for complying with domestic and international law. If it considers itself a domestic criminal judicial organ then it should be required to comply with domestic law. If it considers itself to be an international body then it should comply with international law. At present it complies with neither;

(9) It has failed to properly define the crimes enumerated in section 3 of the Act;

(10) The authorities have taken 17 months since the Tribunal's formation and the accused have been in custody for almost a year. However, once charged, it is likely the defence will be granted 3 weeks to prepare;

(11)The Tribunal judges, prosecutors and investigators lack experience and training in a very complex field of law. If it is suggested that they have been trained by the ICC this is untrue, as has been verified this with the ICC itself;

(12) The rules still fail to safeguard fundamental rights. The inclusion of a number of rights into the Rules will not change this. The fact that the First Constitutional Amendment removes any rights guaranteed under the Constitution is of primary concern. This point was raised by Brad Adams of Human Rights Watch. The Law Minister's response was that "these men committed murder";

(13) The Tribunal is only targeting members of the opposition parties;

(14) The legislation is discriminatory in intent as it explicitly only allows prosecution on one side of the conflict;

(15) The Tribunal does not have the appearance of impartiality as the judges meet frequently with members of the Government and victims groups;

(16) The censoring of the media prevents any proper public debate. Any criticism of the Tribunal or the Government results in the threat of contempt proceedings;

(17) There appears to be little desire to do this openly, fairly, transparently and in accordance with international norms. There is a

www.pathagar.com

total reluctance to have any international scrutiny of the preparations or the proceedings. The only way to ensure the process is fair is to (a) allow foreign counsel: (b) allow international monitors; and (c) amend the legislative framework in accordance with international standards with full respect for fundamental rights and due process.

(18) The allegations by S K Chowdhury that he was tortured by the RAB, on each of the three occasions when he has been brought to the Tribunal, have not been investigated.

(19) The statements made by the accused during their interrogations cannot be used in court and therefore the interrogations appear to have been pointless.

(20) As far as known, there has been no response by the Foreign Minister or the Law Minister to the letter from Ambassador Rapp of March 21, 2011.

Eric Avebury

July27, 2011
Posted by Eric Avebury at 10:11 AM

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট -২৫

ইব্রাহীম কুট্টি নিহত হলে তার স্ত্রী মামলা করেন। এ মামলায় আল্লামা সাঈদী আসামী নন। অথচ ইব্রাহীম কুট্টিকে হত্যার দায়ে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। মামলার FIR

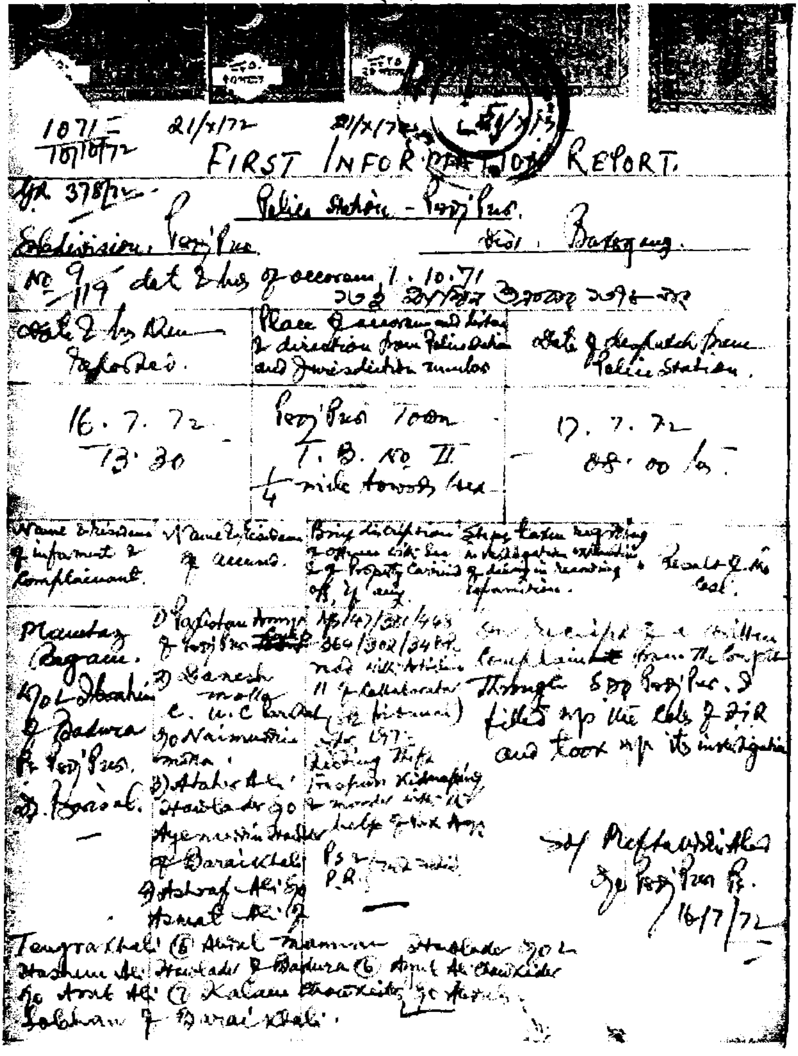
1071 — 21/7/72
FIRST INFORMATION REPORT.
Police Station - Pirojpur.
Sub-division: Pirojpur. Dist: Bakerganj.
No. 9/119 date & hrs. of occurrence 1.10.71
Date & hrs when reported. | Place of occurrence and distance & direction from Police Station and jurisdiction number | Date of despatch from Police Station.
16.7.72 13.30 | Pirojpur Town T.B. No. II ¼ mile towards … | 17.7.72 08.00 hrs.
Name & residence of informant & complainant. | Name & residence of accused. | Brief description of offence with section & of property carried off, if any. | Steps taken regarding investigation, explanation of delay in recording information. | Result of the case.
Momtaz Begum, W/o Ibrahim of Badura P.S. Pirojpur, Dt. Barisal. | 1) Pakistan Army of Pirojpur 2) Danesh Molla 3) Naimuddin 4) Atahar Ali 5) Ashraf Ali … | 147/148/149/364/302/34 … | … a written complaint from the complainant through S.D.O. Pirojpur … filled up the body of FIR and took up its investigation.
S/ … S.I. Pirojpur P.S. 16/7/72

www.pathagar.com

২

বিবাদী:- ১) [illegible] (মৃত) [illegible] ।

২) দানেশ মোল্লা, চেয়ারম্যান শান্তি কমিটি, পিং [illegible] [illegible] (মৃত) ৩) [illegible] [illegible] [illegible] সাং [illegible] ৪) [illegible] [illegible] [illegible] সাং [illegible] ৫) [illegible] [illegible] [illegible] সাং [illegible] ৬) [illegible] [illegible] পিং [illegible] সাং [illegible] ৭) [illegible] [illegible] পিং [illegible] [illegible] সাং [illegible] ৮) [illegible] [illegible] পিং [illegible] সাং [illegible] ৯) [illegible] [illegible] [illegible] সাং [illegible] ১০) [illegible] পিং [illegible] সাং [illegible] ১১) [illegible] [illegible] পিং [illegible] [illegible] সাং [illegible] ১২) [illegible] [illegible] [illegible] ১৬৭ [illegible] পিং [illegible] ১৩) [illegible] [illegible] পিং [illegible] [illegible] সাং [illegible] ।

সাক্ষী:- ১) [illegible] ২) [illegible]
৩) [illegible] [illegible] ৪) [illegible] [illegible]
৫) [illegible] [illegible] [illegible] ৬) [illegible]
৭) [illegible] [illegible] ৮) [illegible] [illegible]
৯) [illegible] [illegible] সাং [illegible] [illegible] [illegible]

www.pathagar.com

২

বিবরণ এই যে ঘটনার-দিন বিবাদীগণ [illegible]
[illegible] এর [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামক [illegible] সহিত
[illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] -
আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাকে
[illegible] [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] ও [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] [illegible]-
[illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] ও [illegible]
[illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] যে [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
হিন্দু আমাদের [illegible] [illegible] আমরা [illegible]
আশ্রয় [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]-
[illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible]-
আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
বিবাদীগণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

www.pathagar.com

প্রকাশ থাকে যে বর্তমান [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] কোন প্রতিবাদ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] হইল।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ইতি —

সই/ [illegible]

Copied by [illegible]

1.25
1.25
2.50

Compared by [illegible]

Certified to be True Copy
M. A. [illegible]
[illegible]/72

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - ২৬

আবদুল কাদের মোল্লার চিঠি

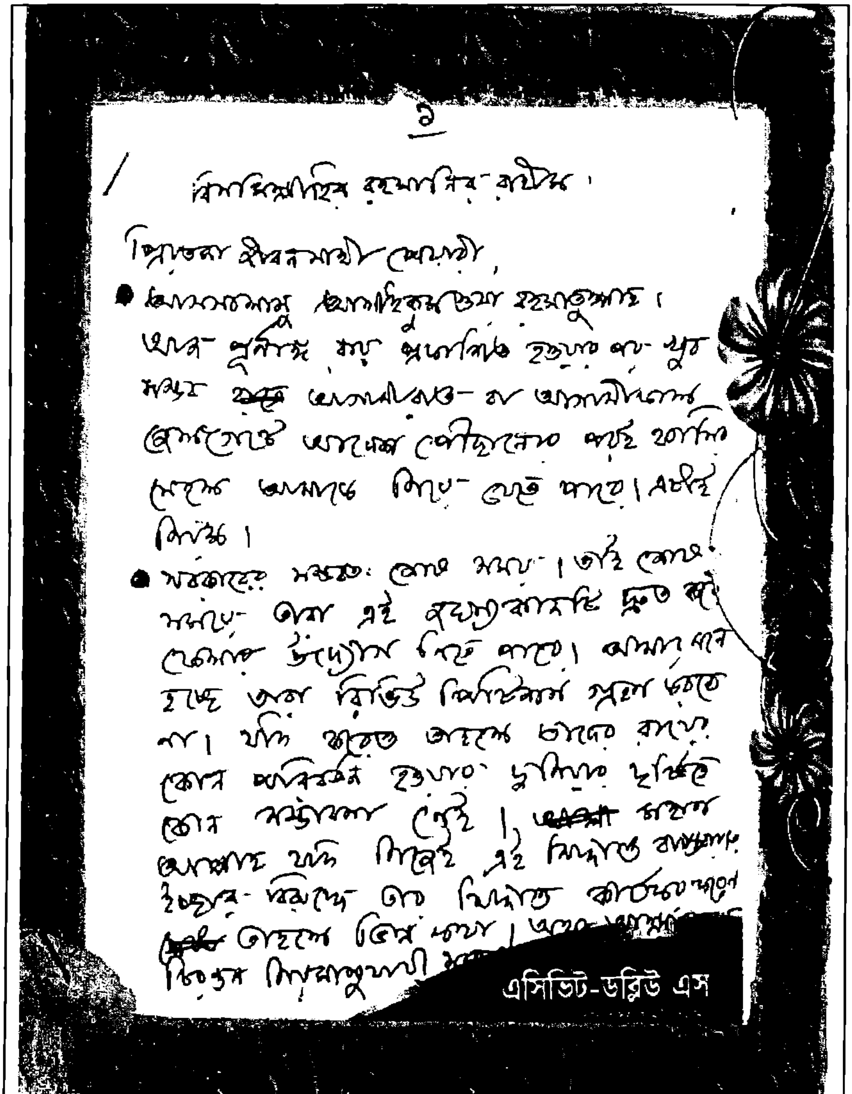

১

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

প্রিয়তমা জীবনসাথী পেয়ারী,

● আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।
খবর পুনরায় রায় প্রকাশিত হওয়ার পর যুদ্ধ
সময় ~~[illegible]~~ মানবতা-র আসামীদের
প্রেসিডেন্ট সাহেবের পৌঁছানোর পরই হয়ত
সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারে। এটাই
নিয়ম।

● সরকারের মতলব ভাল নয়। তাই কোন
সময় এই রহস্যজনক দ্রুত কাজ
নেবার উদ্যোগ নিতে পারে। আমার মনে
হচ্ছে তারা বিভিন্ন দিক থেকে [illegible]
না। যদি সত্যিই তাহলে তাদের মধ্যে
কোন পরিবর্তন হওয়ার দুনিয়ার দৃষ্টিতে
কোন সম্ভাবনা নেই। ~~[illegible]~~ তবে
আল্লাহ যদি নিজেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
হওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন
~~[illegible]~~ তাহলে ভিন্ন কথা। অন্য ব্যাপারে
চিন্তার নিয়মানুযায়ী [illegible]

এসিভিটি-ডব্লিউ এস

www.pathagar.com

2

না। আমার নীচেও যে অনুসরণ
কারোর হত্যা করেছে। [illegible] হযরত
আলী (রা:) এর সাহাবাদের কেউ একজন
সাহাবীর সাহাবীদের [illegible] একজন নিষ্ঠুর
ভাবে হত্যা করেছে। [illegible] আমার জানা
এ সমস্ত কার্যকলাপে বিন্দুমাত্র [illegible] সত্য
বা ইসলামী বিপ্লবী ধারার কোনো উল্লেখ
করেছেন। আমার জানামতে আল্লাহ
কি করেছেন তা কেউ বলতে পারে
নেই।

(circled mark) সরকার বলেছে, সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকার
দিয়ে এসে আওয়ামী লীগের কর্তৃপক্ষ সাহেব
দেন নাই। ইসলামের মুহাম্মদ মুজাহিদ
চেয়ারও ছিলেছেন। এখন সভাপতি পদে আছে
জামায়াত নির্বাচনে অবশ্য আমার দলও
~~নির্বাচন~~ দেখিয়েছেন। এর প্রমাণ যা
যে জামায়াত এবং নির্বাচন নীতি
এবং বিষয়ে জনগণের প্রতি রাজনৈতিক
বিশ্বাস সম্পর্কিত। আমি যে দেশের
থেকেই বলে আসছি, আমাদের বিরুদ্ধে
সরকার যেসব অভিযোগ আনছে, এগুলো

www.pathagar.com

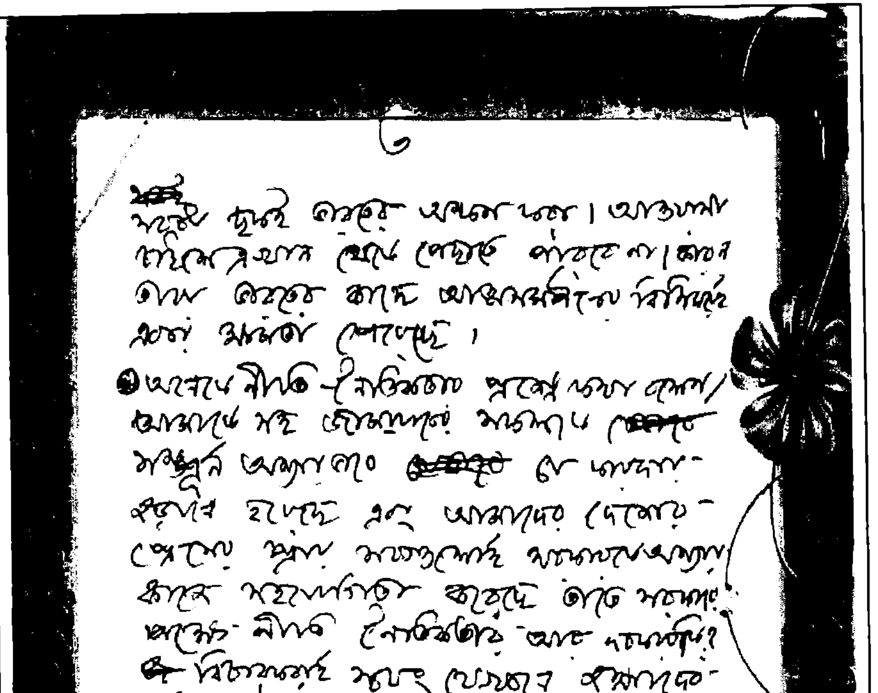
৬

সত্যই তৈরি এখন নয়। আত্মসম্মান
নিয়মের কারণ থেকে পেছনে পারছে না। কারণ
তারা তৈরি করা আন্তর্জাতিক বিধিমালা
এবং আইনও পেয়েছে।

● অপরাধ নীতি – নৈতিকতা প্রশ্নে কথা বলেন/
আমাদের সহ যোদ্ধাদের সাথীদের
সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে যে অপপ্র-
চারণ হয়েছে এবং আমাদের দেশের-
প্রেমের স্বাধীন স্বতন্ত্রতার অন্যায়ভাবে অন্যায়
ভাবে সহযোগিতা করেছে তার সাথে
অন্যান্য নীতি নৈতিকতার আর প্রশ্ন আছে?
বিচারকার্য সময় যেভাবে সাক্ষীদের
ভূমিকা অত্যন্ত আকর্ষণীয়
নিরপেক্ষ সাক্ষীদের হত্যার চেষ্টা –
মেরে ফেলা হয়েছে তাতে স্বাধীনতার প্রশ্ন
বিচারের অন্তত: একেবারে খোদ
করা কোনভাবেই সমীচীন নয়, তবে
একটি আবেদন যে আমাদের দলীয়
ভাবে আমাদের যে অন্যায়ভাবে মৃত্যু-
দণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে,

www.pathagar.com

৪

একে দেখতে পারবেন না। সাম্রাজ্যবাদ
ইহুদী চক্র এবং স্বার্থান্বেষী সংগঠন না
হতে পারত এবং মুক্তিকামী মানবতাই
মানুষ অবশ্যই বুঝতে এবং আমাদ-
মুক্তি এই সংগ্রাম সফলতা অর্জন করবে
হবে- ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে-
এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

● কাশেম আলী-আল-ওয়াহাব- ১৭ থেকে
২৪ ঘন্টা আবার অন্ধকার থাকে। সবাই
আমাকে অন্য বাথরুমের সেলের মত এবং
ইবাদত করার জায়গা থাকলেও চাইতে
আমার ও জীবনের — দেশ-
বাসীদের জন্য অনেক কোটি অর্থ
সম্পদকে দুনিয়ার চাইতে অনেক
বিশ্বাসী আল্লাহর দেয়া দ্বীন বিজয়
এবং অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিকে
সকল বাঙালীদের আল্লাহর পথে
প্রতি মুহূর্ত করার আল্লাহর সাহায্য
চাওয়ার প্রয়োজন। আল্লাহর কাছে
আমাদের — বাসীদের জন্য
আসলে প্রার্থনা করা উচিত আমার

www.pathagar.com

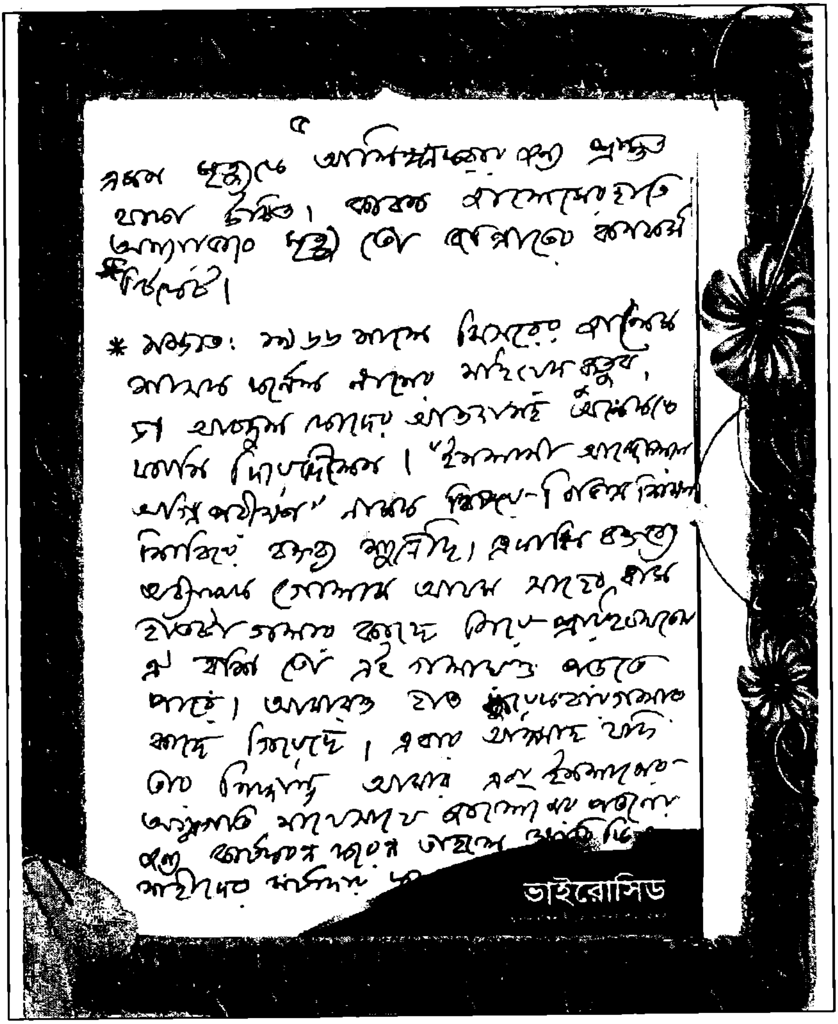

www.pathagar.com

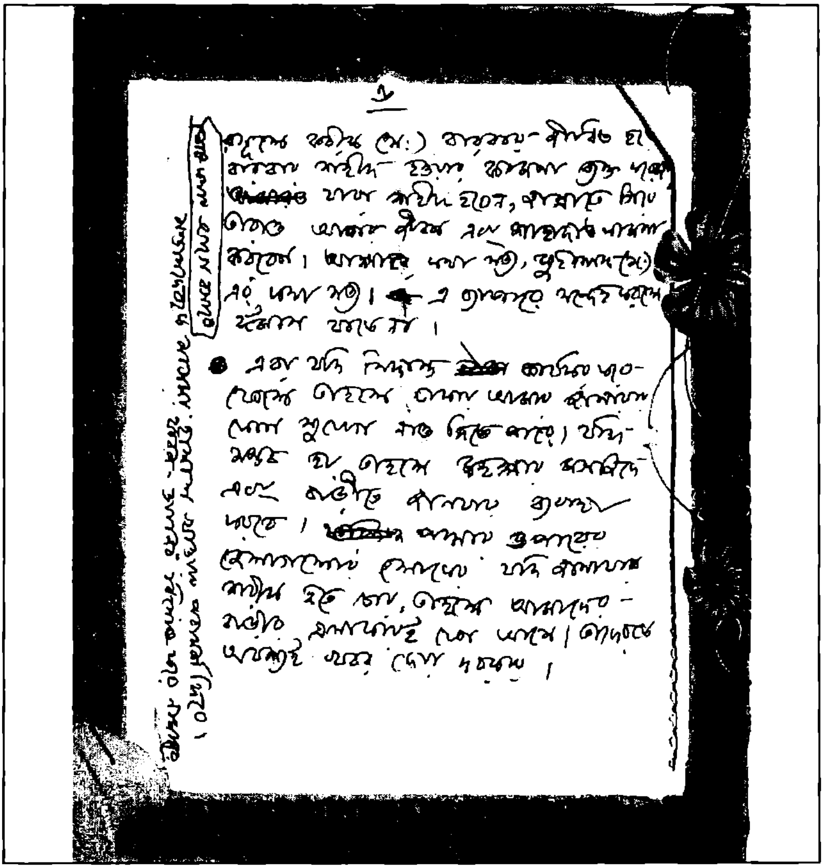

www.pathagar.com

৭

● ক্যাম্পের ক্লাসে যে আমাদের মেশিন অফিসার
মাঝে মাঝে হয়। যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ
অনুষ্ঠান ~~[illegible]~~ এর মধ্যে কবিতা
মত বেদ-পাঠ পর্ব না হয় না। সাহিত্য
অনুষ্ঠান ইসলামীয় আলোচনা নিয়ে
দান বরাবর হচ্ছে, ইসলামী আদর্শ
দান সংক্রান্ত পরিবর্তনে সাহায্য
সহযোগিতা হচ্ছে। বিশেষ করে আমার-
প্রেরণা এবং মানুষ কারণে যাতে-
শহীদ হবেন, অনেকগুলো ইসলাম
এমন পরিবর্তনে সাহায্য-সহযোগিতা
ক্যাম্পে উপস্থিত দিতে হবে।

● ইসলাম মত দুরের বাংলাদেশি এবং
যে কোন ইসলাম এর ক্ষুদ্র বিষয়
সাধারণ জানতে হবে। সারদিনে
ক্যাম্পেও নতুন হবে।

এসিডিটি-ডব্লিউ এস

www.pathagar.com

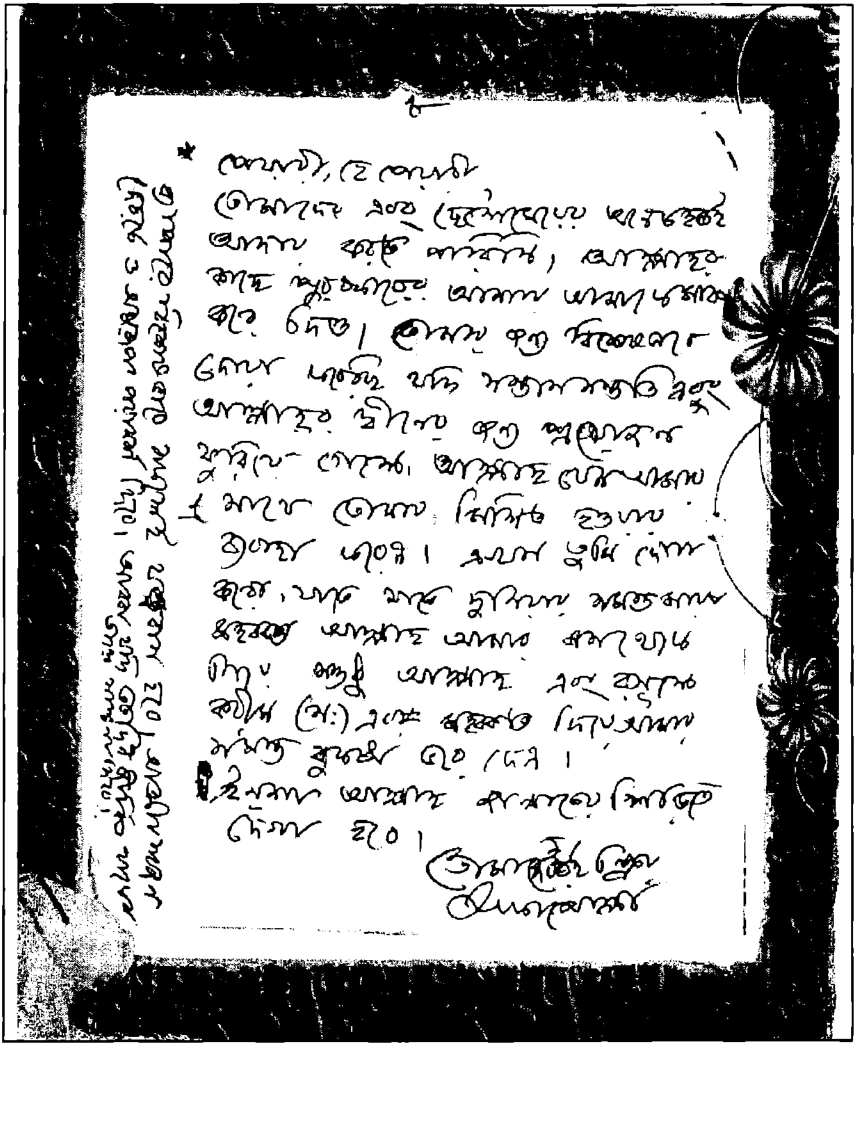
সোনামণি, হে সোনামণি
তোমাদের এতো ছেলেমেয়ের [illegible]
আমার কাছে পাঠিয়ো, আল্লাহর
কাছে শুকরিয়া আদায় [illegible]
করে দিও। তোমার জন্য বিকেলের
দোয়া [illegible] যদি [illegible]
আল্লাহর দ্বীনের জন্য [illegible]
[illegible] গেলো। আল্লাহ তোমাদের
সবার [illegible] হওয়ার
তৌফিক দেবে। এখন তুমি দোয়া
করো, [illegible] দুনিয়ার [illegible]
[illegible] আল্লাহ আমার [illegible]
দিন। [illegible] আল্লাহ এবং রাসুল
করিম (স:) এর [illegible]
[illegible] ৫০ [illegible]।
ইনশাআল্লাহ আল্লাহর [illegible]
[illegible] হবো।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট -২৭

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে নিয়ে
গোলাম মাওলা রণি লেখা

11 Dec, 2013

লেখা- ১

কাদের মোল্লার উস্তাভাজি- ডাল, বৈকালিক গান এবং একটি চিরকুটের ইতিকথা...

ছোট্ট একটি ব্যক্তিগত দায় থেকে আজকের লেখাটির অবতারণা। কাসিমপুর জেল থেকে মুক্তির দিন সকালেই ঘটলো ঘটনাটি। মুক্তি লাভের আশা আর জেল গেটে পুনরায় গ্রেফতার হবার আশংকার দোলা চলে দুলতে দুলতে আমি আমার মালপত্র গুছাচ্ছিলাম। এমন সময় লুঙ্গি পরা এক ব্যক্তি আমার রুমে ঢুকে সালাম দিলো এবং বললো- কাদের মোল্লা সাহেব আপনাকে একটি চিঠি দিয়েছেন। মুহুর্তের মধ্যে আমি কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। সিদ্বান্ত নিতে পারছিলাম না, চিঠিটি কি গ্রহণ করবো না ফেরত পাঠাবো। এরই মধ্যে আগন্তক টেবিলের ওপর চিঠিটি রেখে তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। আমি কম্পিত হস্তে চিঠিটি খুললাম। একটি ছেড়া ছোট কাগজে ৩/৪টি বাক্য লিখেছেন কাদের মোল্লা। কিন্তু বাক্যগুলোর তীর্যক অভিব্যক্তি আমাকে যারপরনাই আহত করলো। সেই চিরকুটের ইতি কথা বলার পূর্বে আরো কিছু প্রসঙ্গ পাঠকগণকে জানাতে চাই-

কাসিমপুর জেলে ঢোকার পর পরই আমার জেলমেটগণের নিকট কাদের মোল্লার সম্পর্কে বহু কথা শুনছিলাম হররোজ। বিশেষ করে খাবার টেবিলে তার সম্পর্কে আলোচনা হতো সব চেয়ে বেশি। ট্রাইব্যুনালের রায়ে দোষী সাবস্ত হবার পূর্বে ডিভিশন প্রাপ্ত বন্দী হিসেবে সুরমা সেলেই ছিলেন। ডায়াবেটিসের রুগি। খাবার টেবিলে বসে প্রথমেই বলতেন কিছুই খাবেন না। তার পর একটার পর একটা খাবারের দিকে তাকাতেন। শিশুর মতো হাসি দিয়ে বলতেন মামুন- গোস্তের রংটা বোধ হয় ভালই হয়েছে। তার পর মাহমুদুর রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলতেন ঘ্রানটাও তো চমৎকার। মীর কাসিম বা অন্য বন্দীদের দিকে তাকিয়ে এমন ভাব করতেন যেন কাদের মোল্লা সাহেবকে খাওয়ার জন্য একটু অনুরোধ করেন। এক সময় তিনি অনুরোধে সাড়া দিয়ে খাওয়া শুরু করতেন এবং হই-হল্লোড়, হাসি- তামাসা এবং নানা রকম গল্প উপাখ্যান বলে পুরো খাবার টেবিল মাতিয়ে রাখতেন। বিষণ্ণ বন্দীরা তাই কাদের মোল্লার উপস্থিতিটাকে এক ধরনের প্রশান্তি হিসেবে গণ্য করতো।

www.pathagar.com

অমি যখন জেলে ছিলাম তখন কাদের মোল্লা ছিলেন অন্য সেলে সাধারণ বন্দীদের মতো। যুদ্ধাপরাধের সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে তার প্রতি ছিলো জেল কর্তৃপক্ষের সতর্ক প্রহরা। ফলে প্রতি বিকেলে পাশাপাশি সেলের বন্দীরা নিজেদের সীমানা প্রচীরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বার্তা বলার চেষ্টা করতো আবার পুরোনো বন্দীদের কেউ কেউ রাস্তায়ও বের হয়ে আসতো। কিন্তু কাদের মোল্লাকে সেই সুযোগ দেয়া হতো না। কাদের মোল্লার সেবক সকাল বিকালে আমাদের সেলে আসতো ফ্রিজ থেকে ইনসুলিন নেবার জন্য। জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কে বা কারা যেনো সুরমা সেলে ছোট্ট একটি ফ্রিজ বসিয়েছিলো কেবল মাত্র কাদের মোল্লার ওষুধ পত্র রাখার জন্য। সেই ফ্রিজে কাদের মোল্লার ডায়াবেটিসের ওষুধ পত্র থাকতো। সেবক যখন ওষুধ নিতে আসতো তখন তার নিকট থেকে কাদের মোল্লা সম্পর্কে টুকটাক জানতে পারতাম।

বন্দী জীবনের নিরন্তর সময় যেনো আর কাটতে চাইতো না। ফলে আমরা সময় টুকুকে যথাসম্ভব আনন্দ মুখর করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতাম। যার যতো জ্ঞান বা প্রতিভা ছিলো- সবই উজার করে দিতাম সহযাত্রীদেরকে আনন্দ দেবার জন্য। একদিন বিকেলে বসেছিলাম সুরমা সেলের বারান্দায়। পাশাপাশি চেয়ার নিয়ে আমরা সবাই- গিয়াসউদ্দিন আল মামুন, মাহামুদু রহমান, মীর কাসিম আলী আর এটিএম আজাহার। হঠাৎ নীরব হয়ে গেলাম অজানা কারনে। অর্থ্যাৎ বলার মতো কোন কথা ছিলোনা কারো মুখে। হঠাৎ মামুনই বলে উঠলো- এই সময় মোল্লা ভাই থাকলে আমাদের সবাইকে গান শোনাতেন। জামাতের লোক আবার গান গায় নাকি- মনে মনে টিটকারী কেটে জিজ্ঞাসা করলাম- কি গান গাইতেন? রবীন্দ্র সঙ্গীত- অসাধারণ তার গায়কী গলা আর সুরের ঢং- মাহমুদুর রহমান বললেন।

আমি নিজে টুকটাক গাইতে জানি। তাই প্রস্তাব করলাম কিছু একটা গাওয়ার জন্য। তারা আগ্রহ দেখালে আমি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলাম- 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে'। সবাই শুনলেন এবং প্রশংসা করলেন। তবে একথা বললেন যে, আমার চেয়েও কাদের মোল্লা সুন্দর করে গান করেন। তার গান পরিবেশনের সময় তিনি উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে এমনভাবে চোখের ভাব বিনিময় করেন যে শ্রোতাগণ তার সঙ্গে গুণগুনিয়ে কন্ঠ মেলাতে বাধ্য হন। ফলে পুরো অনুষ্ঠান হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। অন্যদিকে আমি গান করি চোখ বুঝে। যখন আমার সঙ্গী-সাথীগণ যখন আমাকে চোখ খোলা রেখে আরো একটি গান গাইতে অনুরোধ করলেন তখন আমি ভারী লজ্জা পেয়ে গেলাম

www.pathagar.com

এবং আর এগুতো পারলাম না। ফলে তারা আবার পুনরায় কাদের মোল্লার প্রশংসা করতে থাকলেন।

একদিন আমরা সকলে খাবার টেবিলে বসে দুপুরের খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেবকরা তখন খাবার পরিবেশনের জন্য এগ্রাম করছিল। এমন সময় কাদের মোল্লার সেবক এসে গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের নিকট ছোট একটি চিঠি ধরিয়ে দিল। চিঠিটি পড়ার পর মামুনের মুখমন্ডল ক্ষোভ, লজ্জা আর রাগে লাল হয়ে গেল। এরপর সে চিঠিটি মীর কাসেম আলীর হাতে দিল। কাসেম সাহেব চিঠিটি পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আমার হাতে যখন চিঠিটি এলো তখন দেখলাম কাদের মোল্লা লিখেছেন-

প্রিয় মামুন,

সালাম। নিতান্ত বাধ্য হয়েই তোমার সেবক মতির বিরুদ্ধে তোমার নিকট নালিশ জানালাম। ইদানিং কোনো জানি আমার বেশি বেশি ডাল আর উস্তা ভাজি খেতে ইচ্ছে করে। আমার নিজের অর্থ দিয়ে এসব কিনে খাওয়া যে সম্ভব নয় তা তুমি জানো। তুমি আমার জন্য এ যাবৎ অনেক কিছু করেছ- আর তাই তোমার উপর অজানা এক অধিকার জন্ম নিয়েছে। সেই অধিকার বলে আমার সেবককে বলেছিলাম চোখায় (রান্না ঘরে) যখন খাবার ভাগাভাগি হয় তখন মামুনদের ভাগ থেকে একটু ডাল আর উস্তাভাজি বেশি করে নিও আমার জন্য। কিন্তু তোমার সেবক আমাকে এই সুযোগ দেয়নি। জীবন-মৃত্যুর শেষপ্রান্তে দাড়িয়ে এই অভাগা তার ছোট ভাইয়ের নিকট একটু ডাল আর উস্তাভাজি চেয়ে যদি অন্যায় করে থাকি তবে মাফ করে দিয়ো। ইতি-

চিঠি পড়ে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাহমুদুর রহমান সাহেব বললেন- কাল থেকে মোল্লা সাহেবের জন্য আলাদা ডাল আর উস্তাভাজি রান্না হবে। সব বিল আমি দেব। মামুন ক্রোধে কাঁপছিল আর সেবককে শাসাচ্ছিল। আর অন্যরা একধরনের বিষন্নতার নষ্টালজিয়ায় ভুগতে লাগলাম।

এবার আমি বলছি- আমার কাছে লিখা কাদের মোল্লার চিরকুট কাহিনী। তিনি লিখেছেন-

প্রিয় রনি,

যদি কখনও সময় পাও এবং তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমার ফাঁসির পর একবার হলেও বলো বা লিখো- কাদের মোল্লা আর কসাই কাদের এক ব্যক্তি নয়। আমার আত্মা কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদবে আর কসাই কাদের তখন কিয়ামত পর্যন্ত অট্টহাসি দিবে

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট -২৮

আবদুল কাদের মোল্লাকে নিয়ে গোলাম মাওলা রণি লেখা

লেখা- ২

কাদের মোল্লার রায়

নেপথ্যে ভয়াবহ অবহেলার অভিযোগ

গোলাম মাওলা রনি এমপি

লেখক : রাজনীতিক

www.pathagar.com

অতিরিক্ত পরিশিষ্ট

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

সাক্ষাৎকারে ড. হাসান

যুদ্ধাপরাধী রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে

ডা. এমএ হাসান

স্টাফ রিপোর্টার

০৫.০৫.২০১০

ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ডা. এমএ হাসান বলেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যুদ্ধাপরাধী রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যারা যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাদের দৃষ্টি শুধু একটি রাজনৈতিক দলের দিকেই। তিনি বলেন, এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন অনেক যুদ্ধাপরাধী তার জাতীয় পার্টির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেন। ফুলপুরের আলবদর নেতা কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী রজব আলী ফকির ওই সময় জাতীয় পার্টিতে আশ্রয় নেন। ময়মনসিংহের নতুনবাজার এলাকার আবদুল হান্নান ও ইঞ্জিনিয়ার আবদুল জব্বারের মতো অনেকেই রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাপরাধের শত শত অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু তারা কেউই জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন বলে তাদের দিকে কারও দৃষ্টি নেই। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তান আর্মির ১৯৫ জন সদস্যকে ক্ষমা করার এখতিয়ার সরকারের নেই। ভবিষ্যতে তাদের বিচার করা যাবে না চুক্তিতে এমন কোনো শর্ত ছিল না। ড. কামাল হোসেন এ চুক্তি সংসদের মাধ্যমে অনুমোদন করে নেননি। ডা. হাসান একটি বেসরকারি টেলি-ভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাত্কারে এসব কথা বলেন।

ডা. হাসান আরও বলেন, একটি দলের অপরাধীদের বিচার হবে আর অন্যান্য দলের অপরাধীরা বিচারের আওতায় আসবেন না, এটা হতে পারে না। অপরাধী যে দলেই থাকুক, তাদের বিচারের আওতায় আনা উচিত। অপরাধ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কেউ পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ হত্যা, ধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী অপরাধে নিজেকে সরাসরি সম্পৃক্ত করেছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে যারা শুধু পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, তারা যদি সত্যি সত্যি আন্তরিকভাবে অনুশোচনায় ভোগেন,

www.pathagar.com

তাহলে আমাদের দেশের মানুষ তাদের ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন, তাদের বিচার হতে হবে।

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তান আর্মির ১৯৫ সদস্যকে ক্ষমা করা প্রসঙ্গে ডা. হাসান বলেন, ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিচার থেকে দূরে সরে আসে। ওই চুক্তি এমন নিঃশর্ত ছিল না যে, ভবিষ্যতে তাদের বিচার করা যাবে না। কথা ছিল নিজ দেশে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার তাদের বিচার করবে। কিন্তু তারা সে বিচার করেনি। ওই চুক্তি এখন নিখোঁজ হয়ে গেছে। ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ড. কামাল হোসেন। চুক্তিটির জন্য তিনি পরে সংসদের অনুমতি নেননি। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোনো সরকারের ক্ষমা করার অধিকার নেই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা দলগত বিচারের বিপক্ষে। যারা অপরাধ করেছে এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে, শুধু তাদেরই বিচার হবে। একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেই যে তিনি অপরাধী হয়ে যাবেন, এটা ঠিক নয়। আমাদের আলটিমেট দাবি হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নামের বিরোধ দূর করা। দুটি পক্ষ তৈরি করা বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। দলগত বিচার করতে গেলে দেশে দুটি পক্ষ তৈরি হবে। কাজেই যে অপরাধ করেছে, শুধু তারই বিচার হবে। আমরা একটি সমঝোতা চাই। চাই শান্তি, ঐক্য ও সাম্য।

আওয়ামী লীগের যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে ডা. হাসান বলেন, আওয়ামী লীগেও যুদ্ধাপরাধী রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি পরিষ্কার করার দায়িত্ব এখন আওয়ামী লীগেরই। তাদেরই উচিত দলে কারা যুদ্ধাপরাধী এবং দলের কোন নেতার আত্মীয়স্বজন যুদ্ধাপরাধী, তাদের খুঁজে বের করা। গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে এটা করা উচিত।

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

১৪.০৬.২০১০

শুধু ঢাকার যুদ্ধাপরাধীদেরই বিচার হবে : আইন প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

শুধু রাজধানী ঢাকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার কথা জানিয়েছেন আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম। গতকাল এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমরা সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করব না। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় বসে যারা তাদের সংগঠিত করেছে কেবল চিহ্নিত সেসব যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হবে।

www.pathagar.com

The Daily Jugantor
18/10/2010

যুদ্ধাপরাধী পরিবারের আপ্যায়ন নিলেন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান
পটুয়াখালীতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষোভ

পটুয়াখালী জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুল বারেক জানান, 'পৌর মেয়রের পিতা মোসলেম উদ্দিন মোক্তার এবং বড় ভাই মহিউদ্দিন হিরু ছিলেন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী। জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় ৯ ও ১০ নম্বরে রয়েছে তাদের নাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পটুয়াখালী পিড এস মাঠে প্রকাশ্যে বিচারে মহিউদ্দিন হিরুর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেন মুক্তিযোদ্ধারা। পরবর্তীতে বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান মোসলেম উদ্দিন। এরকম একটি পরিবারের দেয়া ভোজসভায় অংশ নিয়ে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালকে বিতর্কিত করেছেন নিজামুল।

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

২৫.০৫.২০১০

ফরিদপুরের বিভিন্ন সড়কে জ্বলজ্বল করছে নূরু মিয়া রাজাকারের নাম: নামফলক ভেঙে দেয়ার দাবি উঠলেও প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে পুতুলের দাদা শ্বশুর হওয়ায় প্রশাসন বেকায়দায়

আরিফ ইসলাম, ফরিদপুর

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যখন সরকার উঠেপড়ে লেগেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ফরিদপুরের বিশিষ্ট রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বাবা খন্দকার নূরুল হোসেন নূরু মিয়ার নামে ফরিদপুরের বিভিন্ন সড়কের নামকরণ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তারই ছেলে খন্দকার মোশাররফ হোসেন। মন্ত্রী হওয়ার পর অসংখ্য সড়কের নামকরণ করেছেন তার যুদ্ধাপরাধী বাবার নামে। মুক্তিযোদ্ধারা শুরু থেকেই এর চরম বিরোধিতা করলেও স্থানীয় প্রশাসন রাজাকার নূরু মিয়ার নামফলকগুলো না ভেঙে বরং বিপুল উত্সাহে আরও নতুন নতুন সড়কের নামকরণ করছে। একই সঙ্গে ফরিদপুর স্টেডিয়ামের নাম পাল্টে শ্রমমন্ত্রী তার পিতার নামে অর্থাৎ নূরু মিয়া স্টেডিয়াম করার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে ফেলেছেন বলে ফরিদপুরের মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষোভের সঙ্গে আমার দেশকে জানিয়েছেন।

ফরিদপুর জেলার একমাত্র বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফের নামে স্টেডিয়ামটির নামকরণ করার জন্য এই জেলার মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরশ্রেষ্ঠের বৃদ্ধা মা মাকিদুননেছা

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে এলেও শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও তার ভাই খন্দকার মোহতেশাম হোসেন বাবর তাদের রাজাকার পিতার নামে স্টেডিয়ামের নামকরণের পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। এই জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা অবিলম্বে রাজাকার নূরু মিয়ার নামে নির্মাণ করা ফরিদপুরের সব সড়কের নামফলক ভেঙে ফেলার জোর দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজাকার নূরু মিয়ার নামে নয় বরং বীরশ্রেষ্ঠের নামে স্টেডিয়ামের নামকরণের দাবি জানিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ফরিদপুর জেলার সাব-সেক্টর কমান্ডার ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রবীণ রাজনীতিবিদ নূর মোহাম্মদ বাবুল ক্ষোভের সঙ্গে জানান, প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই মোশাররফ হোসেনের লালিত সন্ত্রাসীরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। একজন রাজাকারের ছেলের নির্দেশে সন্ত্রাসীরা আমার ওপর হামলা করেছে। কারণ মোশাররফ হোসেন ও তার ভাইয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের পছন্দ করেন না। কারণ তারা একজন বিশিষ্ট রাজাকারের ছেলে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সড়কের নামকরণ না করে বরং একজন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর নামে সড়কের নামকরণ করাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার। কারণ রাজাকারদের নাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করিনি। তিনি অবিলম্বে রাজাকার নূরু মিয়ার নামে করা ফরিদপুরের সব সড়কের নামফলক ভেঙে ফেলার দাবি জানান।

ফরিদপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ও ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট সামছুল হক ভোলা মাস্টার বলেন, অসংখ্যবার আমি বিভিন্ন প্রোগ্রামে রাজাকারের নামফলক ভেঙে ফেলার দাবি জানিয়েছি। শুধু তাই নয়, আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণভবনের বৈঠকেও একই দাবি জানিয়েছি কিন্তু তারপরও রাজাকারের নামফলক ফরিদপুরের সড়কগুলো থেকে ভেঙে ফেলা হয়নি। কিন্তু জনগণ যখন একত্রিত হয়ে রাজাকারের নামফলক ভেঙে চুরমার করে দেবে তখন কেউ ঠেকাতে পারবে না। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল হাসান মিঠু এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কাউকে লাগবে না, আমরা ফরিদপুরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধী নূরু মিয়ার নামে যেসব সড়কের নামফলক করা হয়েছে তা ভেঙে ফেলব। ৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের কোনো শহরে রাজাকারের নামে নামফলক থাকবে না। ফরিদপুর কোতোয়ালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বোষ বলেছেন, রাজাকারের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন যখন বাংলাদেশের মন্ত্রী হয়েছেন, তখনই ফরিদপুরবাসীর কপাল পুড়ে গেছে। ত্যাগী আওয়ামী লীগের নেতাদের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করেছেন আর মন্ত্রীর ভাই মুরগি বাবর হয়েছেন ফরিদপুরের গডফাদার। মন্ত্রী ও তার ভাই বাবরের অপকর্মের প্রতিবাদ করলে তাদের হাত-পায়ের রগ কেটে সারাজীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে। শহীদদের রক্তভেজা পতাকা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা রাজাকারের ছেলের গাড়িতে বাড়িতে তুলে দিয়েছেন উল্লেখ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ফরিদপুর জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি নাজমুল হাসান নসরু বলেন, যে দেশের মুক্তিযোদ্ধারা দু'মুঠো ভাতের জন্য ভিক্ষা করে, সে দেশের

www.pathagar.com

রাজাকার ফ্যামিলির ছেলেরা মন্ত্রী হয়ে কোটি কোটি টাকা লুট করছে আর রাজাকারদের প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে কারণেই আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি ফরিদপুরে রাজাকার নূরু মিয়ার নাম প্রতিষ্ঠা করছে তারই কন্যা শেখ হাসিনার বেয়াই ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন। ফরিদপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মরহুম হাসিবুল হাসান লাবলুর স্ত্রী ফরিদপুর সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বিশিষ্ট নারী নেত্রী ঝরনা হাসান এ প্রসঙ্গে বলেন, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। এখন ক্ষমতা আছে বলেই রাজাকার বাবার নামে সড়কের নামকরণের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন শ্রমমন্ত্রী। এর ফল মোটেও ভালো হবে না। জনগণ একদিন এর বিচার করবে। ভেঙে ফেলবে সড়কের নামফলক। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির রাজাকারের নামে সড়ক করার কারণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, যেদিন রাজাকার নূরু মিয়ার নামে সড়কের নামকরণ করা হয়েছে সেদিন থেকে ফরিদপুরবাসীর উচিত ছিল মাটির উপরে বসবাস না করে নিচে বসবাস করা। মনির মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিকে একত্রিত হওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে যুদ্ধাপরাধীদের নামে করা সব নামফলক ভেঙে ফেলার জোর দাবি জানান।

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

২৭.০৫.২০১০

আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল রাজাকার পরিবারের সদস্য : একাত্তরে বড় ভাইয়ের সঙ্গে পাকিস্তানের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন

কামরুল ইসলাম

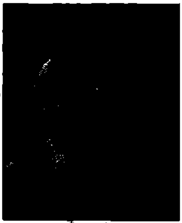
আজিজুল ইসলাম

এম এ নোমান ও রাকিব হোসেন

আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম রাজাকার পরিবারের সদস্য। এ অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, তার বড় ভাই হাকিম হাফেজ আজিজুল ইসলাম নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ছিলেন। পাক হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য তার নেতৃত্বেই ঢাকায় প্রথম শান্তি কমিটি গঠিত হয়। একই সঙ্গে তিনি রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষা করতেন। অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই স্বাধীনতাবিরোধী কাজে বড় ভাইকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় তার রাজাকার ভাইয়ের মালিকানাধীন প্রিন্টিং প্রেসে তিনি ম্যানেজার হিসেবেও চাকরি করেন। অ্যাডভোকেট কামরুল ১৯৯৪ সাল থেকে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন অ্যাডভোকেট কামরুল।

www.pathagar.com

নেজামে ইসলাম পার্টি ও অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের পরিবার সূত্রে জানা যায়, উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইউনানী চিকিত্সক ও ঢাকা তিব্বিয়া হাবিবিয়া ইউনানী কলেজের অধ্যক্ষ হাকিম খুরশিদুল ইসলামের চার ছেলে। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে হাকিম হাফেজ আজিজুল ইসলাম, আনোয়ারুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম ও মোরশেদুল ইসলাম। ১৯৫৭ সালে হাকিম খুরশিদুল ইসলামের মৃত্যুর পর বড় ছেলে হাকিম হাফেজ আজিজুল ইসলাম এ কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পর্যায়ক্রমে তিনি এ কলেজের অধ্যক্ষ হন। একই সঙ্গে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি তত্কালীন পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক হন। ১৯৬৯ সালে এ দেশে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন জোরদার হলে নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রচারণা চালানোর জন্য 'নেজামে ইসলাম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। হাকিম আজিজুল ইসলাম এ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনকারীদের নিয়ে তিনি এ পত্রিকায় 'ইবলিশের দিনলিপি' নামে প্রতি সপ্তাহে একটি বিশেষ সম্পাদকীয় লেখেন।

মাত্র ৭ বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে কামরুল ইসলাম বড় ভাই হাকিম আজিজুল ইসলাম ও ভাবী ফয়জুন নেছা রানুর স্নেহাশীষে বড় হতে থাকেন। বেগম ফয়জুন নেছা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সম্পর্কে আমার দেশকে বলেন, ১৯৬১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আমি তাদের পরিবারে আসি। এ সময় কামরুল ছিল ১০-১১ বছরের কিশোর। আমার স্বামীই তার ভাই-বোন নিয়ে ১৩-১৪ জনের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। ছোট ভাই-বোনদের পড়ালেখার খরচ জোগাতেন তিনিই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কামরুলের বয়স ছিল ২১ বছর। ওই সময় আমরা সবাই এক বাসাতেই ছিলাম। যুদ্ধে তার স্বামী হাকিম আজিজুল ইসলাম ও দেবর অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অতকিছু বলতে পারব না এবং আমার পরিবারের বিরুদ্ধে যায়- এমন সত্য প্রকাশ উচিত হবে না। তবে এতটুকু বলতে পারি, স্বাধীনতার পরপরই বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের একজন এমপির নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী আমাদের বাসায় হামলা করে এবং আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে হামলাকারী মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সবাইকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকিও দিয়ে যায়। এর একদিন পরেই মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আমার স্বামীর পরিধেয় বস্ত্র ও চশমা আমার কাছে পাঠায়। পরে আমার দেবর কামরুল ইসলাম ও মামুন নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট বহু খোঁজাখুঁজির পর একটি পরিত্য³ গর্ত থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় আমার স্বামীকে উদ্ধার করেন।

পুরান ঢাকার চকবাজার এলাকার ৪৮/১ , আজগর লেনে অবস্থিত অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের বাড়ির আশপাশের লোকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কামরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাসই বড় ভাই হাকিম আজিজুল ইসলামের সঙ্গে ছিলেন। আজিজুল ইসলাম ২০০৫ সালে মারা যান। পিতা হাকিম খুরশিদুল ইসলামের রেখে যাওয়া

www.pathagar.com

জায়গায় তারা ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ৫ তলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বর্তমানে এ বাড়িটি ইসলামী ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকার একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামকে আমি শিশুকাল থেকেই চিনি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বড় ভাইয়ের সঙ্গেই থাকতেন এবং তার কাজে সহযোগিতা করতেন। ১৯৯৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এর আগে ১৯৮৫ সালে এলএলবি পাস করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে ৬৪ নং ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগ মনোনীত পার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। এ নির্বাচনে তিনি বিএনপি প্রার্থী কামালউদ্দিন কাবুলের কাছে পরাজিত হন। মূলত এ সময় থেকেই তিনি আওয়ামী লীগ রাজনীতির পক্ষে সোচ্চার হন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের সাম্প্রতিক কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, অতীতে অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের ভূমিকা যাই থাকুক, বর্তমানে তিনি এলাকাবাসীর সুখ-দুঃখের সঙ্গী। এলাকার সব উন্নয়নমূলক কাজেই তিনি কল্পনাতীত ভূমিকা রেখে চলেছেন।

তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজে হাকিম আজিজুল ইসলামের এক সময়ের সহকর্মী জানান, আজিজুল ইসলাম সাহেব ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কলেজে যোগ দেয়ার আগে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ছিলেন। পাশাপাশি তিনি প্রেস ব্যবসা করতেন এবং একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। হাকিম আজিজুল ইসলামের প্রেসেই কামরুল ইসলাম ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের মতো রাজাকারের সহযোগীদের বিচারের আওতায় আনা উচিত কিনা, প্রশ্নের জবাবে হাকিম আজিজুল ইসলামের স্ত্রী ফয়জুন নেছা রানু আমার দেশকে বলেন, আমরা সবাই এদেশেরই মানুষ। সব দেশেই সব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করে না। কেউ কেউ ভিন্নমতও পোষণ করে থাকে। ভিন্নমত পোষণ করাটা কোনো অপরাধ নয়। বরং এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। বর্তমানে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বলে যা করা হচ্ছে তা জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। বিচারের জন্য গঠিত তদন্ত সংস্থার প্রধান আবদুল মতিন স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠায় তিনি পদত্যাগ করেছেন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এ ধরনের অভিযোগ সরকারের অনেকের বিরুদ্ধেই রয়েছে। কাজেই এখন উচিত হবে এগুলো খোঁজাখুঁজি করে জাতিকে বিভক্ত না করা। একই সঙ্গে কাঁদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করতে হবে। কেননা কেউ এ দেশে গ্রিনকার্ডধারী নন। ইচ্ছা করলেই কাউকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা যাবে না। দেশ গঠনে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

এ বিষয়ে আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আমার দেশকে তিনি বলেন, আমার ভাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেননি। তিনি রাজাকার কিংবা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী ছিলেন– এ ধরনের কোনো প্রমাণ কেউ দিতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধে তার নিজের ভূমিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ)-এর প্রথম ব্যাচের সদস্য

www.pathagar.com

হিসেবে আমি ভারতের দেরাদুন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের ওই ব্যাচে হাসানুল হক ইনু, আফম মাহবুবুল হক ও শরীফ নুরুল আম্বিয়াসহ অনেকেই ছিলেন। কাজেই আমার ব্যাপারে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা ঠিক নয়।

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

২২.০৪.২০১০

পুতুলের দাদাশ্বশুর রাজাকার হলেও যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না
দেশে কোনো রাজাকার নেই
ফরিদপুর আ'লীগ নেতাদের শেখ হাসিনা

আরিফ ইসলাম, ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কড়া ভাষায় বলেছেন, দেশে রাজাকার বলে কোনো শব্দ নেই। দেশে কোনো রাজাকার নেই। তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের দাদাশ্বশুর ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রয়াত খন্দকার নূরুল হোসেন নূরু মিয়া ফরিদপুরে রাজাকারদের তালিকার ১৪ নম্বর রাজাকার হলেও তিনি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না বলে শেখ হাসিনা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি ফরিদপুরের নেতাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, তার ভাই শেখ সেলিম ফরিদপুরের রাজাকার মুসা বিন শমসের ওরফে নূইলা মুসার সঙ্গে ছেলে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা করেছে। এটা কেন তারা কখনও বলেন না; অথচ শেখ হাসিনার মেয়ের দাদাশ্বশুর নূরু মিয়ার নামে সবাই অভিযোগ করেন যে, তিনি রাজাকার ছিলেন। নূরু মিয়া পিস কমিটির সদস্য থাকলেও যুদ্ধের সময় তিনি কোনো অপরাধমূলক কাজকর্ম করেননি বলে শেখ হাসিনা গর্বের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের মনে করিয়ে দেন।

গত নির্বাচনে শেখ হাসিনার বেয়াই ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন ফরিদপুর সদর আসন থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর মন্ত্রিত্ব পান। এই শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও তার ছোট ভাই খন্দকার মোহতেশাম হোসেন বাবরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগ জানানোর জন্য সোমবার রাতে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের নির্যাতিত নেতাদের যে বৈঠকের আয়োজন করা হয়, সেখানে আওয়ামী লীগ প্রধান এসব কথা বলেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত নেতাদের কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সন্ধ্যা সোয়া ৭টা থেকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফরিদপুর আওয়ামী লীগ নেতাদের ওই বৈঠক রাত সোয়া ১০টা পর্যন্ত চলে। তিন ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার বেয়াই মোশাররফ হোসেন ও বেয়াইর ছোট ভাই বাবরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে জেলা নেতাদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

সভাপতি জায়নুল আবেদিন, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ সদস্য বাবু বিপুল ঘোষ, জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও ফরিদপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যন অ্যাডভোকেট সামছুল হক ভোলা মাস্টার, জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও যুদ্ধকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার সাব-সেক্টর কমান্ডার নূর মোঃ বাবুল, ফরিদপুর সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বোস, মাহবুবুর রহমান খান, মনিরুল হাসান মিঠু, আবদুর রহমান প্রমুখ। উপজেলা চেয়ারম্যান সামছুল হক ভোলা মাস্টার প্রধানমন্ত্রীকে শ্রমমন্ত্রী ও তার ভাই বাবরের নির্যাতনের কাহিনী এবং তাদের বিভিন্ন অপকর্মের ঘটনা তুলে ধরে বলেন, শ্রমমন্ত্রীর বাবা নূরু মিয়া একজন রাজাকার ছিলেন। ফরিদপুরের রাজাকারদের তালিকায় তার অবস্থান ১৪ নম্বরে। ছেলে মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে রাজাকার বাবা নূরু মিয়ার নামে ফরিদপুরের বিভিন্ন রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। রাজাকারের নামকরণ করা রাস্তা ভেঙে ফেলার জন্য ভোলা মাস্টার দাবি জানান। বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা নূর মোঃ বাবুল বলেন, আমি আপনার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনীতি করেছি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়েছি। সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। অথচ আজ ৭৭বছর বয়সে আমাকে কুপিয়ে আহত করা হলো। আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরানো হলো। এই সন্ত্রাসী হামলার জন্য তিনি শ্রমমন্ত্রী ও তার ভাই বাবরকে দায়ী করেন। শ্রমমন্ত্রীর গ্রুপের সন্ত্রাসীদের হাতে আহত জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ আহ্বায়ক শওকত আলী জাহিদের ভাই আবদুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগের রাজনীতির জন্য তাদের পরিবার সারা জীবন যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার প্রতিদান হিসেবে আজ তার ভাইকে একটি পা হারাতে হলো। প্রধানমন্ত্রী সবার বক্তব্য ধৈর্যসহকারে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়ে ফরিদপুর জেলা নেতাদের বলেন, আত্মীয়তার চেয়ে আমার কাছে দল অনেক বড়। তাই দলের ক্ষতি করে আমি কাউকে কিছু করতে দেব না। কারও বাসাবাড়িতে নয়, রাজনীতি হবে আওয়ামী লীগের অফিসে বসে। শওকত আলী জাহিদ এবং নূর মোঃ বাবুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার আসামিদের ধরা হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন।

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ ও সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

সহায়কগ্রন্থপুঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ও দলিলাদি

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৪, ২০০৬, ২০১১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিজি প্রেস, ঢাকা।

মুকুল, কাজী : ২০০৯, ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ৭৩ এর আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস)। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা।

ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদিত): ১৯৯৮, বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ , জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

হাসান, মঈনুল: ২০১০, মূলধারা'৭১, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আরেফিন, এএসএম সামসুল:২০০৩, বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

আহাদ,অলি: ১৯৮২, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫, ১ম সংস্করণ, বর্ণরূপা মুদ্রায়ণ, ঢাকা।

মোর্তজা, গোলাম আহমাদ: ২০০৭, ইতিহাসের ইতিহাস, মদিনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

আসাদ,আবুল: ১৯৯০, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা।

রমন, বি: ২০০৮, RAW এর কাও বয়েরা, স্মৃতির সিঁড়িতে আবরোহন, প্রতীতি প্রকাশন, ঢাকা।

নুর, এম.এ.: ১৯২, প্রচালিত আইন ও বিচার কার্যক্রম, মডেল প্রেস, ঢাকা।

আহমদ,সা'দ: ১৯৮৬, আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিন কাল (ব্রিটিশ, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ), রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার, কুষ্টিয়া।

মুসা, আহমেদ: ১৯৯৪, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।

মালিক, ড. আব্দুল: ২০০৩, বাংলাদেশের রাজনীতি-মুখ ও মুখোশ, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।

মিয়া, এম.এ. ওয়াজেদ: ২০০৯, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আহমদ,সা'দ: ১৯৯০, মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন, ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস লিঃ, ঢাকা।

চৌধুরী, সালাউদ্দীন শোয়েব: ২০০১, 'র'-এর ভয়াল থাবা, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।

মজুমদার, এ বি এম খালেক: ২০০৫, শিকল পরা দিনগুলো, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

উল্লাহ, মাহবুব এবং আহমাদ, আফতাব: ২০০২, দুঃসময়ের কথাচিত্র-সরাসরি। বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

www.pathagar.com

উল্লাহ, মাহবুবঃ ২০০১, ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।
খান, ড. দিরাজুর রহমানঃ ২০১০, বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা।
আলী, কর্ণেল শওকতঃ ২০০১, সত্য মামলা আগরতলা, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
হোসেন, তোফাজ্জল (মানিক মিয়া): ১৯৮১, পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা।
আসাদ, আবুলঃ ২০০৮, একশ' বছরের রাজনীতি, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।
রহমান, ড. সাঈদ-উরঃ ২০০৪, ১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা।
মুকুল, এম আর আখতারঃ ১৯৯৭, আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা।
আহমদ, মহিউদ্দীন (সম্পাদিত): ২০০৬, আমাদের একাত্তর, সিডিএল, ঢাকা।
হেলাল, আতিক (সম্পাদিত); ২০০৬, মেজর জলিল রচনাবলী, কমল কুঁড়ি প্রকাশন, ঢাকা।
খায়ের, খন্দকার আবুলঃ ১৯৯২, ৭১ এর গণহত্যার আসল নায়ক গোলাম আজম না শেখ মুজিব, তৌহিদ প্রকাশনী, ঢাকা।
শরীফ, ড. আহমদ; ১৯৯২, জামান, কাজী নুর-উজ্; কবীর, শাহরিয়ার (সম্পাদিত): একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা।
রুশ্দ, আবুঃ ২০০১, গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা বাংলাদেশে 'র', আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান। জিনাক, ঢাকা।
খান, রাও ফরমান আলী; মামুন, মুনতাসীর (অনুদিত):১৯৯৬, বাংলাদেশের জন্ম, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
ইমাম, জাহানারাঃ ১৯৯৮, একাত্তরের দিনগুলি, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা।
মকসুদ, সৈয়দ আবুলঃ ২০১১, স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মীদের প্রথম জবানবন্দী-অরন্য বেতার, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
হক, মাসুদুলঃ ২০০৬, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মীরা প্রকাশন, ঢাকা।
কবির, শাহরিয়ারঃ ২০১০, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার- পক্ষ ও বিপক্ষ, অনন্যা, ঢাকা।
ইসহাক, মুহাম্মদঃ১৯৭৭, মাধ্যমিক ইতিহাস, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বোর্ড, ঢাকা।
ইমাম, এইচ টিঃ ২০০৪, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
রেন্টু, মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমানঃ ২০০২, আমার ফাঁসি চাই, স্বর্ণলতা-বনলতা প্রকাশন, ঢাকা।

www.pathagar.com

হাসান, ডাঃ এম এঃ ২০০৮, যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ, প্রকাশক WCFFC, ২৩/১, খিলজী রোড, শ্যামলী, ঢাকা।

জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী। জানুয়ারী ১৯৯২

চৌধুরী, আবদুল গাফ্ফার: ২০০১, ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্তর, জ্যো পাবলিশার্স।

জলিল, মেজর (অবঃ) এম,এ,:১৯৮৯, অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা ; ইতিহাস পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ।

কাইয়ূম, অধ্যাপক হাসান আব্দুল (সম্পাদিত):২০০৪, মাওলানা ভাসানী, ঝিনুক প্রকাশ, ঢাকা।

বালাদেশ আওয়ামী লীগ, গৌরবের ৫৫ বছর (সংকলন), ২০০৪।

মুসা, আহমেদঃ ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ-

খান, আব্বাস আলীঃ ১৯৯৪, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বালাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

রায়হান, ইবনে : বংগভংগের ইতিহাস,

আহমদ, আবুল মনসুর, ১৯৭৮, আত্মকথা, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।

নাজির, পি এঃ ১৯৯৩, স্মৃতির পাতা থেকে, নতুন সফর প্রকাশনী।

মুকুল, এম আর (মোস্তফা রওশন) আখতারঃ ২০১০, চরমপত্র (তৃতীয় মুদ্রণ), অনন্যা, ঢাকা।

ইসলাম, সাইফুলঃ ১৯৯৩, স্বাধীনতা ভাসানী ভারত, ঢাকা:বস্তু প্রকাশন।

আযম, গোলামঃ ১৯৯৫, আমার বাংলাদেশ, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

চৌধুরী, হায়দার আলী; ১৯৮৭, পলাশী যুদ্ধোত্তর সংগ্রামের পাদপীঠ , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথঃ ১৯৯৫, গল্প গুচ্ছ, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

শফিক, মাহমুদঃ ১৯৯৭, গণহত্যা ১৯৭১ , জোনাকী প্রকাশনী।

নেহরু, জওহরলালঃ ২০১১, দ্যা ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া, ভারতের সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশঃ চারদিন।

আহম্মদ, আবুল মনসুরঃ রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

সালিক, সিদ্দিকঃ মাসুদুল হক (অনুদিত); ২০০৭, নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আলী, মেঃ জেঃ রাও ফরমানঃ মোস্তফা হারুন (অনূদিত); ভূট্টো, শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ, উর্দূ ডাইজেস্টে প্রকাশিত

বাংলাদেশ ডকুমেন্টস প্রথম খন্ড,

চক্রবর্তী, রতন লাল (সম্পাদিত): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা ১৯৭১,

www.pathagar.com

মাসকারেণহাস, অ্যান্থনঃ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (অনূদিত): ২০০৬, দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ, পপুলার পবলিশার্স।
খান, সিরাজুল আলমঃ ২০০৮, নির্বাচনী ইশতেহার, প্রকাশকঃ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন।
ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথঃ ১৯৯৭, ৭১ এর দশমাস, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।
আরেফিন,এ এস এম সামছুলঃ ১৯৯৮, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
মামুন, মুনতাসীর; ২০১২, শান্তি কমিটি ১৯৭১, মাওলা ব্রাদার্স।
আহমদ, কামরুদ্দিনঃ স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর,
খায়ের, খন্দকার আবুলঃ ১৯৯২, ১৯৭১-এ কি ঘটেছিলো রাজাকার কারা ছিলো, তৌহিদ প্রকাশনী, যশোর।
সাইয়িদ,অধ্যাপক আবু : সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযাম,
রহমান, ড. তারেক মুহাম্মদ তওফীকুরঃ ২০০৭, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১), Academic Press & Publication Library (APPL).
আমার অবিশ্বাস, হুমায়ুন আজাদ;
ইসলাম, এম. সহিদুলঃ ২০১২, সাক্ষাৎকার, মৃদুল প্রকাশন, ঢাকা।
উমর, বদরুদ্দিনঃ ২০১২, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তৎকালীন রাজনীতি, খন্ড -১, সুবর্ন, ঢাকা।
মোহাইমেন, এম.এ.: ১৯৮৪, ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর, পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
মোহাইমেন, এম.এ.: ১৯৯৪, ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ্, পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
যুদ্ধাপরাধ বিতর্ক এবং কতিপয়বুদ্ধিমান মানুষের গল্প, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ (সংকোলন)।
রহিম, আবদুর ; ২০১০, যুদ্ধাপরাধীর জবানবন্দি, 'ন' (প্রকাশনী), ঢাকা।
বাংলা নামের দেশ, পৃষ্ঠা- ৮১, আনন্দ পাবলিশার্স (ভারত) কর্তৃক ১৯৭২ প্রকাশিত।
আহমদ, শারমিন; তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা, ঐতিহ্য
খন্দকার, এ কে খন্দকার; ১৯৭১ ভেতরে বাইরে, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৪
আহমেদ, হুমায়ূন; দেয়াল, অন্য প্রকাশন
হুদা, এটিএম শামসুল; ফিরে দেখা জীবন,প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৪
আহমেদ, রাজিব; মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর দলিল ও ইতিহাস, ,বইপত্র, ২০১৩
রাহমান, মেজর জেনারেল (অবঃ) মুহাম্মদ খলিলুর; পূর্বাপর ১৯৭১ পাকিস্তানী সেনা গহ্বর থেকে দেখা; সাহিত্য প্রকাশ।

www.pathagar.com

শফি, মুশতারি; বেগম জাহানারা ইমামের স্মৃতির উদ্দেশে চিঠি
সাক্ষাৎকার (বই), সম্পাদনায় ঃ এম. সহিদুল ইসলাম, মৃদুল প্রকাশন
Khan, Mohammad Asghar Khan:1983, Generals in politics: Pakistan 1958-1982. Croom Helm. London:
Banglapedia, Asiatic Society of Bangladesh, 2003
Law (legis) department (1971). The East Pakistan Rajakar ordinance 1971, Governemnt of East Pakistan.
Khan, Zillur. R; 1996, The Third world charismat Sheikh Mujib and the struggle for Freedom. University Press Limited, Dhaka, Bangladesh.
Ministry of law and Parliamentary Affairs (1972). Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) order 1972. Government of Bangladesh. Bangladesh Government Press, Dhaka, Bangladesh.
Afroz, Turun: 2010, Genocide, war crims of crimes against humanity in Bangladesh. Forum for secular Bangladesh, and Trial of war ciminals of 1971, Dhaka.
Ahmad, M: 1991, The Univirsity Press Limited, Dhaka, Bangladesh.
Khan,A.A.: 1977, The Evidence Act. 1872. Khoshroz Kitab Mahal.
Rashid, H: 2010 Bangladesh-India Relations Living with a Big Neighbour. All development pubilishing house, Dhaka.
Haque, ATM Shamsul: 2007, Mosaic of Memories-varied experiences of a member of the civil service. Pathak shamobash, Dhaka.
Ministry of Law and Justice (1984), Code of criminal Procedurs, 1898, Government printing press, Government of Bangladesh, Dhaka.
Raina, Asoka: 1981, Inside Raw, The story of India's Secret Service, Vikas.

www.pathagar.com

Burke, S. M.: 1974, Mainsprings of Indian and Pakistani foreign policies, Oxford University Press, London..
Callard, Keith B: 1959, Pakistan's Foreign Policy: An Interpretation, Institute of Pecific Relations, New York.
Rehman, Javaid: 2000, The weaknesses in the international protection of minority rights, Kluwer Law International, The Hague.
Mallick, Azizur Rahman (A R): 1977, British Policy and the Muslims in Bengal; Bangla Academy.
The Indian Quarterly Register;
Hamid, Abdul: 1967, Muslim Separatism in India , Oxford University Press .
Khan, Sarder Ali: 1908,India of Today, Time Press, Bombay.
The Indian National Congress, Part -1, G . A. NATESAN & Co., ESPLANADE, Madras;
A History of Freedom Movement, Pakistan Historical Society
Maniruzzaman, Talukder:2003, The Bangladesh Revolution And Its Aftermath, The University Press Limited
Jinnah Speeches, Pakistan Publication, Karachi.
Payne, Robert: 1973, Massacre, Macmillan, New York.
Bose, Sarmila: 2011, Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh war, Hachette, India
Rahim Dr M, A,:1981 History of the University of Dacca, University of Dacca.
Hasanat, Abul:1974, The Ugliest Genocide in History, Muktadhara [Swadhin Bangla Sahitya Parishad] 74 Farashganj, Dhaka.
Gupta, Jyoti Sen: 1974 History of Freedom Movement in Bangladesh 1943-1973 some involvement, Naya Prokash.
Alam, Habibul Bir Pratik : 2006, BRAVE OF HEART, Academic Press & Publication Library (APPL),
Chaudhuri, Kalyan: 1972, Genocide in Bangladesh, Orient Longman, Bombay.
Munshi, M.B.I.(Edited):2006, The India Doctrine, Bangladesh Research Forum.

www.pathagar.com

Government of Pakistan, 5 August, 1971,The Crisis in East Pakistan, Government of Pakistan.
Fuller, Bampfylde: 1930, Some Personal Experiences, Murray, 1930
Marsden, Victor (Translated): 1999, Protocol of the Learned Elders' Zion, The Book Tree.
Singh, Jaswant: 2010, Jinnah: India, Partition, Independence, Oxford University Press.
Azad, Mawlana Abul Kalam: 1988, India Wins Freedom, Orient Longman Limited, Madras, India.
Talukdar, Muhammad H.R. (Edited): 1987, Memoirs of Huseyn Shaheed Shurawardy, University Press Limited.
Gandhi, Rajmohan: 1988, Understanding the Muslim Mind, Penguin Books India.
Samsad English- Bengali Dictionary ; Fifth edition, 1976.
Wahab (P), Maj. Gen. (Retd) M A:Mukti Bahani Wins Victory
Ahmed, Imtiaz:The Superpower strategy in the Third World : the 1971 South Asia;
Burke, S. M: 1974, Mainsprings of Indian and Pakistani foreign policies , University of Minnesota Press,USA
Uban, Maj.Gen Sujan Singh.: 1985, Phantoms of Chittagong the Fifth Army in Bangladesh, Allied Publishers, India.
The Secretariat of International Commission of Jurists, THE EVENTS IN EAST PAKISTAN, 1971: A Legal Study, Geneva, 1972
Sengupta Nitish K. ; The Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharat to Mujib, , Penguin, India
Bangladesh Document vol-I, Indian Government,
Muhit, AMA :Bangladesh Emergency of a Nation
Safiullah, Maj. Gen. (Retd) K M: Bangladesh at war, Academic Publisher, Dhaka 1989
Bass, Gary Jonathan : The Blood Telegram India's Secret War in East Pakistan, Random House India, 2013
Victory in Bangladesh, Maj Gen (Retd) Lachman Shing PVSM ; Nataraj Publishers, 1981

www.pathagar.com

e-books

কামাল, ফিরোজ মাহবুবঃ একাত্তরের-আত্মঘাতের ইতিহাস, Through the webpage Dr Feroz Mahbub Kamal, Accessed on 10.10.2010

Chowdhury, Dr. M. Abdul Mu'min: Behind the Myth of 3 million, Accessed on 04.01.2012

সংবাদপত্রঃ

১. ঐ আমার দেশ তারিখঃ ২৭.০৩.২০১২। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা অর্থনৈতিকভাবে কার অধীনে রয়েছি।

২. সাপ্তাহিক দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা (১৮৮৫-১৯৯৫); শ্রী অতুল্য ঘোষ, পৃঃ ১৩০

৩. ইতিহাস অন্বেষা, জুন- জুলাই ২০১০ সংখ্যা। উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী, ইবনে আমীর,

৪. দৈনিক পাকিস্তান; তারিখঃ ১০ মার্চ ১৯৭১

৫. দৈনিক সংগ্রাম ; তারিখঃ ১০ মার্চ ১৯৭১

৬. Daily Telegraph (London); March 30, 1971; Tanks crushed revolt in Pakistan, Simon Dring,

৭. প্রথম আলোঃ তারিখঃ ২১ মার্চ, ২০১২; গণহত্যা এড়াতেই মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা,ড. কামাল হোসেন,

৮. প্রথম আলো; তারিখঃ ১৭.০৩.২০১০

৯. আমাদের সময়; ২৯.০৭.২০১১

১০. প্রথম আলো, ০৭.০৯.২০১৪

১১. দৈনিক ইনকিলাব; তারিখঃ ২৯.০৭.২০০০

১২. Dhaka Courier; 15 April 1994; Indo-Bangladesh Friendship Treaty; Expression of Indian Mistrust and Our Sincerity, Brigadier Anwarul Azim Khan;

১৩. দৈনিক যুগান্তর; ২২.১১.২০১০, 'বামপন্থীদের ঐতিহাসিক ভুল' প্রসঙ্গে কিছু কথা ; আ বে দী ন , জ য় নু ল;

১৪. লন্ডনের 'দ্য টাইমস' এর ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সনের সম্পাদকীয়।

১৫. আমার দেশ, ২২.০৪.২০১০

১৬. দৈনিক প্রথম আলো, তারিখঃ০১.১২.২০১০ 'স্বায়ত্বশাসনের দাবী থেকে স্বাধীনতার ডাক' মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

১৭. ইজভেস্তিয়া, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ (বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী ; পৃঃ ৫০৮ থেকে সংগৃহীত)

www.pathagar.com

১৮. প্রাভদা ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ (বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ -- সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী ; পৃঃ ৫০৫ থেকে সংগৃহীত)
১৯. দৈনিক যুগান্তর, ০৫.১২.২০১০; বিভুরঞ্জন সরকার; বিজয়ের মাসে যে প্রশ্নের উত্তর খোজা জরুরী , -
২০. আমাদের সময় ,শনিবার, ০৮.০৮.২০০৯; ৩য় সংস্করণ; মাহমুদুর রহমান মান্না , কতটা গণতান্ত্রিক হয়েছে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ?
২১. দৈনিক আজকের কাগজ, ১২ চৈত্র ১৪০০, নীলিমা ইব্রাহীম, '৭১-এর ছাবিবশে মার্চের এ্যালবামঃ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা,
২২. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ আগষ্ট ২০১২
২৩. দৈনিক আমার দেশ, তারিখঃ ১২.০৪.২০১১; পাঞ্জাবের গভর্ণর সরদার লতিফ খোসার সাক্ষাৎকার।
২৪. কালের কণ্ঠ, তারিখঃ ১৫.১২.২০০৯
২৫. সাপ্তাহিক জনতার চোখ; তারিখঃ ০৫.০২.২০০৯; মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার,
২৬. সাপ্তাহিক বিক্রম; তারিখঃ ১২.১২.১৯৮৮
২৭. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক ২৮ অক্টোবর ২০১০. আত্মজৈবনিক সাক্ষাতকার ড. কামাল হোসেন।
২৮. দৈনিক আমার দেশ, তারিখঃ ১২.০৪.২০১১; পাঞ্জাবের গভর্ণর সরদার লতিফ খোসার সাক্ষাৎকার।
২৯. সাপ্তাহিক 'কাগজ', ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৯০; শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন'– মতিউর রহমান চৌধুরী
৩০. আমাদের সময় , তারিখঃ ২৭.০৯.২০১০
৩১. দৈনিক বাংলা তারিখঃ ০৪ জানুয়ারী ১৯৭২
৩২. বাংলাদেশ গেজেট; অতিরিক্ত সংখ্যা; তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
৩৩. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখ ০১.০৪.২০১০
৩৪. দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ ১১.১০.২০০১
৩৫. দৈনিক সংবাদ; ০৩.০১.১৯৭৩
৩৬. দৈনিক আমার দেশ, তারিখঃ ১৩.০৩.২১০১২
৩৭. আমার দেশ, ১৩ মার্চ ২০১২
৩৮. প্রথম আলো, ১৩ ।০৮ ।২০১৪, ফিরে দেখা পাঁচাত্তর, মহিউদ্দিন আহমেদ
৩৯. প্রথম আলো ১৫ আগস্ট, ২০১৪; মুজিব হত্যা, খুনি মেজররা ও আমাদের দ্বিচারিতা;সোহরাব হাসান
৪০. ১২ জুন ২০০৮ তারিখের সকল জাতীয় সংবাদপত্র।

www.pathagar.com

৪১. The Economist, date Jul 30th 2011
৪২. দৈনিক আমার দেশ; তারিখঃ ২৭.১১.২০১১
৪৩. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক এর ২৫.০৩.২০১০ তারিখে প্রকাশিত ছাত্রলীগ সার্কাস শীর্ষক প্রতিবেদনে ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার।
৪৪. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক , ১২ আগষ্ট ২০১০
৪৫. আমার দেশ , ১৬.০৩.২০১০
৪৬. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, ১৯.০৭.২০১২
৪৭. দৈনিক আমার দেশ, তারিখ ঃ ১৪.০৭.২০১১
৪৮. দৈনিক দিনকাল, তারিখঃ ২০.০৫.১৯৯৩; বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার ১২ বছর, শওকত মাহমুদ,
৪৯. দৈনিক আমার দেশ, তারিখঃ ১৬.০৩.২০০৭
৫০. ২০.১০.২০১০ তারিখে আমাদের সময় পত্রিকায়-বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের বিজ্ঞাপনে গোলাম আযমের ১৯৭১ সনের বক্তব্য।
৫১. THE HINDUSTAN TIMES, New Delhi: 21 December 1971
৫২. The daily Newyork Times; 17.12.1971; BENGAL'S ELITE DEAD IN A DITCH, Nicholas Tomalin
৫৩. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক; তারিখঃ ২৩.০২.২০১২
৫৪. আমার দেশ; তারিখঃ ২৭.০৯.২০১১; প্রধানমন্ত্রী হত্যার ষড়যন্ত্র, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম,
৫৫. আমার দেশ; তারিখঃ ১১.১০.২০১১; প্রধানমন্ত্রী হত্যা ষড়যন্ত্র-৪, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম
৫৬. Daily Telegraph , December 20, '71
৫৭. New York Times (New York, NY, USA): p. 1 December 19 , 1971"125 Slain in Dacca Area, Believed Elite of Bengal".
58. The Indian Quarterly Register; p: 647
৫৯. বাংলাদেশ প্রতিদিন, রকমারি, তারিখঃ ১৪.১২.২০১০
৬০. দৈনিক ভোরের কাগজে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সংখ্যায়' 'জহির রায়হানের অন্তর্ধান বা ঘটেছিল সেদিন' পান্না কায়সার
৬১. দৈনিক লাল সবুজ; ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৩ ;
৬২. দৈনিক আজকের কাগজ ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩
৬৩. বাংলাদেশ প্রতিদিন, রকমারি, তারিখঃ ১৪.১২.২০১০
৬৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন, রকমারি, তারিখঃ ১৪.১২.২০১০
৬৫. সপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৮৭; ন্যাপের ৩০ বছর।

www.pathagar.com

৬৬. ১৯৭৮ সনের কোন এক সময় 'সাপ্তাহিক মতামত বা জনমত' এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে বলা হয় জহির রায়হানকে ভারতের একটি কারাগারে দেখা গেছে।
৬৭. দৈনিক সমকাল ৩০ জানুয়ারি ২০০৭; মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণাঙ্গনে জহির রায়হান ট্রাজেডি, ফারুক ওয়াসিফ,
৬৮. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক; তারিখঃ ২৩.০২.২০১২
৬৯. দৈনিক যুগান্তর, তারিখঃ ০৫.০৪.২০১২
৭০. দৈনিক বাংলা; তারিখঃ ১১.০১.১৯৭২
৭১. দৈনিক ইত্তেফাক; তারিখঃ ০৬.১১.২০০৭
৭২. বাংলাদেশ প্রতিদিন; তারিখঃ ২৫ মার্চ ২০১১; একজন প্রবীণ নেতার মহাপ্রয়াণ, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম
৭৩. আমাদের সময় ; তারিখঃ ২৫.১২.২০১০
৭৪. দৈনিক ইত্তেফাকের ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩ এর সম্পাদকীয়
৭৫. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখঃ ১৯.০১.২০১২ ।
৭৬. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক; তারিখঃ ২৬.০৪.২০১২; গুম? রাজনীতি, শুভ কিবরিয়া।
৭৭. ১২ জুন ২০০৮ তারিখের সকল জাতীয় সংবাদপত্র।
৭৮. আমাদের সময়; ০৫.০৫.২০১০; ডাঃ এম এ হাসান, আহ্বায়ক, ওয়ার ক্রাইম্স ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির ০৪.০৫.২০১০ তারিখে টেলিভিশনে দেয়া বক্তব্য
৭৯. আমাদের সময়, তারিখঃ ১৯.০৩.২০১০
৮০. দৈনিক ইত্তেফাক; তারিখঃ ০৬.১১.২০০৭
৮১. The Nation, 31 May, 2009
৮২. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখঃ ০১.০৪.২০১০
৮৩. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক তারিখঃ ২৩.০২.২০১২; দলীয় না নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, শুভ কিবরিয়া,
৮৪. দৈনিক যুগান্তর ; তারিখঃ ০৪.০৪.২০১০
৮৫. দৈনিক যুগান্তর তারিখঃ ০৬.০৪.২০১০
৮৬. বাংলাদেশ প্রতিদিন, তারিখঃ ০৪.০৪.২০১০
৮৭. দৈনিক ইত্তেফাক ; জুলাই ৭, ১৯৭৩
৮৮. দৈনিক প্রথম আলো, তারিখঃ ২০.০৪.২০১২।
৮৯. দৈনিক আমার দেশে, তারিখঃ ২১.০৪.২০১২
৯০. আমার দেশ ; তারিখঃ ০১.০১.২০১২; গুপ্তহত্যা , বছরের ট্রাজেডি, অলিউল্লাহ নোমান,
৯১. প্রথম আলো; তারিখঃ ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০

www.pathagar.com

৯২. দৈনিক প্রথম আলো, তারিখঃ ২০.০৪.২০১২ ।
৯৩. মাসিক 'অন্য দিগন্ত'; এপ্রিল ২০১০
৯৪. দৈনিক আমাদের সময়; ৩০.০৫.২০১০; জেগে থাকো যুবলীগ, সৈয়দ বোরহান কবীর
৯৫. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখঃ ৩০.০৪.২০০৯
৯৬. Times of India, 25.07.1925
৯৭. দৈনিক কালের কণ্ঠ , ২৮.১১.২০১০; টুন টুন টুনা টুনি , তিতুমীরের লড়াই ;
৯৮. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮-২০/০১/২০১০, কেরী স্টিফেন কিউসি, বাংলাদেশের সংবিধান এবং যুদ্ধাপরাধ বিচার আইন ।
৯৯. দৈনিক সংগ্রাম, ২ মার্চ ১৯৭১
১০০. আমাদের সময় ০১.০৭.২০১০
১০১. আমাদের সময় ০৩.১১.২০১১
১০২. আমার দেশ, তারিখঃ ১৮.০১.২০১২
১০৩. ১৩. ০১. ২০১১ তারিখের Stephen J. Rapp এর সংবাদ সম্মেলন ।
১০৪. দৈনিক ইত্তেফাক; তারিখঃ ০২.০৭.২০১১; অন লাইন জরিপ,
১০৫. Press conference of Stephen J Rapp , January 13, 2011, মতামত ।
১০৬. দৈনিক আমার দেশ, তারিখঃ ১৮.০৩.২০১২
১০৭. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, তারিখঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২
১০৮. দৈনিক আমার দেশ, তারিখ ঃ ০৯.০৪.২০১২
১০৯. দৈনিক জনকণ্ঠ, ০৮.০২.২০১৩
১১০. সপ্তাহের বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২; পৃঃ ৩০-৩২
১১১. দৈনিক আমার দেশ; ১৪.০৭.২০১১
112. cÖ_g Av‡jv, 03.09.2014 |
১১৩. নয়াদিগন্ত, ১৩.০৩.২১০৩; শাহবাগে অর্জন, শাহবাগ বর্জন, মামুন ইমতিয়াজ.
১১৪. The Economist, London, 09.03.2013
১১৫. দৈনিক মানবজমিন, ১৫.০৩.২০১৩
১১৬. আমার দেশ, ১৫.০২.২০১৩
১১৭. প্রথম আলো, ২১.০৩.২০১৩
১১৮. দৈনিক যুগান্তর, ০৭.০৩.২০১৩
১১৯. প্রথম আলো, ৮ জুলাই ২০১৪; দশম জাতীয় সংসদের প্রথম বাজেট অধিবেশনটি ছিল খুবই প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য, সৈয়দ আবুল মকসুদ

www.pathagar.com

১২০. দৈনিক জনকণ্ঠ , ২০.১০.২০০৪ । সার্বজনীন দুর্গাপূজা ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন,
শাহরিয়ার কবির,

১২১. প্রথম আলো, ১২.০৬.২০১২

১২২. দৈনিক কালের কণ্ঠ, তারিখঃ ২৬.১২.২০১০

Nevigated websites:

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight; [Accessed on 04.01.2012

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight; [Accessed on 04.01.2012]

3 http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Dhaka_University_massacre [Accessed on 04.01.2012]

4 http://www.newworldencyclopedia.org /entry/Bangladesh_War_of_Independence// [Accessed on 03.01.2012]

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight; [Accessed on 04.01.2012]

6 http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-43576// [Accessed on 03.01.2012]

7 http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-43576// [Accessed on 03.01.2012]

8 http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police // [Accessed on 02.01.2012]

9 http://bgb.gov.bd/index.php /bgb/history// [Accessed on 03.01.2012]

10 www.liberationwarmuseum.org/in this month-in-1971/188-may-12-1971 [Accessed on 29.10.2009]

11 www.liberationwarmuseum.org/this-month-in-april 4, 1971 [Accessed on 29.10.2009]

12 www.liberationwarmuseum.org / this-month-in-June 5, 1971 [Accessed on 29.10.2009]

13 www. liberationwarmuseum.org/ in this day/ June 4, 1971 [Accessed on]

14 www.liberationwarmuseum.org/ this day/ June 1, 1971[Accessed on 29.10.2009]

www.pathagar.com

15 www.liberationwarmuseum.org/ this day/ June 4, 1971[Accessed on 29.10.2009]
16 www.liberationwarmuseum.org/ this day/ April 02, 1971[Accessed on 29.10.2009]
17 www.liberationwarmuseum.org/ this day/ April 10, 1971 [Accessed on 29.10.2009]
18 www.liberationwarmuseum.org /in this day/April15 , 1971[Accessed on 29.10.2009]
19 http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=117851 [Accessed on 02.06.2011]
20 http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA13/001/2000/en/a40d7d31-df83-11dd-8abb-118b2e919ec0/ asa1 30012000en.html [Accessed on 02.06.2011]
21 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-06-27/india/ 27752774_1_manekshaw-field-marshal-sam-bahadur // [Accessed on 29.05.2011]
22 http://www.topix.com/forum/world/bangladesh/TJB1Q2IQBSQT18CPH [Accessed on 29.05.2011]
23 http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/24/mujib-confusion-on-bangladeshi- deaths [Accessed on 08.06.2011]
24 http://www.google.com/#hl=en&sa=X&ei=PRP6TeXNIvRrQeD9m2Dw&ved=0CFUQBSgA&q=In+1975,Sheikh+Mujibur+Rahman+was+assassinated.+Though+Mrs +Indira+Gandhi+first +considered+intervention+and + Army+alerted+3+divisions,+in+the+end+the+government+h esitated+and+the+moment+passed.&spell=1&ba v=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=9dd7129c70b71d22 &biw=1358&bih= 97 [Accessed on 15.06.2011]
25 http://www.cfr.org/india/raw-indias-external-intelligence-agency/p17707 [Accessed on 23.10.2011]
26 www.liberationwarmuseum.org /this day/ June 1, 1971 [Accessed on 29.10.2009]
27 www.omipial.amarblog.com [Accessed on 25.12.2009]
28 http://www.sonarbangladesh.com/article.php?ID=956 [Accessed on 19.05.2012]
29 www.liberation warmuseum.org August 28, 1971[Accessed on 31.07.2011]

www.pathagar.com

30 www.liberation warmuseum.org /Today/April 11, 1971[Accessed on 31.07.2011]

31 www.liberationwarmuseum org/Today/August 5, 1971[Accessed on 31.07.2011]

32 www.liberationwarmuseum org/Today/May 15, 1971[Accessed on 31.07.2011]

33 www.albd.org/menifesto (English & Bangla) [Accessed on 06.11.2010]

34 http://bangladeshonlinelawyers.com/law/index.php?option=com _content&view=article&id=53&Itemid=55 [Accessed on 29.07.2011]

35 http://www.internationallawbureau.com/blog/?p=3073 [Accessed on 31.07.2011]

36 http://www.bn.m.wikipedia.org/wiki/ফেরদৌসী_মজুমদার accessed 17.04.2014

37 http://socialhistory.org/nl/news/shahriar-kabir-prison accessed 15.04.2014

38 http://www.dawn.com/news/11817/protest-in-dhaka-for-release-of-journalist accessed on 08.04.2014

39 http://www.muktadhara.net/page03.html accessed on 08.04.2014

Talk show:

1. Syeda Asifa Ashrafi Papia MP, Talk show, RTV. March 06, 2013

২. RTV Talk show, তারিখঃ ০৬.১০.২০১১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স

ISBN : 974-15-41445 -0